একশো বছরের সেরা লেখিকাদের প্রিয় গল্প

সম্পাদনা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য্য ও উজ্জ্বল কুমার দাস

একশ বছরের

সেরা লেখিকাদের প্রিয় গল্প

সম্পাদনায়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

উজ্জ্বলকুমার দাস

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

৩৬এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

গল্পের নাম **পৃষ্ঠা**

ভূমিকা

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।/পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের সম্পর্কে এই উক্তি করেছেন যা প্রতিটি নারী পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আসছে।

বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী বেশির ভাগ মানুষ এর মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে অনভিপ্রেত ভাবনায়। কিন্তু বাস্তবে যদি তাতেও ফাটল ধরে আর তখনই নারীদের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয় বিশ্বকবির বাণী—'যদি সুখে দুখে মোরে কর সহচরী/আমার পাইবে তবে পরিচয়।'

শুধু এই কথা বলেই থেমে থাকা নয়, নারী শুধুমাত্র সহচরী হয়ে থাকবার বাসনায় তৃপ্ত হতে পারে না। তার মনের মধ্যে থাকে তীব্র ক্ষোভ। পুঞ্জিভূত মেঘের মতো ধীরে ধীরে তার মনের আকাশে বিস্তৃত হতে থাকে।

একসময় সেই পুঞ্জিভূত মেঘ অবিরাম বৃষ্টিধারার মতো ঝরে পড়ে ধরণীতে। আবেদন-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে সে নিজের অধিকারের দাবী জানিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সোচ্চার হয়ে ওঠেন বিশ্বকবিও 'নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার?' এই সোচ্চার কণ্ঠের ধ্বনি বিশ্বব্যাপি পবিব্যপ্ত হতে থাকে।

শুধুমাত্র লিঙ্গভেদে কেন এত বৈষম্য, বঞ্চনা, পরাধীনতা—যার ফলশ্রুতি হিসেবে একুশ শতকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'নাবীর ক্ষমতায়ন বর্ষ হিসেবে।

ভারতবর্ষের নারীদের যে অভিশাপটি অনন্তকাল ধরে অচল-অনর পাথরের মতো চেপে বসে রয়েছে তা হল 'শৃঙ্খলিত নারীসমাজ'। বহু বিক্ষোভ, আন্দোলন, সংগ্রাম করে এই পাথরটির অচলায়তন কিছুটা নাড়ানো সম্ভব হলেও একেবারে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভব হয়নি। তার ফল স্বরূপ পুরুষপ্রধান এই সমাজে নারীর মর্যাদা নির্ভরশীল থাকে পুরুষের দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা, ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর।

দীর্ঘকালের অভ্যাসে নারীও এই প্রথাকেই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। এই প্রথা বা অভ্যাসে অভ্যস্ত নারী একটি পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিতে আদর্শ গৃহিণী, সতীলক্ষ্মী, সেবাপরায়ণা বধূ-কন্যা বা ভগিনী। শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও সেই সমস্ত নারীরা তাদের লেখনীকে সচল বেখে আমাদের উপহার দিয়েছেন বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প।

বাংলা সাহিত্যেব সেই ভাণ্ডার থেকে কিছু গল্প বেছে নিয়ে 'একশ বছরের সেরা লেখিকাদের প্রিয় গল্প' গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে। দেড়শো বছরের আগে থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত যে সমস্ত লেখিকার জন্ম তাঁদের একটি করে গল্প বাছা হয়েছে এই গ্রন্থের জন্য। পাঠক পাঠিকারা ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাবেন লেখাগুলোর মধ্যে।

যদি অবধানতা বশত কোন লেখিকার গল্প এই সংকলনে বাদ গিয়ে থাকে তাহলে নিজগুনে ক্ষমা করবেন। অনুসন্ধান জানালে পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করার আশা রাখব। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ দাসকে। যাঁর প্রচেষ্টায় এই বই পাঠক পাঠিকাদের হাতে পৌছবে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য
উজ্জ্বলকুমার দাস

আদরের, না অনাদরের?

শরৎকুমারী চৌধুরানী

মঙ্গল আরতির মঙ্গল ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে শরতের মধুর জ্যোৎস্নায় মগ্ন দেখিলাম। পার্শ্বে শায়িতা সুকুমারী বালা আমারই, —আমারই সে—নির্ভয়ে নিস্পন্দে ঘুমাইতেছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তাই বড় সাধ হইলেও চুম্বন করিলাম না। মধুর জ্যোৎস্নায়, মৃদুমন্দ বাতাসে, ঈষৎ ঘুমঘোরে দেখিলাম, ধরণী নিজ সন্তান-সন্ততি লইয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রায় মগ্ন—বুকের কাছে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাছারা ঘুমাইতেছে—সকলেই মাতৃস্নেহে, মাতৃআদরে আপ্লুত। হেথায় পক্ষপাতিতা নাই—সকলেই মাতার সমান যত্ন স্নেহের ধন। সুমধুর জ্যোৎস্নাটুকু মায়ের হাসিখানির মত প্রকৃতি জননীকে হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে—মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলাম—ঘুমন্ত প্রকৃতি কি সুন্দর! দেখিতে দেখিতে তখন বহু দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—এমনই কত জ্যোৎস্নায় আপনাকে প্রিয়জনে বেষ্টিত দেখিলাম। স্মৃতিতে মধুর জ্যোৎস্না আরও মধুরতম মনে হইতেছিল, মনে পড়িল—"তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে, কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।" সহসা তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—শুনিতে পাইলাম, আমাদের বাতায়নের সম্মুখবর্তী পুষ্করিণীর ঘাটে একটা কথাবার্তা আরম্ভ হইয়াছে।

"কে ও? —কেষ্টদাসী, আজ যে বড় রাত থাকতে থাকতে ঘাটে এসেছিস? —কাল রাতে তোদের পাড়ায় শাঁখ বাজছিল, তোদের বৌয়ের কি এবার তবে বেটাছেলেটি হল?"

"না গো ছোট কাকী, সে কথা আর বলো না—আমাদের যেমন অদৃষ্ট, বৌয়ের আবার বেটাছেলে এ জন্মে হবে! যা হয়, একটা মেয়ে হয়েছে।"

"এবার নিয়ে তিনটে মেয়ে হল বুঝি?"

"হ্যাঁ গো কাকী, তিনটে হল।"

"তা হলে গণ্ডা ভর্তি হবে—তবে যদি বেটাছেলে হয়।"

"হ্যাঁ গো খুড়ী, তারই তো মতন দেখছি। তা মেয়েটা হয়েছে শুনে দাদা বলে—কেষ্ট, আমি আর উঠতে পারি না, আমার গায়ে আর বল শক্তি নেই। মায়ের কাছে ধাই বিদেয় চাইলে, মা আসলে বিছানা থেকে উঠলো না, কথা কইলে না। বৌ মেয়ে তুলবে না। কত বলা-কওয়ায় কোলে নিলে, তা বলে যে, গলা টিপে দেবো। আমি এখানে না থাকলে মেয়েটা বোধ করি মাটিতে পড়ে থেকে সদ্য মারা যেত। বাড়ীসুদ্ধ দুঃখেতে যেন কেমন হয়েছে।"

"তা থাকবে বৈ কি, তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে। অভাগীর মেয়ের যেমন অদৃষ্ট, দশ মাস গর্ভে ধরে কিনা একটা মাটির ঢেলা হল।"

"আহা খুড়ী, পাছে এবার আবার মেয়ে হয় বলে বৌ ভেবে ভেবে আধখানা হয়ে গেছে। আর পোড়া মেয়েগুলোরও সকলই বিশ্রী কিনা, এবার বৌয়ের এমন অরুচি হয়েছিল যে, পেটে জল যেত না। বড় মেয়েটা এই সবে চার বছরের। খুকী হয়েছে শুনে বলছে, ও তো খোকা নয়, তবে ওকে বিলিয়ে দাও।"

"কচি বয়েস, ওরা যেমন শোনে তাই বুঝে; একটা একটা কথা পাকা মতন বলে ফেলে, তা অটকৌড়ে হবে তো?"

"তা এখন কি জানি, হয়ত অমনি নিয়ম রক্ষা, আটটি ছেলে ডেকে কুলো বাজিয়ে দেবে। মা এবার কত সাধ করেছিল খোকাটি হবে, অটকৌড়েতে ভাল করে হাঁড়ি করবে, তবে ষষ্ঠী পুজোতে তেল সন্দেশ বিলোবে, তা কিছুই হল না, সকলই মিথ্যা হল!"

"তা মেজদিদি নরেশের বিয়ে দিক না। এর হল না হল না করে এতদিন পরে শেষে মেয়ে হতেই চললো। নরেশ একটি ছেলে, কেবল মেয়ে হলে নাম রাখবে কে?"

"তা খুড়ী, দাদা কি করবে। এ কালের ছেলে, ওরা ঝগড়া-ঝাঁটির ভয় পায়। বৌয়ের ছেলে হল না হল না করে মা যখন হেদিয়ে দাদার বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখনই দাদা বিয়ে করতে চায়নি, তা এখনও তো মেয়ে হচ্ছে—ছেলে হবার আশা হয়েছে। তবে মায়ের কিনা একটি ছেলে, মা তাড়াতাড়ি সকলই চায়। বৌয়ের এমন কিছু বেশি বয়সে মেয়ে হয়নি, বছব আঠার বুঝি বড় মেয়েটা কোলে হয়েছে—তা মা একেবারে অস্থির হয়ে বৌকে কত ওষুধ-বিষুধ খাইয়েছিল, কত মাদুলি, কত ঠাকুরের দোর ধরা, কত কি করার পর ঐ মেয়ে হল। তা তখন আশা হল, মেয়ে হয়েছে, তা এইবার তবে নাতি হবে—ও মা, বার বার তিন বার, আর কত সহ্য করবে। তা মা তো বলে যে, বৌয়ের এবার মেয়ে হলেই ছেলের আবার বিয়ে দেব। তা দাদা তো রাজী হয় না, নইলে মা কন্যে পর্যন্ত দেখে রেখেছে। আর মা একটু চিবকাল অধৈর্য আছে। আমরা তাই বলি, অত ভেবে হাতড়ে পাতড়ে বেড়ালে কি হবে, মেয়ে হয়েছে, ছেলেও হবে, তা এবার আর আমাদের কিছু বলবার রইল না।"

এখন সূর্যোদয় হয় নাই। উষার ঈষৎ মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে। এখনও কৃষ্ণপক্ষেব চাঁদ পশ্চিমাকাশে জ্বলজ্বল করিতেছে। মৃদু মৃদু প্রভাত সমীরণ কত দূর হইতে কেযাফুলেব সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া লইয়া আসিতেছে। জনকোলাহল এখনও উত্থিত হয় নাই। এমন সময় আমাদের পরিচিত গৃহিণীর কলকণ্ঠস্বরে পাড়ার সকল লোক জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিয়া জানালায গিয়া বসিলাম। একদিকে বাখারির বেড়া এবং তিনদিকে ইমারৎ-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বাগান নামধাবী স্থানের মধ্যে একটি ছোট রকম পুষ্করিণী। এমন বর্ষাতে কুলে কুলে জল হইযাছে। কিন্তু চারিপাশের জল হিংচা, কলমি, সুশনি শাকে সবুজ—কেবল মাঝখানে খানিকটা জল কতকটা পরিষ্কার আছে। পুকুবটির পাড়ে এক ধারে আম, জাম, জামরুল প্রভৃতি দু'চারটি ফলবান বৃক্ষ— বৃক্ষের তলা কেহ কখনও পরিষ্কার করে না। এক ধারে পাঁচ-ছয়টি কলাগাছ— প্রাযই তাহাদের একটি না একটি গাছকে ফলভারে পুকুরে উপর অবনত দেখা যায়। এক ধারে দু'একটি আধমরা গাঁদা ফুলের গাছ--দু'একটি জীর্ণ গোলাপগাছ—কখনও তাহাতে ফুল হইতে দেখা যায় না। কদাচিৎ দু'একটি কুঁড়ি দেখা যায, কিন্তু তাহা অর্ধস্ফুট না হইতে হইতে শুকাইয়া যায়। একটি অপরাজিতা লতা, হতাদরে বেড়ার গায়ে লতাইয়া উঠিয়া বেড়ার কঙ্কালের কতক অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—মাঝে মাঝে দু'চারটি ফুলও লতার বুকে শোভা পায়— সে ফুলে দেবপূজাও হয়। রোপণকালে লতাটির কত না আদব ছিল, কিন্তু এখন আব কেহ তাহার দিকে চাহে না—তবুও সে এখনও ধীরে ধীরে নিজ কার্য করিতেছে।

"ও মা, কথা কইতে যে ভোর হয়ে এলে—আজ আর জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হল না। তা থাক— একটু জাহ্নবীর জল পরশ করব এখন—একেবারে তবে পুকুর থেকে চান করেই যাই। ওগো, ও নাতবৌ, এইখানে আমার একটু তেল দিয়ে যা।" আজ ঘাটের শুভ দিন—ভাবি মজলিস—গৃহিণী নহিলে ঘাট ভাল মানায় না।

"তাই তো বলি কেষ্টদাসি, এ-কালের ছেলেপিলে কি মা-বাপকে মানে? আমার শ্বশুর বড় গিন্নীর (ইহার সপত্নীর) ছেলে হল না বলে অমনই আমার সঙ্গে কর্তার বিয়ে দিলেন—তা বাছা, পরমেশ্বর মুখ রক্ষা করলেন তেমনই, বছর দুই বিয়ে হতে না হতে প্রথমেই আমার রাধানাথ হল। তা আঃ

কোথা গেল আমার সে ছেলে—আমি পোড়াকপালী বসে আছি—ভাগ্যিস্ তার দুটো গুঁড়ো আছে, তাই নিয়ে সংসারে আছি—নইলে পাগল হয়ে কোন্ দেশে চলে যেতুম। তারপর জানিস্ বাছা, তার বছরখানেক বাদে বড় গিন্নীর হরলাল হল। আমার যখন বিয়ে হল, তখন বড় গিন্নীর ছেলে হবার বয়েস যায়নি—তবে ওর বাপ শুনেছি খুব ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন—আর কর্তার চেয়ে বড় গিন্নী বছর দুয়ের বয়সে ছোট ছিল—বিয়ের সময় মাথায় প্রায় এক দেখে সুতো জোঁকা দিয়ে তবে বিয়ে হয়। আমার একটু ডাগর হয়ে বিয়ে হয়েছিল, কর্তাব তো আমি দোজপক্ষের মতনই—আমিই সময়কালে বিয়ের পরিবারের মতো হলুম। তা সেকালের কর্তারা অত হিসেব কিতেব বুঝতেন না, বললেন বিয়ে কর—এঁরা এমন এ কালের ছেলেদের মত মা-বাপেব কথা ঠেলতে পারতেন না। আমার শ্বশুর বলতেন, যে আবেগের বেটি কোঁদল করবে, সে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকুক— আমার বাড়ী তার ঠাঁই হবে না। তাঁদের দবন ছিল কত— কর্তা বাড়ির ভেতর এলে আমরা কচি কাঁচা বৌ-ঝি তো ভয়ে কাঁটা হতম—ঠাকবুণ সুদ্ধ ভয়ে সাবা হতেন। একেলে মেয়েরা দিবা-বাত্রি স্বামীব সঙ্গে মুখোমুখি করে থাকে— জানিস কেষ্ট, আমাদেব তা হবার জো ছিল না। বাত্রে সকল নিযুতি হলে তবে ঘরে কেউ দিয়ে আসত, তবে যেতুম। এক একদিন বাবান্দায়, কি দালানে ঘুমিয়ে পড়তুম— আব কেউ ঘরে যেতে বলতে যদি ভুল যেত, তবে সেইখানেই রাত কাটত। রাধানাথ ছ-মাসেব হলে তবে শাশুড়ী একদিন রাধানাথের বিছানা ঘবে দিলেন, সেইদিন থেকে যায় যেদিন পালা পড়ত, সে সেইদিন ঘবে শুতে যেতুম। আমাদেব ছেলে হলে ছ-মাস কর্তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কববাব হুকুম থাকত না—তবে এদানী কিছু দরকার হলে কর্তা লুকিয়ে-চুরিযে ভাঁডাব ঘবে, কি বান্নাঘবে এসে বলে যেতেন। তা বাছা, আমবা দিনেরবেলা কথা কইতুম না, শাশুড়ী টেব পেলে গঞ্জনা সইতে হবে, এমন কথা নাই বা কইলুম। তা এ-কালে সব রকমই আলাদা, দেখেশুনে হাত-পা পেটেব মধ্যে সেঁধিযে যাচ্ছে।"

মুখে অনর্গল বক্তৃতা চলিতেছে—হস্ত তৈলসমেত সর্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইতেছে। ক্রমে সূর্যোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে অনেকগুলি রমণী মুখকমল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেবই মন গহীণীর বক্তৃতাব দিকে, সকলেই নিজ নিজ স্নান ভুলিযা গিযাছেন—কাহাবও দাঁত মাজা আব শেষ হয না, কেহ গামছা দিয গাত্র মর্দন করিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। মূল কথা, মিত্রদের মেয়েটা হইয়াছে শুনিয়া সকলেই—তাই তো, আহা, মেয়েটা হল, বেটাছেলেটি সার্থক হত, বলিয়া আহা উহু কবিতেছেন। একজন আশ্বাস দিযা কহিলেন "তা হোক, কত লোকেব সাত মেয়েব পর ছেলে হয—আমাব পিসতুত বোনের সেদিন চাব মেয়ের পর খোকাটি হয়েছে— খোকাটি এই ষেটেব এক বছবের হল।"

এই বমণীমণ্ডলীর মধ্যে দু'ঘোমটাবৃত যুবতী বধূ ও কন্যা স্নান কবিতেছিল --একটি চতুর্দশবর্ষীযা কন্যা আব থাকিতে পাবিল না। মাতৃ সম্বোধনে কৃষ্ণদাসীকে কহিল—"তা মা, মামীব মেয়ে হযেছে বলে তোমাদেব দুঃখু রাখবার যেন ঠাই নেই, তাই ঘাটে এসেও সেই কাহিনী হচ্ছে—তা তুমি যা বল, আমার কিন্তু বাপু ঘোষদের কালো কালো ছেলের চেয়ে মামীব মেয়েদেব বেশ ভাল লাগে—অমন একটা কালো ছেলের চেয়ে সাতটা সুন্দর মেয়ে ভাল। তোমাদেব এক কথা, মেয়ে বুঝি কোন কাজে লাগে না? তুমি এই যে আষাঢ মাসে এখানে এসেছে, দু-তিন মাস যে করে দিদিমার সেবা করছ, মামা তেমন করেনয় দিদিমাই তো দুঃখ করেন, আমার মেয়ে অসময়ে যত করে, ছেলে আমাব তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ের দরকার—এদিকে মেয়ে হয়েছে শুনলেই সর্বনাশ বাধে। এই যে ও-বাড়ীর ছোট ঠাকুরমা—কাকা তো এক পয়সা আনতে পাবেন না—যাই ক্ষেমা পিসি ছিলেন, তিনি খরচপত্র দিচ্ছেন, তবে কাকার শুদ্ধ চলছে। কিন্তু শুনেছি, ক্ষেমা পিসির আগে আর দু' বোন হয়, তাই

ওঁর নাম ক্ষেমা রেখেছিল।" এমন বিদ্রোহসূচক কথা শুনিয়া ঘাটসুদ্ধ সকলে অবাক হইয়া গেল। কাক আর ডাকে না, গাছের পাতা আর নড়ে না। গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন, "ওলো পেরভা, থাম থাম—যখন তোর হবে, তখন বুঝবি—এখন ছেলেমানুষ কি বুঝবি—ছেলেমানুষের মুখে অত পাকা পাকা কথা ভাল শোনায় না।"

"তা ছোট ঠাকুরমা, সত্যি কথা বলছি—কেন এই ও-বাড়ীর ছোট মামীও বলছেন যে, ওঁর যদি মেয়ে হয়, তাতে কিছু দুঃখু হবে না। মামীও তো মেয়েদের কত ভালবাসেন, কেবল দিদিমার লাঞ্ছনার ভয়েই তো পাছে মেয়ে হয় বলে অত ভয় পান। মেয়ে হয়েছে, এখন ছেলে হবার সাধ হয়, দিদিমার ভয়ে মেয়েদের ভাল করে আদর পর্যন্ত করতে পারেন না। মামাবাবু ভয়ে পুজোর ভাল কাপড় অবধি করতে দিতে সাহস পেলেন না—নইলে মেয়েকে দিতে তাঁর ইচ্ছা হয়—কে জানে বাপু, তোমবা কি বোবা—তোমরা কি মেয়ে নও—?"

"হ্যাঁ গো জ্যাঠাইমা ঠাকরুণ, আমরা মেয়ে বটে, তা আমার কত আদর ছিল জানিস? আমি মায়ের প্রথম সন্তান—দিদিমার আদুরে, ঠাকুরমার আদুরে—ঠাকুরমা বলতেন, ও কি আমার মেয়ে, ও আমার সাত বেটা, তা বলে গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়া গৃহস্থের অলক্ষণ।"

ক্রমে প্রভাব সমবয়স্কা আরও দু'চারিটি কন্যা ঘাটে আসিয়া জুটিল। হরিদাসী কহিল—"কি ঠানদিদি, আজ যে ঘাট জাঁকিয়ে তুলেছ, ব্যাপারখানা কি?"

"কি লো হবিদাসী, এসেছিস? তাই তো বলি, তুই নইলে কি ঘাট মানায? আমবা বুড়ো মানুষ, আমরা আর ঘাট জাঁকাব কি, দুটো দুঃখের-সুখের কথা কইছি বই তো নয়। তোদেবই এখন জাঁকেব বয়েস—তাই বলছিলুম, বলি হরিদাসী যে এখনও এল না—কাল রাতে বুঝি নাতজামাই এসেছিল?"

"সে আমি কি জানি ঠান্‌দিদি, সে তোমবা জান। আমরা ঘাটে আসতে আসতে পথেব ধারে হরকালী কাকার বাড়ী গেছলুম—তাদের খোকা দেখে এলুম; তাই আসতে একটু দেরি হল।"

"বটে! ওদের কেমন অদৃষ্ট দেখেছিস—এখন সময় ভাল, সব দিকে ভাল হয়—বৌযেদের কেবলই বেটাছেলে হচ্ছে। আর ঘটাও তেমনি করে—এই আটকৌড়েতে হাঁড়ি কণা বে—ষষ্ঠী পুজোয় তেল সন্দেশ দেওয়া রে—ভাতে বোগ্‌নো করা রে—খাওয়ানো রে, দাওয়ানো রে, সব করে। কেষ্টর মার যেমন অদৃষ্ট—একটা বৌ—কেবল গণ্ডা গণ্ডা মেযে হচ্ছে।"

হবিদাসী। "—তা হলই বা—মেয়ে বুঝি ফেল্‌না?"

"ও বাবা! তোদের এ-কালের যে সবই সমান দেখি—পেরভাও ঐ কথা নিয়ে কত মুখনাড়া দিলে—মেয়েছেলে আবার কোন কাজের গো?"

"কোন কাজের নয় গো? বাপ-মা, স্বামী-পুত্র, কারও অসুখ হোক, কাবও অনটন হোক, মেয়েতে যত করে, এত কোন্ ছেলেতে করে গা? মাকে মেয়ে যত যত্ন করে, মায়ের দুঃখ যত মেযেতে বোঝে, এত কি ছেলেতে বোঝে? ওগো, ওগো, স্ত্রীলোক হচ্ছে লক্ষ্মী—হাজার টাকাকড়ি থাক্, দেখ, যে বাড়ীতে গৃহিণী নেই, সে ঘরকন্না কেমন বেশৃঙ্খল, যে ছেলেদের মা নেই, সে ছেলেপিলের কত অযত্ন! মেয়ে হয়েছে শুনেই তোমরা লাফিয়ে ওঠ, কি না বিয়ে দিতে হবে! তা বাপু, ছেলের জন্য কি কিছু খরচ নেই? সেনেদের বাড়ী দেখতে পাই, ছেলেদের খাওয়া হলে তবে সেই পাতে মেয়েদের অমনি যা-তা দিয়ে খেতে দেয়। ছেলেদের জুতো জামা, সাফ কাপড়। মেয়েদের মযলা পাঁচী ধুতি। ছেলেদের দু' পয়সা করে এক একজনের খাবার বরাদ্দ, মেয়েদের এক পয়সার আটার রুটি করে তিন চারটিকে দেয়। ছেলেরা ভাল গদিতে খাটে শোয়—মেয়েগুলি মেঝেতে মাদুরে একটা ছেঁড়া লেপ

পেতে শোয়। বড় বড় ছেলেরাও মা-বাপের সঙ্গে শুতে পায়, ছোট বোন দু'টি রাঁধুনীর কাছে শোয়।—আহা, তাদের যদি একটু যত্ন আছে! সেদিন ও-বাড়ীর মেজ কাকীর মেয়ে মামার বাড়ি থেকে বাড়ি এসেছে, ঠাকুরমার কাছে সকালে ভাত চেয়েছে, তখনও কেউ খায়নি বলে ঠাকুরমা স্বচ্ছন্দে তাকে বললে কিনা, মেয়েমানুষ আগ-দোফের ভাত খাবি কি! এখনও কেউ খায়নি, আগে ভাগে ভাত দাও! আগে বাপ খুড়ো খাগ, তবে সেই পাতে খাস। আহা, সে ছ-সাত বৎসরের মেয়ে, অত কি জানে, ভাতের জন্য কাঁদতে লাগল। শাশুড়ীর ব্যবহার দেখে মেজ কাকীমা রাগ করে তখনই তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। আমাদের কাছে কত দুঃখু করতে লাগল যে, বাছা যে একদিন বাড়ি এল, দুটো ভাতের জন্যে কেঁদে চলে গেল। এ কি মায়ের প্রাণে সয়! তা কে জানে, মেয়ে আদরের না অনাদরের!"

"বাবা, এ-কালের মেয়েগুলোর মুখের তোড় দেখ, যেন ঝড় বয়ে গেল, যা যা, আর জলে পড়ে থাকিস নে, অসুখ হবে।"

যাহা হউক, অল্পবয়স্করা আর অধিক উত্তর-প্রত্যুত্তর করিল না। তাহারা স্নান সমাপনান্তে গৃহে চলিয়া গেল। সকলেই আসিতেছে, অল্পবিস্তর শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পুষ্করিণী-অধিকারিণীর সেই তৈলমর্দনই চলিতেছে। এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া হরকালীর মায়ের প্রবেশ—কি ব্যাপার! ইনি ভারি ব্যস্ত—ইঁহারই গৃহে কাল শাঁখ বাজিয়াছে—বধূর পুত্রসন্তান হইয়াছে।

"এ কি—ঠাকুরঝি যে, আজ গঙ্গা নাইতে যাস্‌নি? আমি বলি, আজ কেবল আমারই যাওয়া হয়নি—তা বোন, কি করি, মেজ বৌমার কাল রাত্রে বেটাছেলেটি হল—তা ফেলে যাই কি করে? জানিস তো, এ-কালের মেয়েগুলো সব বিবি হয়েছে—তাপ সেঁক নেবে না, ঝাল খাবে না। আমি তেমন মেয়ে নই—ঐ জন্যে বৌয়েদের কখন প্রসবকালে বাপের বাড়ি পাঠাই না। সেজ বৌয়ের বাপ আবার ডাক্তার, তিনি তাপ নিতে দেবেন না, ঝাল খেতে দেবেন না—মেয়েকে গদি পেতে শোয়াতে চান। জানো ঠাকুরঝি, আমাদের যেমন নিয়ম আছে, ডাক্তার বলেন, ও-সব ফেলে দাও। আমি তেমন মেয়ে নই—এই বসে বৌকে ভাজা ভাজা করে তাপ দিয়ে এলুম, এইবার নেয়ে গিয়ে ঝাল খেতে দেব। ডাক্তার আছেন, তিনি আছেন,—তাঁর মেয়ে ঘরে এনে কি আমি নিয়মভঙ্গ করব। সে-বার আঁতুড়ে সেজ বৌয়ের মেয়েটা গেল, ডাক্তার দেখতে এসে বললেন, এইসব স্যাঁতানে জায়গায় পড়ে ব্যায়ারাম হয়েছে,—বলে আঁতুড় নাড়তে চান—আমি তা কিছুতেই করতে দিই নি।"

"সে মেয়েটার কই কি ব্যায়ারাম হয়েছিল, আমি তো শুনিনি—তাঁর উপর না সেই বাবার দৃষ্টি পড়েছিল?"

"তাই ত বলছি ভাই—ওঁরা বড় বোঝেন। শিশি শিশি ওষুধ এল। গেলাতে চান—গিলবে কে?—বাবা মুখ চেপে ধরে আছেন—সে জ্ঞান নেই। ও রোগের যা, রোজা এনে সব করলুম, তা কিছু হল না। হবে কি—রোজা বললে যে, পোয়াতি চাঁপাফুলের গাছের নীচে গেছল—তাই দৃষ্টি পড়েছে। সাহেবের মেয়ে, বেটী হয়ত কোন গাছতলায়-মাছতলায় গেছল, ও-সব তো মানা হয় না। এবার আমি আর বাপের বাড়িমুখো হতে দিইনি। সেবার যেন মেয়েটা গেল গেল, কিছু ক্ষতি হল না—এবার বেটাছেলেটি হয়েছে, একটু ভাল করে তাপ-সেঁক না দিলে কি হয়? পোয়াতি ভাল থাকলে, তবে ছেলের পিত্তেশ—কি বলিস ভাই?"

"তা বৈ কি, বংশ রক্ষার জন্য বৌয়ের আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বই তো নয়। তা হোক, বেটাছেলেটি হয়েছে—আটকৌড়েতে হাঁড়ি করিস। তোদের সূতিকাপূজো আছে তো?"

"হ্যাঁ, সূতিকাপুজো হবে বৈ কি—তা লক্ষ বামুনের পায়ের ধুলো কোথায় পাব—বারোটি বামনের পায়ের ধুলো দেব—আর পুজো-আশ্রয় সব হবে। আটকৌড়ে যেমন আর সব বৌয়ের ছেলেদের বেলা করেছি, এরও তেমনি হবে—এক হাঁড়ি জলপান, একটি করে সিকি, চারটে করে মেঠাই এইসব ঘরে ঘরে দেব। আর বাড়িতে ছেলেরা যারা আসবে, তাদের বেটাছেলেদের দু' আনা, মেয়েদের চার পয়সা করে দেব। আর বেঁচেবত্তে থাকে তো ভাতটিও দিতে হবে। যেমন বেটাছেলেটি হয়েছে আহ্লাদের, তেমনি খরচপত্রও হবে। এই ধাইকে নগদ এক টাকা, একটা ঘড়া কালই দিতে হল—আবার আসবে বিদেয় নিতে। মেয়ে হলে, সেই যা নাড়ীকাটা একটা টাকা ধার আছে—আর কি!"

"তা পরমেশ্বর দিন দিয়েছেন, আমোদ-আহ্লাদ খরচপত্র করবি বৈ কি। আমার দু' মেয়ে এখানে আছে, আমার ঘরে তিনটে হাঁড়ি দিস, আর আমার সতীন-পো বৌও ভিন্না হয়েছে।"

"হ্যাঁ ভাই, তা বললে ভাল। এই বাড়ি গিয়ে হাঁড়ির ফর্দ করতে হবে। আবার বাজনা আসবে, তবে নাচ আসবে, তার বিদায় খরচ ঢের"—

"শুনেছিস, মিত্তিরদের বৌয়ের আবার মেয়ে হয়েছে!"

"ও মা, বলিস কি, আবার মেয়ে—কে বললে?"

"এই কেষ্ট রাত থাকতে এসেছিল, আঁতুড় ছুঁয়েছিল কিনা, সেই কত দুঃখ খেদ করতে লাগল—তারই সঙ্গে কথায় কথায় তো জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হল না—আমি ভোরে কাপড় কাচতে এসেছি, আর কেষ্ট এল।"

"হ্যাঁ ঠাকুরঝি, গঙ্গা তোমার কার নাম গা?"

"আমার ছোট খুড়-শাশুড়ীর নাম 'ফঙ্গামণি', তাই আমরা জাহ্নবী বলি—ঠাকুরদের নাম আমাদের প্রায় করবার জো নেই। আমাদের বৃহৎ পরিবার, সকল নাম বেছে চলতে হয় তো--আমরা তো একেলে নই যে, সুদ্ধ শ্বশুড়-শাশুড়ীর হদ্দ মেরে কেটে বাছব।"

"তাই তো ঠাকুরঝি, মিত্তিরদের বৌটা কি গা—এবার গোটা চার-পাঁচ মেয়ে হল বুঝি - আমার বড় বৌমার ষেটের কোলে এই দু'টি; দু'টি নষ্ট হয়েছে; তাই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেজ বৌমারও দু'টি বেটা, একটা মেয়ে, তা মেয়েটা মামার বাড়ি থাকে, দিদিমার আদুরে, মেজ বৌমা বাপের একটি মেয়ে কি না। তা ঐ প্রথম মেয়ে দিদিমাই মানুষ করেছে, সে মেয়ের ভার আর আমাদের নিতে হবে না—দিদিমা তাকে হাতের তেলোয আর নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বেটাছেলে করে কাপড় পরানো হয়, হেমন্তকুমারী নাম, তা হেমবাবু বলে ডাকা হয়। সে মেয়ের আদিখ্যেতা কত। আর সেজ বৌয়ের দু'টো মেয়ের একটা সেই আঁতুড়ে গেছে, আর এই খোকাটি হয়েছে।"

"তা বেঁচে থাক, আমরা সব পাঁচ কর্মে যাব, খাব, নেব। আমাদের ঘরের কথা। মেয়েগুলো কেবল মিথ্যা বৈ তো নয়। সূতিকাপুজো নেই, আটকড়াই কর আর না কর, ভাত—তা বড় সাধ হয তো পাঁচজনকে এনে খাওয়াও। একটু কেবল পেসাদ মুখে দেওয়া, তার ক্রিয়া নেই, কর্ম নেই, পিতৃপুরুষ এক গণ্ডুষ জল পায় না। ঐ যা বিয়ের সময় একবার পিতৃপুরুষ জল পান বৈ তো নয়।"

"যাই, এইবেলা বাড়ি যাই; সেজ বৌয়ের বাপ হয়ত এসে এতক্ষণ কত হাঙ্গামা করছে। ছেলেরা ছেলেমানুষ, তারা তো কথা কইতে বড় পারে না—আমি এমন জবরদস্তি না হলে রক্ষা ছিল! আর ছেলেগুলোরও ঐ মত—সব একেলে কিনা। তা আমার উপর বড় কথা কয় না। বেশি বললেই আমি বলি যে, এখন বড় হয়েছিল, আমায় মানবি কেন? আমি তোদের চারটি নিয়ে বিধবা হয়ে কত কষ্ট

করে তোদের এত বড় করলুম, এখন আমি পর হলুম, শ্বশুরই আপনার হল। তা ওরা আর কথা কইতে পারে না। এই ছোট ছেলে—ঐ একটু মুখেফোঁড়— আর কোলের কিনা, আদুরে—ওকে কিছু বলতে পারিনে, ও আঁতুড়ে-মাতুড়ে ছুঁয়ে-নেপে সৃষ্টি করে। এই আঁতুড় উঠবে আর বৌগুলোকে দিয়ে নেপ বালিশ পর্যন্ত কাচিয়ে নেব।"

"ও সব আর বলিস নে—জাত-জন্ম আর রইল না। এ কালের ছেলে, ওরা সব এক রকম। আমার ছোট জামাই অমনি, সেবার বিধু প্রসব হতে এখানে এসেছিল, জামাই রোজ দেখতে আসত, সেই বিছানায় বসে গল্পসল্প করে চলে যেত। প্রথম যেদিন এল—আমি তখন নাইতে গেছি—মালা হাতে করে দাঁড়িয়েছি, আর আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আমার খপ করে পায়ের ধূলো নিলে। কি করব, বললুম—'বাবা, আঁতুড় ছুঁয়ে কি আমায় ছুঁতে আছে? আবার হাতে মালা।' তা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'আমার অত মনে ছিল না।' আমি আর কি করব—মালা গেল, আবার পুকুরে নেয়ে মরি। তা জামাইয়ের যে মত, মেয়েকে সেই মতেই রাখতে হয়। আমি লুকিয়ে দুটো দুটো গুঁড়ো ঝাল দিই। মেয়েগুলোও তেমনি, হাত পেতে নিলে, কতক খেলে, কতক বা না খেলে,—বলে, 'ঝাল খেলে মা কেবল জলতেষ্টা বাড়ে বৈ তো নয়, তোমরা তো জল দেবে না—সুধ্ধ সাবু খেয়ে থাকলে তেষ্টাও হয় না, জলও চাই না।' কে জানে ভাই, ওদের কেমন কথা। আঁতুড়ে তেষ্টা পায় না—আমাদের এমনি তেষ্টা ছিল যে, অতি ময়লা জলও এক কোষ চুরি করে খেয়েছি। আমাদের কালে ঝাল দিয়ে সুধ্ধ মুখ ধুতে জল দিত। তাতে কি প্রাণ বাঁচে!'

"তা বৈ কি, আমার এই চারটি গুঁড়ো হয়েছে, ফি বারই আঁতুড়ে মাগীকে পয়সা দিয়ে পায়ে হাতে ধরে জল চুরি করে খেয়েছি। এদিকে ভাজা ভাজা তাপ, ওদিকে সরা সরা ঝাল---যেমন তেষ্টা, তেমনি গা'র জ্বালা—ওতেই তো শরীর ঝনঝনে হয়। ঐ গো, বাজনা এসেছে, তবে আজ আসি।" বলিয়া গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভিজা কাপড়ের অঞ্চল স্কন্ধে ফেলিয়া প্রস্থান।

গৃহিণী। "দেখেছিস গয়লা-বৌ, হরকালীর মায়ের তেজ দেখেছিস! অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, আপনার চার ছেলে -েলে কেবল জানানো হয়—আমার চারটি গুঁড়ো। যমের জ্বালা ভুগতে হয়নি, তাই অত জাঁক— ছেলে হলেই তো হয় না। বাঁচাই মূল। যমে না সর্বনাশ করলে আমিও আজ রাজার মা।"

গয়লা-বৌ। "তা বৈ কি মা-ঠাকরুণ যমের জ্বালা বড় জ্বালা। আমার দু'-ছেলে দু'-মেয়ে যমকে দিয়েছি, এখন দু'টি মেয়ে একটি ছেলে নিয়ে প্রাণ ধরে আছি। বড়টি শ্বশুরবাড়ী গেছে। মা, কেঁদে কেঁদে মরছি। মা, আমরা দুঃখী মানুষ, তা বাছাবা আমার এমন যে, আমার পয়সা নেই, কেমন বোঝে— পাছে চাইলে না দিতে পারি, তাই এত সোনাব সামগ্রী পাড়ায় আসে, কখনও খেতে কিনতে চায় না।"

গৃহিণী। "তোর মেয়েটি না বেশ ভাগ্যিমন্তের ঘরে পড়েছে?"

গয়লা-বৌ। "হ্যাঁ মা, তোমার আশীর্বাদে তারা বড় ভাগ্যিমন্ত, আর আমার নয়নতারাকে খুব যত্ন করে। কিন্তু তা বলে কি মায়ের মন বোঝে—আমি যে সকালে এক পয়সার মুড়ি, তিনজনকে দিতে পারি না, তাতে যে আমার বুক ফেটে যায়।"

গৃহিণী। "তা কি করবি, কাঁদিস নে, চুপ কর। মেয়েজন্ম পরের ঘরে যাবার জন্যেই হয়েছে। তাই তো বলি গয়লা-বৌ, মেয়েগুলো মিথ্যা। দু'দিন বাদে পরের ঘর যাবে—তা বলে এ-কালের মেয়েদের কাছে তা বলবার জো নেই।"

গয়লা-বৌ। "তা মা, দু'-দিন বাদে শ্বশুরবাড়ী যাবে বলেই তো আমার প্রাণ কেমন করে। তাই জন্যেই তো মা, আমি মেয়ে দু'টিকে না দেখে থাকতে পারিনে। বেটাছেলে মা, বেঁচে থাকলে ওরা আপনারা আনবে নেবে, বৌ হবে, আদর-যত্ন চিরদিন পাবে—আমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাকবে। মেয়েদের মানা করলে আর কে করবে? শাশুড়ী ননদ অত করবে না—দু'দিন বাদে মেয়েরা আবার মা হবে—আপনার ছানাপোনা নিয়েই ব্যস্ত হবে। আজ যদি মা আমি না আদর করি তো কে আর তাদের আদর করবে?"

গৃহিণী। "তা বই কি! তোর ঢের গেছে কি না, তাই তোর বেশি মায়া—নইলে জগৎ জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটি হয়েছে বলতে দশ হাত বুক হয়—শুনতে কেমন। ঘটাঘাটি আমোদ-আহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হলেও অরুচি নেই। মেয়ে প্রথম হলে লোকে বলে, তা হোক—এইবার ছেলে হবে। প্রথম যা হয়েছে, বেঁচে থাক—জেঁয়াচ বজায় থাকলে তবে তো মঙ্গল। তবে তো ছেলের পিত্তেশ।"

গয়লা-বৌ। "হ্যাঁ মা, যাই—বেলা হল।"

ক্রমে ঘাট শূন্য হইয়া আসিল, স্বপ্নময় মোহমুগ্ধ নয়নে আসিয়াছিলাম, সত্যের তীব্রতা লইয়া ফিরিলাম। প্রকৃতি জননীর আর সেই মধুর স্নেহময় ভাব নাই—এখন চারিদিকে কর্তব্যের ঘোর শাসন কর্তব্য লইয়া সকলে ছুটাছুটি করিতেছে। নয়নে আর সেই মোহ নাই—সূর্যালোকে সকলই পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মনে জাগিতেছে আদরের, না অনাদরের! স্নেহেও পক্ষপতিতা আছে—শুধু স্নেহে নহে—মাতৃস্নেহও আছে—মাতাও কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ ও যত্ন করিয়া থাকেন। ভাবিতে ভাবিতে শয্যাসম্মুখে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার সে ফুলটি এখন ফুটিয়া উঠে নাই—আমার চুম্বনের সূর্যালোকে এখনও সে ফুল স্পর্শ করে নাই, তাই এখনও সে ফোটে নাই—নিঃশঙ্ক সুষুপ্ত মুখে যেন লেখা রহিয়াছে পড়িলাম—

"অনুগ্রহ করে এই কোরো, অনুগ্রহ কোরো না এইজনে।"

আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম—হাসিয়া আঁখি মেলিয়া সে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বুকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মা আমার, তুমি আদরের, না অনাদরের?—আমি আদরের।

কবির পরিণাম

শ্রীমা

সতীশ বাল্যকাল হইতেই কবিতা লেখে। যখন সতীশ স্কুলের বালক ছিল, তখন তাহার সহপাঠীরা বিস্মিত নেত্রে দেখে যে আকাশে নীল মেঘস্তবক অথবা জ্যোৎস্নাময়ী শুভ্র রাত্রি দেখিলে, প্রফুল্ল ফুলবন বা শ্যামল প্রস্তরবাহিনী নদীকূলে বেড়াইতে গেলে বালক সতীশ মুগ্ধবৎ বসিয়া কি ভাবিতে থাকে। তার পরে বিনা আয়াসে—কি না অভিধানে, একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়া ফেলে।

একথা যখন অনেকের কানে পৌঁছিল, তখন অনেকে সতীশের উপরে বড় অসন্তুষ্ট হইল। কেহ বলিল "ও ছেলের লেখাপড়া হইবে না", কেহ বলিল, " এ ছেলের প্রকৃত বুদ্ধি হইবে না", যাঁহারা সাধারণের নিকেট আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মাথা খারাপ বলিয়া সতীশের ঐ একটা রোগ হইয়াছে।" এসব কথার মধ্যে কোনগুলো সত্য কোনগুলো মিথ্যা আমরা তাহা জানি না, তবে এইমাত্র জানি যে, যে রোগের জন্য সতীশ মাস্টার মহাশয়ের কাছে ধমক খাইল, গুরুজনদিগের কাছে গালি খাইল, বন্ধুরা "কালিদাস, শেলি, মাইকেল দত্ত" বলিয়া তাকে ঠাট্টা করিল, তাহার সে দারুণ রোগ কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না।

ক্রমে সতীশের বয়স তেরো ছাড়াইয়া তেইশ, তেইশ ছাড়াইয়া তেত্রিশে পৌঁছিল, সতীশচন্দ্রও স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, কলেজ ছাড়িয়া আপিসে উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্গে সেই দুশ্চিকিৎস্য রোগও প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন কাজে কাজেই সতীশের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ এই কবিতা রোগগ্রস্তের আরোগ্য আশা ছাড়িয়া দিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন।

অন্য লোকে এইরূপ "নিশ্চেষ্ট" হইলেও একজনের চেষ্টায় "নির" উপসর্গ যোগ করিতে আমাদের সাধ্য হইল না। কারণ সতীশের সহধর্মিনী শ্রীমতি সরোজিনী দেবী স্বামীর এই দুরারোগ্য রোগ দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—যখন সতীশ কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন ছুটির সময়ে বাড়ি গিয়া, গভীর রাত্রিতে অচিরজাগ্রতা পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষীয়া ভার্যা সরোজিনীকে "সুন্দর পূর্ণিমা নিশি" কিম্বা "ফুটিছে বকুল ফুল" অথবা "কার মুখ পড়ে মনে" প্রভৃতি মধুর পদাবলী যুক্ত নিজের রচিত কবিতাগুলি সরল ব্যাখ্যা সহ শুনাইতেন, তখন যে সরোজিনীর তাহা ভাল লাগিত না, একবার শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা হইত না, তাহা কখনই নহে। বরং আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, সতীশের সে মধুর গাথা বসন্ত কোকিলের ঝঙ্কারের মত সরোজিনীর হৃদয়ে অতি নিভৃত স্থানে প্রতিধ্বনিত হইত। আরও শুনিয়াছি কবির ভার্যা বলিয়া সরোজিনীর মনে বেশ একটু গর্বও জন্মিত।

যাহা হউক এখন আর সরোজিনীর সেদিন নাই। এখন সরোজিনী ঘরে গৃহিণী, শিশু সন্তানের জননী, দাস-দাসীগণের শাসনকারিনী। তাই এখন আর কবিতা বা কবি-হৃদয় লইয়া সরোজিনীর চলে না। এখন নিজের পুরাতন বালা দু'গাছি নতুন করিয়া গড়ান চাই, খোকা-খুকীর সাটিনের পোষাক চাই, লোকজনের কাছে লৌকিকতা ও প্রতিপত্তি চাই। যে সময়ে যা শোভা পায়। চিরদিন ও সব ছেলেমী ভাল লাগিবে কেন?

সুতরাং স্বামীর "ছেলেমী" ঘুচাইতে সরোজিনী রাগ করিল, অশ্রু ফেলিল। কোনও দিন "প্রচণ্ড" মুখঝামটা সহ তীব্র বাক্যবাণ সেই কবিতা রোগগ্রস্ত, উপরওয়ালার জ্বালায় ত্রস্ত, স্বামীটার হৃদয় বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে হৃদয় কিছুতেই আঘাতপ্রাপ্ত হইল না! সে হৃদয় জড় কি পাষাণ তাহা জানি না, কিন্তু সরোজিনীর তীক্ষ্ণাস্ত্র সকল ভোঁতা হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে সরোজিনী "ব্রহ্মাস্ত্র" প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন। উপবাস করিলেন। তখন কবিতা-রোগী বিনয় বচনে বলিল,"তোমার বালা ও ছোট খোকার পোষাক কিনিয়া দিব, কিন্তু দিন কতক পরে, সেভিংস ব্যাঙ্কে যে টাকা রহিয়াছে, তাহা দিয়া শীঘ্র একখানি পুস্তক ছাপাইব। সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে যে সকল কবিতা লিখিয়াছি, সে সকল যতক্ষণ একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার মনের তৃপ্তি নাই। —আগে বইখানি হউক, তার পরে তুমি যা চাও তাই দিব।"

রাগে সরোজিনীর মুখ লাল হইল। এরকম কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পুরুষের উপরে রাগ করিয়া উপবাস করা বিফল, তাই সরোজিনী উঠিয়া ভাত খাইল। সেইদিন হইতে সহধর্মিনী সতীশের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না। কেবল মনে মনে ডাকিল "হে ঠাকুর! হে সিদ্ধেশ্বরি! তোমরা ওঁর এ রোগ দূর কর, আমি তোমাদেব পূজা দিব।"

যথাসময়ে সতীশের কবিতা পুস্তক মুদ্রিত হইল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সতীশ অতি সুন্দর কাগজে, অতি সুন্দর অক্ষরে, তাঁহার প্রাণময়ী কবিতাগুলি প্রকাশ করিলেন। বাঁধানও খুব সুন্দর হইল। সতীশ কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীনাথবাবু নূতন সমালোচক। বাঙ্গালার অনেক বিখ্যাত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের প্রধান লেখক। গ্রন্থ সমালোচনায় তিনি কৃতী শুনিয়া সতীশ একখানি পুস্তক জামার পকেটে লইয়া তাঁহাব বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

দুই-চারি কথার পরে, নূতন মক্কেল যেরূপ সঙ্কোচে উকিলেব নিকটে কথা কহে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ সঙ্কোচে পাশ করা ছেলের পিতার নিকটে কথা কহে, সেইরূপ সঙ্কোচে-- সেইরূপ ইতস্তত করিয়া সতীশ শ্রীনাথবাবুকে নিজের লিখিত পুস্তকখানির বিষয়ে প্রকৃত মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সতীশকে "কৃপাপ্রার্থী" জানিয়াই শ্রীনাথবাবুর মুখে সহসা গাম্ভীর্য উদিত হইল। অনেকেরই এ রকম হইয়া থাকে। সতীশের প্রার্থনায় কোনও উত্তর না দিয়া, নিজে কি কি কাগজে লেখেন এবং সম্পাদকগণ তাঁহার লেখা পাইবার জন্য কিরূপ লালায়িত হন, কল্পনা দেবীর সহায়তায় শ্রীনাথবাবু সেইসকল পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে বেচারাকে অগত্যা সেইসকল কথা ধীর মনোযোগে শুনিতে এবং বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতে হইল।

আরও খানিকক্ষণ পরে, শ্রীনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গ্রন্থখানির নাম কি?" ধীরে ধীরে সতীশ উত্তর করিলেন আজ্ঞে এখানির নাম "অশ্রুধারা"। পূর্ববৎ গম্ভীরভাবে শ্রীনাথবাবু বলিতে লাগিলেন, "অশ্রুধারা! নামটা আমি ভাল বিবেচনা করি না। কথা কি জানেন, নামের ভিতরে মাধুর্য গুণের অপেক্ষা রজোগুণই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। কৃতী লেখক সেইরূপই করেন।"

অতর্কিতভাবে সতীশের এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সতীশ কি তবে অকৃতী লেখক?

ডিবা হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "আপনার গ্রন্থেব একটু পড়ুন

দেখি।"

সতীশ পুস্তক হাতে করিয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রথমে কবিতার নাম পড়িলেন "গঙ্গা স্তোত্র" তার পরে কবিতা পড়িলেন—

"নমো দেবি সুরধুনী পতিত পাবনি!—"

একছত্র না ফুরাইতেই সমালোচক বাধা দিয়া, "এ যে ভট্টাচার্যদিগের পাঠ্য মন্ত্র—এ রকম কবিতার এখন চলন নাই। আপনি আর একটি পড়ুন।"

আমরা সত্য কথা বলিব; সতীশ যদি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন তাহা হইলে অন্ততঃ নিজ পক্ষ সমর্থনে দুইটা কথা বলিতে পারিতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। লোহার গায়ে অনেক আঘাত সহে, কিন্তু ফুলের গায়ে হাতের ভর সহে না। যাহা হউক সতীশ কম্পিত হৃদয়ে কম্পিত কণ্ঠে, তাহার "বরষা" শীর্ষক কবিতা পড়িলেন—

"পরাণ কেমন করে!
আকাশে বরষা, ধরায় তমসা,
একেলা রয়েছি ঘরে!
মোহন ঠমকে, চপলা চমকে,
হেরিয়া নয়ন ঝরে!—"

শ্রীনাথবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক, আর আবশ্যক নাই। স্বভাব কবিতায় যেরূপ উঁচুদরের ভাষা ও জীবন্ত ভাব থাকে, ইহাতে সে সব কিছুই নাই। আপনার কবিতা কৃত্রিমতা—দুষ্ট। আপনি কষ্ট কল্পনার কবি।"

ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে হীরার ধার ভাঙ্গিল। বেচারা সতীশ, এতকালের পরে আজি সমালোচকের কাছে আখ্যা পাইল কষ্ট কল্পনার কবি। এতদিনের পরিশ্রম, এতদিনের আনন্দোচ্ছ্বাস আজি সমালোচনার আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইল! সতীশ নীরব, নিস্পন্দ।

করুণ হৃদয় শ্রীনাথবাবু তখন অনুগ্রহ পরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি দুঃখিত হবেন না, চেষ্টা করুন, কালে ভাল ফল হতে পারে। জানেন সতীশবাবু, আমার ভগিনীপতি একজন সুকবি—স্বভাব কবি। তিনি 'চিদানন্দ বিকাসিনী' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা সকলে সেখানি 'বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য' বলিয়াছি, আপনাকে তা থেকে কয় ছত্র শুনাই।" অতি কষ্টে সতীশ ধৈর্য সংগ্রহ করিয়া বসিলেন। সমালোচক চিদানন্দ বিকাসিনী খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। কবিতার নাম পড়িলেন "বিদ্যুৎ"। তার পরে পড়িলেন—

"হে বিদ্যুৎ! হে বজ্রাগ্নি!
তব স্রোতে ভাসিছে গগন,
আরো, প্লাবিত হতেছে সারা বিশ্ব,
কি প্রখর তেজস্বিনী,
কিবা বঙ্কিম হাসিনী,
কোথা মিলে হেন অপূর্ব সুদৃশ্য!

সম্বর্ত আর্বত পুষ্করাজি মহামেঘ যত'

সবে চায় লইতে আশ্রয়, তবে পদাম্বুজে অবিরত।"

সতীশ আর বসিলেন না। শ্রীনাথবাবুকে পুস্তক দিলেন না। এক পলকের মধ্যে এক নির্জনে উপস্থিত হইলেন। তার পরে সাশ্রুনেত্রে সেই কবিতা পুস্তকখানি বুকে চাপিয়া বলিলেন, "কবিতে। তোমার জন্যে আত্মীয় পরের অবাধ্য হইয়াছি, বিদ্বেষভাজন হইয়াছি, গালি খাইযাছি, তোমাব জন্য সবই সহিতে পারি, কিন্তু বজ্রদংষ্ট্রা কীটের মতো নির্মম সমালোচক যে তোমার সুকোমল প্রাণ চিবাইতে থাকিবে—আমার হৃৎপিণ্ড তাহার ভোঁতা অস্ত্র দিয়া হত্যা করিতে থাকিবে, তাহা আমি কখনই সহিতে পারিব না। পরের প্রীতিকামনায় অথবা নিজের যশোবাসনায় আর তোমাকে বাহিরে পাঠাইব না— আমার হৃদয়ান্ত পুরবাসিনী কবিতা দেবী! তুমি আমার হৃদযে থাকিলেই আমার সকল সুখ, আমার স্বর্গসুখ! তোমার জন্যে খ্যাতি, সম্মান ছাড়িয়াছি, ভার্যার প্রণয় ছাড়িয়াছি, এবারে চল, লোকালয় ছাড়িব। কেবল তোমাকেই ছাড়িব না!"

আর সতীশ চাকরি করিল না, বাড়ি আসিল না। কোথায় গেল সে সংবাদও পাওযা গেল না! সরোজিনী পিতৃগৃহে বাস করিযা সন্তান কযটাকে মানুষ কবিতে লাগিল। কিন্তু সে নিজে জীবন্মৃতা।

বনভোজন
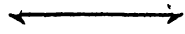
শ্রীনি দেবী

মে মাসেব প্রারম্ভে আমার ছুটি হইয়াছে। কলেজ বন্ধ হইলে বাড়ি যাবার চেষ্টা। আবার মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে (১ম ও ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে) এই সময় ছুটি হয। একবাবে আমাদের সহপাঠীরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে গেলেন, আমি এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম। আজ এক সপ্তাহ হইল বাড়ি আসিয়াছি, তবু প্রবাসের গল্প আর ফুরায় না। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে যতটুকু ডাক্তারী পাঠাদি, তাহাও বউদিদি ও আমার ছোট বোন শেলির কাছে বলতে হচ্ছে। শেলির সম্পূর্ণ নাম শেফালি, কিন্তু আমরা 'শেলি' বলে ডাকি। অবশ্য তার ছোট মুখে একটি কবিত্বের ছায়া প্রতিভাসিত হইত। আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে ঐ একটি ভগ্নী। তাই সকলে বলে 'তোমরা একে ভারি আদুরে মেয়ে করেছ।' শেলি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। এখনও তাহার বিবাহ হয নাই। আমাব পিতা কুলীন ব্রাহ্মণ, তাই আমাদের মেয়ে বড় হলেও তত দোষ হয় না। কিন্তু এখানে তা নয়, আমরা পশ্চিমে থাকি, তাই পাত্রের অভাব আর গত বৎসর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মারা যাওয়াতে আরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। মা আমাব দিদির অভাবে বড় কাতরা। এক বৎসর পবে বাড়ি আসিযাছি, কিন্তু একদিনও পিতা-মাতার প্রফুল্ল মুখ দেখি নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ বৎসর বি. এল. পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা বেনারসে প্র্যাকটিস করেন ও পিতাকে কর্ম হইতে অবসব লইবার সুযোগ দেন। কিন্তু কনিষ্ঠা শেফালী'র বিবাহই প্রধান অন্তরায়। ছোট ভাইটি মিডল ক্লাসে পড়ে। সেও আমাব বড় অনুগত। আমবা সকলে ভাই-ভগ্নী মিলিয়া শোকাতুরা মাতাকে সান্ত্বনা করিতে দিবানিশি চেষ্টা কবি। মাকে অবসর পাইলেই মহাভাবত ও বামাযণের সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকাগুলি শুনাই। কখন কখন সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাই। এই প্রকার আনন্দে ছুটিব দিনগুলি শীঘ্র শীঘ্র ফুবাইযা যাইতেছে। একদিন শেলি বললে, 'এস দাদা, একদিন বনভোজনে যাই চল না।'' বউদিদি সৌৎসুক্যে তাহাতে উৎসাহ দিলেন। আমি বলিলাম, "বেশত।" কিন্তু মাতার অনুমতির অপেক্ষা, বিশেষ আমরা তাঁহাকে বাড়িতে রাখিযা যাইতে চাহি না। অথচ তিনি নির্জনে থাকিতেই ভালবাসেন। শেলির আগ্রহে মা বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা যেও, আমার কাল যাওয়া হবে না। যেহেতু শ্বশুর মহাশয়ের বাৎসরিক তিথি, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন কবাইতে হইবে।" সকলে তাহাতেই আনন্দে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমাব তেমন উৎসাহ ছিল না। শেলি বললে, "কাল না গেলে আমাব যাওয়া হবে না, কাল শনিবার আমার স্কুলের ছুটি আছে।" অগত্যা তাহাই স্থির হইল। এখন কথা কোথায় যাওয়া হবে।

বউদিদি বললেন, "ভাই, আমি ঝুঁসি কখনও দেখি নাই, এইবার চল ওপারে নৌকো করে বেড়িয়ে আসি, দেশ থেকে এসে অবধি নৌকায় উঠি নাই।" সকলে তাহাতেই রাজি হইলেন। সেখানে গিয়ে বউদিদি রাঁধবেন আমরা খাব, ইহাও তাঁহার সঙ্গে ঠিক করা হল, যেহেতু বউদিদি মহাশয়া হাঁড়ি হেঁশেলকে বড় ভয় করিতেন। রান্নাঘরের ধোঁয়া দেখলেই চোখ লাল হয়ে মাথা ধরিত। কিন্তু আজ আর তিনি পিছপা নন। আমার ছোট ভাই গুণনাথ সেও প্রস্তুত হইল। শেলিব কথাই নাই, অধিকন্তু তাহার সঙ্গিনী নলিও সেই সময় আমন্ত্রিত হইলেন। নলিনী আমার পিতার বন্ধুর কন্যা, শেলির

সমবয়স্কা ও সহপাঠিনী। আমরা পাঁচজন বনভোজনের যাত্রী, ইহা ছাড়া একজন দাসী ও চাকরও সঙ্গে যাইবে মা বলিলেন। কোনও মতে রাতটা পোহাইল। সর্বাগ্রে শেলি উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া নলিকে আনাইয়া লইল। ক্রমে আমরা সকলেই প্রস্তুত হইলাম। মা আমাদের আহারের সামগ্রী সকল গুছাইয়া দিলেন। ঘোড়ার গাড়ি করিয়া দারাগঞ্জের ঘাট পর্যন্ত গেলাম। সেদিনকার প্রাতঃকাল তত পরিচ্ছন্ন ছিল না, আকাশ যেন ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। মা একবার উপরদিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাচ্চ তোমরা, মেঘ করেছে যেন।" আমাদের যাইবার উৎসাহ এত বেশি যে সে কথার প্রতি আর কাহারও মনোযোগ হইল না। মহানন্দে আমরা যাত্রা করিলাম ও দারাগঞ্জের ঘাট হইতে একখানি নৌকা করিয়া সকলে পারে চলিলাম। গুণা ঘড়ি খুলিয়া দেখিল বেলা ৯টা হইয়াছে। কিন্তু রবির নবীন ছবি গঙ্গা বক্ষে শোভিতেছে না। নৌকা তর তর বেগে বহিয়া যাইতেছে প্রভাত পবন চপলমতি বালকের ন্যায় জাহ্নবীর মাথা হইতে পা পর্যন্ত ধরিয়া নাচিতেছে, কখন ঘোমটা খুলিয়া দিতেছে, কখন আঁচলখানি লইয়া দোলাইতেছে, গঙ্গাবধূর বীচিমালা যেন বঙ্গ কামিনীর অঞ্চলবন্ধ চাবির গোছার মতন যেখানে সেখানে ছড়িয়া পড়িয়া যাইতেছে। দু'ধারে সৈকত তীরে আজ আর বেশি লোকজনের সমাগম নাই। পক্ষিগণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া নীড় ছাড়িয়া উঠিতেছে না। আমরা সকলে সূর্যদেবের অভাবে যেন ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। বউদিদির আর সে হর্ষোৎফুল্লতা দেখা যাইতেছে না। শেলি নলিও চুপ করিয়া বসিয়া কেবল নৌকার গতি, জলের তরঙ্গ, পবনের রঙ্গ ও মেঘের গম্ভীর বদন দেখিতেছে। মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বায়ু প্রতিকূল নহে। ক্রমেই আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। নৌকা ঘাটে লাগিল, আমরা সদলে নামিলাম ও কিছু দূরে গিয়া একটি বাগানে বৃহৎ বকুল বৃক্ষতলে বসিলাম। দাসী ও চাকর আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। শেলি নলি বউদিদির সঙ্গে গেল ফুল তুলিতে। আমরা দুই ভাই উদ্যানের পার্শ্বস্থ একটি সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে গেলাম। গঙ্গাতীরের উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে একখানি বাড়ি, কিন্তু প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন। একখানিতে যত ফকির সাধু আসিয়া আশ্রয় লয়, অপরটিতে সন্ন্যাসীর আশ্রম ও শিষ্যেরা বাস করে ও তদুপরিস্থ ভূমিখণ্ডের উপরিভাগে একটি কূপ, শুনিলাম ইহা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত আছে বলিয়া ইহার জল বিখ্যাত। সেই কূপের সন্নিকটে একটি ছোটখাট ফুল বাগান। ক্রমে সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলার সহিত ভাব করিয়া বাবাজীর নিকটে গেলাম। বাবাজী একখানি মৃগচর্মে উপবিষ্ট ও শীর্ণকায়, বয়স পঞ্চাশতের কম নহে। প্রশান্ত মূর্তি। আমাদিগকে ইঙ্গিতে বলিলেন, এ সময় কেন বাড়ি হইতে বাহির হইযাছ? পরে অন্যান্য অনেক প্রকার উপদেশপূর্ণ আখ্যান কহিলেন। বাবাজীর গৃহে একটি সেতার ও কতকগুলি পুরাতন পুঁথি গেরুয়া বস্ত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শিষ্যজি কহিলেন গুরু ইচ্ছামত গীতা আবৃত্তি করেন। ইহার পর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। ইচ্ছা হইল সহযাত্রীদিগকে ফিরিবার সময় দেখাইয়া লইয়া যাইব। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখি, বাগানে মহা ধুম, বউদিদির হাতে হাঁড়ি। শেলি নলি চাল ধুইতেছেন, কুটনা কুটিতেছেন, দাসী-চাকরকে বাধা দিয়া জল আনিতেছেন। বড় আনন্দ। আমিও ইহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইলাম বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আত্মার স্ফূর্তি কমিযা গিয়াছে। যা হোক খাওয়া-দাওয়া হইল, ক্রমেই আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া ঘাটে আসিয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম দেখিতেছ, এখন কি নৌকা ছাড়িবে?" তাহারা কহিল, "এখনও কোন ভয় নাই, আমরা বাড়ি পৌঁছাইয়া যাইব, ঢের সময় আছে।" সেই বিজ্ঞ কর্ণধারের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। কিছু দূর যাইতে যাইতে বায়ুর বেগ প্রবল হইতে লাগিল। তখন মাঝ গঙ্গায় নৌকা, আর কি হইবে! মাঝিরা পাল খুলিয়া গুণ টানিয়া

লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমেই চতুর্দিক অন্ধকারে ভরিয়া গেল, ঝড় দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গঙ্গার তরঙ্গের ধ্বনি বায়ুভরে কম্পমান! ঢেউগুলি গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে। ক্রমে নৌকার তলভাগে লাগিতেছে—কূলে কূলে গিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঝড় সত্যসত্যই প্রবল বেগে গাছপালা ভাঙ্গিয়া মাটি ধূলা বালি উড়াইয়া সবেগে নৌকা আক্রমণ করিল। গুণের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, মাঝিরা আছাড় খাইয়া পড়িল। বালিকা দুইটি এ উহাকে প্রাণপণে ধরিয়া আমার কোলে মাথা দিয়া পড়িয়াছে। আমাদের বৌদিদি গুণনাথকে আশ্রয় করিয়া আছে। জলে যেমন তরঙ্গ, আমাদের প্রাণে তেমনি ভয়ের তরঙ্গ। হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করিয়া আসন্ন মৃত্যু গণিতেছে। আমার ভাবনা—কি করিয়া এই বিপদ হইতে ভাই ভগিনীগুলির প্রাণ বাঁচাইব। কোনও উপায়ই ঠাওরাইতে পারিতেছি না। ঝড়ের জোরে নৌকা ঘুরিয়া-ফিরিয়া জলে পড়িয়া গেল। তখন আমরা উহা হইতে লাফান স্থির করিলাম। কিন্তু হতভাগ্য বালিকারা যে সাঁতার জানে না। তবু আমি শেলি নলিকে বলিলাম, "আমার কোমর ধর।" বউদিদি ও গুণা সাঁতার জানিতেন। নৌকা ছাড়িয়া আমরা সেই অন্ধকারে তরঙ্গ সঙ্কুল জাহ্নবীর কোলে ভাসিতে ভাসিতে স্রোতাভিমুখে চলিলাম। দুইটি বালিকাকে টানিয়া টানিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, আর পারি না, কূল-কিনারা বা কোথায়? এক একবার বিদ্যুতালোকে কেবল জলের তোলপাড় চক্ষে পড়িতেছে। কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া যে কোন দিকে গেলেন, তাহার তো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে আরও বিপদে মগ্ন হইলাম। মেয়ে দু'টির হাত আমার কোমর হইতে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই আমি নিজে হালকা হইয়াছি। এদিকে ঝড়ের বেগও প্রশমিত হইয়া আসিল। আমি যথাসাধ্য বলে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিলাম। তখনও বাতাস এক এক বার সোঁ সোঁ রবে ক্রোধাহত ফণীর ন্যায় গর্জিয়া উঠিতেছিল। কূলে গিয়া সেই বালু ভূমিতে আর্দ্রবস্ত্রে পড়িয়া থাকিলাম। তখন সন্ধ্যা অতীত। নির্জন নীরব তটদেশে জন মানবের চিহ্ন নাই, কেবল দূরে একখানি কুটীরে ক্ষীণ আলোক জ্বলিয়া উঠিল। অবসন্ন দেহ প্রাণ লইয়া উঠিলাম। এ মুমূর্ষু প্রাণে কিসের বল, কোথা হইতে আসিল, পাঠক পাঠিকারা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমার জীবনের জীবন ভাই ভগ্নীগুলির উদ্দেশ্য এক্ষণে প্রাণে শত বল শত উদ্যম যোগাইতেছে। আমি সেই ক্ষীণলোক ধরিয়া কুটীর অভিমুখে গমন করিলাম। বাহির হইতে দেখি কেহ কোথাও নাই, একটি স্ত্রীলোক বসিয়া কেবল জপ করিতেছেন। আমি যাইতেই জপ ভঙ্গ করিয়া, স্বয়ং জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি এমন দুর্যোগে?"

আমি, মনুষ্য কণ্ঠস্বরে যেন কত বল ভরসা পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। আর্তস্বরে কহিলাম "মাগো! ঘোর বিপদাপন্নজনকে একটু স্থান দাও।" তখন ভিতরে গিয়া দেখি কুটীরখানির মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু আছে। আমি নিজের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম ও কিঞ্চিৎ অগ্নিসেঁকে হাতপা সোজা করিয়া নদীর কূলে কূলে ভ্রাতা-ভগ্নীর নাম করিয়া অতি চিৎকার স্বরে ডাকিতে লাগিলাম। কুটীর বাসিনী বৃদ্ধার নিকট জানিলাম আমি বেণীঘাটে আসিয়া পড়িয়াছি। পরে গঙ্গার তীরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি কতকগুলি লোক সন্ধ্যার আঁধার ভেদ করিয়া বড় বড় মশাল লইয়া আমার দিকে আসিতেছে। নিকটস্থ হইয়া দেখি নিদারুণ উদ্বিগ্নমনা পিতা স্বয়ং আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিযা আর ক্লিষ্ট, প্রাণের আবেগ সামলাইতে পারিলাম না, দুই চক্ষুর জলে অন্ধ হইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিলাম, "বাবা! সর্বনাশ হইয়াছে, সব হারাইয়াছি।" পিতা হৃদয়ের গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া বলিলেন, "আর এখন বিলম্ব করা উচিত নহে, চল খুঁজি গিয়া।"

মশাল লইয়া ডুবুরীরা অনুসন্ধান করিতে করিতে গণা ও ভ্রাতৃজায়াকে পাইল, কিন্তু তাহারা অচেতন। পিতা শেলি নলির জন্য দারুণ ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। আমাকে কহিলেন ইঁহাদিগকে

।'।।। ।কাথ ।চিকিৎসালয়ে গিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা কর, আমি মেয়ে দু'টির অনুসন্ধান করিব। উহাদিগকে লইয়া চিকিৎসকের নিকটে গেলাম। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা উভয়েরই চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমাকে দেখিয়া তৃপ্তি হইল না, বালিকারা দু'টি কোথায় জানিতে চাহিলেন। চিকিৎসকের আজ্ঞামত আমি কহিলাম তাহারা অন্য ঘরে আছে। তাহাদিগের জীবনের আশা দেখিয়া নিজে ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে কিছু ঔষধ লইয়া রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র পিতার কাছে গেলাম। নৈরাশ্যকাতর, পীড়িত ও সমস্ত রাত্রি জাগরণে অপরিসীম শ্রমে শ্রান্ত পিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি সেইসকল লোকজন লইয়া হতাশমনে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। যত খুঁজিতেছেন, তত আরও গঙ্গার গভীরতর তলদেশ হইতে গভীরতম প্রদেশে যাইতে ইচ্ছে হইতেছে—কিছুতেই নয়ন মনকে বুঝাইতে পারিতেছেন না যে তাঁহার পরম স্নেহের শেলি আর নাই। তাঁহার এই অপ্রত্যক্ষ দারুণ ক্ষতির জন্য অবিশ্বাসী হৃদয়কে আর গঙ্গাতীর হইতে সরাইতে পারিতেছেন না। মানব-চক্ষু পদে পদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চায়, চক্ষুর অগোচর কার্যে বিশ্বাস কোথায়? তাই হাতে প্রমাণ না পাইলে নয়নের সাধ মিটে না। মনুষ্যের সকল সাধনা চক্ষুর তলে—মুদিয়াই থাকি, মেলিয়াই থাকি। যোগী, ভোগী, সাধু, অসাধু, সৎ, অসৎ সকল ব্যাপার না দেখিলে মনুষ্য জীবন পূর্ণ হয় না। তাই আজ পিতার নৈরাশ্যে আশা-মিশ্রিত সন্দিহান হৃদয় লইয়া পীড়া। আজ যদি শেলির মৃতদেহখানি তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে এরূপ চিত্তের বৈকল্য থাকিত না—একেবারে শেষ সীমায় গিয়া দাঁড়াইতেন। অনেক অনুসন্ধানে পরাজিত হইলাম। আমি বহু কষ্টেসিষ্টে একখানি গাড়ি করিয়া তাঁহাকে বাড়ি পাঠাইলাম ও নিজে হাসপাতাল হইতে ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া বাড়ি গেলাম। সকল শোক দুঃখের অপেক্ষা প্রধান আশঙ্কা, ভয় ও ভাবনা—মাতার নিকটে কি বলিয়া মুখ দেখাইব। অকালে তাঁহার লক্ষ্মী-সরস্বতী বিসর্জন দিয়া আমার অশক্ত পদদ্বয় তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় না। বাটী পৌঁছিয়া বহির্বাটীতে থাকিলাম। মাতা কনিষ্ঠ পুত্র ও বধূকে দেখিয়া দারুণ হৃদয়-বিদারক স্বরে তাঁহার প্রাণের শেলির অভাব জানাইলেন। সেই অশ্রুপ্রবাহে কত অশ্রু মিলিত হইয়া শোক-সিন্ধু প্রত্যেক অন্তরকে ভীষণ তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। অশান্তি, অনিদ্রা, অনাহার, অনুতাপ ও অবসন্ন দেহ মন লইয়া আমাদের পরিবারের দুঃসহ দিনগুলো কাটিতে লাগিল। প্রভাত হয়; সন্ধ্যায় ঢাকে। রাজনীর গাঢ় তিমির সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে ধুইয়া যায়, কিন্তু মানব প্রাণের ঘোর শোকাচ্ছন্নতা কিছুতেই দূর হয় না। কালের সৈকত রাশি স্তরে স্তরে নদীকে আবৃত ও রুদ্ধ করে, কিন্তু মরমের গূঢ়তম প্রদেশের অন্তঃসলিলা চির-প্রবাহিতা।

ইহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কত রূপান্তর। আমাদেরও তাই। আমি মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া চাকরী পাইয়াছি। নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে সাহারণপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনের পদাভিসিক্ত হইয়াছি। সাংসারিক সুখ-দুঃখের বোঝা পৃষ্ঠে বহিয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা চিন্তা নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কনিষ্ঠা শেলির সেই সরল মুখখানির প্রতিবিম্ব হৃদয় দর্পণ হইতে সরাইতে পারি না। কিন্তু পিতা-মাতার নির্বাপিত আগুন জ্বলিয়া উঠিবার ভয়ে মুখে কিছু প্রকাশ করিবারও যো নাই।

বড়দিনের ছুটিতে দাদা সকল পরিবারকে লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি দেরাদুনে গিয়া কিছুদিন থাকিবেন। কেবল আমার পিতা এলাহাবাদের বাড়িতেই রহিলেন। তিনি এখনও শেলির বিষয়ে সন্দিহান চিত্ত। তাঁহার প্রাণের কন্যার মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকাল-বিকাল প্রত্যহ সেই গঙ্গাতীরে গিয়া যত দূর দৃষ্টি যায়, চক্ষু প্রসারিত করিয়া খুঁজিয়া লইতেন

ও কল্পনার সাহায্যে এই দেখেন যেন জাহ্নবীর বিশাল বক্ষভেদ করিয়া কোমল স্বর্ণবলয়—শোভিত হাত দু'খানি বাড়াইয়া কে বলিতেছে "আমায় ধর, আমায় তোল, আমি ভাসিতেছি।" এইরূপে বিষম সন্দেহ দোলায় দুলিয়া তাঁহার জীবন কাটিতেছে।

আমি মাতাকে হরিদ্বারে লইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। তিন দিনের ছুটি পাইয়া তাঁহাকে লইয়া তথায় গেলাম। হরিদ্বার এখান হইতে নিকট—৩/৪ ঘণ্টার পথ। আমরা ভোর ৭টায় উঠিয়া, লুকসের স্টেশনে একবার গাড়ি বদলাইয়া বেলা ১১টার সময় তীর্থস্থানে পৌঁছিলাম কিন্তু পূর্ববর্তী স্টেশন জ্বালাপুর হইতে মা গঙ্গার পেয়াদা আমাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। পরে হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছিবামাত্র মধুচক্রে মধুমক্ষিকাদল প্রায় তাহারা চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিল। আমরা যেন বূ্যহের ভিতর পড়িলাম। সকলেই পাণ্ডা হইতে চায়, তাহাদের ঐ এক প্রশ্ন "মশায় কোথা বাড়ি? চাটুর্জি, মুখার্জি কি আছে?" সকলের হাতে এক একখানা খাতা বহি। এখানকার রীতিই এই, গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপুত্রের খাতায় স্ব স্ব নাম-ধাম লেখা। এমনকি পিতা পিতামহ ইত্যাদির নাম গোত্র লেখাইতে হয়, তাহা হইলে উহারা যোজমান বাঁধিয়া রাখেন। আমি অনেক কষ্টে উহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু একটি লোক নাছড়াবান্দা হইয়া আমাদের সঙ্গ লইল। অবশেষে তাহার খাতায় পিসিমার নাম গোত্র প্রকাশিত হইল, এজন্য তাহার দাবী-দাওয়া অধিক। যাহোক আমরা স্টেশন হইতে নামিয়া সোজা গঙ্গাতীরে যাইব কিম্বা বাসায় ফিরিব ইহাই বিবেচনা করিতেছি, তখন সেই হরিদ্বার পথপ্রদর্শক পাণ্ডা মহারাজ কহিলেন, "এখানে একটি বাঙ্গালী মাইর আশ্রম আছে, সেইখানে সকল বাঙ্গালী বাসা লয়, অতএব আপনাবাও গিয়া সেইখানে বাসা লইবেন।" মাতার মনে সেই পরামর্শ ভাল বোধ হইল। অতএব আমরা দুইখানি এক্কানামক মর্তরথ ভাড়া করিলাম। একখানিতে আমরা মাতা-পুত্রে ও অপরি খানিতে ভৃত্যরাজ জিনিসপত্র লইয়া উঠিলেন। পাণ্ডাজি পিছু পিছু চলিলেন। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক রকমের লোক কেহ পদব্রজে কেহ রথে চলিলেন। সকলেই তীর্থযাত্রী। একই আশা—একই ভরসা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের এক্কা বেগে যাইতে চেষ্টা করিযা পারিতেছে না। পথ বড় অসরল—উঁচু-নিচু, বাঁকা-চোরা। কিন্তু কাহারও সে বিষয় গ্রাহ্য নাই। সকলেই সানন্দে সৌৎসুক্যে প্রকৃতির নবীন দৃশ্যময়ী মূর্তি দেখিতে ব্যগ্র। অদূরে শৈবালিক গিরিবর অলসভাবে ভীমকায় বিস্তার করিয়া শুইয়া আছেন। তদুপরি কত তরু গুল্ম কোমল হরিৎ লতাপাতা ছড়াইয়া সাদরে শৈবালিকের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে, যেন সুকুমার শিশুগুলি মায়ের বক্ষে থাকিয়া গলা জড়াইয়া মধুর চুম্বন দানে ব্যস্ত। সর্ব প্রাণ-তোযক পবন দুলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে। এই পার্বতীই শোভাপূর্ণ নির্মল স্বচ্ছবায়ু সেবিত প্রকৃতির লীলা-ভূমি হরিদ্বার কিম্বা হরদ্বারকে স্বর্গদ্বার বলিতে কাহার না ইচ্ছা করে? পূত ধারাময়ী জাহ্নবীর জন্মস্থান এখানে। এককালে সাগর বংশীয় ভগীরথ এই স্থান হইতে গঙ্গা প্রবাহের সৃষ্টি করেন। হিমাদ্রি শিখর ভেদ করিয়া সে স্থান হইতে এই অমৃতধারা নিঃসারিত হইতেছে, তাহাও ইহার সন্নিকটেই। সেই স্থান গঙ্গোত্রী নামে অভিহিত। যাহোক আমরা বাঙ্গালী মাইর আশ্রমে উপনীত হইলাম। আশ্রম একখানি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ি, ভিতবে নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির গৃহ, তৎপার্শ্বে আর একখানি দালান ও উঠান, তার সম্মুখে একখানি রাঁধিবার চালা ও অন্যান্য আবশ্যক স্থান। বাড়িটি ছোট কিন্তু অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উঠানে পুঁইশাকের একটি মাচা, কয়েকটি ফুল গাছও আছে। গৃহস্বামিনী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক, কিন্তু সুদীর্ঘ জটাধারিণী, বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ। দেখিতে গৌরবর্ণা। ব্রাহ্মণ তনয়ার মত প্রকার বটে। অবস্থা সম্পূর্ণ গৃহীর মত হইলেও তিনি নিজ বৈধব্য-দগ্ধ জীবন এই পবিত্র স্থানে এইভাবে কাটাইতেছেন বলিযা সাধু-ফকির মধ্যে পরিগণিত। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সেই রমণী সাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন।

আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গঙ্গা স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিলাম। গৃহস্বামিনী কহিলেন, "আপনারা কতক্ষণে ফিরিবেন? আমি আপনাদের জন্য পাক করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আজ আমার এক স্থানে যাইবার কথা আছে—" বলিয়াই আবার কহিলেন, "আপনারাও কি যাইবেন? গতকল্য এখানে একজন মহাত্মা আসিয়াছেন, তিনি না কি ত্রিকালজ্ঞ অতি বৃদ্ধ প্রাচীন সন্ন্যাসী, সকলেই তাঁহার দর্শনে যাইতেছে, আমিও তাঁহাকেই দর্শন করিতে যাইব। তিনি চণ্ডীর পাহাড়ে চণ্ডীদেবীর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন।" এই কথায় আমরাও তাঁহার সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা করিলাম ও বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূর নহে। অল্পক্ষণ পরে আমরা "হরকি পইড়িতে" পৌছিলাম। হরিদ্বারে এইখানেই সকল যাত্রী স্নান দানাদি করিয়া থাকেন ও অপর পার্শ্বে কুশাবর্তঘাটে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি হয়। "হরকি পইড়ির" ঘাটের উপরেই প্রয়োজন উপযোগী দোকান পশার। ইহা ছাড়া ফুলতোলা মালী, দুগ্ধবিক্রেতা, ফলবিক্রেতাও মাঝে মাঝে বসিয়াছে। ঘাটের উপরেও অনেক দেব-দেবীর মন্দির। আমরা সম্মুখস্থ সোপানোপরি বস্ত্রাদি রাখিয়া জলে নামিলাম। পাণ্ডাজী সেইখানে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন—"মা সঙ্কল্প কর, হাতে জল নাও, আমি মন্ত্র পাঠ করিতেছি। কিন্তু তুমি বল এইখানে পঞ্চমুদ্রা দিয়া হরির চরণ পূজা করিব।" আমি তাহার এই অযথা আদেশের অপ্রতিপাল্যতা তাহাকে বুঝাইয়া কহিলাম "তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা অবশ্যই পাইবে।" এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দান অপ্রতিহতভাবে প্রদত্ত হইল। যথা নিয়মে সেখানকার সকল কার্য সমাধা করিয়া বাটী অভিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। ঘাটে ও পথে অনেকের মুখেই সেই প্রাচীন সাধুর আগমন বার্তা শুনিলাম ও অনেকেই যাইতেছে দেখা গেল! অতএব আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া সাধু সন্দর্শনে যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। বাসায় আসিয়া গৃহস্বামিনীর ভাত কলাইয়ের ডাল আর পুঁইশাক চচ্চড়ি পরমানন্দে আহার করিয়া চণ্ডীর পাহাড়ে চলিলাম। আমার তো কোন কষ্ট হইল না, কিন্তু মা আমার রোগে-শোকে কাতর ও ক্লিষ্ট, তিনি যে আরও শ্রান্ত হইবেন ইহাই আমার মনে হইতে লাগিল। অবশেষে নীলধারা অতিক্রম করিয়া আমরা সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিলাম। শত শত যাত্রী অবাধে উঠিতেছে নামিতেছে। আজ অপেক্ষাকৃত লোকের ভিড় বেশি। সকলের মুখে সাধুর মাহাত্ম্য বর্ণিত, আমাদের পৌছিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। মা অতি ধীরে ধীরে হাঁটেন, তাহতে বেলা অবসান প্রায়। অপরাহ্ন ৫টার সময় পর্বতের উপরে গিয়া উপনীত হইলাম। দর্শনার্থিগণ এ সময় আসিতে ভয় পায়, পাছে ফিরিযা যাইতে অন্ধকার হয়। মন্দিরের পার্শ্বে মহাত্মার আসন শুনিলাম। আমরা মাতা-পুত্রে যখন গেলাম, তখন চণ্ডীদেবীর পাণ্ডা ছাড়া আর কেহই তথায় ছিল না। মৃগচর্মোপরি উপবিষ্ট একটি অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ যোগী। শ্বেত জটা ও শুভ্র শশ্রূগুম্ফে মুখমণ্ডল শোভিত। গৈরিক বসনে দেহ আবৃত। ঋষিবর নয়ন মুদ্রিত করিয়া একান্তচিত্তে ওঁকার ধ্যান করিতেছেন। কেমন পবিত্র প্রশান্ত মূর্তি যেন স্বয়ং মহাদেব তপস্যায় রত! আর কি দেখিলাম সে অতি বিচিত্র অভাবনীয় দৃশ্য। উহারা কি দেবতা কি মনুষ্য, তাহাও নয়নে মনে ঘোর ধাঁধা লাগিয়া গেল। কি দেখিতেছি সত্য না স্বপ্ন আসিয়া এই ক্লান্ত দেহে কুহকাবৃত করিয়াছে কিছুই তো বোধগম্য হইতেছে না। যেন জয়া-বিজয়া দক্ষিণে-বামে মহাদেবের দুই পার্শ্বে অবস্থিতা, রমণী দুইটির সন্ন্যাসিনী বেশ। বয়ঃক্রম ২০/২২ বছরের অধিক নয়। এই কোমল প্রাণে কিসের বৈরাগ্য? কেন নবীন বয়সে তাপসী বেশ? এই সুন্দর মুখমণ্ডলে কেন প্রীতি প্রফুল্লতার অভাব? পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শ্যামল মেঘে আচ্ছাদিত। আমরা মাতা-পুত্রে নির্বাক স্পন্দন হইয়া অনিমেশে চাহিয়া আছি, প্রাণের ভিতর ঘোর সন্দেহ কম্পন হইতে লাগিল। এ

যেন শত পরিচিত স্নেহসিক্ত মুখ। মায়ের মনে পুরান আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল। অতীতের কাহিনী যেন স্মৃতির ভিতর চমকিয়া উঠিল। তিনি আশার বিদ্যুতালোকে জগতের স্থায়িত্ব দেখিতেছেন, তাঁহার স্নেহের তরু-লতাগুলি বাঁচিয়া আছে, কাননখানি পূর্ণ! কিন্তু সন্দেহের মেঘে ঘোর আচ্ছন্ন, তাই আবার অন্ধ। নয়ন মন সকলি অন্ধ। অবশেষে মা আমার গললগ্নীকৃতবাসে সেই নবীন যোগিনীদ্বয়কেই প্রথম প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। তাহারা আপত্তি করিয়া কহিল, "ক্ষান্ত হউন, আমাদের গুরুদেবের সমক্ষে আমরা প্রণাম লইতে পারি না।" এই কথা শুনিবামাত্র মাতার ধৈর্যচ্যুতি হইল, তিনি সেই রমণীর হাত ধরিয়া নিজের বক্ষের ভিতর টানিয়া কহিলেন, "ওগো মা! একবার তো মা বলিয়া ডাক, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইক। এ যে সেই কণ্ঠস্বর যাহা আজ দশ বৎসর শুনি নাই, যে মুখ দেখিবার জন্য নয়ন ব্যাকুল, যে বাক্য শুনিবার জন্য কর্ণ আকুল, একবার ডাক মা।" আমার মাতার এই ভাব দেখিয়া নবীন সন্ন্যাসিনীর চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। সে কহিল, "মা কোথায়? আমি কোথায়?" এই বলিতে বলিতে মোহ ভাবাপন্ন হইয়া অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয়া রমণী আগন্তুকদ্বয়ের আগমনে এমন ঘটিল কেন ভাবিয়া গুরুদেবের পদবন্দনা করিয়া ধ্যান ভঙ্গ করাইল। তিনি কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ কমণ্ডলুর জল সেচনে প্রথমার চৈতন্য জন্মাইয়া পুনরায় স্বস্থানে বসিলেন। আমি তখন সষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক কহিলাম, "অদ্য সুপ্রভাত, সফল হইলাম চরণ দর্শনে।" সন্ন্যাসী ঈষদ হাস্যে চাহিলেন ও কহিলেন, "দর্শন পাইলে, এখন প্রস্থান কর, নচেৎ রাত্রিকালে এখান হইতে নামা কষ্টকর হইবে।" মা শুনিবামাত্র কহিলেন, "না ঠাকুর, আর যাইব না যে পর্যন্ত আমার অন্ধ নয়ন খুলিবে। আমি যে সেইসকল দেখিতেছি। সেই মুখ, সেই কথা, সেই স্নেহের টান আমার অন্তরে উথলিয়া যাইতেছে। আমাকে দয়া করিয়া ঐ শিষ্য দুইটি দান করুন। মানব যখন নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবিতে পারে না, তখনই প্রতিমূর্তি গড়িয়া পূজা করে। তাহাকে দেখিতে না পাই, তাহারই চিত্র আঁকিয়া চক্ষের সম্মুখে রাখি। স্বরূপের পরিবর্তে প্রতিরূপ কি মনুষ্যের চিত্ত শান্ত করে না?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন মা ব্যাকুল হইতেছ? ইহারা এখন সংসারের বন্ধন কাটাইয়া পরম সুখের পথ অবলম্বন করিতেছেন। অনেক শিক্ষাতে ইহাদের মনের ময়লা কাটিয়াছে। তুমি কে? ইহারাই বা কে? ইহাদের জন্য এত ব্যাকুল কেন? সংসারে সম্বন্ধ অতি অল্পক্ষণের জন্য। মা গৃহে যাও, ইহারা পরম তাপসী।" তখন আমি করপুটে বিনয়পূর্বক কহিলাম, "আমাদের সন্দেহ অপনোদন যদি দয়া করিয়া করেন, কৃতার্থ হই।" তিনি কহিলেন, "বল"। "আপনার আগমন কোথা হইতে?" "কাশীনাথ হইতে সম্প্রতি আসিয়াছি, সেইখানে আমার মঠ। উত্তরাখণ্ডে যাইব। আর তো কিছু বলিবার নাই? আমি কহিলাম, "আর একটি কথা জিজ্ঞাসিব ক্ষমা করিবেন, এই সন্ন্যাসিনী দু'টির পরিচয়।" সন্ন্যাসী কহিলেন "ইহারা আমার শিষ্যা, এই পরিচয়।" আমার মনে তৃপ্ত হইল না, কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোকের বিষয় বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলাম। মা আমার সেই রমণীদ্বয়কে বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "আহা! কার বাছা, কে এমন সোনার অঙ্গে ছাই মাখাইয়াছে?" প্রথমা রমণী অতি সাবধান দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। সন্ন্যাসী রমণীদ্বয়ের পরিচয় দিতেছেন না, এদিকে সন্ধ্যার মলিন ছায়া আসিয়া পর্বতের উপরিভাগ ঢাকিয়া ফেলিল। আর বিলম্বে বিপদ সম্ভাবনা জানিয়া মাতাকে কহিলাম। তিনি যাইতে অসম্মতা, অবশেষে সন্ন্যাসীকে কহিলেন, 'এই রমণীদ্বয়কে যদি দয়া করিয়া একবার আমার সঙ্গে চণ্ডীদেবীর মন্দিরের মধ্যে যাইতে আজ্ঞা দেন, তবে আমি

বিদায় লই।' মায়ের এরূপ কাতর অনুরোধে সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন। তখন উহারা তিনজনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, আমরা বাহিরে রহিলাম। পরক্ষণেই মাতা আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমণীদ্বয় আসিয়া আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ক্রমে আমার সন্দেহ সরিয়া সত্যে পরিণত হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমা রমণী "দাদা কি এই?" আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম চক্ষেব উপব ভ্রূর মধ্য ভাগে সেই কালো তিলটি এখনও সাক্ষ্য দিতেছে। তখন আর থাকিতে পারিলাম না। কহিলাম এই কি আমার শেলি? হা ভগবান! সত্য প্রকাশ কর।" সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদিগকে কহিলেন, "শান্ত হও। আমি তোমাদের সন্দেহ ঘুচাইব।" মাতা কহিলেন, "এ যে আমার কন্যা ও তাহার সঙ্গিনী, আমি সম্পূর্ণ নিদর্শন পাইয়াছি, পরিচয় হউক আর না হউক। এক্ষণে দয়া করিয়া প্রকাশ করুন কোথায় পাইলেন। আমি জানি আপনি ইহাদের জীবনদাতা। আমি তো জাহ্নবীব কোলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম।" সন্ন্যাসী পূর্ব কথা আরম্ভ করিলেন—

"তবে শুন। বহুদিন হইল অর্থাৎ প্রায দশ বৎসর অতীতপ্রায়, আমি একদিন বাগ্রে সমাধিস্থভাবে কাশীধামের গঙ্গাতীর হইতে স্রোতে বাহিয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় এই দুইটি বালিকা উভয়ে উভয়কে ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। আমার গাত্র স্পর্শে আমি দেখিলাম মনুষ্য দেহ, মৃতকল্প হইলেও জীবিত, সুতরাং আমি উহাদিগকে টানিয়া কূলে তুলিলাম। নিজ মঠে আনিয়া সেবাযত্নে চৈতন্য লাভ হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত জ্বর ভোগ করিতে লাগিল। একমাস পরে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হইল, কিন্তু দুইটিরই একটু একটু শরীরের ক্ষতি হইল। আপনি যাহাকে কন্যা নির্দেশ কবিতেছেন, তাহার শ্রবণশক্তি কিছু নষ্ট হইয়াছে ও দ্বিতীয়টির দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়াছে। যাহা হউক আমি উহাদের আকার-প্রকারে সম্ভ্রান্ত-বংশজা অনুভব করিলাম। প্রায় দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া দীক্ষিত করিলাম ও রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ হইল। পরে ইহাদেব বিদ্যাচর্চার সঙ্গে জ্ঞানেব তৃষাও বাড়িল। শিষ্যত্ব গ্রহণের উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া আমি ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণ কবিযা বেড়াইতেছি। এই সংক্ষেপে পরিচয।" মাতা কহিলেন, "যথেষ্ট হইযাছে, আর কি শুনিব। আমার কন্যাব বক্ষে যে দুর্গানাম অঙ্কিত রহিযাছে, তাহাই যথেষ্ট নিদর্শন।" এই বলিযা মাতা শেলিব বক্ষস্থিত দুর্গানাম যাহা উল্কি দ্বারা বাল্যকালে আমাব ঠাকুরমাতা আদবেব উপহাব দিযাছিলেন, খুলিযা দেখাইলেন। সেই চিহ্নের নীচে আমার দাদার ইচ্ছামত "মা" লেখা হয।

লজ্জাবতী

স্বর্ণকুমারী দেবী

১

শুনিতে পাই তাহার আসল নাম লজ্জাবতী নহে। সে ছোটবেলায় নাকি বড় অভিমানী ছিল, কোন দোষ করিলে পিতা-মাতা যদি তাহাকে তিরস্কার করিতেন অমনি সে লজ্জাবতী লতাটির মত সঙ্কুচিত জড়সড় হইয়া পড়িত। তাহার ছোট্ট, গৌরবর্ণ মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিত, তাহাব ডাগর ডাগর হাসি হাসি চোখ দু'টি জলে ভরিয়া যাইত, হৃদয়ের ভাব লুকাইবার ইচ্ছায় হাসিতে চেষ্টা করিয়া অশ্রুজলে ও ম্লান হাসিতে সে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিত। তাই তাহার বাপ-মা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন—লজ্জাবতী।

লজ্জাবতীর পিতা-মাতা এই মধুর কোমল অভিমানের মধ্যে তাহার হৃদয় মাধুর্য প্রকাশিত দেখিতেন, তাই তাঁহাবা সাদরে ইহার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। কিন্তু শ্বশুর গৃহে লজ্জাবতীব এই অকৃত্রিম বিনয়-নম্রতাপ্রসূত শিশুসুলভ সরল লজ্জামাধুরী কখনও আদৃত হয় নাই। কি করিয়া হইবে? সংসারে নীরবতাব গীতি-মাহাত্ম্য সকলের প্রাণে পৌঁছে কি?

সে তো প্রশংসাব কাজ করিয়া ঢ্যাঁডরা পিটাইতে জানে না, দোষের কাজ করিলেও পাঁচ রকম কথার ছলে ঢাকিয়া লইতে পারে না, বিনা দোষে তাহাকে দোষী করিলেও তাহাতে কোন কথা না কহিয়া অশ্রু বর্ষণ করে। কিন্তু কঠোর সংসারে কোমল অশ্রুর সাক্ষ্য কযজন সত্য বলিয়া গ্রহণ করে? ইহাতে বরং তাহার সপ্রমাণিত হয়। সুতরাং যে স্বভাবের গুণে লজ্জাবতী পিতা-মাতাব আদরের ছিল, সেই স্বভাবের গুণেই শ্বশুর গৃহে প্রতিপদে তাড়না সহ্য করে।

শীতের প্রভাত, কিন্তু আজ কুয়াসা নাই, নির্মল আকাশে সূর্যের অগ্নিগোলক জ্বলন্ত মহিমায় বিরাজিত হইয়া দিক্-বিদিক্ বিভাসিত কারয়া তুলিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে লজ্জাবতী দেখিল, তাহাব ঘরের দেওয়ালে সূর্যকিবণ ঝিকঝিক করিতেছে। ভাবিল কতই না জানি বেলা হইয়া গিয়াছে! তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া, একবাব মাত্র আকাশেব দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে সূর্য প্রণাম করিযা নীচে নামিয়া আসিল। তাহার পর তাডাতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া দ্রুতপদে রন্ধন গৃহে আসিযা দেখিল, তাহার 'যা' তখনও রান্নাঘরে আসেন নাই। দাসী উনুন ধরাইয়া বাঁটনা বাটিতেছে। সে তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুস্থিরভাবে কুটনার আয়োজন করিয়া লইয়া কুটনা কুটিতে বসিল। সেদিন তাহার রাঁধিবার পালা নহে, বড় বৌ রাঁধিবেন সে জোগাড় দিবে মাত্র, তাহার কুটনা কুটা প্রায় শেষ হইয়াছে, এই সময় শ্বশুড়ী আসিয়া সহাস্য মুখে কোমল স্বরে বলিলেন, "বৌমা, শুনেছ—?"

দ্বাদশ বৎসর লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়াছে। এমন সাদরে শাশুড়ী তাহার সহিত কথা কহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে নাই, সে তাঁহার দিকে চাইতে গিযা থতমত খাইয়া আঙুল কাটিয়া ফেলিল।—শাশুড়ী বলিলেন, "শুনেছ ফুলকুমারী আসছে—?" লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি কাটা হাত কাপড়ে লুকাইয়া আশ্চর্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "ঠাকুরঝি!"

আশ্চর্য হইবারই কথা, লজ্জাবতী শ্বশুর গৃহে আসিয়া অবধি কখনও এ পর্যন্ত তাহাকে দেখে নাই,

চতুর্দশ বৎসর হইল ফুলকুমারীর বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর একবারও সে বাপের বাড়ী আসে নাই। শ্বশুর ধনী লোক, পুত্রবধূকে এই গৃহস্থ ঘরে পাঠাইতে অপমান জ্ঞান করিতেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাই এতদিনে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিতেছে। শাশুড়ী আবার বলিলেন, "আজ কার রাঁধার পালা? বড় বৌয়ের বুঝি? তা দেখো বৌমা, বড় মানুষের বৌ—এতদিন পরে আসছে, যত্নের যেন কিছু কম না হয়।"

শাশুড়ী চলিয়া গেলেন, কাটা আঙ্গুল জলে চুবাইয়া ধরিয়া লজ্জাবতী ভাবিতে লাগিল "আজ যে এই সুপ্রভাত আনিয়াছে সে না জানি কিরূপ কল্যাণরূপী ঊষাময়ী প্রতিমা! তাহার আগমনে এই কঠোর অন্ধকার প্রান্তর এতদিনে বুঝি প্রেমালোকে আলোকিত হইয়া উঠিবে!

এক অপূর্ব আনন্দে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

২

একে কন্যা, তাহে ধনীর ঘরণী, গৃহে আসিয়াছে আবার অনেক দিনের পর;— চৌধুরী বাড়ীর অন্তঃপুরে আজ পর্বোৎসবের ধূম, কাহারো মুহূর্ত দাঁড়াইবার অবকাশ নাই। বধূগণ রাঁধিতে ব্যস্ত। দাসীগণ যোগাড় দিতে ব্যস্ত, গৃহিণী আনাগোনা ও ফরমাস করিতে ব্যস্ত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "পিসিমা আসিতেছেন" বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া ছুটাছুটি করিতে ব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি আসছেন গো।"

চাকর দাসী ছেলে মেয়ে গৃহিণী সকলেই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন—লজ্জাবতীও তাড়াতাড়ি হাতা বেড়ি ফেলিয়া মাতৃদেবীর তিরস্কার না মানিয়া দ্বার দেশে আসিয়া উঁকি মারিল,। রন্ধন গৃহের সম্মুখেই অন্তঃপুরের উঠান। একখানি বস্ত্রাবৃত পালকী—অগ্রপশ্চাতে দুইজন সুসজ্জিত দ্বারবান এবং উভয় পার্শ্বে পট্টবস্ত্র ও স্বর্ণহার-বিভূষিতা দুই দাসী, উঠানে আসিয়া দেখা দিল। এই রাজসজ্জা দেখিয়া লজ্জাবতীর স্ফীত হৃদয় সহসা দমিয়া গেল—ধনীর নিকট দরিদ্র অনুগ্রহের পাত্র, তাহাদের মধ্যে কি সখ্যতা সম্পর্ক— হৃদয়ের সম্বন্ধ জন্মিতে পারে?

কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই আড়ম্বরের মাঝে যখন সামান্য সাজে, সামান্য বেশে এক হাস্যময়ী প্রফুল্লমুখী অসামান্য রমণী আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন নিমেষে তাহার বিরস ভাব দূর হইল, হৃদয় এক উত্তাল আনন্দ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মা ফুলকুমারীর হাত ধরিয়া উপরে লইয়া গেলেন, লজ্জাবতী তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস লইয়া আবার রান্নাঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই খানিকটা হলুদ লইয়া বড় বৌয়ের পৃষ্ঠ-বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া দিল। বড় বৌ রাগিয়া বলিলেন, "ও আবার কি সোহাগীপণা!" সে হাসিয়া অস্থির হইল। বড় বৌয়ের রাগ তাহাতে দ্বিগুণ বর্ধিত হইল তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কাজের সময় ওসব ন্যাকামি ভাল লাগে না, কি হাসিই পেয়েছ।" ছোট বৌ বুঝিল কাজটা ভাল করিতেছে না। তবুও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বড় বৌ আবার বলিলেন, "ভ্যালা আদুরেপণা শিখেছিলি! আদুরেগিরি ফলাতে হয় বাপের বাড়ি গিয়ে ফলাস, আমাদের ও সব ভাল লাগে না"—এই কথায় তাহার অন্তর বিদ্ধ হইল, নয়ন সজল হইয়া উঠিল, তবুও সে হাসিতে লাগিল। অনেক দিনের পর তাহার স্বাভাবিক শিশু-সুলভ চপলতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

* * * *

আর লুকাইয়া এক তরফা দেখা নহে—এবার চোখে চোখে মিলন। বধূরা অন্ন ব্যঞ্জন, ক্ষীর নবনী, দধি দুগ্ধ, ফল মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মা কন্যাকে ভোজন স্থানে লইয়া আসিলেন।

আহারের সরঞ্জাম দেখিয়া ফুলকুমারী বড় বৌকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ কি করেছিস লো, এত কেন! আমি কি গুরুঠাকরুণ হয়ে এসেছি নাকি?"

বড় বৌ অর্দ্ধ ঘোমটার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে বলিল, "তা নইলে এতদিন পরে বাপের বাড়ি আসিস? এখন বোস, রান্নার যেন নিন্দে না হয়, পাতে পড়ে থাকলেই বুঝব রুচলো না।"

"মরে যাই, আমি কি রাক্ষস নাকি? ও কে, বড় বৌ?"

মা তাহার উত্তরস্বরূপ বলিলেন, "তা জানিস্ নে ফুলি! ও ছোট বৌ! কি করেই বা জান্‌বি, শ্বশুর পোড়ারমুখো হেমের বিয়েতেও তো একবার পাঠালে না। এত করে বললুম—তা একবেলাও না। এমন জানলে কি অমন ঘরে মেয়ে দিই!"

ফুলকুমারী ইত্যবসরে ছোট বৌয়ের নিকটে আসিয়া বলিল, "এই আমাদের ছোট বৌ! দেখি লো দেখি, মুখ খোল", বলিতে বলিতে সে তাহার ঘোমটা উঠাইল, ছোট বৌ একটু হাসিয়া আবার ঘোমটা টানিয়া দিল। ফুল বলিল, "ওমা বেশ বৌ হয়েছে, দাদা দেখছি ছবির মত বৌ করেছে!" ছোট বৌয়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ফুল এই কথা বলিল, ছোট বৌ হাসিয়া মুখ হেঁট করিয়া ঘিয়ের বাটি ভাতের থালার কাছে আর একটু সরাইয়া রাখিল।

৩

কাজ কর্ম শেষ করিয়া বিকালে লজ্জাবতী উপরে উঠিতেছে। ফুলকুমারীকে আর একবার দেখিবার জন্য সে তৃষিত, ফুলের প্রফুল্ল ভাব, সহাস্য দৃষ্টি, সাদর মধুর কথা, সমস্তক্ষণ তাহার মনে তরঙ্গ তুলিয়াছে। লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় সলজ্জ আগ্রহে অধরের মৃদু হাসি চাপিয়া অধীরচরণ ধীরে ধীরে বিক্ষেপ করিয়া দোতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় পুঁটুরাণী অসিয়া বলিল, "মা, আমার ফুল কাঁটা ফিতে দে, পিসিমা চুল বেঁধে দেবে।" লজ্জাবতী সহসা স্বপ্নরাজ্য হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, বিস্মিতভাবে বলিলেন, " সে কি, তোর ফুল কাঁটা তো আমি রাখিনি!" মেয়ে বলিল, "রাখিসনি কি! সেই যখন তুই কুটনো কুটছিলি আমি তোর কাছে রেখে এলুম!"

"কই আমি ত্রে তা জানিনে। আমাকে তো বলে আসিসনি?" মেয়ে বলিয়া আসে নাই সেটা ঠিক! কিন্তু মা যে তুলিযা রাখেন নাই সেটা তো আব তাহাব দোষ নহে। সে মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, "কাছে রেখে এলুম—তা আর বলে আসব কি! শীঘ্র আমার দড়ি কাঁটা দে।" লজ্জাবতী নিজের দোষটাই মনে মনে মানিয়া লইয়া, তাহাকে আর কিছু না বলিয়া গহনা খুঁজিতে আবার নীচে নামিলেন— আর ফুলকুমারীকে দেখিতে যাওয়া হইল না।

এদিকে দাসী আসিয়া গৃহিণীকে বলিল, "দিদিমণির বিছানা তো করে এনু—তা গায়ে নেপ কি দেব—একটা দাও।" ফুলকুমারী তখন বড় বৌয়ের ঘরে তাহার সহিত গল্প করিতেছিল। গৃহিণী একাকী ছিলেন। দাসীর কথায় তিনি তাহার তলপীতল পা খুঁজিয়া একটিও ভাল লেপ পাইলেন না— সবই ছেঁড়া ছেঁড়া, পাতা চলে, কিন্তু বড় মানুষের বৌকে গায়ে দিতে দেওয়া যায় না। গৃহিণী ভাবিত হইয়া পড়িলেন—তবে বিপদে পড়িলে যাহার বুদ্ধি না যোগায় তিনি স্ত্রীলোকই নহেন। মুহূর্তের মধ্যেই উপায় আবিষ্কৃত হইল। দাসীকে বলিলেন, "দ্যাখ, আজ তো হেম পশ্চিমে যাবে, ছোট বৌয়ের গায়ের নেপটা ফুলির বিছানায় দিগে, আর এর একটা আমি বেছে রাখি—এসে তখন ছোট বৌয়ের জন্যে নিয়ে যাস।"

দাসী চলিয়া গেল, খানিক পরে আসিয়া বলিল, "এমন অগোছাল বৌ-ও দেখিনি। পুটুরাণী গহনা রাখতে দিয়েছিল—তা হারিয়ে খুঁজতে নেগেছে, তাই তাকে আর বলতে পেনু না। আপনিই নেপটা নিয়ে দিদিমণির বিছানা করে এনু।"

"গহনা হারিয়েছে! কি গহনা?"

"মাথার ফুল গো ফুল! দেখো মা আমাদের শেষে দয়ে মজিও না। তোমরা সব হারাবে—আর আমরা গরীব মানুষ যেন মারা না যাই"—

গৃহিণী এই খবরে রাগিয়া আগুন হইলেন, আজ আনন্দের দিন, মেয়ে ঘরে আসিয়াছে—আর কিনা পোড়ারমুখী বৌ গহনা হারাইয়া অলক্ষণ করিয়া বসিল! তিনি প্রথমে বড় বৌয়ের ঘরে আসিয়া খবর দিলেন—"শুনেছিস্? ছোট বৌ গহনা হারিয়েছে! এই সেদিন চেলির কাপড়খানা হারালে, আবার আজ এই কীর্তি! এমন উড়নচণ্ডী বৌ"—

ফুল বলিল—"মা, তা বৌ তো আর ইচ্ছে করে হারায়নি।"

ফুলকে তাহার পক্ষ লইতে দেখিয়া মায়ের রাগ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তুমি তো বাছা বৌয়ের গুণ জান না তাই ওকথা বলছ, দিনকতক থাক তখন বুঝবে! দেখতে মুখখানি অমন—পেটে পেটে দুষ্টুমি, ইচ্ছে করেই হারিয়েছে! আর গহনা তো ওর যাবে না, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! তুই আজ বাড়ি এসেছিস তাই ইচ্ছে করেই অলক্ষণ করছে।"

বড় বৌ কোন কথা কহিল না। ফুলকুমারী বলিল, "আচ্ছা দেখে আসি ব্যাপারটা কি হয়েছে?" তিনজনে মিলিয়া তখন ছোট বৌয়ের সন্ধানে চলিলেন। বেশী দূর যাইতে হইল না। ছোট বৌ নীচের সব ঘর খুঁজিয়া উপরে উঠিতেছিল। বারান্দায় দাঁড়াইতেই শাশুড়ীর তীব্রস্বর তাহার কানে পৌঁছিল—"কি গহনা আবার হারিয়েছিস! (যেন চিরকাল ধরিয়া সে গহনাই হারাইয়া আসিতেছে!) বাড়িতে আর লক্ষ্মী রইলো না! পরের বাড়ি মেয়ে পাঠানই বা যাবে কি করে? শ্বশুররা যখন বলবে আমাদের গহনা কি হোল তখন লজ্জায় না মুখ কালী হয়ে যাবে!"

লজ্জাবতী মৃদুস্বরে বলিল, "এর শ্বশুর বাড়ির গহনা নয়; আমার বাবা আমাকে যে ফুল দিয়েছিলেন তাই পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

"বটে! তোমার বাবা তোমায় যা দিয়েছেন তাই হারিয়েছে? তা আমরা কথা কয়েছি ঘাট হয়েছে! দোষ করলেই কথা কইতে হয়—তা কথা কইলেই অমনি বাপের বাড়ির তুলনা! দেখলি বাছা ফুলি, দেখ—একবার তোর মায়ের অপমানটা দেখ"—

বড় বৌ বলিল, "হলেই বা বাপের বাড়ির গহনা, জিনিসটা তো হারাল!"

শাশুড়ী বলিলেন, "হারাক—হারাক—হারাক সব যাক, আমাদের কথা কয়ে কাজ কি? বলব কি, হরিমোহন ঘোষের মেয়ে আমি—তাই—অমন বৌ নিয়ে ঘর করছি! নইলে আর কেউ হলে বাপ বাপ ডাক ছাড়ত! আয় বাছা, তোরা কেউ কথা কসনে।"

শাশুড়ী চলিয়া গেলেন, ঘরে গিয়া সেই কথা লইয়াই গুলজার করিতে লাগিলেন। ছোটবাবু সেদিন কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া মায়ের নিকট বিদায় লইতে গিয়া সেই সকল কথা তাহার কানে উঠিল। মা নানা কথার পর বলিলেন, "বাছা তোদের তো এখন ঘর সংসার হয়েছে, আমাকে তো আর দরকার নেই—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এখানে থেকে এসব অপমান আমার আর সয় না।" ছোটবাবু ছোট বৌয়ের ব্যবহার শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন,

গোলযোগের আর ছাই কি দিন ছিল না, আজ বিদেশে যাইবার দিন কত হেঙ্গাম! তিনি তো গৃহে গিয়াই ছোট বৌকে বকিতে লাগিলেন। কেবল বকিলেই রক্ষা ছিল—বলিলেন, "আমি আর এরূপ গোলযোগ সহিতে পারি না, এই চলিলাম আর ফিরিব না।"

স্বামীকে যদি লজ্জাবতী সব খুলিয়া বলে তো এতটা কিছুই হয় না। কিন্তু স্বামীর কঠোর বাক্যে তাহার হৃদয় এত কাতর হইয়া উঠিল যে মুখ দিয়া কথা ফুটিল না! বিদায়ের দিনে এইরূপ স্নেহসম্ভাষণ জানাইয়া স্বামী যখন চলিয়া গেলেন সে বিছানায় পড়িয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহার উপায় কি! যেরূপ স্বভাব লইয়া সে জন্মিয়াছে!

৪

চতুর্দশ বৎসর পরে ফুলকুমারী পিত্রালয়ে আসিয়াছে, তাই আপনার বাড়ি হইয়াও এ বাড়ির সবই যেন তাহার চোখে নূতন। মায়ের সে শ্রী নাই, তিনি এখন বৃদ্ধা, বালিকা বড় বৌ এখন গৃহিণী, দাদারা সব বড় হইয়াছেন, ঘরে ঘরে বালক-বালিকার নব মুখ—সকলই তাহার কাছে নূতন। সর্বাপেক্ষা নূতন লজ্জাবতী এবং তাহার প্রতি বাড়ির ব্যবহার! সে যেন ছাই ফেলিতে ভাঙাকুলা। তাহাকে জা বকেন, মা বকেন, স্বামী বকেন, মেয়ে পর্যন্ত—এমন কি দাসীরা পর্যন্ত বকে! তাহার কি দোষ। কোন দোষ আছে কিনা ইহা বিচার করিয়া দেখাটাও কেহ আবশ্যক বিবেচনা করে না—লজ্জাবতী কখনও নিজের দোষের প্রতিবাদ করে না।

ফুলকুমারী অবাক হইয়া গেল—তাহার হৃদয় মমতার্দ্র হইয়া পড়িল। সে ছোট বৌয়ের পক্ষ হইয়া মাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দেখিল বৃথা চেষ্টা, মা তাহাতে আরও বেশী রাগিয়া যান। এদিকে নিষ্ফল হইয়া সে সন্ধ্যার পব লজ্জাবতীর কক্ষে গমন করিল, যদি কোনরূপে তাহাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। গৃহ দ্বারে আসিয়া মাত্র দাদার রুষ্টস্বর তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ফুলকুমারী ভিতরে না গিয়া সেইখানেই দাঁড়াইল। তখনই প্রায় দাদাকে গৃহের বাহিরে আসিতে দেখিয়া বলিল, "দাদা, বৌকে বকছ, আমি তো বৌয়ের কোন দোষ দেখছিনে"। দাদা সহসা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে দোষ কার?"

"দোষ যদি ধরতে হয় তো পুঁটুরাণীর, নইলে কারো নেই। সে যদি বৌকে গহনার কথা বলে, তাহলে তো আর চুরি যায় না।"

'কিন্তু মায়ের মুখের ওপব অমন চোপা করাব কি দরকার ছিল?"

ফুলকুমারী একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল. "দাদা. সেটা ঠিক চোপা নয়। মা যদি বুঝে দেখতেন। তাহলে তাতে রাগ করতে পারতেন না, তবে এখন বুড়ো হয়েছেন এক বুঝতে আর এক বুঝে বসেন। কিন্তু তাই বলে তুমিও দাদা ভুল বুঝ না। কি হয়েছে বলি শোন।" কি কথার পর লজ্জাবতী মাকে কি বলিয়াছিল ফুলকুমারী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি ওর দোষ পেলে?"

"না।"

"তবে ভেবে দেখ দেখি, বিনা দোষে তুমি পর্যন্ত ওরূপ করে বকলে ওর কিরূপ কষ্ট হয়! বিশেষ করে আজ বিদেশে যাবার দিন ওকে বকে যাচ্ছ, তোমার একটু মায়া করে না দাদা?"

দাদা আর কিছু না বলিয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিল। শয্যায় আসিয়া দেখিলেন লজ্জাবতী কাঁদিতেছে, নিকটে বসিয়া কহিলেন, "লজ্জাবতী, তুই কি চিরকাল লজ্জাবতী থাকবি? এতক্ষণ সব খুলে বললেই

তো আমি বুঝতুম তোর দোষ নেই। যা হয়েছে তা হয়েছে, ভুলে যা লক্ষ্মীটি, আর কখনও তোকে বকব না। আমায় মাপ কর।" লজ্জাবতী গভীর সুখে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিল।

৫

স্বামী চলিয়া গিয়াছেন—রাত্রি গভীর—চারিদিক নিস্তব্ধ, কিন্তু লজ্জাবতীর নিদ্রা আসিতেছে না। গভীর কষ্টের পর স্বামীর প্রেমাদর পাইয়া কৃপণের ন্যায় সে তাহা এখনও আস্তে আস্তে উপভোগ করিতেছে। এক একবার তাহার আশ্চর্য মনে হইতেছে, স্বামী সব কথা কি করিয়া জানিলেন?—কে বলিল? সহসা সে চমকিয়া উঠিল, ফুলকুমারী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিল, " বৌ, এখনো বিছানায় যাসনি।" স্বামীকে বহির্বাটীর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া আসিয়া সেই যে সে নীচে সতরঞ্চের উপর শুইয়া পড়িয়াছে—আর ওঠে নাই। ফুলকুমারীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি এখনও শোওনি?"

ঠাকুরঝি বলিলেন, "আমি শুয়েছিলাম, বিছানা থেকে উঠে তোকে দেখতে এলুম। দাঁড়া প্রদীপটা কাছে আনি, ভাল করে মুখ দেখা যাচ্ছে না।" ফুলকুমারী দীপটা নিকটে আনিয়া ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া নিকটে বসিল। বৌয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিল, "তোর না ভাই বার বছর বিয়ে হয়েছে? আচ্ছা তখন কি তুই এর চেয়েও ছোট ছিলি? তোকে এখনও এমন ছোট দেখতে! মনে হয় যেন কনে-বৌটি!" বৌ একটু হাসিল—ননদ তাহার হাতটি হাতের মধ্যে ধরিয়া বলিল, "তুই ভাই অমন কেন?"

"কেমন?"

"যেখানে তোর দোষ নেই সেখানেও কথা কসনে?"

"কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টো হয়। কে জানে আমি কি রকম করে বলি –সবাই ভুল বোঝে?"

"দাদাও? কেন আমি দাদাকে বুঝিয়ে বলতে তো তিনি সব বুঝলেন?"

তবে ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ লইয়া স্বামীকে সব কথা বলিয়াছে! তাহার জন্যই সে স্বামীব আদর পাইয়াছে! কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তিনি কিছু বললে আমাব বড় কান্না পায়।"

"তাই তো কোন কথা মুখ ফুটে বলা হয় না? বুঝেছি।"

"না তা ঠিক না, তিনি বিরক্ত হয়ে তাবপর আর জিজ্ঞাসা করেন না।"

"হায়রে আমার অভিমানিনি! কে জানে ভাই তোকে সবাই বকে কি করে! কি করে তোর উপর রাগ করে!"

"দিনকতক পরে তুমিও বকবে! দেখবে আমার উপর রাগ না করে লোকে থাকতে পারে না।"

"কক্ষনো না।"

"যদি দোষ করি?"

"তা হলেও না। তোকে যে সকলেই বকে—আমি আবার কোন প্রাণে বকব!"

লজ্জাবতী তাহার হাত দু'টি ধরিয়া টিপিয়া বলিল, "তাও নাকি কখনও হয়!"

আনন্দ-সজল নেত্রে খানিক পরে ফুলকুমারী চলিয়া গেলেন। বৌ বিছানায় গেল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম হইল না। সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা, স্বামীর আদর, ফুলকুমারীর সস্নেহ বাক্য, অকৃত্রিম সখীত্বভাব

তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে লাগিল। সুখের চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইল।

ভোরবেলা উঠিতে গিয়া দেখিল মাথা বড় ঘুরিতেছে—আবার সে শুইয়া পড়িল। ফুলকুমারী সকালে গৃহে আসিয়া বৌকে তখনও শয্যায় দেখিয়া মশারীর দরজাটা একটু খুলিয়া যখন উঁকি মারিল, লজ্জাবতী তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। লজ্জাবতীকে নিতান্ত বিবর্ণ, ক্লান্ত দেখিয়া ফুলকুমারী বলিল, "বৌ, তোর কি অসুখ করেছে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

লজ্জাবতী তাড়াতাড়ি বলিল, 'না'।

ফুলকুমারী বলিল, "কিন্তু তুই যে কাঁপছিস, শীত করছে? গায়ে কাপড় দে না।"

লজ্জাবতী বিছানার এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, "আমার লেপটা কই দেখছিনে তো"— গোলমালে শাশুড়ীর দত্ত লেপটি দাসী তাহার জন্য আনিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

"ওমা, সারারাত লেপ না গায়ে দিয়ে এমনি কাটিয়েছিস! কেন তোর লেপ কোথায় গেল?"

"জানিনে, ঝি বুঝি শুক'তে দিয়েছিল, তুলে দিতে ভুলে গেছে"—বলিতে বলিতে লজ্জাবতী বিছানার বাহির হইল। ফুলকুমারী তাহার মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "সত্যি বৌ, তুই এখন উঠিসনে, শুয়ে থাক, তোর কপালটা যেন গরম গরম মনে হচ্চে।"

বৌ হাসিয়া বলিল, "এখন শুয়ে থাকলে কি চলে? ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে, স্নান করলেই সেরে যাবে এখন।"

"কেন—চলবে না কেন? আজ বুঝি তোর রাঁধার পালা? তা অসুখ করলেও পালা রাখতে হবে নাকি? আমি রাঁধব এখন।"

লজ্জাবতী জিভ কাটিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি— ক্ষেপেছ নাকি? সত্যি আমার কিছু হয়নি।" এমন আজগুবি অসম্ভব প্রস্তাব সে যেন জীবনে কখনো শুনে নাই। বলিতে বলিতে সে খাটে বসিয়া পড়িল। ফুল বলিল, "আমার মাথা খাস্ তুই শো,—"

এমন সময়ে দাসী একটা লেপ আনিয়া বিছানায় ফেলিয়া বলিল, "এই তোমার লেপ রইলো গো—কাল আনতে ভুলে গেছনু—তা উনুন যে বয়ে যাচ্ছে আজ কি আর রান্নাবান্না করতে হবে না?"

লজ্জাবতী বলিল, "চল যাচ্চি।"

দাসী গেল, ফুল বলিল, "আমার কথা রাখবিনে, তবু রাঁধতে যাবি।"

বৌ কাতর হইয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, তুমি রাঁধবে সে কি করে হবে?"

"কেন তাতে কি হয়! তবে আমি তোর এত পর— বেশ!" এই কথা বলিযা ফুল রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, লজ্জা বলিল, "শোন ঠাকুরঝি— না, তা নয়! কিন্তু মা তাহলে রাগ করবেন, তিনি ভাববেন—"

"তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া সে আমার!"

লজ্জাবতী একটু ভাবিল—ভাবিয়া সেই প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতাটা মনে মনে কল্পনা করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "ছি ছি তাও কি হয়! না ঠাকুরঝি, সে কোন মতে হবে না!"

"কোন মতে হবে না! বেশ তুই রাঁধলে আমি কিন্তু সে রান্না খাব না।" ফুল রুষ্ট স্বরে এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল—লজ্জাবতী ডাকিল, "ঠাকুরঝি।" কিন্তু ফুল আর ফিরিল না। লজ্জাবতী আর পারিল না—সে তাহার ঘূর্ণমান উত্তেজিত উষ্ণ মস্তক লইয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল। এখনও একদিন যায় নাই ইহার মধ্যে ঠাকুরঝিও তাহার উপর রাগ করিল। সে বুঝিল এ রাগ ঠাকুরঝির স্নেহপ্রসূত—

কিন্তু তবুও তাহাতে তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইল, দুঃখে অভিমানে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। কাঁদিয়া মনে মনে সে কহিল, ঠাকুরঝিও আমার উপর রাগ করিল! আমার মরণই ভাল!

৬

লজ্জাবতী খানিক পরে নীচে রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিল, ফুল উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বড় বৌকে রান্না সম্বন্ধে নানরূপ প্রশ্ন করিতেছে—বড় বৌ কুটনা কুটিতে কুটিতে হাসিয়া উত্তর করিতেছেন। ফুলের বাঁহাতী উনুনে ডালের হাঁড়ি—ডানদিকে কড়ায় তেল ফুটিতেছে—সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বৌ লো! তেল চড়বড় করে এলো এখন তরকারীগুলো দিই?" বউ হাসিয়া বলিতেছে, "বলি তোমার অমন কাজ না করলেই কি নয়! চড়বড়ানি আগে থামুক তখন দেবে—" ফুল বলিল, "ঐ লো বউ ডাল উতলে উঠলো! কি করি আয় আয়—"

লজ্জাবতী বলিল, "এই যে আমি আসছি ঠাকুরঝি।" সে আসিতে ডাল উথলিয়া খানিকটা ফুলের পায়ে পড়িয়া গেল। পা পুড়িল ফুলের, তাহার জ্বালা ভোগ করিল যেন লজ্জাবতী, এই ঘটনায় এমনই সে ব্যথিত হইয়া পড়িল! সে শুষ্ক মুখে তাড়াতাড়ি তাহার শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা তাই ত! সত্যিই ফুলকুমারী রানছে—আমার বিশ্বাস হয়নি। আবার পা পুড়িয়ে ফেলেছে—বলি সব রাজার ঝিরা! ননদ দু'দিন মাত্র থাকতে এসেছে তাকে না পুড়িয়ে মনস্কামনা সিদ্ধি হল না!"

বড় বৌ বলিল, "আমি তো সেই অবধি বারণ করছি, তা ঠাকুরঝি তো শোনে না কি করব? ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে, না পারে—আমি রাঁধছি, তোর কেন বাপু আসা!"

শাশুড়ী। "ছোট বৌয়ের অসুখ করেছে তাই উনি রাঁধতে এয়েছেন! দেখ ফুলি, আমি আজ মাথামুড় খুঁড়ে মরব! এদিকে আয় বলছি, মাইরি—এমন বৌও তো আমি কখনও দেখিনি।"

বড় বৌয়ের প্রতি ফুল ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মাকে বলিল, "না মা আমি সখ করে রানতে এসেছি, আমি এই ডাল আর তরকারীটা রেঁধে যাচ্ছি—তুমি যাও।"

মা বলিলেন, "তুমি রাঁধবে, আর বৌরা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে? আয় বলছি, নইলে আমি রক্ষে রাখব না"—বলিয়া হেঁসেলে উঠিয়া ফুলের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন এবং সমস্ত বেলা ধরিয়া তাহাকে এমন চোখে চোখে রাখিয়া দিলেন যে ফুলের আর লুকাইয়াও এ মুখো হইবার যো রহিল না।

৭

লজ্জাবতী তাহার অসুখ শরীর লইয়া নিস্তব্ধে রাঁধিল, কিন্তু রান্নার পর গৃহে আসিয়া সেই যে শুইয়া পড়িল, আর উঠিবার সামর্থ রহিল না।

বড় বৌ ফুলের ভাত বাড়িয়া উপরে লইয়া আসিল। পুঁটুরানী পিসিমাকে ডাকিল, "পিসিমা ভাত এসেছে খাবে গো।" মা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আহার স্থানে আসিয়া ছোট বৌকে না দেখিয়া বলিলেন, "রাজার ঝির বুঝি আর এদিকে আসতে নেই!" পুঁটুরাণী বলিল, "মায়ের বড় অসুখ করেছে সে শুয়ে পড়েছে।"

শাশুড়ী বলিলেন, "সব ভাণ, কাজের নামে অমনি অসুখ।"

তাহার অসুখের কথা শুনিয়া ফুলের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—বুঝিল বিশেষ অসুখ না হইলে সে এখানে আসিত। সে বলিল, "না মা, সকাল থেকে তার অসুখ করেছে—রেঁধে ভাল করেনি, একটা বাড়াবাড়ি না হয়।"

মা বলিলেন, "অমনি বাড়াবাড়ি হোল! একটু বুঝি মাথা ধরেছে আর পড়ে আছে। গেরস্থের বাড়ি অত বড়মানুষী করলে চলে না।"

ফুল আর কিছু না বলিয়া আহারের পর তাহার গৃহে গমন করিল, মাও তাহার সঙ্গ লইলেন।' লজ্জাবতীকে দেখিয়া শাশুড়ীর জ্ঞান জন্মিল যে, সে সত্যই পীড়িত। ফুল তাহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "উঃ! আগুন যে! বৌ শীতে কাঁপছে, নেপটা আবার গেল কোথা? কাল তো বৌয়ের বিছানায় মোটেই নেপ ছিল না—সারা রাত শীতে সারা হয়ে আসলে এ অসুখটা হয়েছে।"

শাশুড়ী বলিলেন, "বড় মানুষের ঝি! একটা নেপ দিয়েছিলুম তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। গেরস্থঘর একদিন কি নিজের ভাল নেপটা নইলে চলে না! না হয় ননদকেই গায়ে দিতে দিয়েছিলুম—তার জন্যে একেবারে অসুখ বাধান।"

লজ্জাবতী জানিতই না যে শাশুড়ী তাহার লেপের পরিবর্তে অন্য লেপ তাহাকে দিয়াছেন। সুতরাং সকালে রন্ধন গৃহে যাইবার সময় বিছানা তুলিতে গিয়া ছেঁড়া লেপখানা দেখিয়া ভাবিল, দাসী লেপটা বদল করিয়া আনিয়াছে—তাই পুঁটুরাণীকে দিয়া লেপটা ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল। ফুল বলিল, "সে যা হোক, এখন একটা লেপ পাঠিয়ে দাও দেখি!" শাশুড়ী চলিয়া গেলেন। ফুল লজ্জাবতীর সেই করুণ কাতর মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন আমি জোর করে রাঁধলুম না, তাহলে তো তোর অসুখ হোত না!"

লজ্জাবতীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল—সে বলিল, "না আমার রেঁধে অসুখ করেনি। বল দিদি, তোমার আর রাগ নেই—তুমিও ভাই আমার উপর রাগ করলে!"

ফুলকুমারী কাঁদিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "আর আমি কখনো রাগ করব না—বল ভাই, তুই কিছু মনে করবি নে!"

লজ্জাবতী কোন কথা কহিল না, তাহার মাথা ফুলের বুকে রাখিয়া গভীর প্রশান্ত সুখে সে কাঁদিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে এক হইয়া, দুজনে অশ্রুজলে অশ্রুজল মিলাইল!

বুঝিবা লজ্জাবতীর কাঁদিবার সাধ মিটিল! ইহার পর আর সে কাঁদিল না —স্বামী যে কথা দিয়াছিল, ফুল যে কথা দিয়াছিল তাহা ঠিক রহিল—আর লজ্জাবতীকে তাঁহাদের বকিতে হইল না। —কয়েক দিনের মধ্যেই লজ্জাবতী রোগ-শয্যা হইতে একেবারে চিতা-শয্যায় শয়ন করিল।

শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আহা গেলো গো—নিজের দোষে প্রাণটা খোয়ালে! রাগ করে নেপটা গায়ে দিলে না গো। রাগ করে বললে না যে অসুখ করেছিল।"

দাসী, চাকর, জা, সকলেই এই এক ধূয়া ধরিয়া কাঁদিলেন — কেবল একটি গভীর শোকক্লিষ্ট, অনুতপ্ত হৃদয় তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া নির্জনে মর্মান্তিক দুঃখের অশ্রু বর্ষণ করিয়া মনে মনে কহিল— "হায় হায়, কি করিলাম! কেন তাহার উপর রাগ করিয়াছিলাম। বুঝিবা সে ঐ অভিমানেই গেল—বুঝি আমিই তাকে মারিলাম! একবার মুহূর্তের জন্য ফিরিয়া এস দিদি—একবার প্রাণ ভরিয়া আদর করিয়া লই —আদরের ভিখারিণী, তোমাকে কেহ আদর করে নাই, আমিও করিলাম না; জীবনে এ দুঃখ শেলের মত মর্মে মর্মে বিঁধিয়া থাকিবে।"

চণ্ড ও মুকুলজী
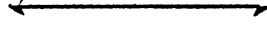
শ্রীমতী হেমলতা সরকার

আষাঢ় মাসের 'মুকুলে' মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে। এবার সেই বংশজাত আর এক মহাত্মার বিষয়ে কিছু বলিব, ইঁহার নাম চণ্ড। ইনি মেবাররাজ রাণা লাক্ষের পুত্র। লাক্ষের রাজত্বকালে মেবারের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইযাছিল। তাহার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা ছিল। তন্মধ্যে কুমার চণ্ড সকলের বড়।

একদিন রাণা লাক্ষ মন্ত্রী পরিষদ প্রভৃতিকে লইয়া রাজসভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় মাড়বাব রাজ রণমল্লের নিকট হইতে 'নারিকেল' ফল (রাতপুতদিগের মধ্যে নারিকেল ফল পাঠাইয়া বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার রীতি ছিল) লইয়া একজন দূত তথায় উপস্থিত হইল। রাণা তাহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মাড়বাররাজ চণ্ডেব সহিত আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইযাছেন। রাণা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, তাই ভাল! আমি ভাবছিলাম, এই বৃদ্ধ বয়সে কে আবার আমার বিবাহের প্রস্তাব কবে পাঠাবে। 'চণ্ড সে সময় রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আসিয়া পিতার পরিহাসেব কথা শুনিয়া বলিলেন, 'পিতা যখন পবিহাস করিয়াও সে কন্যার সহিত নিজের বিবাহেব কথা ভাবিয়াছেন, তখন আমি আব তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না।' সুতরাং তিনি কোনও মতেই সে কন্যাকে বিবাহ কবিতে সম্মত হইলেন না। রাণা লাক্ষ পুত্রকে কত বুঝাইলেন, কত তিবস্কার কবিলেন, কত অনুরোধ কবিলেন, কিছুতেই তাহাকে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন! আমি কী পিতা হইয়া এত অনুনয় বিনয় করিলাম, কিছুতেই তোমার গ্রাহ্য হইল না? আমি তো মাড়বাব-রাজকে অপমানিত করিতে পারি না। আমি তার কন্যাকে বিবাহ করিতেছি, কিন্তু তুমি আজ আমাব নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, চিরদিনের মত তুমি মেবারের সিংহাসনেব আশা পরিত্যাগ করিলে, এই বিবাহে যদি আমার পুত্র জন্মে, সেই মেবারের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবে। 'চণ্ড পিতাব নিকট বিধিপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন।

কালে নূতন মহিষীর একটি পুত্র জন্মিল। তাহার নাম মুকুলজী। মুকুলজীব বযস যখন পাঁচ বৎসর, তখন রাণা লাক্ষ মুসলমানদিগের অত্যাচাব হইতে গয়াতীর্থ রক্ষা করিবার জন্য গমন করেন। যাইবার পূর্বে রাজ্যের বড় বড় লোকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তো চলিলাম, আর যে ফিবিব এরূপ আশা নাই, এখন আমি কোন্ ভূসম্পত্তির মুকুলকে দান করিয়া যাই? 'কুমার চণ্ড অমনি দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কেন মেবারের রাজসিংহাসন!' শুধু এই কথা বলা নয়, পিতার গমনের পূর্বে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া চণ্ড মুকুলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং নিজে তাহার মন্ত্রী হইয়া রাজ্য শাসন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাণা লাক্ষ মুকুলকে সিংহাসনে বসাইযা তীর্থে গমন করিলেন।

কুমার চণ্ড বিশ্বস্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় ভ্রাতার রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র বালক মুকুল বসিয়া আছে, আর চণ্ড দীন দাসের ন্যায় নিম্ন আসনে উপবিষ্ট। এ দৃশ্য দেখিয়া সভাস্থ সকলের মনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইত। সকলে চণ্ডকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। কিন্তু হায়! এত বড়

মেবার রাজ্যে কেবল একজন ছিলেন, যিনি চণ্ডের কাজকর্ম ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার সকল কাজেই একটা না একটা দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেন। সে কে জান? চণ্ডের বিমাতা মুকুলের জননী। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া চণ্ডের নামে অনেক নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। চণ্ড প্রথম প্রথম বিমাতার এইরূপ ব্যবহার মনে লইতেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন, তাঁর কোন কাজেই পার নাই, সকল কাজেই সন্দেহ তখন তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মুকুলের জননী কেবলই বলিতেন, চণ্ডই প্রকৃত রাজা, আমার পুত্র কেবল সাক্ষীগোপাল।

বিমাতার কথাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একদিন চণ্ড তাঁহাকে বলিলেন, মা, আপনি নাকি বলেন যে, মুকুলকে বঞ্চিত করিয়া আমি নিজে রাজা হইবার চেষ্টাতে আছি। একবার ভাবেন না যে, আমার যদি রাজা হইবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আজ আর আপনাকে রাজমাতা হ'তে হ'তো না। যা হোক, আপনার মনে যখন এমন ভয়, তখন আমার এ রাজ্য ছাড়াই ভাল। আমি আপনার পুত্রের রাজ্য ছাড়িয়া চলিলাম। আপনি পুত্রের কল্যাণ দেখুন। কিন্তু সাবধান আমার পিতার রাজ্য যেন ছারখার না হয়। আর আপনার পুত্রের যেন কোন বিপদ না হয়।' এই বলিয়া চণ্ড বিমাতার পদধূলি লইয়া ভ্রাতাকে আশীর্বাদ করিয়া মেবার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া শূন্য হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেলেন। বিমাতা একটি কথাও বলিলেন না।

মুকুলের জননী অচিরে আপনার পিতা ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজনকে ডাকিলেন। তাঁহারা রাজকার্য দেখিতে লাগিলেন। মাড়বাররাজ প্রথম প্রথম দৌহিত্রকে কোলে লইয়া সিংহাসনে বসিতেন। পরে একাই বসিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার পিতা-পুত্রে সকলই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। এমনকি মুকুলকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্রও চলিতে লাগিল। তথাপি মুকুলের জননীর চেতনা নাই। শেষে একদিন মুকুলের বৃদ্ধা ধাত্রী রাণীকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া কহিল, 'আপনি কি একেবারে অন্ধ হইয়াছেন? পুত্রের রাজ্য ও জীবন সকলই যায়, তবু কোন সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন?' ধাত্রীর তিরস্কারে রাণীর চক্ষু ফুটিল। ''তাই তো কি সর্বনাশ! পিতা ও ভ্রাতার হস্ত হইতে রক্ষা পাই কিরূপে?' ভাবিয়া দেখিলেন তিনি নিরুপায় ও অসহায়। তখন অন্য গতি না দেখিয়া চণ্ডকে বলিয়া পাঠাইলেন, ''চণ্ড, তুমি ভিন্ন এ বিপদে আর রক্ষা নাই। তুমি শীঘ্র আসিয়া তোমার পিতার রাজ্য ও ভ্রাতাব প্রাণ রক্ষা কর।''

চণ্ড সংবাদ পাইবামাত্র উপস্থিত হইলেন। সকলে সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। তিনি বিশ্বাসঘাতক মাড়বাররাজকে হত্যা করিয়া, তাঁর পুত্রকে সদলে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। শত্রুকে দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভ্রাতার রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিযা মহামনা চণ্ড আবার বিদায় লইলেন। এবার বিমাতা বলিলেন, 'তুমি আর দূরে যাইও না। তুমি এখানেই থাক।' চণ্ডেব হৃদয় বিমাতার পূর্বাচরণে এতই দুঃখিত হইয়াছিল যে তিনি কোনক্রমেই আর থাকিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, 'জননী! বিপদে পড়িলেই আমাকে ডাকিবেন, আমি চিরদিন আপনার পুত্রের রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। কিন্তু আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। কি জানি আপনার মনে আবার যদি কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়। শত্রুর অস্ত্রাঘাত বুক পাতিয়া লইতে পারি, কিন্তু অবিশ্বাস সহ্য হয় না।'—এই বলিয়া চণ্ড জন্মের মত পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রজাগণ হায়! হায়! করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাঁশী

শ্রীসরলা দেবী

'ঠাকুরজামাই আমরা কোথায় যাচ্ছি? এ কি আমাদের গ্রামের পথ? না! এ যে রাজমহলের রাস্তা, ঐসব পাহাড়, রাস্তার এক পাশে খাদ—এতদূরে কেন এসে পড়লুম?'

জীবন চুপ করিয়া রহিল। সুহাসিনী কৌতূহলী নেত্রে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, সেখানে গাড় বর্ণে কি লেখা লিখিত দেখিল, একটা ভয় ও সন্দেহে তাহার হৃদয় অকস্মাৎ আচ্ছন্ন হইল। ফাঁদে পড়া হরিণীর ন্যায় ত্রস্ত চঞ্চল লোচনে, কাতরস্বরে বলিল, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জীবন, বাড়ি কোথায়?'

জীবন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'ঐ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওব তলায় গাড়ি থামবে, ঐ পাহাড়ের উপর যে ছোট্ট বাড়িটি রয়েছে ঐ আমাদের বাড়ি।'

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, 'সে কি, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।'

'তবে শোন'—জীবনের স্বর আবেগের আধিক্য প্রযুক্ত ঘনশ্বাসজড়িত, 'সুহাসিনী, তুমি আমার হৃদয়ের রাণী, জীবনসর্বস্ব এতদিন অতি কষ্টে আমি নিজেকে সম্বরণ করে রেখেছিলুম। আর না, দৈব এতদিনে আমার সহায় হয়েছে। তোমার যখন পিতৃগৃহ থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে এল, অথচ প্রভাসের হাতের কাজ ফুরোল না, তখন আমি গিয়ে তোমায় আনবার প্রস্তাব করলেম। প্রভাশ অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্মতি দিলে। আমি সেখানে যাত্রা করার পূর্বে এখানে এসে এই বাড়ি ঠিক করে গিয়েছি, এ স্থান আমার পূর্ব পরিচিত। প্রিয়তমে এই গৃহে তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হয়ে অধিষ্ঠান করবে।'

প্রিয় সম্বোধনটি এমনভাবে উচ্চাবণ করিল যেন বহুদিনের অনশনপীড়িত ব্যক্তিব বসনাগ্রে সহসা অতি সুস্বাদু বস্তুর আস্বাদন মিলিয়াছে।

সুহাসিনী স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ ব্যথিত হইয়া বলিল, 'জীবন, মুর্খ! তুমি কী বলছ৷ বাড়ি ফিরে চল, সেখানে শান্তি তোমার পথ চেয়ে রয়েছে।'

'আর না সুহাসিনী, সে বাড়ি আর না, এখন হতে এই আমাদের বাড়ি।'

সুহাসিনী কাঁদিয়া উঠিয়া তাহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিল, 'ফিরে চল, ফিরে চল ভাই! আমি তোমার শরণাপন্ন বোন, আমাকে তাঁর কাছে দিয়ে এস, তিনি বিশ্বাস করে তোমাকে পাঠিয়েছেন, আমাদের পথ চেয়ে রয়েছেন, বিলম্ব দেখে কত চিন্তিত হচ্ছেন, তাঁর বিশ্বাস রাখো।'

জীবন মৌন, তাঁহার সংকল্প অবিচলিত। গাড়ি ক্রমেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সুহাসিনী জীবনের পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল—গাড়ি খাদের পাশ দিয়া যাইতেছে, একবার এক দৃষ্টিপাতে খাদের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া লইল, তারপরে আর ইতস্তত মাত্র না করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। জীবন তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া চকিতে তাহার সহিত মাটিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া খাদে গড়াইয়া পড়িল।

গাড়োয়ানের আহ্বানে গ্রামস্থ লোক জড় হইয়া তাহাদের উঠাইল। দু'জনেই সংজ্ঞাহীন, আহত, রক্তাপ্লুত দেহ। দু'ই-চারিদিন পরে সুহাসিনীর সংজ্ঞা লাভ হইলে তাহার কথিত ঠিকানায় প্রভাসকে

সংবাদ পাঠান হইল। জীবন বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার তখনও ভালরূপ চেতনা সঞ্চার হয় নাই। প্রভাস তাহাদের সন্তর্পণে পাল্কীতে উঠাইয়া বাড়ি লইয়া গেল। কিরূপে এই অস্থানে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল তাহা তখন জানিতেপারিল না। বাড়ি গিয়া জীবনের জ্ঞান সঞ্চার হইবামাত্র সে প্রভাসকে তাহার শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া পাঠাইয়া সব বলিল, কিছু গোপন করিল না।

বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতি প্রভাসের মমতার উৎস রুদ্ধ হইল, সে শুষ্ক অন্তঃকরণে কঠিন হৃদয়ে সুহাসিনীর রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেল।

২

দীপালোকবর্জিত অন্ধকার গৃহে জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তি সুহাসিনীর শয্যার পাদতলে বসিয়া কাঁদিতেছে, শিয়রে প্রভাস, স্থিরপুত্তলিকা প্রতিম, তাহার চক্ষে অশ্রু নাই। যাহার জন্য তাহার সর্বস্ব ধ্বংস হইতেছে তাহার প্রতি করুণার লেশহীন নীরস তীব্র ক্রোধে হৃদয় পূর্ণ হইয়া বহিয়াছে।—কিন্তু তাহার ক্রোধের পারদ তখন নিম্নগৃহে মৃত্যুশয্যায় শয়ান।

সুহাসিনী একবার চক্ষু মেলিল, জ্যোৎস্নার আলোকে প্রভাসের মুখের দিকে চাহিল। তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল, 'জীবনকে ক্ষমা কোরো।'

শান্তি এই করুণা বাক্যে কৃতজ্ঞতাভরে শয্যাপ্রান্ত হইতে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রভাসের কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, শুধু সুহাসিনীর ক্লান্ত অধরের শেষ আহ্বান বুঝিল। তাহার অন্তিম চুম্বন লইয়া, দীর্ণ হৃদয়ে তাহার বক্ষের উপর লুণ্ঠিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে শান্তি প্রভাসকে সে গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিল।

গভীর রাত্রে, বহু কষ্টে আপনার অবশ দেহ ভার কোনমতে টানিয়া আনিয়া একজন হতভাগ্য চিরনিদ্রিতা সুহাসিনীর চরণ কমল অশ্রুজলে ধৌত করিয়া, মনে মনে সেই দেবীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া, পুনর্বার বহু আয়াসে ধীরে ধীরে আপনার গৃহে ফিরিয়া গেল।

৩

জীবনের মৃত্যুশয্যা। শুধু শান্তি তার পাশে বসিয়া রহিয়াছে, সে গৃহে আর কেহ নাই। বিষণ্ন, ক্ষীণকণ্ঠে জীবন বলিল, 'আর তো দেরী নেই শান্তি, একবার তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো।'

জীবনের আহ্বানে প্রভাস আসিল, আসিয়া শয্যা হইতে কিছু তফাতে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন বলিল, 'শেষবার তোমার কাছে মার্জনা চাচ্ছি প্রভাস, জন্মের মত বিদায়, এখনও কি একবার স্নেহালিঙ্গন দিবে না?'

প্রভাস নিরুত্তর রহিল। জীবন ব্যথিত হৃদয়ে, শ্রান্ত দহে দেয়ালের দিকে ফিরাইযা বলিল, 'আমি মার্জনার যোগ্য নহি ঠিক, অতি সহনাতীত অন্যায় করিয়াছি, তাই হউক, এ শাস্তি আমার বহনীয়।'

আর এক মুহূর্তেই সব ফুরাইল। একটা গভীর বেদনা জীবনের মৃতমুখে ছাপ রাখিয়া গেল।

৪

শুক্লপক্ষ, আকাশ মেঘলা, প্রবল ঝোড়ো বাতাস বহিতেছে। দুঃখী হউক, সুখী হউক, এত বাতাস। সকলের মনকেই একটু বিক্ষিপ্ত করে, তাহাদের স্ব স্ব চিন্তাভার হইতে ঈষৎ ইতস্তত উড়াইয়া লইয়া যায়। আজ যদি প্রথম বসন্তের সুশোভন মধুরিমাময় জ্যোৎস্নারাত্রি হইত তাহা হইলে শান্তির হৃদয় এখনও মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু আজিকার ঝোড়ো প্রকৃতির সঙ্গলাভে তাহার মন ঈষৎ শিথিল হইয়াছে। পীড়িত নিরাবলম্বন হৃদয়ের প্রকৃতির দুরন্তপনা উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কতকটা আশ্রয়

সান্ত্বনা, অবলম্বন আছে। শান্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহ কোণ হইতে বহুদিনের অনাদৃত সেতারটা লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিল। তার তারের ঝঙ্কার উপরের গৃহে তাহার ভ্রাতার কানে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার মর্ম বিদ্ধ করিল।

বৃহৎ পুরীর দুই বিভিন্ন তলার দু'টি কক্ষে দুই ভাই-বোনের বাস। ইহাদের পৃথিবীর আর কেহ নাই। অথচ দুঃখের দিন ইহাদের পরস্পরকে পরস্পরের হৃদয়ের আরও একটু কাছাকাছি টানে নাই—বিস্তর তফাৎ করিয়া দিয়াছে। হৃদয়ের ব্রণস্থানে পরস্পরের সহানুভূতির স্পর্শ হইতে উভয়েই সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়ায়। যে গৃহে আগে প্রেমের রাজত্ব ছিল, যেখানে হাসি, গান, প্রীতি কারণে-অকারণে নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত আজ তাহা বিষণ্ণ, নিরানন্দ, চিরপ্রেমবিরহিত। ইহাদের অন্তরে অন্তরে মিল আছে দুজনের দুঃখে দুজনে মনে মনে ব্যথিত হয়, কিন্তু বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই।

প্রভাস এক একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাঁশী বাজায়, তার বাঁশীর বিলাপ শান্তির হৃদয় স্পর্শ করে, ভ্রাতার দুঃখে তাহার শিরায় শিরায় দুঃখপ্রবাহ সঞ্চরণ করিতে থাকে, কিন্তু কোন সান্ত্বনার কথা কহিতে আসে না, কোন স্নেহবাক্য বলে না, শুধু বিছানায় পড়িয়া পড়িযা প্রভাসের জন্য কাঁদে, বাঁশীর বিরামের জন্য কান পাতিয়া থাকে।

যখন আর বাঁশীর শব্দ কানে আসে না, তখন জানে সে রাত্রির মত প্রভাস শান্ত হইল, সুহাসিনীর আবাহন সমাপ্ত হইল, দুঃখের তীব্রতা অনেকটা প্রশমিত হইল।—হায় কী ছিল আর কী হইয়াছে। তখনকার প্রত্যেক দিনটি কী মাধুরীপ্লুত, কী শোভাময়, কী মধুময়। কী সহজ আনন্দে চারিটি তরুণ হৃদয়ের জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছিল। মাঝে হইতে কুটিল লালসা কোথা হইতে আসিয়া সব ভণ্ডুল করিল, জীবনের মরণ-কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? শান্তি কি বুঝে না প্রভাসের প্রতি জীবন কতদূর অপরাধী? স্বামীর অপরাধে ভ্রাতাকে দুঃখী জানিয়াই তো দ্বিগুণ দুঃখে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কিন্তু সেইসঙ্গে অন্তিমশয্যায় অনুতপ্ত, ক্ষমাভিখারী স্বামীর প্রতি ভ্রাতার কাঠিন্য যখন স্মরণ হয়, সেই বেদনাক্লিষ্ট মৃতমুখখানি যখন মনে পড়ে তখন তাহারও হৃদয় বড় কাঠিন্যে পূর্ণ হয়, আর প্রভাসের নিকট স্বামীর অপরাধের জন্য, অতীত সুখদিবসের জন্য কাঁদা হয় না, নিজের দুঃখ, সান্ত্বনা নিজের অন্তরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

প্রভাস শান্তির নিরানন্দ শূন্য হৃদয়ের কথা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হয়, কিন্তু তাহাকে জীবনের পক্ষপাতী জানে, মনে করে জীবনের যতখানি অপরাধ শান্তি তাহাকে তাহার অপেক্ষা অনেকটা কমাইয়া দেখে, তাই প্রভাসের দুঃখের পরিমাণ সে ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে না। সে যে জীবনকে মার্জনা করে নাই ইহাই শান্তি মনে রাখিয়াছে, কত দুঃখে যে করিতে পারে নাই তাহা বুঝে নাই। তাই শান্তির কাছে আর হৃদয় খোলা হয় না। অভিমানে সঙ্কোচে দু'জনে দূরে দূরে থাকে, কেহ কাহারো হৃদয়ের নাগাল পায় না।

কিন্তু প্রভাসেরই মনের আবেগ বাহিরে বাঁশীতে ছাড়া পায়, শান্তির তো কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। সব সময়ে তাহার নিঃসঙ্গ দুঃখবিলীন জীবনের কথা তাই মনেও হয় না। তাই আজ যখন প্রথম তার বীণার করুণ ঝঙ্কার প্রবল বায়ুপ্রবাহে প্রভাসের কানে ভাসিয়া আসিয়া শান্তিকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাহার চিত্ত বড় বড় চঞ্চল হইল। সুরের পরতে পরতে প্রভাসের মানসচক্ষে বড় শূন্যতার স্তর একে একে উন্মুক্ত হইতে লাগিল। এই তরুণ বয়সে এই দুঃখভারে অবনমিত ভূমিস্যাৎ

হৃদয়ের সমস্ত কারুণ্যটা তাহার রক্তে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্তে যত দুঃখ শান্তির না ছিল তাহার অপেক্ষা বেশি দুঃখে তাহাকে দুঃখী অনুমান করিল। ঘনীভূত দুঃখ তরলায়মান হইলেই হৃদয়ভার অশ্রু হইয়া গলিয়া আসে, আজিকার প্রকৃতির প্রভাবে শান্তির মনভাব কিঞ্চিৎ লঘু হইয়াছিল বলিয়াই সে বীণার নিকট অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু প্রভাসের উত্তেজিত কল্পনায় বোধ হইল শান্তির বীণা ধারণ তাহার দুঃখের চূড়ান্ত অবস্থা ব্যক্ত করিতেছে। এই ম্লান চন্দ্র, এই প্রবল বাত্যা তারি মধ্যে নির্জন গৃহে শান্তির দীনা ছবি প্রভাসের হৃদয়কে বড় নাড়া দিল। শান্তির নিকটে গিয়া একটি স্নেহ সম্ভাষণ তাহার ললাটে একটি সস্নেহ হস্তস্পর্শের জন্য হৃদয় বড় লোলুপ হইল—কিন্তু কিছুই করা হইল না। চট করিয়া একটা চিন্তা মনে বাধিল—শান্তি যদি তাহাকে ঠিক না বোঝে? সে যেভাবে আর্দ্র হইয়া তাহার নিকট যাইবে তাহার অপেক্ষা বেশি কিছু যদি শান্তি ধরিয়া লয়? যদি মনে করে জীবনের অপরাধের ন্যূনতা সম্বন্ধে সে এখন শান্তির সহিত একমত? তাহা নয়, তাহা নয়, জীবনের প্রতি সে কোমলতা দেখাইতে পারিবে না, জীবনকে সে মার্জনা করিতে পারে না।—তাই শান্তির নিকট যাওয়া হইল না, তাই আর তাহাকে দু'টি মিষ্ট কথা বলা হইল না। তাহার পর এমনই মাঝে মাঝে কোন কোন সন্ধ্যায় শান্তির সেতার বাজিতে লাগিল, প্রভাসের চিত্তও ক্রমেই বেশি অস্থির হইতে লাগিল, শান্তির প্রতি স্নেহ ব্যবহারের লালসায় অবস্থা পীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু সে পীড়া শান্ত করিবার উপায় রুদ্ধ, দু'জনের মধ্যে এমনি কঠিন সঙ্কোচের দেয়াল উঠিয়াছে। অবশেষে একদিন তাহার আবেগ আত্মশান্তির নূতন পথ খুঁজিয়া লইল। প্রভাষ কাগজ পড়িয়া নাম ও স্থান পরিবর্তন করিয়া আপনাদের কাহিনী লিখিল, সহজ সুন্দর ভাষায় সমস্ত কারুণ্য ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিল, ক্রমে ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া আসিল। শান্তির বীণার তান কানে আসিলেই সে যেন নেশাপ্রাপ্ত হইয়া কলম ধরিত। তার পরদিন সকালবেলায় পড়িলে সেটা দাঁড়াইত একটা সুললিত মর্মহারী সাহিত্যপ্রসূন।

৫

শান্তি কখনও প্রভাসের গৃহে আসে না। একদিন দ্বিপ্রহরে প্রভাস বাহিরে গিয়াছে। বহুকাল পরে শান্তির সেদিন তাহার গৃহে আসিতে সাধ হইল। সঙ্গীহীন, একক ভ্রাতার কী করিয়া সারাদিন কাটে, কত যে হৃদয়-বেদনা গৃহতৈজসেরা তাহার যেন সাক্ষ্য দিবে, যে সকল অচেতন পদার্থ তাহার ভ্রাতাকে সর্বদা ঘিরিয়া থাকে তাহাদের কাছে আসিয়া একবার তাহার জন্য অশ্রুপাত করিতে সে প্রভাসের গৃহে আসিল। বহুদিন পরে সুহাসিনীর নিদর্শনপূর্ণ সে গৃহ দেখিয়া শান্তির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না, টেবিলের সম্মুখে চৌকির উপর উপবেশন করিল, টেবিলের উপর একখানা বাঙলা কাগজ দেখিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহা হাতে লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। হঠাৎ একটা লেখায় তাহার মনোযোগ আবদ্ধ হইল, ক্রমে সে অবহিতচিত্তে, উত্তেজিত মস্তিষ্কে তাহা পাঠ করিতে লাগিল। প্রভাস গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল শান্তির হাতে কি কাগজ এবং তাহার মধ্যে কোন রচনায় সে নিবিষ্টচিত্ত। সে কিছু বলিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তির পড়া শেষ হইলে উঠিয়া ক্লিষ্টমূর্তিতে প্রভাসের দিকে চাহিয়া বলিল, 'দাদা একি তুমি আর আমি'? প্রভাষ বলিল 'হ্যাঁ'।

শান্তি আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। নিজের গৃহে গিয়া একবার ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিল, তাহার পর উঠিয়া চোখ মুছিয়া গৃহকাজে গেল। প্রভাসের সহিত সম্পর্ক আরও বিরল হইয়া আসিল—আর কখন তাহার গৃহে যায় না। প্রভাসের সঙ্গীতের ভাষা শান্তি বুঝে, চিরকাল তাহাতে অভ্যস্ত, কিন্তু আর কিছু শান্তির পক্ষে বিজাতীয়। তাহার লেখার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহা যে কতখানি দুঃখ, কতখানি সমবেদনার ফল তাহা বুঝিতে পারিল না। সে শুধু ভাবিল, 'দাদা হৃদয়হীন,

আত্মীয়-জনের মর্মভেদী দুঃখকে যশের পণ্যদ্রব্য করিয়াছেন', শান্তির প্রতি ব্যবহারে যে স্নেহের ত্রুটি হইয়াছিল তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভাস প্রতিনিয়ত এই সাহিত্যতীর্থে করিতেছে তাহা শান্তি বুঝিল না, তাহার প্রতিকারেচ্ছার ব্যাকুলতা কিছু ধরিতে পারিল না।

তাহার পর হইতে শান্তির সেতার একেবারে স্তব্ধ হইল। সজীবতার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত রুদ্ধ হইল। সে নূতন করিয়া হৃদয়ের চারিপাশে কঠিনতার প্রাচীর গাঁথিল। তখন প্রভাসের বাঁশী প্রতি রাত্রি বড় ক্রন্দন কাঁদিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে প্রাচীর ভেদ করিয়া বহু বিলম্বে হততেজে শান্তির হৃদয়ে পৌঁছিত। আর তাহা শান্তিকে শীঘ্র উতলা করে না, আর শান্তি প্রভাসের ব্যথায় ব্যথিত হয় না। কিন্তু কতদিন এভাব টিকিবে? ক্রন্দনের আঘাতে আঘাতে প্রাচীর জীর্ণ হইয়া আসিল, অল্পে অল্পে বিলম্বে তাহা খসিল, একদিন শান্তির অনাবৃত বক্ষে বাঁশী আবার বিঁধিল। এ সুহাসিনীর আবাহন নহে, প্রভাসের আত্মকরুণা নহে, এবার বাঁশী বারবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্তির নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার রুদ্ধ হৃদয়ে প্রবেশ পায় নাই—শান্তি সব বুঝিল। আজ প্রভাসের লেখার মর্মও সে বুঝিল, তাহা যে স্নেহবিরহিত হৃদয়ের ব্যাকুল মিলনাকাঙ্খার ভাষা তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিল। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিল।

প্রভাস ছাদের উপর এক হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া আছে, বাঁশী তার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। শান্তি নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া তাহার অন্য হাতটি নিজের হাতে লইয়া বলিল, 'দাদা'।

প্রভাস চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল।

'আমায় মাপ কর ভাই।'

অশ্রুবিজড়িত স্বরে প্রভাস বলিয়া উঠিল, 'তুই আমায় মাপ কর শান্তি, তোর এত দুঃখেও আমি তোর প্রতি কঠিন ছিলুম! আমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর! জীবনকে ক্ষমা করিনি, তার অন্তিম ভিক্ষা অবহেলা করেছি। হায়, কে পাপী, জীবন না আমি?—ওহে জীবন, ভাই, একটিবার ফিরে এসো, এ হতভাগ্যকে তোমার শেষ আলিঙ্গন দিয়ে যাও।''

*　　　*　　　*　　　*

তারপরে? তারপরে সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল, শুধু এই ক্লেশতাপিত ধরণীর দু'টি প্রাণীর জীবনভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া আসিল।

সাচ্চা গিনি ও ঝুটা গিনি
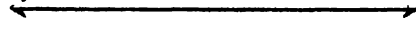
শ্রীস্নেহলতা সেন

দার্জিলিং পাহাড় হইতে ফিরিবার এক মাস পরেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। বড়দিনের ছুটিতে পত্নীকে লইয়া শ্বশুর গৃহে গেলাম। বিবাহের পর এই প্রথম নতুন জামাই বাড়িতে আসাতে অত্যন্ত ধুমধাম পড়িয়া গেল। আমার শ্যালিকা, বীণার খুড়ত ভগ্নী, নূতন ভগ্নীপতিকে জলযোগ করাইয়া বলিলেন, "প্রমথবাবু, আপনার ঘড়ির চেনে এসব কি ঝুলছে? দেখি, একটি হীরে বসান পেন্সিল, একটি সোনার কম্পাস, আর একটা—এটা কি একটা নূতন পয়সা?"

প্রমথবাবু বলিলেন, "তা বেশ তো। কিছু দোষ আছে কি?"

"তা কি বলছি! কিন্তু কেন রেখেছ তাহা বলতে কি দোষ আছে?"

"উহা একটা Charm।"

"কি রকম চার্ম?"

"বিয়ের দিন রাত্রে তোমার দিদি আমার চেনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।"

"না, মিথ্যা কথা।"

"না সত্যি-স্বামী বশ করবার মন্ত্র পড়ে তোমার দিদি জেদ করে পরিয়ে দিলেন।"

আমার শ্যালিকা লাবণ্যপ্রভা আর কিছু বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহার উপহাসেব জ্বালার ভয়ে বলিতে সাহসও হইল না, কিন্তু যদি কেহ শুনিতে চাহে তাই বলিতেছি।

আমি বিলাত না গিয়াই ষোল আনা সাহেব ছিলাম, কাজেই মাঝে মাঝে বিলাতি দোকানে যাইতে হইত—সেলের (Sale) সময় তো কথাই নাই। গ্রীষ্মের উপযুক্ত কয়েকটা কাপড়ের প্রয়োজন ছিল, তাহা কিনিবার নিমিত্ত White Away-র দোকানের জন্য বাহির হইলাম। এই দোকানে (Chronic state of sale) সেল চলিত, রোগটা কখনও বেশি কখনও কম। আজ দেখিলাম আর এক সেলের বিজ্ঞাপন দোকানের দেওয়ালে রহিয়াছে। এখান হইতে দু'-চারখান জিনিষ কিনিয়া অন্য দু'-এক দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় Harrison Hathaway-র দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিলাম (Half price) অর্ধেক মূল্যের সেল হচ্ছে। ইংরাজ সাহেব-মেম, বাঙালি সাহেব, মেম, পার্সি, বাঙালিবাবু, মাড়ওয়ারি, দর্জিমহাশয়, চান্দনিব দোকানদার ইত্যাদির ঘরগুলি পরিপূর্ণ, নড়িবার জায়গা নাই। দর্জি, মাড়ওয়ারি ও দোকানদারগুলি কাপড়ের থান যে টেবিলের উপর রাশীকৃত ছিল, তাহা আক্রমণ করিয়াছে। মেমগণ লেস ফিতা ইত্যাদির নিকট মৌচাকের চতুর্দিকে মৌমাছির ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন, বাঙালিবাবুগণ সস্তা দরে বিলাতি বুট ও জুতা আনন্দিত মনে উৎসাহের সহিত কিনিতেছেন, সাহেবগণ এদিক-ওদিক ঘুরিতেছেন। আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত সস্তা একটি রেশমের ছাতা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উহা কিনিয়া দোকানের সাহেবের হাতে একটা গিনি দিয়া ফেরত টাকার জন্য কাউন্টারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম।

সে বৎসর সরকার গরিব ভারতবাসীদিগের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা (গিনি) বিতরণ করিয়াছিলেন। একজন দ্বারবান বা পাখা-কুলি চারি মাসের মাহিনা হইতে অতি কষ্টে ষোলটি টাকা সঞ্চয় করিয়া সুদূর গ্রামে

তাহার জননী বা পত্নীকে মনি-ওর্ডার পাঠাইলে, সেখানে তাহার হাতে ডাকওয়ালা একটি গিনি ও একটি টাকা দিয়া আসিত। সে দুঃখিনী জন্মে একবার সোনা স্পর্শ করিয়া জীবন সার্থক করিত, কিন্তু তাহা পুনরায় ভাঙাইতে গিয়া প্রাণান্তে হইত ও পাঁচটি বা ছয়টি পয়সা ব্যয় করিতে হইত।

আমি ভাবিলাম বেশ হয়েছে এখানেই গিনিটা ভাঙ্গান হইবে। চারিদিকে কি হইতেছে তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় সাহেব আসিয়া কহিল, "মশায় এ গিনিটা কি রকম?" (Sir this guinea looks queer). আমি আশ্চর্য হইয়া উহা হাতে লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিলাম যথার্থ Queer কারণ ইহা গিনি নহে, একটি মাজা-ঘসা ঝকঝকে নূতন পয়সা। আমার পার্সে গিনি রাখিয়াছিলাম পয়সাটা কি আসল! তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম যে আমার পূজনীয়া বৌঠানদের মধ্যে কাহারও কাণ্ড। আমি পয়সাটা রাখিয়া, একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলাম। সাহেবটি আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চেঞ্জ (Change) আনিতে গেল।

এমন সময় আমার পার্শ্বে কাউন্টারের সম্মুখে আর একজন আমারই মত বাঙালি সাহেব আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বা অধিক হইবে, তাঁহার পশ্চাতে এক চৌদ্দ-পনের বৎসরের বালিকা সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রতি আমার মন ও চক্ষু আকৃষ্ট হইল। নাটক নভেলে নায়িকার ন্যায় ইহার যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, নিখুঁত মুখমণ্ডল তাহা বলিতে পারি না, তবে এমন অনির্বচনীয় কমনীয় কোমল লাবণ্যময়ী মুখশ্রী আর কখনও দেখি নাই। আধুনিক বিলাত প্রত্যাগত সমাজের ন্যায় বেশভূষা, মস্তক অনাবৃত, ঘন মুক্ত কেশরাশি পৃষ্ঠ ছাইয়াছে, একটি সরু জরির ফিতা মস্তকে বাঁধা রহিয়াছে। বালিকা এত লোকের মধ্যে যেন জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একজন বেহারা বাবুর বিবিধ আকারে চারি-পাঁচটি পার্সেল লইয়া আসিল, তখন তিনি একটি ৫০ টাকার নোট একজন সাহেবের হাতে দিলেন। সে হিসাব করিয়া একটি গিনি এবং কয়েকটা টাকা ও পয়সা ফিরাইয়া বাবুর সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। ঠিক এই সময় দোকানের একজন মেম ঠক ঠক করে বাবুর ও আমার মাঝখানে আসিয়া কেরাণীবাবুকে কি একটা তাড়াতাড়ি বলিযা একখানা কাগজ ফেলিযা ফিরিলেন। মনে হইল যেন একটি ছোট রকম ঝড় বহিয়া গেল। এমন সময় অন্য সাহেব আমার হাতে আমার ফেরত টাকা ও রেজকী দিয়া গেল। আমি অন্যমনস্কভাবে পার্সে ভরিলাম কিন্তু উহা বন্ধ করিতে আর সময় পেলাম না। ঠিক সেই সময় মেমের নূতন ফ্যাসনের পাঞ্জাবি কুর্তার ন্যায় আস্তিনের এক ঝাপটা লাগিয়া টেবিলের উপরে বাবুর টাকা পয়সা ও গিনি সমুদায় ঝনাৎ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মেমটি মধুর স্বরে বলিলেন, "Oh I beg your pardon" এবং সে স্থান হইতে সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। বাবু এদিকে ঝুঁকিয়া কুড়াইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঝুঁকিলাম, আমার খোলা পার্সের সমুদায় এবার ঝনঝন শব্দে পড়িয়া গেল। তখন আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কত ছিল?"

"একটা গিনি ও সাড়ে চারিটা টাকা।" আমি সব একত্র করিয়া তাহার পর তাঁহার হাতে একটি গিনি ও চারি টাকা আট আনা দিয়া নিজের পার্শ্বে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা ভরিলাম। এদিকে দোকান বন্ধ হইবার সময় হইয়াছে, দুই-তিনজন দোকানের মেম-সাহেব তাহাদের অধৈর্য স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছিল। আমি আর একবার বালিকার সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া আমার ছাতা হাতে লইয়া প্রস্থান করিব, এমন সময় বাবুটি উচ্চৈস্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "I say how's this? What did you give me? This is not a guinea!"

আমি একটু থমকিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম সত্য গিনি নহে, আমার সেই লক্ষ্মীছাড়া পয়সাটা; বোধহয় উঠাইবার সময় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ও তাড়াতাড়িতে এই ভুলটা হইয়াছে। ইহার পূর্বে

যে সাহেবকে ভুলক্রমে উহা দিয়াছিলাম। সে বিদ্রুপ ও সন্দেহযুক্ত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "Why, that's the very coin? You gave me just now for a guinea"! (এইটাই ত আপনি আমাকে গিনি বলিয়া দিয়াছিলেন) ইতিমধ্যে চারি-পাঁচজন দোকানের লোক আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সকলের মুখে সন্দেহের ভাব। বাবু হাত বাড়াইয়া ঝুটা গিনিটা আমায় দিলেন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা বিস্ময় পূর্ণ বিস্ফারিত নয়নে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পড়িল, তাহার মুখ লাল হইল আমি চারিদিকে পুনর্বার চাহিলাম। মনে মনে বলিলাম "ধরণী দ্বিধা হও"। কিন্তু ধরণী দ্বিধা হওয়া সহজ ব্যাপার নহে, তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, "ডাইনেমাইট এক্সপ্লোসন হউক, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হউক, কলকাতা জাহান্নামে যাক, (Russian) রাসিয়ানরা এখনই আসুক। আবার ভাবিলাম যে এক লাফ দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ি, কিন্তু হায়, কিছুই হইল না। আমি সেখানেই নির্বিঘ্নে বেষ্টিত হইয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম, ও থতমতভাবে কহিলাম, "উঠাইবার সময় গোলমাল হইয়াছিল বোধহয়। এই নিন আপনার গিনি।"

"সুবিধারকম ভুল"! এই কথা শুষ্কভাবে বলিয়া তিনি পার্সে ভরিলেন।

আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি পার্সে একটা গিনি রাখিয়াছিলাম, বোধ হয় বাড়িতে কেহ ঠাট্টা করিয়া উহা বদলাইয়া দিয়াছিল, তাই আমি—"

"ওঃ তাই বুঝি আপনি ঠাট্টাটা আমার উপর চালালেন।" একটু বিদ্রূপের হাসি অধরে দেখা দিল। বালিকা তিরস্কারের স্বরে মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা!"

একটি কথা কেবল, কিন্তু আমার কানে যেন অমৃত বর্ষণ হইল। দেখিলাম আর কিছু বলা বৃথা। বালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে একবার চাহিলাম, তাহাব পর বৌঠানকে কিরূপে জব্দ করিব তাই ভাবিতে ভাবিতে কোনরকমে দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাড়ি গিয়া আমরা দুই বৌঠানকে সম্মুখে হাজির করিয়া খুব ঝগড়া করিলাম। ঝগড়াটা এক পক্ষীয় কাবণ দুইজনেই হেসে হেসে কুটি কুটি হইলেন। যখন বাকশক্তি ফিরিযা পাইলেন তখন একজন বলিলেন, "বাবা গেলুম!" আর একজন বলিলেন, "ঠাকুরপো কেমন জব্দ হয়েছেন আজ।" আমি খুব চটিয়া বলিলাম, "আচ্ছা দেখা যাবে, দুইজনেই পবে বুঝিবে।" এতক্ষণে আমার রাগটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, আর সেই মধুর কণ্ঠস্বরের একটি কথা 'বাবা!' কানে লাগিয়াছিল, সেই মুখ কেবল মনে আসিতেছিল, মেজাজটা শিগগিরই ঠাণ্ডা হইল। তখন বলিলাম, "আচ্ছা এখন তোমাদের আনন্দটা যদি একটু কমে থাকে তবে এখন বল তো কে করেছে এই কাজটা?" কেহ কিছু স্বীকার করিল না। তখন বলিলাম, "যদি শার্লক হামস (Sherlock Holmes)-এর মত ডিটেকটিভ (Detective) হতুম, তাহলে এখনি বলে দিতে পারতাম।"

ছোট বৌঠানকে চোখ দু'টি বড় করিয়া বলিলেন, "সে আবাব কি?"

"Sherlock Holmes বলে একজন ইংরাজ ডিটেকটিভ ছিল। তাহার অসাধারণ শক্তি ছিল। সে খুনের বা ডাকাতির স্থানে যাইয়া একটা কাগজের টুকরা বা একটা পয়সা উঠাইযা বলিয়া দিত। যে যাহার এই কাগজ বা পযসা তাহার এক চোখ কানা, লাল চুল, ৪০ বৎসর বযস, বেঁটে, রাগী আর খুব দুধ....তার এমন শক্তি যে ঐ কাগজটা....এইসব বাহিব কবিত।"

"যাও, আর গল্প বলে...."

"সত্যি বৌঠান, এ রকম একটা গল্প ছিল। আচ্ছা Count of Monte Cristo-র গল্পটা বলা শেষ হলে, এই বইয়ের গল্প বলিব। কিন্তু আঁজকের কথা ভুলছি না, এর শোধ নেবো।" আর বাস্তবিকই লইয়াছিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি যে আমি মাঝে মাঝে বৌঠানদের ছুটির সময় কোন ইংরাজি বইয়ের গল্প বলিতাম।

তার পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকা পড়িতে হঠাৎ আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। একটি প্যারাতে লেখা আছে, "The dangers of shopping in English shops" তাহার মর্ম এই যে আজকাল বিলাতি দোকানের সেলে নানা প্রকার লোক যায়। জুয়াচোর ভদ্রলোক, সাহেব সেজে যায়। গতকাল সন্ধ্যাবেলা একজন লোক একটি পয়সা গিনি বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছিল ইত্যাদি। প্যারাটার নিম্নে নাম ছিল "By one who knows" আমি নীরবে একা একা ইহা তিনবার পড়িয়া, উহা কাটিয়া বাহির করিয়া আমার বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম। আর সেই লোকটি ও তাহার কন্যা কে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল।

তিন-চারি মাস পরে আমি পূজার ছুটিতে দার্জিলিং পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমি একটি বেঞ্চে বসিব ভাবিতেছি—দেখিলাম নিকটেই এক বেঞ্চ দেখা যাইতেছে কিন্তু তাহার উপর দুইজন উপবিষ্ট। পুরুষ কি রমণী হঠাৎ ক্ষীণ আলোকে বোঝা গেল না। যখন একেবারে নিকটে গেলাম তখন থমকিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম দোকানের সেই ব্যক্তি ও তাহার কন্যা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। ভদ্রলোকও আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনিলেন, আমার প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি, তুমি আবার দেখা দিয়েছ?"

আমি অতি ভদ্রতার সহিত কহিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এখানে বসিতে পারি?"

"অবশ্য, বসিবে না কেন, ইহা তো আমার বেঞ্চ নহে।" বলিয়া তিনি কন্যাকে ঠেলিয়া দুইজনে একেবারে এক কিনারায় গিয়া সরিয়া বসিলেন।

"আপনার যদি আপত্তি থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

"না, সরকারি বেঞ্চে কেহ বসিবে তাহাতে আর আপত্তি কি, Practical Jokes (ঠাট্টা) পছন্দ করি না, আর কোন আপত্তি নাই।"

"আপনি দেখিতেছি সে কথা এখনও ভুলেন নাই, কিন্তু—"

"না আমার স্মৃতিশক্তিটা খুব ভাল।"

"সেদিনকার ঘটনাটা যে একটা মস্ত ভুল, আমি কে, তাহা একবার শুনিলে বোধহয় আব অবিশ্বাস করিবেন না।"

"মহাশয়, আমার এখন ওসব ইতিহাস শুনিবার সময় নাই। চল বীণা, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কন্যা একবার চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া পিতার সহিত চলিল। সে চাহনিতে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—যেন বলিতেছে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিছু মনে করো না।" অবিলম্বে পিতা ও কন্যা অকল্যান্ড রোডে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে কালই ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচয় দিব ও কলঙ্ক দূর করিব। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে আমাব পিতার বন্ধু ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের পরিচিত। উক্ত ডাক্তার আমার ন্যায় স্যানিটেরিয়ামে ঘর লইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে একটি পত্র Letter of introduction পাইলাম। আহারের পর জলাপাহাড়ে বীণার পিতার বাড়ি Cecil Cot-এ গিয়া উপস্থিত হইলাম। বীণা বাহিরে একখানি বই হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র মুখ লাল হইয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি টুপি তুলিলাম কিন্তু ততক্ষণে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একটু পরে তাহার পিতা বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "কি হে, আবার এখানে এসেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আশা করি আরও অনেক বার আসিব।"

"বটে?"

"এ চিঠিটা অনুগ্রহ করিয়া পড়ুন।"

তিনি কৌতূহলী হইয়া হাতে লইয়া খুলিয়া পড়িলেন। পড়া শেষ হইলে, চোখ তুলিয়া আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাত বাড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি প্রকাশবাবুর পুত্র জানিতাম না। তোমাকে ভুল সন্দেহ করেছিলাম বলিয়া মাপ কর, তবে যেরকম কাণ্ডটা হয়েছিল, আমার বড় দোষ নাই, কি বল?

"একটু দোষ আছে, আমার কি জুয়াচ্চোরের মত চেহারা?"

"জুয়াচ্চোরের কি কপালে 'জুয়াচ্চোব' লেখা থাকে, তাহলে আর লোকে ঠকতো না। থাক সে সব কথা, তোমার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। বীণা, এদিকে এস তো।"

বীণা সলজ্জভাবে হাসিমুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

"বীণা, ইনি মিস্টার চৌধুরী, প্রকাশবাবুর পুত্র। আমাদের কমলার স্বামীর খুড়তুত ভাই।"

বীণার সহিত পরিচয় হইল, দু'-একটি কথা কহিলাম; তাহার পিতার সহিত নানা প্রকার গল্প করিয়া চলিয়া গেলাম। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সেখানে আমার আহারের নিমন্ত্রণ রহিল। সময়মত আসিলাম, সারাদিন থাকিয়া চা খাইয়া বৈকালে বিদায় লইলাম। শুনিলাম বীণা মাতৃহীনা, পিতার একমাত্র কন্যা। যাইবার সময় বীণা আমার হাতে একটা কি দিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। দেখিলাম সেই নূতন পয়সাটা। তখন মনে হইল যে উহা ভুলিয়া দোকানেই টেবিলের উপর ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। এতদিন বালিকা উহা তাহার নিকটে রাখিয়া দিয়াছিল, আমাকে কখনও অবিশ্বাস করে নাই। এসব ভাবিতে হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইল। ইহার পর কয়দিন যেন সুখস্বপ্নে কাটিল। প্রতিদিন সেখানে চা পান করিতাম আর বীনার সৌন্দর্যসুধা পান করিতাম। সমস্ত জগৎ যেন আমার কাছে নূতন সৌন্দর্যে শোভিত হইল। একদিন বীনার পিতার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিলাম, পিতাকেও এক পত্র লিখিলাম। দু'জনের অনুমতি পাইয়া একদিন বৈকালে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বীণার নিকটে গেলাম। বীণা বাহিরে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে তাহা দেখিতেছিল। অস্তমিত সূর্যের লাল আভা তুষারমণ্ডিত পর্বত চূড়ায় পড়িয়া তাহাতে যেন ক্ষণকালের জন্য স্বর্ণমুকুট পরাইয়া দিল—ক্ষণকালের জন্য মানব স্বর্গশোভা দেখিয়া লইল, পরমুহূর্তে সূর্যদেব পর্বতেব পশ্চাতে ডুবিয়া গেলেন। বীণার কোমল হাতখানি হাতে লইয়া কহিলাম, "বীণা, একদিন তোমার বাবার সোনার গিনি লইয়া একটি ঝুটা গিনি দিয়াছিলাম। আজ একটি রত্ন লইতে আসিয়াছি!" বীণা বুঝিল, মুখখানা আরক্তিম হইয়া উঠিল কিন্তু সে কথায় কাহারও কাছে হার মানে না। অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বত্নের পরিবর্তে কি দেবেন?"

"এই ঝুটা রত্নটি।" আপণাকে দেখাইলাম। তারপর দু'জনের অনেক কথাবার্তা হইল। সেসব বাজে কথা আর বলিয়া কি হইবে; বিবাহের পরে নূতন পয়সটাতে একটি ছেঁদা কবিয়া ঘড়ির চেনে ঝুলাইয়া রাখিলাম। বীণা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিযা দেয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলি, "উহা একটা চার্ম।" তত সত্যি কথা!

নিশি

সরলাবালা সরকার

রামকান্তবাবুকে বড়ই নির্লিপ্ত স্বভাবের লোক বোধ হইত। জগৎ সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যথাসময়ে পোষাকটি পরিয়া ছাতিটি মাথায় দিয়া আফিসে যাওয়া ও আফিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসা—এই দুইটি কেবল তাঁহার দৈনিক কর্তব্য। লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে প্রায় তাঁহাকে দেখা যাইত না, তবে প্রয়োজনবশত মাঝে মাঝে কাহারও সহিত দুই চারিটি কথা বলিতেন এই মাত্র। পাড়ার একজন হঠাৎ-কবি রামকান্ত সম্বন্ধে বলিতেন, "রামকান্তের মন সর্বদাই তাঁহার গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে।" যথার্থ কথা, রামকান্তের গৃহপিঞ্জরে তাঁহাব গুড়গুড়িটি ভিন্ন আর বিশেষ কেহ সঙ্গী ছিল না।

রামকান্তবাবুর সংসারটি ক্ষুদ্র। শ্রীমতী বাজলক্ষ্মী এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। স্বামী-স্ত্রীতে কেমন প্রণয় অথবা অপ্রণয় তাহা আমরা জানি না, তবে কলহ যে কচিৎ হইত একথাটা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রামকান্ত নিজের গুড়গুড়ি, তাখিয়া ও দুই-একখানি পুস্তক লইয়া সময় কাটাইতেন, রাজলক্ষ্মী গৃহের পারিপাট্য করিতে সংসারেব কাজকর্ম করিতে তাঁহাব সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। অভ্যাগতের গতিবিধি নাই, বালক-বালিকার কোলাহল নাই, এজন্য রামকান্ত অত্যন্ত শান্তিতে থাকিতেন।

বিধাতার কেমন খেলা, সহসা একদিন এই আঁধার ঘরে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল। একদিন সন্ধ্যাকালে সহসা আনন্দহীন শান্তিভঙ্গ করিয়া এই নিস্তব্ধ গৃহে অশান্ত আনন্দ-কোলাহল উঠিল। যেন দেবতা পূজার একটি নির্মাল্য দেবপাদচ্যুত হইয়া রাজলক্ষ্মীব শূন্য অঙ্গে খসিযা পড়িল। প্রতিবেশীনীগণের এ গৃহে বড় একটা গতিবিধি ছিল না, কিন্তু আজ সে নিযম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। এত দিনের পর রামকান্তের একটি মেয়ে হইয়াছে শুনিয়া সকলেই দেখিতে আসিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রাজলক্ষ্মীর বহুদিনের শুষ্ক মাতৃস্নেহসাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল। এমন কি, নির্বিকারচিত্ত রামকান্তও সকলের অনুবোধে একবাব সূতিকাগৃহের দ্বারে আসিযা কন্যাটিকে দেখিলেন। চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছিল কিনা অন্তর্যামীই বলিতে পারেন।

এতদিন রামকান্তের সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। বন্ধনরজ্জু তাঁহকে বাঁধিতে পারে নাই। আজ তিনি নিজে আসিয়া ধরা দিলেন। মেয়েটি যেন একটা আকস্মিক উৎপাতের মত, তাঁহার হৃদয়রাজ্যে হাঙ্গামা বাধাইয়া দিল। একী শক্তি; মাতৃঅঙ্গশায়ী ওই ক্ষুদ্র বালিকাটির এত ক্ষমতা! আফিস হইতে আসিয়া যথারীতি জলযোগ কবিয়া যেমন নিশ্চিন্ত মনে তাকিয়া বৈসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন এখন ঠিক আর সেরূপ হয না। ইতিমধ্যে রাজলক্ষ্মী পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে রামকান্তের শান্তি-সুখ একেবারে গিয়াছে। গৃহ অভিভাবকশূন্য, পীড়িতার যথারীতি শুশ্রূষা হইতেছে না, কন্যাটিরও যত্ন হয় না। রামকান্তের এই বিপদের সময় যাঁহারা পূর্বে তাঁহার গৃহে আসিতেন না, তাঁহাদের অনেকে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনী—এখন তাঁহারা সাহায্য করিতে লাগিলেন। বামকান্তকে আবার জগতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইল।

এরূপ বিপদ-বিশৃঙ্খলায় দুই মাস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় মাসে রামকান্তের গৃহলক্ষ্মী স্বামীকে কন্যারত্নটি দান করিয়া স্বর্গগামিনী হইলেন।

২

পত্নীর আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া রামকান্ত যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন একজন প্রবীণা প্রতিবেশিনী কন্যাটিকে আনিয়া তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার দুই চক্ষে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, পত্নী বিয়োগের পর এই তাঁহার প্রথম অশ্রুপাত! পত্নী জীবিত থাকিতে রামকান্ত তাঁহাকে ভালবাসিতেন কিনা তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেন না, আজ বুঝিলেন। বালিকার মুখখানি দেখিতে দেখিতে তাহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতিতে রামকান্তের হৃদয় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিনও তিনি রাজলক্ষ্মীকে আদর করেন নাই, একটি ভালবাসার কথা পর্যন্ত বলেন নাই। রাজলক্ষ্মীর অভিমানশূন্য সদা-প্রফুল্ল মুখখানি তিনি একদিন ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই। পীড়িতার সেই শীর্ণ দেহলতা অন্তিম বাক্য সমস্তই আজ মনে পড়িল। 'খুকিকে একবার কোলে নাও।' এই রাজলক্ষ্মীর শেষকথা! মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রামকান্তের সে কথা মনে পড়িল। বোধ হইল যেন রাজলক্ষ্মী সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "ছিঃ! চোখ মুছে ফেল। আমার স্মৃতিচিহ্ন ত তোমায় দিয়া অসিয়াছি। একবার আমার খুকিকে কোলে নাও।" রামকান্ত প্রগাঢ় স্নেহে কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন।

বন্ধুরা বলিলেন, "এমন করে আর কতদিন থাকিবে, মেয়েটিকে তো বাঁচিতে হবে। আবার বিবাহ কর।" প্রবীণগণ বলিলেন, "এত অল্প বয়সে কি গৃহশূন্য শোভা পায়? বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ কর।" রামকান্ত নীরব হইয়া থাকিতেন।

মেয়ের মুখের দিকে চাহেন আর চোখে জল আসে। আ মরি কি সুন্দর মুখশ্রী। একী বাঁচিবে? ভগবান কি দয়া করিয়া হতভাগ্যের তাপিত হৃদয় শীতল করিতে মেয়েটি দান করিবেন।

মেয়েটি বাঁচিল। মেয়ে বলিয়াই বুঝি এত অযত্নেও বাঁচিল। রামকান্ত মেয়ের নাম রাখিল 'নিশি'।

৩

রামকান্তের আয় অল্প, সংসারটিও ক্ষুদ্র। একটি পিতা, একটি কন্যা, কিম্বা একটি মা আর একটি ছেলে। বেশী একটি ঝি। নিশি এখন কেবল ছয় বছরে পা দিয়াছে, কিন্তু সে এখনই বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে সেই এ সংসারের গৃহিণী। ঘরের জিনিসপত্র সে ইহারই মধ্যে গুছাইয়া রাখিতে শিখিয়াছে। বাবা অফিস থেকে আসিবার পূর্বে জলের ঘটিটি, গামছাখানি, কাপড়খানি এসকল সে কখনই ঝিকে রাখিতে দেয় না। রামকান্তের উপর তাহার অতি কড়া শাসন। যদি কোনদিন তিনি ভুলক্রমে ছাতিটি বাড়িতে ফেলিয়া যান, তাহা হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসিলে নিশি 'এত রোদ লাগিয়াছে, দেখো অসুখ করবে' এই সমস্ত বলিয়া যথেষ্ট শাসন করে। রামকান্ত কাছারী যাইবার সময় 'বাবা তোমার পানের ডিবে নিলে না? পাগড়ীটা বাঁকা করে পরেছ কেন? লাঠি নিতে ভুলে গিয়েছ বুঝি' এইরকম নিশি দশ-বারটা ভুল সংশোধন করিয়া দেয়। রামকান্ত সর্ববিষয়ে নিশির কথানুযায়ী চলেন, তিল মাত্র অবাধ্যতা করিতে সাহস করেন না।

বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি, আকাশ মেঘপূর্ণ, নিশি রামকান্তের নিকট বসিয়া 'গল্প বল, ও বাবা একটা গল্প বল' বলিয়া আবদার করে। রামকান্ত কি করেন গুড়গুড়ি ছাড়িয়া নিশির মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। আবার কোনদিন যদি অফিস থেকে এসে 'আমার বড় অসুখ করেছে বুড়ি' বলিয়া শয়ন করেন সেদিন নিশির খেলাধূলা একেবারে বন্ধ হয়। 'বাবা তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? তোমার পা টিপে

দেব? একটু জল খাবে।' ইত্যাদি প্রশ্ন মিনিটে দশবার করিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। মনের ভাবটা যে হয়ত বাবা বলিতেছেন না, বাবার বুঝি কিছু করিতে হইবে।

রামকান্ত সকালে দু'টি ভাত রাঁধিয়া নিশিকে খাওয়াইয়া ও আপনি খাইয়া অফিসে যাইতেন, নিশির ক্রমে সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। 'বাবা তুমি রোজ রোজ রাঁধ কেন, আমি বেশ রাঁধতে শিখেছি। তুমি দেখই না কেন! তুমি তাড়াতাড়ি পার না আমি বেশ ভাল করে রাঁধব।' ইত্যাদি নানা প্রকার আবেদন আরম্ভ হইল। কোনদিন রামকান্ত স্বীকৃত হইতেন। সেদিন রান্নার ধুম দেখে কে ? ডালনা, চচ্চড়ি, ভাজা কিছুই বাকি থাকিত না, তাহার পরদিন নিশির হাতে ফোস্কা দেখিয়া যখন রামকান্ত কিছুতেই রাঁধিতে দিতে চাহিতেন না, তখন নিশি বলিত, তবে আজ আমরা দুইজনেই 'রাঁধিব'।

সন্ধ্যাবেলা গলির শেষের বাড়িটির জানালার দিকে চেয়ে একটি ছোট মেয়ে কেবল একদৃষ্টে গলির মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। অবাধ্য কালো কালো চুলের থোপাগুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। দু'খানি ছোট ছোট হাত তা বারবার সরাইতেছে। যেই ছাতি হাতে রামকান্ত গলির মোড়ে দর্শন দিতেন অমনি চারিটি চোখে চোখাচোখি হইত।

৪

দিনে দিনে নিশি বাড়িয়া উঠিতেছে। নয় বৎসরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায়! রামকান্ত বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সৎপাত্রে দিবেন একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু টাকা কই, সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে তাহাতে এখনকার দিনে অসৎ পাত্রই জুটিয়া উঠে না। রামকান্ত বড়ই বিব্রত হইলেন।

পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করেন, "আহা মেয়েটার মা নেই, কেই বা বিয়ের কথা বলে। হাজার হোক এখন বড়টি হয়েছে বিয়েতে কি আর সাধ হয় না? বিয়ের ভাবনায় রাতদিন মুখখানি মলিন করে থাকে।" তাহা, সত্যই আজকাল নিশির মুখখানি বড় ম্লান। রাঙা রাঙা ঠোঁট দু'খানি সর্বদা হাসি মাখা থাকিত আজকাল কেন জানি না সে ওষ্ঠে আর হাসি নেই। রামকান্ত আজকাল এত অন্যমনস্ক, যে একবার নিশির মুখখানি চাহিয়াও দেখেন না। নিশি পা ধোয়ার জল নিয়া গেলে আর 'আমার মা লক্ষ্মী' বলে আদর করেন না। অভিমানী মেয়ের অনাদর সহ্য হয় না। নিশির যে চোখে জল আসে তা তো রামকান্ত দেখিতেও পান না।

বঙ্গদেশে মেয়ে কেন জন্মগ্রহণ করে! বোধ হয় পিতা-মাতার পূর্বজন্মের কর্মফলেই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। রামকান্তের জগৎ-সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছেন। কন্যার বিবাহের যে কি উপায় করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, পরিচিত-অপরিচিত সকলেরই অনুগ্রহের ভিখারী হইয়াছেন, কিন্তু সে অনুগ্রহ অতি দুর্লভ!

একদিন রাত্র অধিক হইল, তবু রামকান্তের দেখা নাই। নিশি একবার দরজার কাছে উঁকি দিয়া দেখিতেছে, একবার জানালায় আসিতেছে, কত ঠাকুর দেবতাকে মানিতেছে তবু রামকান্তের দেখা নাই। প্রতি মুহূর্তেই নিশি চমকিয়া উঠিতেছে, ওই বুঝি রামকান্ত আসিতেছেন, ওই বুঝি গলির মোড়ে ছাতা দেখা যায়, কই কিছুই না! অবশেষে যখন রামকান্ত সত্যই আসিলেন, তখন নিশির প্রাণ আসিল। রামকান্ত দুয়ারে পা দিবা মাত্র নিশি তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "বাবা, এত দেরী কেন?" রামকান্ত কেবল বলিলেন, "একটু কাজে" আর কিছু বলিলেন না, বিমর্ষভাবে উপরে উঠিয়া গেলেন। একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিভিয়া যায়, নিশির মুখখানি তেমনি আঁধার হইয়া গেল।

৫

এইবার বুঝি নিশির বিয়ের ফুল ফুটিল। আজ ছয়মাস রামকান্ত কত বন্ধুর বাড়ি ঘুরিয়া কত সুপুত্রের পিতার পায়ে ধরিয়া কত খুঁজিয়া যাহা মিলাইতে পারেন নাই, এবার বুঝি বিধি তাহা মিলাইয়া দিলেন। এতদিনে একটি ছেলে ঠিক হইল। ছেলেটি সৎস্বভাব, বা-মা কেহই নাই, আসামের পোস্টাপিসে কাজ করেন। বিবাহ করিয়া নিশিকে সেখানে লইয়া যাইবেন।

রামকান্ত বৈকালে বাটী ফিরিবার সময় ভাবী জামাতা সুরেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। নিশি একজন অপরিচিত লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল, নীচে গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুরেশচন্দ্র একবার ঈষৎ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন, নিশি চলিয়া গেল।

আজ ছয়মাসের পর রামকান্তের বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। এতদিন নিশির কোথায় বিবাহ দিবেন, কিরূপ পাত্র হইবে, শ্বশুরবাড়ির সকলে ভালবাসিবে কিনা এই চিন্তায় কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন না। আজ সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ভাবী জামাতার মধুর চরিত্র ব্যবহার যত স্মরণ করিতেছেন ততই হৃদয় আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। নিশি সৎপাত্রে পড়িবে, নিশি সুখী হইবে এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, সেখানে আজ অন্য চিন্তার স্থান নাই। সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে নিশির ঘরে গিয়া দেখিলেন নিশি জানালায় বসিয়া আছে। নিশিকে দেখিয়া রামকান্তের চোখে এক বিন্দু জল আসিল, একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নিশির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আজ নিশির মুখখানি দেখিয়া মনে হইল যেন অনেকদিন তাহাকে দেখেন নাই। বলিলেন, "মা লক্ষ্মী এত কাহিল হয়ে গিয়েছ কেন?" নিশি উত্তর না দিয়া মুখ অবনত করিল, অনেক দিনের পর আদর পাইয়া অভিমানে তাহার দীর্ঘ নেত্রপল্লব অশ্রুবিন্দুতে অচ্ছন্ন হইয়া আসিল। পিতা আদর করিয়া মুখ মুছাইয়া বলিলেন, "ছি মা, কান্না কেন?" নিশি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "বাবা কাল কি রাঁধব, বল না?" পিতা বলিলেন, "তোমার যা সাধ হয় তাই রেঁধো। এতদিন খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলে, এখন ছেলেটিকে কার হাতে দিয়ে যাবে? মা হয়ে আর কে রেঁধে দেবে"। নিশি বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি, বাবা, আমি কোথায় যাব?" রামকান্ত বলিলেন, "চিরকালই কি মা তুমি আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে থাকিবে?" বলিতে বলিতে তাঁহারও নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিল, নিশির মাথায় হাত দিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী স্বামীর ঘরে গিযে এমনি লক্ষ্মী হয়ো।"

রাত্রি অধিক হইল। উভয়ে আহার করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। পিতা কন্যাকে কোলে বসাইলেন। কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা আমার আনন্দময়ী, কেমন করে তোকে পরের হাতে দিব। দেবতা করুন, চির জীবন সুখী হয়ো।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না! নিশি আর্দ্রস্বরে বলিল, "বাবা, আমি কোথাও যাব না।" আর কোন কথা হইল না।

সম্মুখে বৈশাখ মাস, তাহার পরে অকাল। অতএব এই মাসেই বিবাহ দিবার জন্য রামকান্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। ভাল ছেলেটি পাছে আবার হাতছাড়া হয়, এখন চারি হাত এক করিয়া দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন। রামকান্ত বিবাহের আয়োজন এবং জিনিসপত্র ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, সময় অভাবে নিশির উদ্দেশ লইতেও পারিতেন না। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল বটে, কেবল বিবাহ সম্পন্ন হইল না। নিশি অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল।

সমস্ত বৈশাখ গেল, নিশির পীড়া আরোগ্য হইল না। ইতিমধ্যে সুরেশচন্দ্রের ছুটি ফুরাইয়া গেল,

তিনি কর্মস্থানে গমন করিলেন। যাইবার সময় নিশিকে একবার দেখিয়া গেলেন, আর ভাবী শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন, "সম্মুখে অকাল, আর আমার শীঘ্র ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, পীড়ার অবস্থা আমাকে সর্বদা লিখিবেন"। রামকান্তবাবু শুনিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু নিশির পীড়া আরোগ্যের চিহ্নমাত্রও দেখা যাইতেছে না। দিন দিনই অধর পল্লব দু'খানি রক্তশূন্য, চক্ষু জ্যোতিহীন হইতেছে। পীড়া উত্তরোত্তর কেবল বাড়িতেছে। রামকান্তের আহার-নিদ্রা নাই, দিবা-রাত্র কন্যার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। নিশি কখনো রামকান্তের গায়ে হেলান দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলে, "বাবা, আমার অসুখ ভাল হলে কি খাব সেই গল্প করি এস।" রামকান্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছেন, নিশিরও ঘুম নাই, "ও বাবা শোও না"। রামকান্ত বলেন, "লক্ষ্মী মা, একটু চুপ করে ঘুমাও।" নিশি বলে, "আর তুমি জেগে বাতাস করবে? তুমি না ঘুমোলে আমি ঘুমাব না।"

একদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যায় পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে, ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় নিশর শীর্ণ মুখখানিতে পড়িয়াছে। নিশি ঘুমাইতেছে, রামকান্ত এক পার্শ্বে, ডাক্তার এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রামকান্ত কেবল আকুল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন ডাক্তার মুহুর্মুহু নাড়ি দেখিতেছেন। অবশেষে ডাক্তারবাবু নিশির হাত ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ আনিবার জন্য উঠিলেন, রামকান্ত ডাকিলেন 'নিশি, মা আমার!' নিশি জাগিয়া উঠিল। বাবা বলিয়া হাত দু'খানি রামকান্তের কোলের উপর তুলিয়া দিল, সেই মুহুর্তেই রামকান্তের গৃহের আলো জন্মের মত নিভিয়া গেল।

ইহার চারদিন পরে একদিন রামকান্ত অফিস হইতে আসিয়া গৃহের বহির্দ্বারে বসিলেন, অমনি জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেখানে আজ আর কেহই নাই। খোলা জানালায় উচ্ছৃঙ্খল বায়ু গৃহে প্রবেশ করিয়া হু হু করিয়া উঠিতেছে। রামকান্তের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "মা আমার, তোমাকে নিয়া আমার বড় ভাবনা ছিল, আমি তোমাকে লইয়া অকুল পাথারে ভাসিতেছিলাম। তুমি আমার বড় আদরিণী, কার হাতে সঁপিয়া দিব, সে তোর আদর করিবে কিনা, এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি, যাঁর ধন তাঁহারই হাতে তুলিয়া দিয়াছি। হায় প্রভু, বন্ধন ভাল, না বন্ধনের মুক্তি ভাল এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই।" নিঃশ্বাস ফেলিয়া রামকান্ত শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রহস্যের জাল

ইন্দিরা দেবী

দশটা বাজিতে কুড়ি মিনিট বিলম্ব আছে। আফিসের বাবুরা ছাতা হাতে দলে দলে ট্রামগাড়ির জন্য ফুটপাতের উপর অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, মটর গাড়ির ভিড় লাগিয়া গিয়াছে।

'ঝাঁকা মুটেরা' মোট লইয়া হন হন করিয়া পথ চলিতেছে। খাবারওয়ালা 'বাগবাজারের রসগোল্লা', 'ক্ষিরের পান্তুয়া' এবং লিচুওয়ালা 'চাই ভাল ভাল মজফফরপুরের লিচু' হাঁকিয়া চলিতেছে। 'দিনবার্তা' নামক দৈনিকের সাব-এডিটর সতীশচন্দ্র রায় আপনার কার্যস্থল কলুটোলা স্ট্রিটের অভিমুখে দ্রুতপদে চলিতেছিল। সহসা অপর এক বিপরীত পথগামী পথিকের সহিত ধাক্কা খাইয়া তাহার চলন্ত গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। অসতর্ক পথিককে দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দিবার পরিবর্তে সে সহসা বিস্ময়সূচক স্বরে বলিয়া উঠিল "একি কাকা যে? আপনি ফিরিলেন কবে? ভাল আছেন তো? খবর কি?"

কাকা আপনার অসংযত চলনেব কৈফিয়ৎ দিবাব পরিবর্তে ভ্রাতুষ্পুত্রের কণ্ঠস্বরে অত্যধিক খুশী হইয়া সবুজ চশমার ভিতব হইতে স্নেহপূর্ণ চক্ষে তাহাব দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাব পর একে একে সতীশের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "এই আজ সকালেই 'জাভা' থেকে ফিরেছি। এখনও বাড়ি যাইনি। শরীর বড় মন্দ নেই, কিন্তু ঘুরে ঘুরে ভারি শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। কী করা যায় বল দেখি? এক পেয়ালা 'চা' না পেলে তো আর বাঁচি না।"

কাকা রামতনুবাবুর বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। বর্ণ উজ্জ্বল গৌব। দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থের বহর একটু বেশি। মাথার চুলে এবং শ্মশ্রু-গুম্ফের অধিকাংশেই পাক ধরিয়াছে। চোখে কাঁচকড়ার সবুজ রংয়ের গোলাকার চশমা, মাথায় একটা বাদামী সিল্কের প্রকাণ্ড পাগড়ী। হাতে একটি সবুজ ও নীলের ডোরাকাটা জাপানি ছাতা। এহেন বিচিত্র বেশধারী কাকাকে লইয়া সতীশ নিকটবর্তী একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করিল। রামতনুবাবু এক পেয়ালা 'চা' নিঃশেষ করিয়া আর এক পেয়ালার ফরমাস দিলেন। এবং শূন্য পেয়ালায় চামচ বাজাইয়া মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিলেন, "তারা, কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল।" তাঁহার মিষ্টগলায় মৃদু মৃদু গানটিতে মধু বর্ষিত হইতেছিল। দোকানের বিক্রেতা ও খরিদ্দারদের অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সতীশ ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। আপনার জাভার গল্প বলুন, এবার সেখান থেকে কি কি অপূর্ব আশ্চর্য জানোয়ার সংগ্রহ করে আনলেন।"

রামতনুবাবু হাসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এবাব যা এনেছি তা একেবারে নূতন, একেবারে অদ্ভুত, এমন আশ্চর্য জীব যে এই বৈচিত্রময়ী পৃথিবীর কোলে বাস করে তা কারু অনুভব করাও সম্ভব নয়। এটি আমাব সব চেয়ে বড় আবিষ্কার। কর্মজীবনের এত বড় সাফল্য লাভ আমার অদৃষ্টে আর কখনও ঘটেনি। এ দেখে জগতের লোক একেবারে অবাক হয়ে যাবে।"

খুড়ার সর্বোৎকৃষ্ট আবিষ্কারের ইতিহাস শোনা সতীশের জীবনে ইহাই প্রথম নয়। সুতরং তাহার তাক লাগিয়া যাইবার মত বিশেষ কিছু কৌতূহল দেখা গেল না। অত্যন্ত সহজ সুরেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "এবারকার আবিষ্কৃত বস্তুটি কি?"

রামতনুবাবু একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে কোন কৌতূহলী চক্ষু তাঁহাদের দিকে দেখিতেছে কিনা। তাহার পর আশ্বস্ত হইয়া আপনার প্রকাণ্ড জাপানী কিমোনোর পকেট হইতে একটি লাল মখমলের বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সটি • চারিধারে মখমল আঁটা, কেবল উপরের ডালাখানি কাচের। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বাক্সের ডালাটি সন্তর্পণে মুছিয়া ফুৎকারে কল্পিত ধূলিকণা পর্যন্ত উড়াইয়া দিয়া বৃদ্ধ বাক্সটি টেবিলের উপর রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখ।" বাক্সের ভিতর খানিকটা বাদামী রংয়ের ঝকঝকে রেশমি কাপড় দেখা যাইতেছিল। সরু সুতার সূক্ষ্ম বুনানি। অনেকটা নেট বা লেশের মত দেখিতে তবু একটু যেন কেমন অদ্ভুত রকমের। সতীশ নিবিষ্ট চিত্তে দেখিতেছিল। সহসা দেখা গেল বাদামের মত রং, অনেকটা সেই রকমেরই গঠন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিশিষ্ট কোন জীব কাপড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

সহসা শিহরিয়া উঠিয়া সতীশ বলিল, "একি মাকড়শা নয়?"

বাক্সটি সযত্নে পকেটে রাখিয়া দিয়া রামতনুবাবু বলিলেন, "ঠিক! কিন্তু তবু এতে বৈচিত্র আছে। এমন রঙেরও জিনিস আর দেখেছ কি?"

"না তা দেখিনি। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের দেশে বর্ণের উজ্জ্বলতা আর সভ্য দেশের শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যের সূক্ষ্মতায় এমনকি আশ্চর্যের বিষয় আছে?" সতীশের কণ্ঠস্বরে পরিহাসের আভাস প্রকাশ পাইতেছিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "না শুধু চেহারার সমালোচনা করো না। এদের ক্ষমতার কথা যখন শুনবে তখন আর ঠাট্টা করতে পারবে না। বাপু হে, এ বড় যে সে জানোয়ার নয়। ঘরের কড়িকাঠ বা দেওয়ালের গায়ে যে 'কালো জাতি' কে দেখে আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা আতঙ্কে অস্থির হন এরা তাদের মত নিরীহ স্থানু প্রকৃতির নয়।"

এদের বর্ণের যেমন বিদ্যুতের মত উজ্জ্বলতা, গতিও তেমন দ্রুত। এই দেখ এখানে চোখের পলক ফেলবার আগে দেখবে তোমার দৃষ্টির বাইরে এক মাইল দূরে চলে গেছে। এত ক্ষিপ্র—যে জাল তৈরি হতে দেখবে কিন্তু কারিগরকে দেখতে পাবে না। একটুখানি রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার আশা আছে একদিন এরা জাপানের রেশমের কলের অন্ন মারবে।"

সতীশ বলিল, "এদের নাম কি? মাকড়শাই তো বলে?"

"হ্যাঁ সেখানে এদের 'জাভা স্পাইডার' বলে। এখানে অবশ্য অন্য নাম হবে। আবিষ্কারের নামে নাম রাখাই তো তোমাদের আধুনিক ফ্যাশন? বোধহয় 'রাম মাকড়শা' তনু 'মাকড়শা' বা 'বসু মাকড়শা' এমন কিছু দাঁড়াবে আর কি?"

সতীশকে নীরব দেখিয়া সে যে তাঁহার এই আশ্চর্য আবিষ্কারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে বৃদ্ধের মনে আর সংশয়মাত্র ছিল না।

রামতনুবাবু লোকটি একটু খেয়ালী। অল্প বয়সে পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। যৌবনের প্রথম প্রভাতে পরম প্রণয়িনী পত্নীর অকাল মৃত্যু সংসারের উপর একটা প্রবল বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিল। রামতনু-বাবুর পিতা রেলির বাড়ির মুচ্ছুদ্দিগিরি করিয়া পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অন্নচিন্তাও তাঁহার ছিল না। এই বন্ধনহীন সংসারবিরাগ ধনী ব্যক্তির অবশ্য আত্মীয়ের অভাব হয় নাই। নানা জাতীয় পক্ষীসমাকুল বটবৃক্ষের মত তাঁহার বৃহৎ ভবন দূর সম্পর্কীয়া মাসী, পিসি, মামী, খুড়ী প্রভৃতি আত্মীয়া ও তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গে সর্বদা কলকলায়মান থাকিত।

তাঁহার নিজের দুইটি সখ ছিল দেশ ভ্রমণ এবং জীবতত্ত্বানুসন্ধান। এই দুই কার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি কতকটা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেশে এসব লোকের সম্মানসূচক উপাধি

'মাথা পাগলা' ছাড়া অন্য কিছু বড় ঘটে না। রামতনুবাবুকেও লোকে 'পাগল' বলিত। লোকের দোষ দেওয়া যায় না। পাগল ভিন্ন আপনার স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া ঘরের পয়সা ব্যয়ে ফড়িং প্রজাপতি পতঙ্গের পশ্চাতে কে ঘুরিয়া বেড়ায়? দক্ষিণ আমেরিকা ও জাপানের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া রামতনুবাবু আরো দুই-তিনবার অপূর্ব প্রজাপতি, অদ্ভুত পতঙ্গ এবং অদৃষ্টপূর্ব সরিসৃপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

একটুখানি গর্বিতভাবে বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েই মনে কচ্চি একটা প্রবন্ধ লিখব। "এসিয়াটিক সোসাইটিতে সেটা পড়তে হবে। যেদিন পড়ব সেদিন তুমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতে পার তাহলে তোমার 'দিনবার্তা'র সংবাদ স্তম্ভে এই অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত জীবের ইতিহাস তুমি প্রথম প্রকাশ করতে পারবে।"

সতীশ একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি হাসিল। কলকাতার লোকে যে একটা মাকড়শার তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ অনুগ্রহ অনুভব করিবে এমন হাস্যকর ব্যাপার বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। রামতনু বাবু বলিলেন, "আশ্চর্য এই—এদের ছাল এত কঠিন যে কুড়ালের ঘা দিলেও ভাঙ্গে না। কুড়াল মারবার অপেক্ষাও তারা রাখে না। কুড়াল উঁচু করে তুলে মারবার পূর্বেই তারা মাইলখানেক দূরে চলে যায়।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,"এরা খায় কি?"

"মাছি মৌমাছি পাখী যা কিছু পায়। এদের জাল এত শক্ত যে এরা অনায়াসে পাখী পর্যন্ত জালে ধরিতে পারে। এদের জালের ফাঁদে যে হতভাগা পাখী পড়বে দু'মিনিটের মধ্যে তার পক্ষী জীবনের চিহ্নস্বরূপ হাড় কখানি আর পালকগুলি জালে পড়ে থাকতে দেখা যাবে। শুনেছি দু'-পাঁচ কুড়ি ক্ষুধার্ত মাকড়শা একটা মানুষকে পর্যন্ত নাকি মেরে ফেলতে পারে।"

সতীশের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, "ভয়ানক জানোয়ার।"

খুড়া হাসিয়া বলিলেন, "ভয়ানক? হ্যাঁ ভয়ানক হত বটে যদি এরা অবাধে জন্মাতে পেত। এক একটা মাকড়সা মাসে ত্রিশ হাজার ডিম পাড়ে। আর ডিমগুলো ফুটতে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে। এই ত্রিশ হাজার জীবের যদি প্রত্যেকে ত্রিশ হাজার করে ডিম হয় তাহলে ভাব দেখি কি ভয়ানক বীভৎস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।"

"জাভা তাহলে মাকড়শায় ভরে যায়নি কেন? তাদের তো ঐরকম হারে বাচ্চা হয়।"

"মাছিতে সংসার উৎসন্ন যায়নি কেন? তারাও তো ঐরকম হারেই বাড়ে?'

"তার কারণ কতক জীবজন্তুতে খেয়ে ফেলে, কতক মানুষে মারে—শীতের সময় অধিকাংশই মরে যায়। এইসব অনেক কারণ আছে।"

"আপনি যে বললেন এরা এত শক্ত যে, কুড়ালে ভাঙ্গা যায় না, এত দ্রুতগামী যে ধরা যায় না তবে এদের মারে কে?"

খুড়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তাহলে খবরের কাগজওয়ালাদের বুদ্ধি আছে। আমি ভাবতাম তাদের মাথাগুলো কেবল দেহের শোভা বর্ধনের জন্যে, সেখানে মস্তিষ্কে ঘৃতের কোন বালাই নেই। বাপু হে, যে গড়তে জানে সে ভাঙতেও পারে। 'জাভা' যাতে মাকড়শার উৎপাতে উৎসন্ন না যায় তার উপায় সেই সৃষ্টিকর্তাই করে দিয়েছেন। সেখানে 'হাতুড়ী পাখী' বলে 'চড়াই পাখীর' মত এক রকম পাখী দেখা যায়, তাদের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে এই মাকড়শাগুলো। বহু শতাব্দীর অভ্যাসে আর লীলাময় সৃষ্টিকর্তার অলঙ্ঘ্য নিয়মাদেশে তারা অতি সহজেই এই দ্রুতগামী জীবকে ধরে ফেলতে পারে। তাদের ডানাগুলি এত শক্ত আর ধারাল যে এদের সূক্ষ্ম শিল্পের আদর্শ স্বরূপ কঠিন জালগুলিকে অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। এ পাখীগুলো 'জাভাতে' খুব বেশি। আমি আসবার সময় দু'টি পাখী এনেছিলাম। কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যাভাবে পাখী দু'টি রাস্তাতেই মরে গেল। অবশ্য তাদের ছালগুলো

আমি রেখে দিয়েছি। সময়মত তোমায় দেখাব এখন। ঠোঁটের আর পেশীর কি রকম জোর ছিল তা দেখলেই বুঝতে পারবে।"

সেই অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য পক্ষীর দেহাবশিষ্ট দেখিবার জন্য সতীশের মনে যে কৌতূহল জন্মিয়াছিল এমন নয়। সে সাধারণ জিজ্ঞাসাভাবে বলিল, "আসবার সময় পাখী দু'টোকে কি খেতে দিতেন? মাকড়শা অবশ্য নয়?"

"না তা নয়! আমি তাদের মাংসের টুকরো খেতে দিতাম। প্রথম প্রথম আপত্তি জানিয়ে তারা পেছন ফিরে বসে থাকত, খাবার ছুঁত না। কিন্তু বাপু হে! পেটের জ্বালা কি জান—বড় জ্বালা। শেষাশেষি হাজত ঘরের ভদ্র কয়েদীদের মত মাথাটি নিচু করে চোখের জল চোখে মেরে ভাল মানুষের বাছারা টুপটাপ করে মাংসই খেয়ে নিত। খেলে কি হবে পেটে বোধহয় সহ্য হোল না। এমন অদৃষ্ট জাহাজে একটা পশুর ডাক্তার পর্যন্ত ছিল না—আহা বেঘোরে বেচারারা মারা গেল। এই পাঁচটা মাকড়শার যখন হাজার হাজার বাচ্চা জন্মাবে তখন কি আর খাবার ভাবনা থাকত। এখন এদের বাচ্চা হলে আত্মরক্ষার জন্য আমায় নিজ হাতে মারতে হবে। ওদের যে বাক্সর বাইরে বার করব তার আর যো'টি রইল না।"

সতীশ ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিয়া বলিল, "বারটা বাজে, ওঃ আমার এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। আচ্ছা আজ তাহলে আমি যাই। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটিতে আপনার এই ভয়ংকর জানোয়ারগুলো যেন পালাতে না পারে।"

ট্রামগাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে বসিয়া চুরুটের পুঞ্জিভূত ধূম উদগীরণ করিয়া দিয়া সতীশ ভাবিতেছিল, "খুড়ার অর্ধবিকৃত মস্তিষ্ক এবার সম্পূর্ণরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ দেখাইয়া মধ্যমনারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করা সমীচীন।"

রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দিনবার্তার সহকারী সম্পাদকের নিদ্রাতুর দৃষ্টি ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার প্রতি পতিত হইতেছিল এবং তাহার শ্রান্তচিত্ত ঘটিকাযন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছিল তবুও কার্যের বিরাম ছিল না। টেবিলের উপরে প্রসারিত কাগজখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রুফ দেখিয়া কাটকুট চলিতেছিল।

এমন সময় বেহারা আসিয়া সম্পাদকের আহ্বানবার্তা জানাইয়া গেল। সম্পাদকের ডাকিবার সহজ অর্থ আরও কিছু কার্যভার চাপাইয়া দেওয়া। সতীশ অপ্রসন্ন চিত্তে গম্ভীরমুখে সম্পাদকের গৃহে প্রবেশ করিল। বিনা ভূমিকায় সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবতত্ত্ববিদ রামতনু বসুকে তুমি জানতে কি?"

"হ্যাঁ, তিনি আমার কাকা হন।"

"সত্যি, তাহলে তো তোমার জন্যে ভারি একটা দুঃখের সংবাদ অপেক্ষা কচ্ছে। আজ সন্ধ্যে সাতটার সময় তোমার কাকা হাইকোর্টের ধারে ট্রামে কাটা পড়ে মারা গেছেন। প্রথমে কেহই তাঁকে চিনতে পারেনি, কাজেই খবর আসতে এত দেরি হয়ে গেল।"

সতীশ কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, "কী সর্বনাশ! আজ সকালেই যে তিনি 'জাভা' থেকে ফিরে এসেছেন। বেলা বারটার সময় আমি তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বসে কথা কয়ে এসেছি। কী সব নূতন জন্তু জানোয়ার জাভা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন সে সম্বন্ধে কত গল্প বলেছেন।"

সম্পাদক দুঃখসূচক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সত্যি, সংসারে এইটুকুই সবচেয়ে আশ্চর্য মানুষ যে জিনিসটাকে একেবারে অসম্ভব মনে করে সেইটেই সবচেয়ে সম্ভব হয়।"

আকস্মিক বেদনার প্রথম আঘাতটা সহ্য হইয়া গেলে সতীশের মনে পড়িল অপুত্রক রামতনু-বাবুর শেষকার্যের যথাবিহিত কর্তব্য করিবার জন্য নিকট আত্মীয় সে ভিন্ন আর কেহই নাই। সে সম্পাদককে আপনার ইচ্ছা জানাইলে তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই, তুমি এখুনি যাবে। সেকি কথা? এ

ত তোমার অবশ্য করণীয় কার্য। আর দেখ! তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমি লিখে দিয়েছি, এতক্ষণ বোধহয় ছাপা হয়ে গেল। তাই ত্রে আগে যদি জানতাম তিনি তোমার এমন আত্মীয় তাহলে তাঁর একটু জীবনী দিয়ে দিলেই হত, আচ্ছা তুমি চলে যাও আর দেরী করো না।"

একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি চড়িয়া সতীশ একেবারে 'মর্গে' গিয়া উপনীত হইল। জমাদারকে নিজের পরিচয় দিলে সে মৃতদেহ দেখিতে দিতে কোন আপত্তি করিল না।

কাকার শোচনীয় পরিণাম দর্শনে সতীশের চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই অকস্মাৎ প্রাপ্ত বেদনার আঘাত তাহাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। অনেক কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করিল।

জমাদার কহিল, "বাবু! এই বুড়ো ভদ্দর লোকটির জামার পকেটে এই দেখুন একটা কাঁচের বাক্স ছিল। বাক্সটি ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে, এতে কেবল এই এক টুকরো কাপড় ছিল।" সতীশ ভাঙ্গা বাক্সটা হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল। সেই বাদামী রংয়ের জালটুকু তখনও বাক্সের ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু যাহার অসীম যত্নে ও বিপুল অর্থব্যয়ে সেটুকু জাহাজে চড়িয়া সুদূর জাভা হইতে এই ভারতের বক্ষে আনীত হইয়াছিল সে আজ আর এ মরজগতে নেই।

মৃতদেহের সৎকার করিয়া সতীশের বাটী ফিরিতে রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রভাতের আলোক রশ্মি গবাক্ষের ছিদ্র পথ দিয়া ক্ষীণভাবে কক্ষে বিচ্ছুবিত হইতেছিল। শয্যা গ্রহণ করিলেও সতীশের নিদ্রা আসিল না। একটা অভূতপূর্ব চিন্তা ক্রমাগতই তাহার মাথাব মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় অফিসের কাজকর্ম কতকটা সারিয়া সতীশচন্দ্র টেলিফোনে তাহার 'ব্রীফহীন' ব্যারিস্টাব বন্ধু রজনী নাথকে নিমন্ত্রণ জানাইল। যথা সময়ে সতীশেব বাসায ব্যাবিস্টার সাহেবের শুভাগমন হইল। সতীশের 'সিগারকেস' হইতে একটি সিগার লইয়া পকেট হইতে দিয়াশালাই বাহির করিয়া সিগারটি ধরাইয়া ব্যারিস্টার নাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে এত জোর তলব কেন? কেসটেস কিছু আছে নাকি?"

"হ্যাঁ, খুব মস্ত একটা কাজ আছে।"

"খোস খবরের ঝুটোও ভাল। কত টাকার কাজ শুনি?"

"তা অনেক—কিন্তু গোড়ায় যদি ঘর থেকে কিছু মূলধন বার করতে পার।" রজনী নাথের হাস্যোজ্জ্বল মুখে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারের মতই একটা অন্ধকাব ছায়া ঘনাইয়া আসিল, মাটিতে মৃদু মৃদু জুতা ঠুকিতে ঠুকিতে সে উত্তর দিল, "সতীশ তুমি তো আমার অবস্থা সবই জান। ঐ মির্জাপুরের বাড়িখানার ভাড়া ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় আয় নেই। আর এও জান কতগুলি লোকের জীবন সেই ভাড়ার টাকা কটিতে নির্ভর করছে।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু তোমার বাড়িখানা যদি বেচে ফেল বিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। তা থেকে দশ হাজার টাকার সুদে একটু কষ্ট করে সংসার চালাও, আর বাকি দশ হাজার টাকায় আমরা একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করে দেখি এস।"

চমকিত হইয়া রজনী নাথ বলিয়া উঠিল, "কি সর্বনাশ? জুয়া খেলা? সতীশ তুমি বাড়ি ঘর বেচে ডার্বির টিকিট কিনতে চাইছ নাকি?"

"না হে না! এ তার চেয়েও অনিশ্চিত। সে তো কেউ না কেউ পাবে, এটা ঠিক শূন্যে অট্টালিকা নির্মাণ আর কি। আগে সবটা শোন তারপর যত ইচ্ছে শিউরোও।"

তাহার মাথার ভিতর যে নূতন খেয়ালটা গজাইয়াছিল তাহা বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিয়া সতীশ বলিল, "আমাদের এ থেকে হয় রাজা নয় ফকির হতে হবে। লোকে বলে 'তনুকাকা' পাগল ছিলেন।

কিন্তু জীবতত্ত্ব আবিষ্কারে তাঁর কখনও কোন পাগলামী কেউ দেখেননি। নিজের স্বার্থ বুঝতেন না তাই লোকে তাঁকে পাগল বলত। আমার বিশ্বাস আমরা যদি এই পরামর্শমত চলি তাহলে আমাদের ঠকতে হবে না।"

ব্যারিস্টার শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তা যদি সত্যি হয়, আঃ চারুকে বিয়ে করবার কোন বাধাই থাকবে না।"

উচ্চ হাসির সহিত বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া সতীশ বলিল, "এক যাত্রায় পৃথক ফল ত আর হতে পারে না। তাহলে সুনীতির অহঙ্কার ঠাকুরর্দারও আমার হাতে নাতনি সম্প্রদানের তাহলে আপত্তি থাকবে না। আর নিজের একখানা কাগজ করে চিরকালের সাধটা মিটিয়ে নিই।"

পূর্ব বর্ধিত ঘটনার এক মাস পরে আষাঢ় মাসের শেষে একদিন একখানা সংবাদপত্রে একটি নূতন সংবাদ প্রকাশিত হইল। 'ইডেন উদ্যানের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি মাকড়শার জালের মত জাল দেখা গিয়াছে। জালটি দেখিতে অনেকটা মাকড়শার জালের মত। কিন্তু তাহার সুতা এত মজবুত, বুনানি এমন যে একটা পাখী পড়িয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারে নাই।"

খবরটা এত তুচ্ছ যে সতীশ ভিন্ন আর কেহই বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করে নাই।

সতীশ উদ্যানাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ পাইল যে ঘটনাটি সত্য এবং জালটি এত শক্ত যে ছড়ির আঘাতেও ছিঁড়িয়া যায় নাই—আরো আশ্চর্য এই যে, যে জাল বুনিতেছে তাহার দর্শন আজ পর্যন্ত কেহ পায় নাই। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "জালটা কোনও প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখান হয়েছিল?"

সাহেব আসিয়া উত্তর দিলেন, "নিশ্চয় বাবু! আমি প্রফেসর জ্যাকসনকে দেখিয়েছিলাম।"

"কি বললেন তিনি?"

কিছুই না। তিনি বললেন, "জাল যে বুনছে সে জানোয়ারটাকে ধরে দিলে আমি ভালরকম বখশিস করব। তাকে ধরা তো দূরের কথা এ পর্যন্ত কেহই চোখে দেখেনি।"

"জালে একটা পাখী পড়েছিল না?"

"হ্যাঁ, পাখীটার আওয়াজ শুনেই তো আমি প্রথমে জালটা দেখতে যাই। কিন্তু আমি যখন গিয়ে পৌছেছিলুম তখন জালের উপর কতকগুলো পালক আর হাড় কখানি ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে পেলাম না।"

প্রায় পনেরদিন পরে 'ইডেন উদ্যানে রহস্যের জাল' শীর্ষক সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলো পরিপূর্ণ হইয়া উঠল। রাস্তাঘাটে বেকার উকিলদের বার লাইব্রেরী ঘরে, সৌখিন বাবুদের বৈঠকখানায়, নিষ্কর্মা যুবকদের তাসের আড্ডায়, সখের থিয়েটার পার্টিতে হাটে-বাজারে সর্বত্রই এই এক কথার আন্দোলন চলিতেছিল।

সতীশ বন্ধুকে জরুরী টেলিগ্রাম করিয়া দিল, "অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করিয়া দাও।" শ্রাবণ, ভাদ্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে ইডেন উদ্যানের ভৌতিক ব্যাপার লইয়া হুলস্থূল চলিতেছিল। বাগানের এতটুকু স্থানও আর শূন্য ছিল না। প্রতি রজনীতে জালের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়া যাইত। প্রভাতে নব নিযুক্ত ঝাড়ুদারেরা লাঠি ও ঝাঁটা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিত। এক রাত্রে ইডেন উদ্যান হইতে গঙ্গার ধারের পশ্চিম দিকের রাস্তাটি একেবারে বস্ত্রাবাসের মত জালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। কেল্লা হইতে একজন অশ্বারোহী সৈনিক সেই পথে যাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনে ফিরিয়া গেল। ভীত অশ্ব কোনমতেই অগ্রসর হইল না।

জালে দেশ ভরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু যে নিপুণ অশরীরী শিল্পী এই রহস্যের জালে দেশ আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। এজাল যেন ইন্দ্রজালের মতই লোক চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া সংখ্যার পর সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছে। নির্মাতাদের চোখে দেখা যায় না, তাহাদের

অস্তিত্বের প্রমাণ শুধু সেই রেশম নিন্দিত অতি সুন্দর লেসের মত বাদামী রংয়ের জাল। বাগানের বা ময়দানের পাখীগুলির আর সাড়া পাওয়া যায় না। গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে কেমন একটা বিষাদের ছায়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।

কাগজওয়ালারা বড় বড় অক্ষরে কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং তাহার পর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছেন, "বাগানে আগুন লাগান হউক, নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া নানা রকম ঔষধের পিচকারী দেওয়া হউক ইত্যাদি।" প্রায় সকল রকমই করা হইল, কিন্তু একটা অ্যাসিডের শিশি ভাঙ্গিয়া একটি বালকের মৃত্যু ঘটিল। জাল নষ্ট করার যে বড় বেশি প্রয়োজন ছিল তাহা নয়। জাল নির্মাতাদের ধ্বংস করাই এখন প্রধান আবশ্যক।

বর্ষার গুরু গুরু মেঘ গর্জন ফুরাইল। গৃহাগত প্রবাসী পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহ বর্ষণের মত দারুণ গ্রীষ্মের পর ধরণীর তপ্তবক্ষের দীর্ঘকালের তাপদাহ জুড়াইয়া দিয়া শুষ্কতোয়া শীর্ণ নদীগুলিকে কূলে কূলে ভরাইয়া বৎসরের মত সে নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল। কৃষককুল আনন্দে গুনগুন করিয়া গান গাহিয়া লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যাইতেছে। সুবর্ষণে ক্ষেত্র সরস। কেবল চিরপিপাসী চাতক ঊর্ধ্বমুখে 'ফটিক জল' বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার অপরিতৃপ্ত পিপাসা বুঝি সমস্ত বর্ষার জলও মিটাইতে পারে নাই। পূজার উৎসবে বঙ্গ মাতিয়া উঠিয়াছে।

সুরক্ষিত, সঙিনহস্ত সান্ত্রী প্রহরীর নিদ্রাহীন চক্ষে ধূলা দিয়া মাকড়শার জাল বড়লাট ভবনের উদ্যান মধ্যে দেখা দিল। গড়ের মাঠের বড় বড় গাছের মাথাগুলো বাদামী জালের সূক্ষ্ম বস্ত্রে ঢাকা পড়িয়া গেল। এই সময় 'দিনবার্তা'য় একদিন একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। 'যেদিন হইতে প্রথম ইডেন উদ্যানে মাকড়শার জাল দেখা গিয়াছিল সেইদিন হইতে হিসাব ধরা যায় তাহা হইলে অনায়াসে বুঝা যাইবে যে চারিমাসে কোটি কোটি রহস্যপূর্ণ জীবে মহানগরী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে' ইত্যাদি।

কথাটার যথার্থতায় অনেকেরই মনে বিভীষিকার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। রাত্রে ঘুমাইয়া অনেকেই শত পদ অথবা সহস্র মস্তক বিশিষ্ট না জানি কিরূপ শরীর শিহরণকারী বিচিত্র জীবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

বড় বড় 'স্টীম রোলার'গুলো অনবরত জাল পরিষ্কার করিতেছিল। একদিন একটা 'স্টীম রোলার' যখন একদিকে জাল ছিন্ন করিয়া অপরদিকে কাজে যাইতেছিল তখন দেখা গেল যে তাহার পশ্চাতে আবার নূতন জাল প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছে। এই সময়ে চালক দেখিল যে মাকড়শা জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব বিদ্যুৎ গতিতে জালের টানা লইয়া চলিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে দেখিতে দেখিতে রোলারটা একেবারে জালে ঢাকা পড়িয়া গেল। দূর হইতে দর্শকগণ অবাক হইয়া দেখিতেছিল দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের মত কোন অদৃশ্য হস্ত অনবরত সূক্ষ্ম বস্ত্রের স্তূপ যোগাইয়া দিতেছিল তাহার আর শেষ নাই। জালে জড়াইয়া 'রোলার' তাহার চলৎশক্তি হারাইয়াছিল। চালক অতি কষ্টে বস্ত্রাবাস ভেদ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। বড়লাটের মন্ত্রীসভা মাকড়শার অত্যাচার নিবারণের তত্ত্ব নির্দেশের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন, কমিশনারদের মধ্যে একজন হেস্টিংসে থাকিতেন। একদিন সকালবেলা জানালা খুলিতে গিয়া তিনি দেখেন জানালার আইভিগুলি আতঙ্ককর বাদামী জালের পর্দায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

কাকার কথা যদি সত্যি হয় তবেই দেশের মঙ্গল। নচেৎ পরিণাম যে কি ভয়ানক শোচনীয় হইয়া উঠিবে এই চিন্তায় সতীশচন্দ্রের নিজের আর্থিক ক্ষতিকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতেছিল। বড়লাট ও মন্ত্রিসভা এই মায়া রহস্য হইতে উদ্ধার লাভের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। দিনবার্তার বিপুল ধনের অধিকারী মালিক উহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। কলকাতা ও মফস্বলের ধনী সম্প্রদায় উহার সহিত আরো কয়েকটি শূন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তবুও সে জটিল সমস্যা জটিলই রহিয়া গেল। অসাধ্য পুরস্কার লাভের প্রার্থনায় কেহই অগ্রসর হইল না। মেঘনাদের মত অন্তরীক্ষে আত্মগোপন করিয়া অদৃশ্য শরক্ষেপে যে মায়াবী জীব ধরণী বক্ষে ভীতি ও তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল তাহার কার্যের একটুকুও শৈথিল্য দেখা গেল না।

যদি কেহ বেলুন আরোহণে উপর হইতে দেখিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে মহানগরী বক্ষস্থিত নন্দন কাননের দ্বিতীয় সংস্করণ ইডেন উদ্যান এবং তাহার নিকটবর্তী বৃক্ষচ্ছায়া স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের মখমল মণ্ডিত বিস্তৃত ময়দান, বহুদূর পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী গ্যাসালোকিত রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থিত বৃক্ষাবলীর উপর দিয়া শুধু সূক্ষ্ম জালের আস্তরণ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহদের সমস্ত সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব লুপ্ত করিয়া দিয়া জালের উপর জাল যেন কোন যাদুকরের যষ্টি স্পর্শে আরব্য রজনীর নিদ্রাতুর রাজপুরীর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়ছে।

ময়দানের কঠিন বক্ষ আর শিশুকণ্ঠের মধুর কলহাস্যে কোমল পদস্পর্শে, সরস, স্নিগ্ধ এবং মুখরিত হইয়া উঠে না। সে যেন পুরাণ বর্ণিত শাপগ্রস্তা ঋষিপত্নীর মত পরিত্যক্ত পাষাণ খণ্ডে পরিণত হইয়া গিয়াছে। জনহীন রাজপথ শত শত গ্যাসালোক বক্ষে ধরিয়া আর গঙ্গাগর্ভে প্রতিফলিত হয় না।

বাবু মহলে, সাহেব মহলে, উদ্যান ভ্রমণ, বায়ু সেবন ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার স্থলে এই দারুণ বিভীষিকা জাগিয়া উঠিয়াছে, কে জানে কোনদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া সকালে উঠিয়া তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের নিরাপদ কক্ষ ঐ দুর্ভেদ্য রহস্যের জালে জড়াইয়া গিয়াছে। সকলেই সশঙ্কিত চিত্তে তাহারী জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সহসা একদিন দিনবার্তায় প্রকাশিত হইল ''জালের রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে, মাভৈঃ।'' ব্যারিস্টারের জাহাজ ফিরিয়া আসিল, জাহাজখানি কেবল হাজার হাজার পাখীর খাঁচাতেই পরিপূর্ণ। সতীশ ও ব্যারিস্টার লাটসভায় সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইবার জন্য উপস্থিত হইল। সভ্যগণ তাহাঁদের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিযা তুলিলেন। 'দিনাবার্তা'র সম্পাদকের নিকট কয়মাস পূর্ব হইতেই যে শীল করা পুলিন্দাটি রাখা হইয়াছিল সেখানি,খোলা হইলে সকলেই বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিলেন সতীশের ভবিষ্যৎ বাণী অনেকাংশে মিলিয়া গিয়াছে।

সতীশ বলিল, যতক্ষণ না দেশের অশান্তি বিদূরিত হয় আমি কোন পুরস্কারই গ্রহণ করিব না। সেইদিন ইডেনের উদ্যানের নিকট এক বিরাট সভা করিয়া কমিশন ও দেশবাসী সর্বসাধারণের সম্মুখে পিঞ্জরাবদ্ধ হাজার হাজার পাখীকে মুক্তি দেওয়া হইল। ছোট ছোট তেজস্বী বিদেশী পাখীগুলি মুক্ত দ্বার পথে বাহির হইয়া উড়িয়া উড়িয়া নীল আকাশের চারিদিকে ছড়াইযা পড়িল। একজন একটু রহস্যের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''পাখীগুলি কি ঐ মাকড়শার আবাস্থলটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে?''

সতীশ বলিল, ''কাকার অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই তাই থাকবে।'' অনেকেই অর্থপূর্ণ চাহনীর সহিত মুখ টিপিয়া একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন।

শেষ খাঁচার পাখীগুলি যখন খোলা বাতাসে লঘুপক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল, তখন বিবর্ণ মুখে হতাশাজড়িত কণ্ঠে ব্যারিস্টার বলিল, ''সতীশ, আমাদের বিশ হাজার টাকার শেষ চিহ্নটুকুও ঐ পাখীটির সঙ্গে উড়ে চলে গেছে। এখন যদি পাখীগুলি আমাদের আশানুরূপ কাজ না করে তাহলে আমি আজ অর্থ ও সম্মান সব হারিয়ে পথে দাঁড়ালাম।'' উদ্বেলিত নিশ্বাসটা জোর করিয়া চাপিয়া ফেলিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ বলিল, ''আমিও তাই।''

সতীশ ও ব্যারিস্টার উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত সময় যাপন করিতেছিল। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি পূর্বের মত বিনা বাধায় চলিয়া যায়। কোন নূতন আশা কোন নূতন সংবাদ কিছুই নাই। 'দিনবার্তা'র প্রতিদ্বন্দ্বী 'সত্যবাদ'তে প্রফেসর জ্যাকসনের ইংরাজী হইতে অনুদিত অনেক প্রবন্ধ বাহির

হইতেছিল। সবগুলিই প্রায় বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় সতীশের পাগলামীর বিষয়ে ঠাট্টা করিয়া, দিনবার্তাকে গালি দিয়া, দেশবাসীকে নির্বোধ এবং হুজুগপ্রিয় প্রতিপন্ন করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহতে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মুখ আবার বিপরীত দিকে ফিরিল। একদিন এক পক্ষী শিকারী একটি হাতুড়ী চড়াই শিকার করিয়াছিল। পাখীটার পেট চিরিতে দেখা গেল সদ্য ভক্ষিত মাকড়শার ন্যায় অদ্ভুত এক জাতীয় নূতন জীব তখনও তাহার উদর গহ্বরে যথেষ্ট বর্তমান রহিয়াছে। সংবাদটি দেখিতে দেখিতে সংক্রামক রোগের মত সমস্ত শহরময় ছড়াইয়া পড়িল। মন্ত্রিসভা তখনি 'হাতুড়ী চড়াই' মারা আইন-বিরুদ্ধ কার্য বলিয়া নূতন আইন প্রচার করিলেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে পাখীগুলির কার্য খুব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছিল। জালের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছিল। কোথাও ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া আছে, কোথাও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে, কোথাও স্থানচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে। হেস্টিংস খিদিরপুরের ডকের কাছাকাছি হইতে বড়লাট সাহেবের বাটির নিকট পর্যন্ত যে জটিল রহস্যজাল আপনার অসীম ক্ষমতার বিজয় নিশান উড়াইয়াছিল— দেখিতে দেখিতে যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়ামুষ্টির আঘাতে তাহা ভূলুণ্ঠিত হইয়া খসিয়া পড়িল। ছেঁড়া জালগুলো ময়লার গাড়ি বোঝাই করিয়া ধাপার মাঠে পুঁতিয়া ফেলা হইল। পলাতক বড়লোকেরা আবার কলকাতায় আসিয়া প্রচার করিলেন, কলকাতার জলবায়ু এবং কলের ধোঁয়া, গ্যাসের আলো তাঁহাদেব শরীর ঠিক বরদাস্ত না করায়, তাঁহারা এইবার মধুপুর, দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনে গিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের হঠাৎ বহুদিনের বিস্মৃত প্রায় পল্লী-জননীর কথা অসময়ে মনে পড়িয়া গিয়াছিল তাঁহারাও চিরদিনের সংস্কার ও সুবিধা ছাড়িতে না পারিয়া অগত্যা ফিরিয়া আসিলেন। দেশ নামক জঙ্গলে যদিও ব্যাঘ্র-ভল্লুকের উৎপাত নাই সত্য, তবু অসহনীয় রক্তলোলুপ মশক এবং নধরকান্তি শোষক ম্যালেরিয়া উভয়ই বর্তমান। অগত্যা বুদ্ধিমানের মত 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই মহাবাক্যে অনুসরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পাপমুক্ত বিদ্যাঙ্গনার মত ইডেন উদ্যান আবাব নূতন শোভায় ফলে ফুলে পত্রবৈচিত্রে লোক চক্ষে পরম রমণীয় শোভনীয় হইয়া উঠিল। কণ্ঠিপরা, ঝুঁটিবাঁধা উড়িষ্যাবাসীর দল আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বাগানের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিল।

সতীশ ও ব্যারিস্টারের নাম গৌরবের সহিত চারিদিকে উচ্চারিত হইতে লাগিল। ব্যারিস্টারের কার্যের পক্ষে এটা বিশেষ শুভযোগ বলিতে হইবে। আজকাল আর বার লাইব্রেরী ঘরের কড়ি গণনায় অঙ্কবিদ্যার অনুশীলন করিয়া শুষ্কমুখে শ্লথগতিতে শূন্য পকেটে তাঁহাকে বাড়িতে ফিরিতে হয় না। এখন তাঁহার সময়ের অনেক মূল্য। চঞ্চলা রমা সতীশের প্রতিও কৃপাকটাক্ষপাতে কৃপণতা করেন নাই। পুরস্কারের অর্থ ত তাহারা পাইয়াছিল। তাহার পব স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর তাহাকে ডাকিয়া ডেপুটির পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, সতীশ বিনীতভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান কবিযাছিল। সে এখন দিনবার্তার অর্ধেক অংশীদার ও জগতের মধ্যে সুখী লোক, কারণ সে এখন সুন্দরী, শিক্ষিতা তাহাব ঈপ্সিতা সুনীতিবালার স্বামী।

উপসংহারে সেই পাখীগুলির কথা কিছু বলা উচিত। জগতে যে সকল মহাপুরুষ পরের উপকারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা শুধু অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ করিয়াই চলিয়া যান। পাখীগুলি পক্ষীরাজ্যের মহাপুরুষ কিনা বলা যায় না। তাহারা রাজধানীর বিভীষিকা নাশ করিয়াই ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। তাহাদের আবির্ভাব যেমন অতর্কিত, অন্তর্ধানও তেমনি অপ্রত্যাশিত। কিন্তু রাজধানীর বক্ষে মুক্ত আকাশের তলে বাস করিয়াও তাহারা আহারাভাবে মৃত্যুকে বরণ করিল। এ কলঙ্ক কলকাতাবাসীর চিরদিনের জন্য ঘুচিবে না।

অনেক কষ্টে একটি পক্ষী ধৃত হইয়াছিল, সেটিকে যত্নের সহিত 'জু-তে' রাখা হয়। পাঠিকারা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন, আজ পর্যন্ত কলকাতা 'জু' বাগানে 'হাতুড়ি চড়াই'য়ের শূন্য খাঁচাটি পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ বিরাজিত থাকিয়া দর্শকদের চিত্ত সম্ভ্রমপূর্ণ কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলে।

উমাপতি

শ্রীমতী কিরণবালা দেবী সরস্বতী

১

কালীগঞ্জ স্টিমার যখন গোয়ালন্দ ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন ঢাকা মেল প্রায় ছাড়ে ছাড়ে।

হঠাৎ স্টিমারখানি চড়ায় ঠেকিয়া যাওয়ায় এই বিলম্ব। ঘড়ির দিকে চাহিয়া ট্রেন ধরিবার আশায় নিরাশ হইয়া আজিকার রাত্রি যে স্টিমারেই কাটাইতে হইবে, ইহারই জল্পনা-কল্পনা যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই করিতেছিল। ইহার মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে বালক-বালিকা। ও মালপত্র বেশি, তাঁহার রাত্রি যাপনের জন্য বিছানাপত্র বিছাইয়া শয়নের ব্যবস্থাও করিতেছিল, তবে বেশিরভাগ লোকই ট্রেন ধরিবার আশায় স্টিমার ঘাটে ভিড়িবার পূর্বেই, মালপত্রসহ নীচের তলায় গিয়া ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্টিমার ঘাটে ভিড়িবামাত্র কুলি ও যাত্রীদিগের চীৎকার, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি—কে কাহার আগে গিয়া ট্রেন ধরিবে।

একে অল্প মিনিট কয়েক সময় হাতে, তাহার উপর স্টিমার ঘাট হইতে স্টেশন কতকটা যাইতে হয়, পথেও ভীষণ অন্ধকার। অল্প জনকতক যাত্রী যাঁহাদের সঙ্গে অচল এবং সচল মাল ছিল না, তাঁহারাই শুধু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কোনরকমে ট্রেন ধরিলেন।

ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া উঠিলেন, "সুবি, সুবি, আমি গাড়িতে উঠতে পারলাম না, শীগগির নেমে পড়।" ভদ্রলোকের মুখের কথা চলন্ত ট্রেনের শব্দে সম্পূর্ণ শ্রুতিগোচর না হলেও ব্যাপার বুঝিতে সুবির বিলম্ব হইল না। সুবিকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ভদ্রলোকটি দেখেন জিনিসপত্রসহ কুলি তাঁর পিছনে আসিতে আসিতে হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি 'কুলি, কুলি' বলিয়া ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে। রাত্রিকাল, তাহাতে যেরকম সময় পড়িয়াছে, নিজের সঙ্গে এক গাড়িতে যাওয়া নিরাপদ মনে করিয়া ভদ্রলোকটি সুবিকে পুরুষের কামরায় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

২

সুবির বয়স চোদ্দ কি পনের, পাতলা ছিপছিপে একহারা চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বড় সুন্দর—একবার দেখিলে পুনর্বার দেখিবার আকাঙক্ষা হয়। একখানি কাল চওড়া পাড়ের শাড়ি মাদ্রাজী ফ্যাশানে পরা, গায়ে একটি পাতলা ব্লাউজ, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে সরু সরু দু'গাছি তারের বালা ও কাপড় আটকান একটি প্লেন ব্রুচ ছাড়া অন্য অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না। মাথায় কাপড় নাই বলিয়া মনে হয় মেয়েটি এখনও অবিবাহিতা।

গাড়িতে সুবি একেবারে একা, স্বাভাবিক লজ্জাবশত সে বেঞ্চের কোণ ঠেসিয়া জড়সড়ভাবে বসিয়াছিল। সে গাড়িতে পুরুষ যাত্রীর মধ্যে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক ছাড়া অন্য কেহ ছিল না।

ব্যাপার বুঝিতেও সুবির মিনিট কয়েক বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু আপনার অসহায় অবস্থা বুঝিবামাত্র একটা অব্যক্ত অস্ফুট আর্তনাদের সহিত সে সেই গতিশীল ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য গাড়ির দরজার হাতল ঘুরাইতেই তাহার সম্মুখের বেঞ্চে উপবিষ্ট যুবকটি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি করেন? মারা পড়বেন যে।"

বাস্তবিক পক্ষে ট্রেনের গতি তখন বিলক্ষণ বর্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা কানে না তুলিয়া ঝড়ের বেগে সুবি ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল। 'সর্বনাশ! কি করেন, কি করেন' বলিতে বলিতে সেই যুবকটিও সেই গভীর নিশীথের কৃষ্ণ যবনিকা তলে, বনানীবেষ্টিত স্তব্ধ প্রান্তরের বুকে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল। বিপদজ্ঞাপক শিকলটি টানিয়া গাড়ী থামাইবার কথাও তাহার মনে হইল না। চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িবার দরুণ গুরুতর আঘাত না লাগিলেও অল্পবিস্তর আঘাত উমাপতির যে না লাগিয়াছিল এমন নয়। টাল সামলাইয়া উমাপতি সুবির খোঁজ করিল কিন্তু কোথায় সুবি? গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে উমাপতির যেটুকু সময় বিলম্ব হইয়াছিল,তাহারই মধ্যে তাহাদের উভয়ের ব্যবধানের দূরত্বটি হইয়াছিল অনেকখানি, সে কামরায় অন্য যাত্রী কেহ থাকিলে হয়ত শিকল টানিয়া গাড়ি থামাইলে লোকজন, আলোক, আশ্রয় সবই মিলিত, এখন এই বিরাট অন্ধকার স্তূপের মধ্যে কেমন করিয়াই বা সে সুবির খোঁজ করিবে, আর এই জনহীন প্রান্তরের বুকে এই দীর্ঘ রাত্রিই বা কাটাইবেন কেমন করিয়া? তথাপি আশায়-নিরাশায় লাইনের ধার বাহিয়া সে অগ্রসর হইল, কিছুদূর যাইতেই দেখিল—লাইনের বাহিরে মৃতের মত কি একটা পড়িয়া আছে, নিকটে গিয়া দেখিল—সুবিই বটে।

মেয়েটি মাথায় চোট পাইয়াছিল বটে কিন্তু ভয়ে সে প্রায় আধমরার মত হইয়াছিল, উমাপতিকে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া সুবির বিবর্ণ মুখখানি আতঙ্কে একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল এবং একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্বরিতপদে উঠিয়া বসিল। উমাপতির মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি যদি আমার কাছ থেকে সরে না যান "—কথাটা শেষ করিল না—কিন্তু তীব্র দৃষ্টিতে রেলের লাইনের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনের কথা উমাপতির নিকট স্পষ্টই হইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ছিঃ! কী ছেলেমানুষি করেন! কী বিপদে পড়েছেন ভেবে দেখুন দেখি একবার: দেরী করবেন না, আসুন আমার সঙ্গে।"

মেয়েটি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উমাপতির দিকে চাহিয়া বোধ করি তাহার অন্তরের সমস্ত কথা জানিয়া লইল, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল।

৩

সুবিকে সঙ্গে করিয়া উমাপতি যখন গোয়ালন্দে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও সুবির ভগ্নিপতির সন্ধান করিতে না পারিয়া সুবিকে লইয়া এখন কী করা যায় ভাবিয়া উমাপতি চিন্তিত হইয়া পড়িল।

মাসখানেক পূর্বে সুবি তার ভগ্নীর গৃহে গিয়াছিল, ভগ্নিপতি তাহাকে তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌঁছাইতে যাইতেছিলেন। ভগ্নীর বাড়ি যাইতে হইলে এখনই উজান স্টিমারে উঠিতে হয়, উমাপতি সুবিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভগ্নীর বাড়ি যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য উমাপতির অনুগ্রহ ভিক্ষা করিল।

সুবির ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া উমাপতি বলিল, "গাড়ির তো এখন অনেক দেরী, একটা ভাল হোটেলে গিয়ে চলুন ততক্ষণ স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।"

যাত্রীদিগের বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থান গোয়ালন্দে নাই। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র-ঝলসিত অনাবৃত রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে শত চক্ষুর দর্শনীয় হইয়া বসিয়া থাকিতে উভয়েই দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই সুবিও এ প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া থাকিতে পারিল না।

৪

পরদিন কুষ্টিয়া স্টেশন হইতে নৌকা করিয়া নয়নপুর পৌঁছিতে জ্যৈষ্ঠের দীর্ঘ দিবাও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। নদী হইতে পুনরায় গরুর গাড়িতে দুই মাইল পথ চলিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় তাহারা

একখানি মেটে খড়োবাড়ির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। অন্য সময় হইলে অর্থাৎ এই দৈবদুর্বিপাকে পড়িয়া উমাপতির সঙ্গে না আসিয়া ভগ্নীপতির সঙ্গে আসিলে আনন্দোন্মত্তা বালিকা এই বাড়ির দরজায় গাড়ি থামিবামাত্রই এতক্ষণ ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া যাইত। আজ বাড়ির দিকে গো-যানখানি যতই অগ্রসর হইতেছিল, ততই তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, দ্রুত বক্ষস্পন্দনের সহিত হাত-পা একেবারে অসাড় নিস্পন্দ—নাড়িবার শক্তিও যেন নাই।

গাড়ি থামিলে তার এই নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া উমাপতি বলিল, "সমুখের এই বাড়িই তো আপনাদের?"

সুবি মাথা হেলাইয়া জানাইল, "হাঁ, এই তাদের বাড়ি।"

উমাপতি বলিল, "তাহলে আপনি নেমে বাড়ির ভেতর যান, আমি এই গাড়িতেই ফিরে যাই।"

সুবি তেমনি ম্লান মুখখানি নত করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। বিস্মিত উমাপতি একটু নীবর থাকিয়া বলিল, "আমি নেমে বাড়ির কাউকে ডেকে দেব কি?"

সুবি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর চাউনিটুকু উমাপতির মুখের উপর স্থির করিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "বাড়ি ঢুকতে আমার কেমন যেন বড্ড ভয় করছে—"

"এই কথা, আসুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

উমাপতি সুবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় কয়েকটি বালক-বালিকা সুবিকে ঘিরিয়া উল্লাসভরে চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "ও মা দিদি এসেছে।"

সুবির ভগ্নিপতি রাজবাড়ি স্টেশন মাস্টারের নামে গোয়ালন্দ হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন—ট্রেন পৌঁছিলে তাঁহারা যেন সুবিকে নামাইয়া লন। পরের ট্রেনে সেখানে পৌঁছাইয়া তিনি জানিতে পারেন, সুবি নামে কোন মেয়ে সে ট্রেনে ছিল না। ভদ্রলোক নিরুপায় হইয়া সুবির পিতাকে সকল সংবাদ সংক্ষেপে জানাইয়া টেলিগ্রাম করেন। টেলিগ্রামখানি কিছুক্ষণ পূর্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সুবির পিতা জগমোহন ভট্টাচার্য এই দুঃসংবাদে এমনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, উপস্থিত কি করা উচিত কিছুই স্থিব করিতে পারিতেছিলেন না। বয়স্কা মেয়ে একা পথে।—কোথায় গেল সে।

সুবির মা সুবিকে বাড়ি ঢুকিতে দেখিয়া আত্মহারার মত ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"বের করে দাও, বের করে দাও, এখুনি ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দাও ওকে"— বলিতে বলিতে জগমোহন ঘরের দাওয়া হইতে লাফাইয়া উন্মাদেব মত সুবি ও তাহার কাছে আসিয়া তাহাদের মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। পিতার এই ক্রোধোন্মত্ত রুদ্রমূর্তি দেখিযা সুবির ম্লান মুখখানি ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল— তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উমাপতি একেবারে বাড়ির ভেতরে না গেলেও সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে সকল ব্যাপারই তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া উমাপতি একেবারে নির্বাক, এতক্ষণ যাই যাই করিয়াও সুবির এই সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় যাইতে পারিতেছিল না। এদিকে সুবির পিতার কর্কশ চিৎকারে, পাড়া-প্রতিবেশীবর্গের ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষে ও তাঁহাদের নির্লজ্জ অবান্তর প্রশ্নে, নিরপরাধ বালিকার এই দারুণ বিব্রত অবস্থায় উমাপতির করুণ হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভিতরে আসিয়া বিনয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "শুনুন আপনারা, আপনারা যা ভেবে এই নিরপরাধ মেয়েটির কষ্ট দিচ্ছেন, তা ঠিক নয়। ইনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমায় ভদ্র সন্তান বলেই জানবেন। আপনার মেয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।" পবে আনুপূর্বক ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া উমাপতি বলিল, " এর মধ্যে দূষণীয় তো কিছু নেই—"

মুখ খিঁচাইয়া জগমোহন বলিয়া উঠিলেন, "বাপু হে, সে যেন আমি বুঝলাম, অন্যে বুঝবে কেন? একে বয়স্কা মেয়ে, তায় দু'দিন বাদে তার বিয়ে দিতে হবে। একথা তখন তো আর গোপন থাকবে না।

কে ওই মেয়েকে গ্রহণ করবে? এই তুমি যে মুরুব্বিয়ানা চালে এত বক্তিমে করছ, তোমাকেই যদি ধরে পড়ি, তুমিই কি ওকে নিতে চাইবে?"

দারুণ উত্তেজনায় বৃদ্ধ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং পুনরায় গর্জিয়া স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, " হয় মেয়ের গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে মার, নয় যে ওকে সঙ্গে করে এনেছে তার সঙ্গী করে দাও।"

উমাপতির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে ধীর কণ্ঠে বলিল, "তাতে আমি মোটেই অসম্মত নই। যদি বিনা অপরাধে এত বড় সাজা ওঁকে নিতেই হয়, আমায় জানাবেন শেষ পর্যন্ত ওর বোঝা আমার ভারী হবে না"। বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

৫

তারপর বছরখানেক গিয়াছে—আজও সেদিনের স্মৃতি উমাপতির মনে দোলা দিয়া যায়। সুবির ব্যথাতুর পাণ্ডুর মুখখানির কথা ভুলিতে সে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। তাই পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিয়া যখন সে শুনিল তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসামাত্র না করিয়া মা বিবাহ সম্বন্ধ একেবারে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন—তখন মায়ের উপর অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে তখনকার মত তাঁহাকে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, সে স্পষ্টই জানাইয়া দিল—এ বিবাহ করিতে সে পারিবে না, অন্যত্র সে কথা দিয়াছে।

সুলোচনা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। একটু থামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "দোসরা অঘ্রাণে বিয়ে ঠিক করে দাদা চিঠি লিখেছেন। মেয়েও তিনি নিজে দেখে পছন্দ করে তবে তাঁদের পাকা কথা দিয়েছেন। গরীবের মেয়ে, একটি নগদ দেবার শক্তি নেই। তাঁরা যা দু' একখানা গয়না ইচ্ছে করে দেবেন তাই। দাদার আগ্রহ তেমন ছিল না, মেয়েটি দেখেই কিন্তু তাঁর কেমন মমতা পড়ে গেছে। না না করে মেয়েও তো কম দেখা হল না, এমন সুশ্রী কমনীয় মুখ সচারাচর চোখে পড়ে না।"

চটি জুতার অগ্রভাগে উঠানের মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে উমাপতি বলিল, "তুমি মামাকে লিখে দাও মা, এ বিয়ে আমি করতে পারব না। এখনও সময় আছে, তাঁরা অন্যত্র মেয়ের সম্বন্ধ অনায়াসেই ঠিক করে নিতে পারবেন।"

সুলোচনা জ্বলিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "লিখতে হয়, তুমিই লিখে দাও। আমি পারব না।" তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। উমাপতি মাথা হেঁট করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে জাগিতেছিল সেই দুর্দিনের চিত্র। সুবির করুণ কোমল মুখখানি, তার আত্মনির্ভরশীল কাতর, চাউনিটুকু। কিন্তু......

৬

যদিও বেলা দুইটার পূর্বে ডাউন স্টিমার আসে না, মাল বোঝাই ইত্যাদিতে তিনটার পূর্বে ছাড়ে না এবং স্টিমার ঘাট হইতে তাহাদের বাড়িও অধিক দূর নয়, তবুও সুলোচনা বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল গুছাইয়া বেলা বারটার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—ভয় পাছে ষ্টিমার ছাড়িয়া যায়।

সেদিন হইতে মাতা ও পুত্র এই দু'টি অতি নিকটতম আত্মীয়ের মধ্যে যেন কেমন একটা অসন্তোষের ভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া উমাপতি এ বিবাহে সম্মতি দিয়াছে।

ইহার পরে সে বিবাহ সম্বন্ধে মুখে আপত্তিসূচক আর কোন কথাই বলে নাই সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরের বেদনা মুখে এমনি ক্লিষ্টতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল যে, সুলোচনার মাতৃহৃদয়কেও ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কেবলি মনে হইতেছিল পুত্রের অমতে বিবাহ দিয়া তাহার দাম্পত্য

জীবনের সুখ-সৌভাগ্যের উপর একটা অশান্তির বোঝা চাপাইতেযাইতেছেন। নৌকার মধ্যে সকলেই নীরব। কেবল নদীর তরঙ্গ ভঙ্গের সহিত কলকল ছলছল শব্দ। এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুত্রের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সুলোচনা বলিলেন, "নেমে মালটালগুলো ওজন কর না? স্টিমার এসে পড়লে তখন তো আবার তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে।"

উমাপতি বলিল, "স্টিমারের ধোঁয়া না দেখা গেলে কোনদিনই মাল ওজন করে না।"

একটু নীরব থাকিয়া সুলোচনা বলিলেন, "নেবে জিজ্ঞেস করে আয় না, স্টিমার আসবার আর কত দেরী?"

উমাপতি মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া তীরে নামিয়া পড়িল। তারপর হেমন্তের খররৌদ্র বিভাসিত উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া পদ্মার বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজির মেলা, কখনও বা নদীর চরে সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে কৃষক পল্লীর মৃন্ময় কুটীর, কখনও সর্বগ্রাসী প্রলয় নৃত্যকারী পদ্মার ভাঙ্গনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ একসময় ফিরিয়া আসিয়া, নৌকার মধ্যে শুইয়া একখানি মাসিক পত্রের পাতা উলটাইতে লাগিল। 'স্মৃতির দংশন' শীর্ষক গল্পটি তাহার মনকে আকর্ষণ করিল, গল্পটি পড়িতে পড়িতে তাহার কেবলি মনে হইতেছিল তাহার মনের ভাব লইয়াই যেন গল্পটি লিখিত হইয়াছে। মোহাবিষ্টের মত ভাবিতে ভাবিতে উমাপতি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। স্বপ্নে দেখিল, পিতৃপরিত্যক্তা ব্যথিতা সুবি ম্লানমুখে করুণ নয়নে চাহিয়া যেন তাহার নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছে। "আহা! মাথাটি এমন করে হেলে পড়েছে বিছানায় উঠে শুলে হয় না?"

মায়ের স্নেহ কোমল হস্তের স্পর্শের সঙ্গে তাঁহার মৃদু ভর্ৎসনায় উমাপতির তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। সে কোন কিছু বলিবার পূর্বেই নৌকার মাঝি বলিয়া উঠিল, "বাবু, জাহাজের ধোঁয়া দেখা যাইতেছে।"

৭

গোয়ালন্দে ট্রেনে উঠিতে গিয়া ইন্টার ক্লাসের মেয়ে-কামরার দিকে চাহিয়া উমাপতির হৃদকম্প উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক, বিছানার বাণ্ডিল, কলার কাঁদি, ফলের ঝুড়ি, ঘিয়ের টিন, ক্ষীরের হাঁড়ি প্রভৃতিতে কামরা পূর্ণ। তারপর যাত্রীর ভিড়, কাচ্ছা-বাচ্চার কান্না এবং মহিলাগণের স্থান দখল লইয়া, "তুমি শুয়ে আছ, আর বসতে যায়গা পাব না? কেন আমি কি ভাড়া দিইনি না কি?" ইত্যাদি ইত্যাদি ঝগড়া পুরোদমে চলিতেছে। পুরুষের কামরাযও স্থানাভাব। অগত্যা উমাপতি মা ও ভাই-বোনদের লইয়া ইঞ্জিনের কাছাকাছি একখানি থার্ড ক্লাসের অপেক্ষাকৃত খালি গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি জমাটবাঁধা অন্ধকার ও নীরবতার মাঝে আকাশে উজ্জ্বল তারকার মালা, পথিপার্শ্বস্থ বনবীথির মধ্যে খদ্যোতের মেলা এবং মাঝে মাঝে অনাদৃত স্টেশনগুলির চকিত আলোক ছাড়া পথে দর্শনীয় কিছু না থাকিলেও উমাপতি জানালার বাহিরে দৃষ্টি স্থির করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনার "বসে থাকবি কতক্ষণ, রাত জেগে কি শেষটা অসুখে পড়বি? শুয়ে পড় না"—মৃদু ভর্ৎসনায় সে ব্যাঙ্কের উপর শয্যা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

উমাপতির যখন ঘুম ভাঙিল তখনও উষার আলোক ধরণীর বক্ষ আলোকিত করে নাই। ঘুম ভাঙিতেই উমাপতির কানে চাপা হাসির সঙ্গে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল সে বুঝিতে পারিল, নিদ্রিত থাকিবার সময় এই নবাগতাদের গাড়িতে আগমন হইয়াছে। গাড়ির আরোহিবর্গ প্রায় সকলেই নিদ্রিত, কেবল কোল ঘেসিয়া বসিয়া উমাপতির বিবাহিতা ভগিনী শৈবলিনী ও আর দুইটি মেয়ে হাসি গল্পে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সেই চাপা কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন ও হাসির শব্দ মাঝে মাঝে উমাপতির কানে ভাসিয়া আসিতেছিল।

মেয়েদের এমন একটা বয়স আসে, যখন দুনিয়ার দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, অভিযোগ কোন কিছুই তাহাদের মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। বয়সের রঙ্গিন নেশা তখন মনকে এমনি অভিভূত করিয়া রাখে।

এই নবাগতা মেয়ে দু'টির মা একদিকের বেঞ্চে শুইয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন।

তাহাদের কথাবার্তার যেটুকু অংশ উমাপতির কানে গেল, তাহাতে সে বুঝিল, যদিও মাঝরাত্রেই তাহারা গাড়িতে উঠিয়াছে, কিন্তু কথাটা বেশিক্ষণ আরম্ভ হয় নাই, উঃ বাপরে এই সময়টুকুর মধ্যেই এত বন্ধুত্ব।

আর অল্পক্ষণ পরেই ছাড়াছাড়ি হইবে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া শৈবলিনী ক্ষুণ্নস্বরে একটি মেয়েকে বলিল, "বড় দুঃখ হচ্ছে ভাই, হয় তো জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না। নতুন সাথীটিকে পেয়ে আমায় ভুলে যেও না যেন, বুঝলে?"

মেয়েটি সলজ্জ হাসির সহিত মুখখানি নত করিল শৈবলিনী তাহার হাতখানি পরম স্নেহে আপনার হাতের মধ্যে লইয়া মৃদু চাপ দিয়া বলিল, "চিঠির উত্তর কিন্তু দিও ভাই।"

তারপর কাহার বাড়ির নম্বর কত ইহা লইয়া দুইজনের মধ্যে একটু আলোচনা হইল, কেন না, কেহই বাড়ির নম্বর অবগত নয়। মিনিট কয়েক চিন্তার পর স্থির হইল—মায়ের নিকট হইতে উভয় পক্ষই ঠিকানা জানিয়া লইবে।

হঠাৎ শৈবলিনী বলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই, আমার কী ভুল। আদত কথাই যে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। তোমাব শ্বশুরবাড়ির গ্রাম পোস্ট অফিস, জেলা, আব ভাই তোমার বরেব নামটি আমায় বল? তোমার বিয়ে তো এই পরশু, বিয়ে হলেই তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে?"

শৈবলিনীর প্রশ্নে মেয়েটি একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর দিল না। শৈবালিনী বলিল, "লজ্জা কি ভাই, এখনও তো তোমার বিয়ে হয়নি, বরের নাম বলতেও কোন দোষ নাই।"

যে মেয়েটি এতক্ষণ তাহাদের নিকট বসিয়া উভযেব গল্পের রসাস্বাদন কবিতেছিল, সে তাহার দিদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, " কি মেজদি, বলব তোমার বরেব নাম? বলি?"

পূর্বোক্ত মেয়েটি ঈষৎ কোপ কটাক্ষ ভগ্নীর মুখের পতি নিক্ষেপ কবিল, কিন্তু সে দমিবাব বা ভীত হইবার পাত্রী নহে। সে হাসিতে হাসিতে শৈবলিনীর দিকে চাহিযা বলিল, "তা জানেন না, এই আমার মেজদিদির পতি তিনি—'

শৈবলিনী বলিল, "তা যেন বুঝলাম, তা বলে কি তাঁর নাম নেই?"

পরম বিজ্ঞের মত মেয়েটি বলিল, "একটু বুদ্ধি খরচ করলেই সব বোঝা যায়। আচ্ছা, শুনুন তবে— আমার ঠাকুরমা আদর করে দিদিকে সুভদ্রা বলে ডাকতেন, অত বড় নাম ধরে ডাকতে অসুবিধে হয় বলে সবাই ওকে সুবি বলেই ডাকে, কিন্তু ওর আসল নাম হচ্ছে উমাবানী। তাই ওর বরের নাম ও হল উমাপতি। কেমন আমি ঠিক বলেছি কি না?"

মেয়েটি হাসিতে লাগিল। বালিকার হাস্যোচ্ছ্বলিত মুখেব দিকে চাহিযা উঠিয়া গিয়া অন্য বেঞ্চে নিদ্রিতা মায়ের গায়ে ঠেলা দিয়া সোৎসাহে বলিযা উঠিল, "ও মা, মা, উঠে দেখ কে। আমাদেব গাড়িতেই আমাদের বৌদি।"

আনন্দের বেগে শৈবলিনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বিস্মিত চকিতা সুলোচনা বলিয়া উঠিলেন, "কই?"

বাঙ্কের উপর উমাপতিও সেই সময তাহার ভাবী পত্নীর মুখখানি দেখিবার লোভে চোরাদৃষ্টিটুকু মেয়েটির মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু এ কী; এ কোথা হইতে আসিল, এ যে সুবি! দারুণ মানসিক উত্তেজনায় হয় তো তাহার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া উমাপতি পুনরায় মেয়েটিব মুখখানি দেখিবার জন্য চাহিল। লজ্জা-অভিভূতা বালিকা মাথা নিচু করিয়া বেঞ্চের কোণ ঘেঁষিয়া অপরাধীর মত জড়সড়ভাবে বসিয়া রহিল। লুব্ধ মধুপের মত তাহার চারিপাশে ঘুরিয়া-ফিরিয়া উমাপতির অনুসন্ধিৎসু নেত্রযুগল যে বার্তা বহন করিয়া আনিল, তাহাতে আর তাহার বুঝতে বিলম্ব হইল না— কে সে?

আংটি

অনুরূপা দেবী

স্বাস্থ্যলাভের আশায় আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখান হইতে এক অশ্বস্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে সাগরকূলের বালুকার মধ্য হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করা একটা সখের কাজ জুটিয়াছিল। সেই উপলক্ষে প্রতিদিন যেমন ছড়ি দিয়া বালুকার স্তর লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকি, সেদিনও সেইরকম করিতে করিতে একটা হীরার আংটি কুড়াইয়া পাইলাম। আংটিটা গিনি সোনা বা তাহার কিছু কম দরের সোনায় প্রস্তুত। সচরাচর বাজারে এ রকম সোনার আংটি বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না, ফরমাইস দিয়া গড়াইতে হয়। আংটিটির মাঝখানে একখানি বড় কমলহীরা। বালুকা লাগিয়াছিল। ভাল করিয়া ধুইতেই হীরাখানা মেঘমুক্ত নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বেশ দামী হীরা ওজনের একরতির উপর হইবে। কাটাটার মধ্যেও বেশ একটু নিপুণতার চিহ্ন ছিল এবং এইটুকুই এই কুড়ানো জহরটির বিশেষত্ব। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে হীরাখানাকে ছোট একটি ফুলের মতন দেখাইত।

বাড়ি আসিয়া অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। আংটিব বর্ণনাটা দিলাম না, শুধু এইটুকু মাত্র লিখিলাম "...সমুদ্রতটে একটি আংটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। আংটিব বিবরণসহ এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র।"

প্রথম সপ্তাহে আমার বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিল না। কোন লোকই আংটির দাবী করিতে আসল না। কেউ পত্র লিখিল না। মুস্কিলে পড়া গেল। পবের জিনিস ফেলিয়া দেওয়া উচিৎ নয়। কাছে রাখা আরো অনুচিৎ। তবে কি কোন দাতব্য কার্যের জন্য পাঠাইয়া দিব? হ্যাঁ, এই পবামর্শই সবিশেষ বিবরণ লিখিয়া আংটিটা মুড়িয়া সীল করিয়া একটা সৎকর্ম ভাণ্ডারেই পাঠাইয়া দিই। অভাবগ্রস্তগণেরও কিছু উপকার হইবে এবং আমিও পরের বোঝা ঘাড় হইতে ফেলিয়া নিশ্চিত হইতে পাবিব।

আংটিটি ছোট একটি টিনের কৌটায় পুরিয়া কোথায় পাঠাইব ভাবিতে গিয়াই সর্বপ্রথম রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের কথা মনে হইল। লিখিতেছি এমন সময় ভৃত্য আসিয়া দুইখানি পোস্ট কার্ড দিয়া গেল। হাতের কাজটুকু শুভ কর্ম বলিয়া প্রথমে তাহা করিলাম। সীল করা হইয়া গেলে বাতিটা নিভাইয়া দিয়া একখানা কার্ড তুলিয়া পাঠ করিলাম তাহাতে এইরূপ লেখা।—'মহাশয় অতি সজ্জন। একালে এরূপ ধার্মিক ব্যক্তি প্রায় চক্ষে পড়ে না। দুই মাস গত হইল আমার অঙ্গুরীয়টি স্নানের সময় . সমুদ্র জলে পতিত হয়। ইহা সেই অঙ্গুরীয়। অনুগ্রহপূর্বক ঠিকানায় মদীয় ভবনে উহা প্রেরণপূর্বক চিরবাধিত করুন।"

স্বাক্ষর ছিল চারুচন্দ্র কর্মকার। দ্বিতীয় পত্র প্রায় এই প্রকার। বেশির ভাগ তাহাতে এইটুকু ছিল "আমার স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতি এই অঙ্গুরীয় আমার জীবন সদৃশ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছিল। ভবদীয় কৃপায় ইহা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে কৃতার্থ হইব।

ইতি

শ্রীবিহারীচরণ সরকার

সমস্ত সঙ্কল্পই বদলাইয়া ফেলিতে হইল এবং সেইসঙ্গে নূতন একটা সমস্যা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইল। আংটির প্রার্থী দুইজনের একজনও আংটির বর্ণনা পত্রে দেন নাই । অথচ বিজ্ঞাপনে এ কথা সুস্পষ্ট করিয়াই লেখা হইয়াছিল। এ আবেদন বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্যাক করা কৌটা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দুইখানা পোস্ট কার্ড লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া ডাকে পাঠাইতে দিলাম। কি রকম অঙ্গুরীয় খোয়া গিয়াছে তাহা জানাইবার অনুরোধ করিলাম। সে হপ্তার বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের খোয়া যাওয়া আংটির সবিশেষ বিবরণসহ পত্র লিখিতে অনুরোধ করা হইল।

চারু কর্মকার বা বিহারী সরকারের পত্রোত্তর আসিল না কিন্তু প্রতিদিনই আমার নিকটে দুইখানি-চারিখানি করিয়া অঙ্গুরীয়ের জন্য আবেদন সহ নানা দেশ হইতে পত্র ও কার্ড আসিতে লাগিল। কোন কোন পত্রে তাহাও থাকিত না। কিন্তু কোন বর্ণনার সহিত আমার বিজ্ঞাপন দেওয়া আংটির পুরা মিল হইল না। যদিও অধিকাংশ লোকে তাঁহাদের অঙ্গুলী বিচ্যুত হীরাঙ্কুরীয় যথাসাধ্য মূল্যবান বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিতেন, তথাপি কিছু না কিছু প্রভেদ থাকিয়া যাইত। আর যাঁহারা লিখিতেন—আমার অঙ্গুরীয়টিতে খুব বড় একখানা পোখরাজ দেওয়া আছে কিম্বা পান্না বা চুনিরও কোন উল্লেখ থাকিত তাহার তো আর কথাই নাই, সেইখানেই চুকিয়া যাইত।

এমনি করিয়া পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, ঝুড়ি করিয়া জমা করিলে প্রায় এক ঝুড়ি চিঠি এই হীরার আংটিটার দাবী করিয়া আসিল। কিন্তু এমন একখানাও চিঠি পাইলাম না যাহাতে আমার ঘাড়ের এই বোঝাটাকে সেইখানে নিক্ষেপ করিতে পারি। শুধু এই দেখিয়া অবাক হইলাম যে বাংলাদেশের কত লোকই সমুদ্র ভ্রমণে গিয়া রত্নাকর গর্ভে রত্ন বিসর্জন করিয়া আসিয়াছেন। বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম প্যাক করা কৌটাটিকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম। একি এক গ্রহ জুটিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ভৃত্য একখানা পোস্ট কার্ড আনিয়া দিল। তাহাতে একটি খ্রিস্টানি নাম দেখিয়া সবিস্ময়ে নিজই উঠিয়া গেলাম। বাহিরে একটা যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন। ইনি আংটির প্রার্থী। ইনি গত বৎসর সমুদ্রতীরে একটি আংটি হারাইয়া আসিয়াছিলেন। সেইজন্য আমার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অবধি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে হয়তো এটি তাঁহারই অঙ্গুরীয়। কিন্তু ইহার কোন নিশ্চযতা না থাকায় তিনি এ পর্যন্ত ইহার জন্য দাবী করিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু আমার এই শেষ বিজ্ঞাপন—অংটির দাবি অনেকেই করিতেছেন কিন্তু তাহার একটিও বিশ্বাসযোগ্য না হওয়াতে কোন দাবি গ্রাহ্য করিতে পারি নাই, পরের জিনিস লইবার জন্য যাঁহারা নিজের বলিযা অনায়াসে হাত পাতিতে পারেন, তাঁহাদিগকে ধিক —পড়িয়া তিনি আজ এখানে আসিয়াছেন। স্বচক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন জিনিসটি তাঁহার কিনা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার আংটিব সোনাটা কিরকম ছিল বলুন দেখি?"

লোকটি আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আমাকে আংটি দেখাইতে কুণ্ঠিত বুঝিযা তাঁহার ঠোঁটের পাশে একটুখানি করুণার মৃদু হাসি প্রকাশ হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "গিনি সোনা। মশাই, আংটিটা সাহেবদিগের ওখান থেকে গড়িয়েছিলুম কিনা, তাই সোনাটা ভাল দেওয়া হয়েছিল।"

মনে একটু আশা হইল, তবু আর একটু পরীক্ষার দরকার হইল, "আর হীরা খান?"

"কমল হীরে, চমৎকার হীরে, মশাই, ফাইন কাট হীরে।—হীরেখানার আবার একটা ইতিহাস আছে। আমার মা একজন ইউরোপিয়ান লেডি ছিলেন। এ তাঁরি আংটির হীরে। মার স্মৃতিচিহ্ন। পুরান আংটিটি ভেঙ্গে যাওয়াতে এই অংটিটি নতুন গড়িয়েছিলুম। তাতেই তো এই বিপত্তিটা ঘটলো। আংটিটা একটু বড় হয়েছিল হঠাৎ খুলে জলে পড়ে যায়।"

আমার আর দ্বিধা রহিল না, আংটিটি দেখিলে বোঝা যায় তাহা তেমন পুরাতন হয় নাই। নতুনই বটে। তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিতে বাহির হইতে ভিতরে আংটি আনিতে গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আনা ঘটিল না, গৃহিণী বাক্স ও ট্রাঙ্কের চাবি আঁচলে বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তিনি যে এক প্রহর রাত্রির পূর্বে ফিরিয়া আসেন এমন কোন সম্ভাবনা কোন দিনকার দৃষ্টান্ত দ্বারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উত্যক্ত চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। উৎসুক যুবক মনমরা ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন। বলিয়া গেলেন পরদিন আসিয়া আংটি লইয়া যাইবেন।

পরদিন প্রত্যুষে লোকালি ডাকেই একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি এই—

"সবিনয় নিবেদন

এই সপ্তাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া মনে হইল বিজ্ঞাপনদাতা তাঁহার কুড়ানো আংটিটির অনেকগুলি প্রার্থী লইয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, তাই অনিচ্ছার সহিত কর্তব্যবোধে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কিরকম আপনার এ আংটি? গিনি সোনার এলবার্ট প্যাটার্নের একটা হীরার আংটি হইবে কি? হীরাখানা এক রতির উপর ওজনে এবং তাহাকে ঘুরাইয়া দেখিলে যেন একটি ছোট গোলাপ ফুলের মত দেখায়? ভিতরের পিঠে ১০২৫ এই নম্বর লেখা আছে। যদি তাই হয় তবে সে আংটিটা আমি যে অমূল্য রত্ন রত্নাকরগর্ভে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি উহা তাহার অঙ্গুরী, শেষ পর্যন্ত তার অঙ্গুলীতে এমনি একটি আংটি ছিল। বেশ মনে আছে।

আপনি দেখিতেছি ভদ্রলোক, আপনার মত লোকের অনুরোধ করিতে সংকোচ নাই। যদি আংটিটি এই রূপ হয়, তবে তাহা রামকৃষ্ণ মিশনের বেনারস সেবাশ্রমে পাঠাইয়া দিবেন। আমার নিকট আর তাহা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহা যাহার স্মৃতিচিহ্ন, সহস্র হীরকের চেয়েও তাহার স্মৃতি আমার এই চির অন্ধকারে চিত্তকে আলোকিত করিয়া আছে। ক্ষুদ্র হীরা সেখানে কি করিবে?

আশীর্বাদ করিবেন পরলোকে আবার তাহাকে দেখিতে পাই, জগতের মধ্যে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। পত্রে স্বাক্ষর ছিল না বা ঠিকানা দেওয়া ছিল না। বেশ মনে পড়ে অংটিটির নম্বর ১০২৫ই বটে। গৃহিণীকে বেড়াইতে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ দিলাম। পরদিন খ্রিস্টান যুবকটি আসিয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া গেল সীলমোহর ভাঙ্গিতে হইল না, ঠিকানা কাটিতে হইল না। অতি সহজেই আমার ঘাড়ের সেই ক্ষুদ্রাকারের বৃহৎ বোঝাটি সুচারুরূপে নামিয়া গেল।

সেই হপ্তার কাগজে বাহির হইল "আপনার আদেশমত আংটি সেবাশ্রমে প্রেরিত হইল। ঈশ্বর আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

পূজার চিঠি
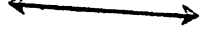
নিরুপমা দেবী

প্রিয়তমেষু,

আমরা আজ এলাহাবাদ থেকে এখানে এসেছি। সেখান থেকে বেরুবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, তোমার চিঠি পাবো এই আশা মনে ছিল। কিন্তু এইরকম করে সুদীর্ঘ পাঁচ-ছয়দিন ও রাত কেটে গেল তবু তোমার দেখা পেলাম না। রোজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আজ চিঠি নিশ্চয় পাবো' এই বুক ভরা আশা নিয়ে উঠি, কিন্তু একে একে সমস্ত ডাকের সময় চলে যায় এবং দিনের আলো নিভে এসে ধরণী ধীরে ধীরে তমসাবৃত হয়, আমার মনটাও একখানা কালো মেঘে ছেয়ে ফেলে, বুকের মধ্যে ব্যর্থ আশার একটা তীব্র বেদনা অনুভব করি এবং চোখদুটো আপনি আপনি ছল ছল করে আসে। পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে কারুর সম্মুখে মুখ তুলতে সাহস হয় না। মনটা যে কেমন হয়ে থাকে তা আমি জানাতে অক্ষম। সেটা অনুভব করবার জিনিস, বোঝাবার অযোগ্য––যেন একেবারে নির্জীব ও স্পন্দহীন। আমার সে ব্যথা তুমি কখনও বুঝতে পারবে না। যদি—

"কোনদিন একদিন আপনার মনে, শুধু
এক সন্ধ্যাবেলা
আমারে এমনি করে' ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা!"

তবে কতকটা বুঝতে পারতে এবং 'শুধু একদিন তবে আমি ধন্য হইতাম, তুমি ধন্য হতে।'

আর তুমি বোধহয় এইসময় নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজের লাইনে মনঃসংযোগ করেছো অথবা নিবিষ্টচিত্তে মনোবিজ্ঞানের জটিল প্রশ্ন ভাবতে ভাবতে পাতা পাল্টাচ্ছো। মন পদার্থটা যে কি এবং তাহার বৃত্তিগুলির অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ ও বিবরণ জানবার জন্য তোমরা যদি মাথামুণ্ডু কতকগুলি তিন-চার সের ওজনের বই না পড়ে আমাদের এই বিরহদগ্ধ ও তোমাদের কল্যাণ কামনায় চির-প্রার্থনারত মনটার দিকে একবার চেয়ে দেখো এবং উহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত হও, তবে তোমাদের যথেষ্ট শিক্ষা ও বিদ্যালাভ হয়, আমরাও বাঁচি। কি ছাই পাঁশ দু'চারখানা ছাপাব পুঁথি ঘেঁটে মরো—এতে দেখবে—'নাই সীমা আগে পাছে। যত চাও তত আছে' এবং "যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।" অযাচিত ও অমনি পাও কি না, তাই বুঝি এত অনাদর—এত উপেক্ষা! মনে আছে সেই দুজনে একসঙ্গে রবিবাবুর বিদায় অভিশাপে পড়েছিলাম 'রমণীর মন সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন।'

যাক ওসব কথা, এখানে এসে দেখি তোমার একখানা চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কোথায় এখানে এসে তোমাকে নিশ্চয় দেখবার কথা, তা নয় কি না একখানা চিঠি পাঠিয়েছো—অত্যন্ত অনুপযুক্ত প্রতিনিধি সন্দেহ নাই। অত আশা দিয়ে আমাকে এমনি করে নিরাশ করলে! এত নির্মম তুমি? তোমার চিঠিখানা দেখছি এব্যর অত্যন্ত সংক্ষেপ, কাজের কথা ছাড়া একছত্রও বেশি নাই। এরকম নিস্তব্ধতা একটা আসন্ন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। তুমি লিখেছো যে পরীক্ষা খুব কাছে। এখানে এলে পড়ার ক্ষতি হবে, তাই এবার আর এখানে আসবে না। এটি তো তোমার মনের কথা নয়। এ সত্যটি

কবে আবিষ্কার করলে?—আমার সেই চিঠিখানা পেয়েছ বুঝি? আমার অন্তরের মধ্যে থেকে একটা প্রতিধ্বনি হোচ্ছে "মিথ্যা অতি প্রকৃত মিথ্যা।" পরীক্ষার আগে তুমি অন্যান্যবার আমার কাছে আসিবার জন্য ব্যগ্রহ হয়েছো। (আমি কাল অনেকরাত পর্যন্ত তোমার সব চিঠিগুলো পড়ছিলাম। সেগুলো থেকে উদ্ধৃত করে দেবো নাকি?) এবং আমার সঙ্গে থেকে যথেষ্ট মানসিক বল লাভ করতে একথা তুমিই আমাকে বলেছো, তুমিই আমাকে শিখিয়েছো। এবং কাজেও তাই দেখিয়েছো। এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষার সময় তোমাতে-আমাতে একসঙ্গে ছিলাম, তবে সে পরীক্ষা দুটোতে অতো ভাল করে পাশ করলে কেমন করে? আজ চার বছর তুমি আমাদের সংসারে আনন্দদান করছো, এরকম অভিযোগ তুমি কখনো করোনি। আমার কাছে লুকানো বৃথা। এসব কারু মনের কথা নয়—এস এখন গোলমাল ছেড়ে দিয়ে দুজনায় আত্মপ্রকাশ করি। এখানে এবার আসবে না—কেমন? রাগ হয়েছে বুঝি? সব জানি গো জানি—আমার সেই চিঠিখানা পেয়ে আমার উপরে রাগ (অথবা কৃত্রিম) করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করছো। তোমাকে 'অবিশ্বাস'? পৃথিবীতে আমার দ্বারা আর সমস্তই সম্ভব হতে পারে শুধু ঐটে ছাড়া। এটা তুমি জানো—খুব জানো, কারণ আমার মনের ক্ষুদ্রতম অংশও তোমার কাছে অগোচর নেই। ভালবাসার অত্যুজ্জ্বল কিরণে আমার সমস্ত হৃদয় আলোকিত ও দৃপ্তিপূর্ণ করে অতি নিভৃত অংশও তন্ন তন্ন করে দেখে নিয়েছো। তোমার সম্বন্ধেও আমার জ্ঞান এর চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, বরং কিছু বেশি, বোধহয় এ গর্বটুকু কবতে পারি। আমরা পরস্পরকে এত ভালো করে জানি যে সূর্যে শৈত্য মনে করতে পারি তবু দু'জনের মধ্যে কখনো সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ছায়া আসতে পারে তা কল্পনাও করতে পারি না। তবে সেই চিঠিখানা পেয়ে দুর্জয় অভিমানের সূত্রপাত করে আমাকে ভয় দেখিয়ে আসবো না বলে শাসানো হচ্ছে কেন? আমি তোমাকে খুব চিনি গো, আমাকে আর মিথ্যি মিথ্যি ভয় দেখাতে হবে না। কেমন আসবে না—আচ্ছা দেখবো। পড়া ভাল হওয়া দূরের কথা, এখানে না এলে পড়ার সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে, আমি বুঝি আর জানিনে। এবার কিন্তু আমার রাগ করবার পালা, সে কথা মনে থাকে যেন। তুমি যতই রাগ কর না কেন তোমাকে সেই তুমি বলেই জানি! আমি বেশ জানি তুমি আমার সেই চিঠি সত্যি বলে নেওনি। কেন তোমাকে ওরকম লিখেছিলাম বিস্তারিত এখানে এলেই জানতে পারবে এবং সমস্ত শুনে তুমি খুব হাসবে। জানো? এসব সুরোদিদির কাণ্ড। কেমন? মিটমাট হলো তো?

তুমি আর একমুহূর্ত দেরী করো না। এরকম করে প্রতিদিন আশায় আশায় থাকা কি কষ্ট! তুমি কথামত ঠিক সময়ে এসোনি দেখে বাবা-মা অসুখ হয়েছে ভেবে ভারি ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাম করেছেন। আর বছর ঠিক এই সময়ে এখানে কত সুখের দিন কেটেছে, মনে করতে কষ্ট হয়। সেইসব স্মৃতি একে একে দ্রুত এসে আমাকে অস্থির করে তুলছে। সেই তোমাতে-আমাতে প্রথম একলা দুজনে বেড়াইতে যাওয়ার কথা মনে পড়ে কি? সেদিন মা কোথায় জানি গিয়াছিলেন, আর তুমি এসে অমার সাথে বেড়তে যাবার জন্য ধরে বসলে। বাপরে কি লজ্জা! হৃদয়ে তীব্র বাসনা, বাহিরে বিষম লজ্জা। কিন্তু তবু যেতে হলো। তুমি যে দুষ্টু তোমার সঙ্গে পারবে কে? তুমি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলে। প্রথম প্রথম লজ্জায় মরে যেতাম, কিন্তু তার পরে কি আশ্চর্য পরিবর্তন! দু'চারদিন যেতে না যেতেই মাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে তোমার সঙ্গে সেই আম গাছতলায় মিশতাম। একটা বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য একটা বৃহৎ আকর্ষণের প্রয়োজন। সত্যি আমি ভাবি আমার সেসব আগের লজ্জা, সঙ্কোচ কোথায় গেল! তুমিই সব গ্রাস করেছ। এখন সহস্র লোকেব মাঝখনে তোমার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছা

করে। আমরা সেদিন আর. মিত্তিরের বাগানের পাশ দিয়ে আসছিলাম। আমার কিন্তু একটুকুও ভালো লাগছিল না, শুধু তোমার সঙ্গে এই বাগানে বেড়ানোর কথা কেবলি মনে হচ্ছিল। সেই দু'জনে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফুল তোলা ও গাছতলায় বসা। তারপরে ফেরবার সময় আমার পায়ে কাঁটা ফুটলো। তুমি আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও সেখানে আমাকে বসিয়ে সেটা না তুলে দিয়ে ছাড়লে না। তুমি না থাকাতে আমি এক মুহূর্তও নিজেকে ভাল করে অনুভব করতে পারাছ না, মনে একটুও শান্তি নাই। আমাদের বেড়ানোর রাস্তাগুলিতে তোমার পদচিহ্ন যেন এখনও অঙ্কিত রয়েছে। সেইগাছ, সেই বাতাস, সেই আকাশ সব সমস্বরে তোমার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এবার আর চিঠির তলায় শুধু নামটুকু পাঠালে হচ্ছে না, একেবারে সশরীরে উপস্থিত হওয়া চাই। আসবার সময় একটা জিনিস আনবে। এলাহাবাদ থেকে আসতে গাড়িতে একটি মেয়েব সঙ্গে আলাপ হয়। তার নাম রেবা। দেখতে খুব সুন্দরী আর খুব লক্ষ্মী। আমাদেরই বয়সী। তার স্বামী এবার ডাক্তারী পাশ দিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল যে সে বৈদ্যনাথে নামবার সময আমাকে একশিশি 'কুন্তলীন', খান কয়েক সাবান এবং আরও দু'একটা জিনিস দিল। তারা এ সপ্তাহ পরে এখানে আসবে। তাকে আমি পূজোর উপহার কিছু দিতে ইচ্ছে করি সুতরাং একটা 'দেলখোস', একখানা " 'নৌকাডুবি' এবং তোমার পছন্দমত মেয়েদের দেবার উপযোগী কিছু জিনিস আনবে। চিঠিখানা খুব বড় হয়ে পড়লো (আমাদের প্রথম মিলনের পরের চিঠিগুলোর চেয়ে ঢের ছোট নয় কি?) যষ্ঠী পূজোর আগে অর্থাৎ বুধবারের দিন আসতে হবে কিন্তু নিশ্চয। তা না হলে বুঝতেই পারছো, ভয়ঙ্কর রাগ—ঘোরতর অভিমান—অশ্রুজলের প্রবল বন্যা। আমাদের এই সময়ের কথা কার্যে যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন, বস্তুত আমার কাছে ইহাই সুখের বলে মনে হয়। দূর থেকে এই বকম একটা আকাঙক্ষা নিয়ে আশায় আশায় থাকা। আজ আসবে, কাল আসবে. এলে তোমাকে নিয়ে কত কি করবো, ভবিষ্যৎ সুখের একটা জাল বুনে এই বকম একটা প্রাণের রুদ্ধ আবেগ নিয়ে থাকা, কতো মধুর। মিলনেব দিনগুলো কত শীঘ্র কেটে গিয়ে আবার বিবহের ব্যথা এনে দেয়। আমি এই বসে কত দূর থেকে তোমাকে চিঠি লিখছি, কিন্তু তোমার উপস্থিতি ও স্নেহস্পর্শ অনুভব করছি। তুমি মেন্‌ট্যাল টেলিপ্যাথি (mental telepathy) বিশ্বাস কব না? আশ্চর্য! কেন আব বছর তুমি যখন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলে, আমি ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন কবে জানতে পেরেছিলাম?

আগের চিঠিতে আমার জন্যে কি আনবে জানতে চেয়েছিলে। ওসব আমি কিছু জানিনে। শুধু তুমি—তুমি আসবে। ইংরাজী পড়ার বইখানা আমার ছোটভাই ছিঁড়ে ফেলেছে একখানা আনবে। এখানে সব ভাল। আশাকরি তুমি ভাল আছ। আমার প্রণাম ও ভালবাসা নিও এবং আরও কিছু। আমি এই বত্রিশ ঘণ্টার প্রত্যেক সেকেণ্ড গুণছি মনে থাকে যেন।

অবগুণ্ঠনবতী

উর্মিলা গুপ্তা

১৩০০ সালের প্রারম্ভে আমি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হই এবং মুম্বাই শহরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করি। তাহার পর বৎসর, বর্ষাকালে এক দিবস সন্ধ্যার সময় আমার জানালার নিকট বসিয়া, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিলাম। প্রায় দেড় বৎসর ডাক্তারী পাশ করিয়াছি, কিন্তু এখন পর্যন্তও তেমন পসার করিতে পারি নাই। শারদীয়া পূজার আর বিলম্ব নাই। শীঘ্রই কিছু দিবসের জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব। পিতা, মাতা ও ভগ্নিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একখানি সুন্দর মুখ মনে পড়িয়া হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সেই সুন্দর সরল মুখখানিব অধিকারিণী, আমার বাল্যসঙ্গিনী ও ভাবী পত্নী মুক্তাবাই, ব্যবসায়ে পসার করিতে পারিলেই মুক্তাবাই আমার ক্ষুদ্র গৃহ আলোকিত করিতে আসিবে। মুক্তার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে আমার নিদ্রাকর্ষণ হল; আমি চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ আমার স্কন্ধদেশে কে হস্তার্পণ করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখি, আমার গুজরাটি বালকভৃত্যটি আমায় জাগরিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার দিকে দৃষ্টি করিতেই সে বলিল, "একটি স্ত্রীলোক হুজুর।" একটি স্ত্রীলোক! আমি তাহকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটি স্ত্রীলোক? কে? কোথায়?"

সে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক আমার কনসল্টিং রুম দেখাইয়া দিল। আমার এই ক্ষুদ্র গৃহেও একটি কনসল্টিং রুম ছিল। যদিও তাহাতে প্রবেশ করিবার বিশেষ আবশ্যক আমার প্রায়ই হইত না। আমি বালকের নির্দেশ মত সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত একটি রমণী মূর্তি, দ্বারের দিকে মুখ করিয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখমণ্ডল দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত। আমি প্রবেশ করিয়া অনুভব করিলাম, তাহার চক্ষু দু'টি আমারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমি প্রবেশ করিয়া, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও সে আমার সহিত কোন বাক্যালাপ করিল না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমার পরামর্শ চান?" রমণী মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আমি তাহাকে একটি চেয়ার দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি এইখানে বসুন।" রমণী একপদ অগ্রসর হইল, কিন্তু আমার বালক ভৃত্যটির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি আমার ভৃত্যকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম।

সে চলিয়া গেলে রমণী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, আমার প্রদত্ত চেয়ারে উপবেশন করিল। দেখিলাম তাহার পরিধেয় বসন বৃষ্টিজলে আর্দ্র ও কর্দমাক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আসিতে আসিতে বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন?"

"হ্যাঁ মহাশয়"—রমণীর কণ্ঠস্বর বেদনাযুক্ত।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি পীড়িত?"

"হাঁ মহাশয়"—রমণী বলিতে লাগিলেন, "আমি পীড়িত, কিন্তু আমার পীড়া শারীরিক নয়,

মানসিক! আমি, আমার নিজের কোন ব্যবস্থার জন্য আপনার নিকট আসি নাই। আমার নিজের কোন শারীরিক পীড়া হইলে, এত রাত্রিতে এই ঝড় বৃষ্টিতে আপনার নিকট আসিতাম না। বাস্তবিক যদি আমার কোন সঙ্কটজনক পীড়া হইত, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম। মহাশয়, আমি অন্য একজনের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। দিবারাত্রি আমার অন্য কোন চিন্তা নাই। কোনও রকম সাহায্য ব্যতীত কি করিয়া তাহাকে বিদায় দিব?"

রমণী দুই হস্তে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার এইরূপ বিচলিত অবস্থা দেখিয়া আমি তাহকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম।

"আপনার কথাতে মনে হইতেছে, আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয়। আপনি কি ইহার পূর্বে, আর কোনও ডাক্তার দেখান নাই?"

"না মহাশয়! ডাক্তার দেখাইয়া কোন ফল হইত না, এখনও হইবে না।"

আমি আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের জন্য কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমি এক গ্লাস জল তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, "আপনি অসুস্থ। এই শীতল জল পান করিয়া একটু বিশ্রাম করুন। তারপর রোগীর অবস্থা আনুপূর্বিক আমায় বলিলে, আমি আপনার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইব।"

রমণী জলের গ্লাস মুখের কাছে তুলিল, কিন্তু তখনই আবার তাহা নামাইয়া রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে রমণী বলিতে লাগিল, "আমি জানি আমার কথা শুনিয়া, আমায় পাগল ভিন্ন আর কিছুই মনে করিবেন না। অনেকেই এরূপ মনে করিয়াছে ও বলিয়াছে। আমি অল্পবয়স্ক নহি! লোকে বলে মৃত্যু যতই ঘনাইয়া আসে, জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকু, তাহার সহিত অনেক দুঃখস্মৃতি বিজড়িত থাকিলেও মানুষের নিকট ততই প্রিয়তর হয়। আমার জীবনের সীমা বেশি দূর নয়। আমারও তাহাই হওয়া উচিত। কিন্তু ভগাবন জানেন, মৃত্যু এখন আমার নিকট কত স্বাগত। আজ যাহার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, কাল সে মনুষ্যের ক্ষমতার বহির্ভূত হইবে। কিন্তু তবু আমি আপনাকে আজ তাহার নিকট লইয়া যাইতে পারিতেছি।

আমি বিস্মিত হইলাম! রমণী কি সত্যই উন্মাদ? কিন্তু উন্মত্ততার কোনই লক্ষণ দেখিলাম না। ধীরে ধীরে বলিলাম, "আপনি যাহা গোপন করিতে চাহিতেছেন, সে সম্বন্ধে অনুচিত প্রশ্ন করিয়া, আপনার যাতনা বৃদ্ধি করিতে চাই না। কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইতেছি। আপনি যে ব্যক্তির কথা বলিতেছেন, সে মৃত্যুশয্যায় শয়ান। হয়তো আজ চেষ্টা করিলে কিছু করিতে পারিব। কিন্তু আজ তাহাকে দেখিতে পাইব না। কাল—আপনি নিজেই বলিতেছেন সে মনুষ্যের সাহায্য ও ক্ষমতার অতীত হইবে; অথচ কাল আমায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। যদি সে বাস্তবিক আপনার কোন প্রিয় ব্যক্তি হয়, তবে আজই তাহার সাহায্যের চেষ্টা করিতেছেন না কেন?"

"ভগবান আমায় জল দাও!" রমণী কাতর স্বরে বলিলেন, "যে কথা নিজেই এক এক সময় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, সে কথা আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলিব কি করিয়া?"

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে আপনি কাল তাহাকে দেখিতে যাইবেন না?" "আমি যাইব না একথা বলি নাই। কিন্তু আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি যে, এরূপ অদ্ভুত বিলম্ব করিতে জেদ করিলে, এ ভয়ানক ঝুঁকি আপনাকেই বহন করিতে হইবে।"

রমণী দৃঢ়স্বরে বলিল, "ঝুঁকি কাহাকেও বহন করিতে হইবেই। যেটুকু আমার উপর পড়িবে, সেটুকু বহন করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

"আপনার ইচ্ছামত কার্য করিতে আমি বাধ্য হইতেছি। আমি স্বীকার করিলাম, কল্য রোগী দেখিতে যাইব। আপনার ঠিকানা বলিয়া যান। আর কাল কখন গেলে সুবিধা হইবে?"

রমণী উত্তর করিল "নয়টা"।

"আমি বলিলাম, একটা প্রশ্ন করিতেছি, ক্ষমা করিবেন সেই ব্যক্তি কি এক্ষণে আপনার তত্ত্বাবধানে আছে?"

"না মহাশয়।"

"আমি তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা করিলে আপনি আজ রাত্রে তাহার সাহায্য করিতে পারেন না?" রমণী আকুল স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কিছু মাত্র না।"

আমি তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করা বৃথা মনে করিলাম। তাহার ব্যাকুলতা সে কতক পরিমাণে দমন করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহার ক্রন্দন আমার মর্ম স্পর্শ করিল। আমি প্রভাতে যাইব অঙ্গীকার করিয়া, তাহাকে বিদায় দিলাম।

সে চলিয়া গেলে বসিয়া বসিয়া তাহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই অদ্ভুত অভ্যাগমন সম্বন্ধে কি করিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার শুনিয়াছিলাম কোন ব্যক্তির বিশ্বাস হইয়াছিল, কোন নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে তাহার মৃত্যু হইবে ইহাও সেইরূপ কিছু নয় তো? আবার মনে হইল, ইহার ভিতর কোন হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র নাই তো? হয় তো এই রমণী, প্রথমে তাহাতে লিপ্ত থাকিতে সম্মত হইয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছে। এবং সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। কিন্তু শহরের এত নিকটে এরূপ হত্যাকাণ্ড সম্ভব নয় মনে হইল। তখন মনে মনে স্থির করিলাম, রমণী নিশ্চয়ই উন্মাদ!

পরদিন প্রভাতে রমণীর গৃহে যাইবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। রমণী যে স্থানের কথা বলিয়াছিল, তাহা শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। আমি শহরের বড় রাস্তা ছাড়িয়া, অপেক্ষাকৃত অপরিসর রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে ২/১টি গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। ২/৩টি বৃষ্টিজলে পূর্ণ বাঁধ ও তৎপার্শ্বে ২/১টি বৃক্ষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানটি প্রায় জনশূন্য। কয়েকখানি কুটীর ও ৩/৪ খানি ইষ্টকনির্মিত গৃহমাত্র আছে। স্থানটি বড় জঘন্য। স্থানবাসী সকলেই প্রায় দরিদ্র ও অধিকাংশই অত্যন্ত সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক। স্থানটির নির্জনতা যেন স্থানবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল। স্থানে স্থানে দেখিলাম কিছু জমি লইয়া উদ্যান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্রতাবশতই হউক, আর যাহার জন্যই হউক কেহই কৃতকার্য হয় নাই। একটি কুটীরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম এক বর্ষীয়সী রমণী একটি ছোট বাঁধের নিকট বসিয়া বাসন মাজিতেছে ও মধ্যে মধ্যে একটি ছোট বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া গালি দিতেছে।

এইরূপে কর্দম ও আবর্জনার মধ্য দিয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একটি গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পথে এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করাতে সে একটি গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি ইষ্টনির্মিত। দ্বিতল, কিন্তু অনুচ্চ। অন্যান্য গৃহ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম সম্মুখের দ্বার ও সমস্ত জানালা রুদ্ধ। আমি দ্বারে আঘাত করিলাম। ভিতর হইতে মৃদু কথোপকথনের শব্দ শুনিলাম, এবং পরক্ষণে দ্বার ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। দেখিলাম সম্মুখে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ। তাহার মুখমণ্ডল কৃশ ও ম্লান। সে মৃদু স্বরে বলিল, "ভিতরে আসুন"।

আমি প্রবেশ করিলে, সে দ্বার পুনরায় রুদ্ধ করিয়া, আমাকে একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে লইয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি সময়মত আসিয়াছি তো?"—

"আপনি নিরূপিত সময়ের পূর্বেই আসিয়াছেন।"

"আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিল, "আপনি এই গৃহে অপেক্ষা করুন। আপনার বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

আমি গৃহে প্রবেশ করিলে, সেই ব্যক্তি দ্বার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

গৃহটি ক্ষুদ্র। একটি টেবিলেও ২/৩ খানা ভগ্নপ্রায় চেয়ার ছাড়া আর কিছু নাই। গৃহে জানালা আছে, তাহা দিয়া একখণ্ড জমি দেখা যাইতেছে; কিন্তু তাহা বৃষ্টিজলে পূর্ণ। চারিদিক নিস্তব্ধ! আমি প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল এই গৃহে বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ একখানা গাড়ির শব্দ হইল। সেখানা গৃহের দ্বারদেশে থামিল। দ্বার মোচন ও তৎসঙ্গে মৃদু কথোপকথনের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তৎপরে একটু গোলমাল ও ৪/৫ জন লোক মিলিয়া একটা ভারী দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত শব্দ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পর, সিঁড়িতে পুনরায় পদশব্দ ও দ্বার মোচনের শব্দ পাইয়া বুঝিলাম যাহারা আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া গেল। দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল ও পরক্ষণে চারিদিক পূর্ববৎ নিস্তব্ধ হইল।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও কেহ আসিল না দেখিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিব মনে করিতেছি, এমন সময় গৃহের দ্বার মুক্ত হইল। দেখিলাম, পূর্বরাত্রের অবগুণ্ঠনবতী হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমায় ডাকিতেছে। রমণীর সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হইতেছে। সে ক্রন্দন করিতেছে।

রমণী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। সম্মুখেই একটি গৃহ। রমণী তাহার দ্বারদেশে থমকিয়া দাঁড়াইয়া, আমায় ইঙ্গিত করিয়া প্রবেশ করিতে বলিল। গৃহে ২/১টি বাক্স ও একখানা তক্তপোষ ভিন্ন আর কোনই আসবাব নাই। জানালা রুদ্ধ, কিন্তু তাহার ২/১টি পাতি ভগ্ন থাকাতে, গৃহে অল্প অল্প আলো প্রবেশ করিতেছিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অল্প আলোকের জন্য কিছু দেখিতে পাইলাম না, ইতস্তত করিতে লাগিলাম। রমণী আমার পাশ কাটাইয়া দৌড়িয়া তক্তপোষের উপর আছড়াইয়া পড়িল।

তখন দেখিলাম, শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি মনুষ্যমূর্তি সেই তক্তপোষের উপর শয়ান। তাহার অনাবৃত শির এবং বদনমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলাম সে পুরুষ। তাহার চিবুক হইতে মাথার উপরিভাগ পর্যন্ত একটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চক্ষু দু'টি মুদ্রিত ও নিস্পন্দ। হস্তদু'টি রমণীর হস্ত মধ্যে স্থিত।

আমি ধীরে ধীরে রমণীকে সরাইয়া দিয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার হস্ত গ্রহণ করিলাম। করিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "কি সর্বনাশ! এ তো মৃত!"

রমণী চমকিয়া উঠিল, তারপর করজোড়ে বলিতে লাগিল, "ও কথা বলিবেন না। ভগবানের দোহাই, ওরূপ নিষ্ঠুর আমায় বলিবেন না। আমি সহ্য করিতে পারিব না। চিকিৎসকেরা কত অসাধ্য সাধন করে! আপনি কি ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন না? দোহাই আপনার—একটু চেষ্টা করুন" বলিতে বলিতে রমণী মৃতের কপালে ও বক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে মৃতের হস্তক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "বৃথা চেষ্টা!" বলিয়াই সর্প ন্যায় চমকিয়া বলিলাম, "জানালাটা খুলিয়া দিন।"

রমণী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না—না"।

আমি দৃঢ়স্বরে পুনরায় বলিলাম, "জানালাটা খুলিয়া দিন", বলিয়া তাহার অপেক্ষা না করিয়াই, জানালার দিকে অগ্রসর হইলাম। রমণী দৌড়াইয়া আসিয়া আমার পথরোধ করিল। বলিল—

"আমি ইচ্ছা করিয়া জানালা বন্ধ করিয়াছি। আপনি যখন তাহাকে বাঁচাইতেই পারিবেন না তখন দেখিয়া কি করিবেন?"

রমণীর ঈদৃশ ব্যস্তভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। "এ ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, আমি ইহা৺ মৃতদেহ দেখিতে চাই", বলিয়া জানালা খুলিয়া ফেলিলাম। ফিরিয়া দেখিলাম. রমণীর অবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়া গিয়াছে—তার জ্ঞান নাই । তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ হইবে। সৌন্দর্যের রেখা অদ্যাপি বিদ্যমান। দুঃখে, কষ্টে ও ক্রন্দনে, মুখমণ্ডল ম্লান ও বিবর্ণ হইয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছে ও দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু উথলিয়া পড়িতেছে।

আমি তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলাম, "আমি অত্যাচারের চিহ্ন দেখিতেছি।"

রমণী স্থির কণ্ঠে বলিল, "ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছে।"

আমি পুনরায় বলিলাম, "এই যুবককে হত্যা করা হইয়াছে।"

রমণী আবেগভরে বলিল,"আমিও ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি ইহাকে অত্যন্ত নির্দয়রূপে হত্যা করা হইয়াছে।"

আমি তাহার বাহুতে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে হত্যা করিয়াছে?"

রমণী বলিল, "দেহ ভালরূপ দেখিয়া প্রশ্ন করুন।"

আমি মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম, তাহার কণ্ঠদেশ স্ফীত ও তাহা বেষ্টন করিয়া একটি চিহ্ন। আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। আমি শিহরিয়া ফিরিয়া বলিলাম, "আজ প্রভাতে যে কয়জন হতভাগ্যকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে, এ ব্যক্তি তাহারই একজন!"

রমণী আমার প্রতি অর্থহীন দৃষ্টি করিয়া বলিল, "হাঁ!"

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কে?"

রমণী অস্ফুট স্বরে 'আমার পুত্র' বলিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃতের পদতলে পড়িয়া গেল। আমি সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হতভাগ্য বিধবা মাতার একমাত্র অবলম্বন। মাতা বহু কষ্টে ও অনশনে পুত্রকে পালন করিয়াছে, কিন্তু পুত্র মাতার ক্রন্দন ও প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া অসৎ সঙ্গে মিশিয়াছে। এবং অবশেষে নিজের মৃত্যু ও মাতার উন্মত্ততার কারণ হইয়াছে।

সময়ের সঙ্গে আমার অবস্থা ফিরিল। মুক্তাবাই আমার গৃহ আলোকিত করিল। আমি মনোমত ভার্যা ও পুত্রকন্যা লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে ভুলিতে পারি নাই।

শরণাগত

পূর্ণশশী দেবী

জায়গাটা গ্রাম তো নয়ই—গণ্ডগ্রাম বলাও চলে না।

চা বাগানের কাছাকাছি, গাছপালা, লতাগুল্মে ঢাকা প্রশস্ত এক সমতল শ্যামল ভূমি। তার দূরে দূরে এখানে-সেখনে দশ-পনেরো ঘর বসতি। অধিকাংশই কৃষিজীবীদের পর্ণ কুটীর। দু'তিনখানা বাড়ি ওর মধ্যে একটু বড় ও শ্রীসম্পন্ন দেখা যায়।

নেপালী গুর্খা ছোট্টুর মা'র বাড়িখানাও প্রায় এই শ্রেণীর, তবে বসতির একেবারে শেষ সীমানায় এবং অত্যন্ত নির্জন ও বনাকীর্ণ। খুব কাছে না গেলে সে গৃহের অস্তিত্বই জানা যায় না। সেখানে গাছে গাছে, শাখা-প্রশাখায় অবাধ মেশামিশি, লতায় লতায় আচ্ছন্ন, এমন নিবিড় ছায়াময় যে, গোধূলির রক্তরাগটুকু নিঃশেষ না হতেই যেন ঘনিয়ে আসে রাতেব আঁধার। কাজেই সন্ধ্যার পর সে পথে চলতে সাধারণ লোকে ভয় পায়। কিন্তু ছোট্টুর মা'র কী সাহস! সেই জনশূন্য, বনাকীর্ণ স্থানে নির্ভয়ে বাস করে সে বুড়ি।

কার্যানুরোধে ছোট্টুকে প্রায় সারাদিনই বাইরে কাটাতে হয়, সন্ধ্যার আগে সে কোনোদিন ফিরতে পাবে না। ঘরে দোসর কেউ নেই, কিন্তু বুড়ির মনে ভয়ডর ছিল না কিছু। মৃত স্বামীব পরিত্যক্ত বন্দুক ও তীক্ষ্ণধাব 'কুকরী'র সহায়তায় সাবা যৌবনকাল নিঃশঙ্কে, নিরাপদে সে কাটিয়ে দিয়েছে এই বনের মধ্যেই—কেউ 'টুঁ' করতে সাহস পায়নি। এখন তো ছোট্টু বড় হয়ে গেছে—আর ভয কিসের?

তাছাড়া ছোট্টুর মা'র সদ্ব্যবহারে পাড়ার ছোট-বড় সকলেই তাকে ভালবাসে ও সমীহ করে চলে। আপদে-বিপদে না বলতেই ছুটে আসে সব, সুতরাং আশঙ্কাব কাবণও ছিল না কিছু।

বিধবা হয়ে পর্যন্ত সে ছেলেকে নিয়ে তার মৃত জ্যাঠার এই বাড়িতে বসবাস করছে, ছোট্টু তখন কতটুকু! মুখে বুলিও ফোটেনি। নিঃসন্তান জ্যাঠা কিছু জমি-জমাৎ বেখে গিয়েছিলেন, তাতেই চাষ করে, মেহনৎ-মজুরী করে কত কষ্টে ছেলেটিকে মানুষ করেছে ছোট্টুব মা। তাব কষ্ট ও শ্রম ব্যর্থ হয়নি, এখন গ্রামের মধ্যে ছোট্টু একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। নির্ভীক বলিষ্ঠ যুবক---সাহসে, শক্তিতে সহজে কেউ আঁটতে পারে না তাকে। সে তার পিতার মত 'টিরি' রাজসবকাবে সৈনিক বিভাগে ভর্তি হতে চেয়েছিল কিন্তু মা যেতে দেয়নি। স্বামীর অকাল মৃত্যুর কথা স্মরণ কবে বিস্তর কান্নাকাটি করে পুত্রকে নিরস্ত্র করেছিল। ছোট্টু মায়ের খুব বাধ্য, বড হয়ে পর্যন্ত সে মা'কে আর শ্রমসাধ্য কাজ করতে দেয় না, সমস্ত নিজে করে। ছোট্টুর মা'র দিন এখন সুখেই কাটে বেশ।

কার্তিকের শেষ। হেমন্ত সন্ধ্যার তরল কুয়াশা পার্বত্য প্রদেশের প্রচণ্ড শীতে ক্রমশ জমাট বেঁধে উঠছে যেন।

ছোট্টুদের বাড়িতে যাবার তরুলতা, ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা সরু 'পাকডাণ্ডী' (পায়ে হাঁটা পথ) পথখানি এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই অন্ধকার জনহীন পথে, শুকনো ঘাস-পাতায় মৃদু মর্মর ধ্বনি জাগিয়ে কে একজন লোক, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল ছোট্টুদের বাড়ির দিকে। সরীসৃপের মত মৃদু, লঘু, সতর্ক গতি তার, ব্যাধভয়ে ভীত মৃগের মত চকিত, সন্ত্রস্ত ভাব।

লোকটা চলতে চলতে দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল, কি ভেবে কি জানি। ছোট্রুর আগমন প্রতীক্ষায় দরজা বন্ধ করা হয়নি তখনো, ভেজানো ছিল। কপাটের ফাঁকে কান পেতে কি যেন শুনল সে, তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে কপাটে খিল এঁটে দিল নিঃশব্দে।

আঙ্গিনা নির্জন অন্ধকার। কিন্তু রান্নাঘরে প্রচুর আলো। উনানে আগুন জ্বলছে। কাঠের 'ডেলকো'র ওপর জ্বলন্ত 'কুপী' রেখে ছোট্রুর মা রান্না করছিল। সেই আলো আর জ্বলন্ত অনলের তীব্র ছটা তার গৌরবর্ণ মুখখানি প্রদীপ্ত করে তুলেছে। বয়সকালে ছোট্রুর মা খাসা সুন্দরী ছিল। বিধবা হবার পর কত সম্পন্ন গুর্খা বিয়ে করতে চেয়েছিল তাকে, কিন্তু শিশুপুত্র ছোট্রুকে বুকে চেপে এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছিল সে। চোট্রু বেঁচে থাক—কি দরকার আর ও ঝঞ্ঝাটে ? ছোট্রুই যে তার সব, ওকে নিয়েই. ।

অন্যদিন এর আগেই রান্না সারা হয়ে যায়। কিন্তু আজকের রন্ধনে একটু বিশেষত্ব ছিল। নিত্যকার শাকসব্জী, ডালের পরিবর্তে হরিণের মাংস, 'মক্কা' বা 'জুনুবী'র রুটির বদলে গমের আটার ঘিয়ের জবজবে 'পরোটা'। অধিকন্তু কাঁচা ধনেপাতা, লঙ্কা ও আমসী সহযোগে রসনার তৃপ্তিকর ঝাল 'চাটনী' সুতরাং রন্ধনকারিণীর মুখও হর্ষোৎফুল্ল। আজ তাদের এই আযোজন দেখে ছোট্রু কতই না খুশী হবে। মায়ের হাতের রান্না 'মাংস' ও 'পরোটা' সে যে বড্ড ভালবাসে। ছেলে কি খেতে ভালবাসে না বাসে, তা মায়ের মত আর বুঝবে কে? মা ছাড়া এত যত্ন আত্তি করে খাওযাবেই বা কে? কিন্তু বুড়ির মা আর ক'দিন? এর পরে .

মাংস ভাজতে ভাজতে বুড়ি মনে মনে কত কল্পনা-জল্পনা করছিল। এইবার একটি বউ ঘরে না আনলে আর চলে না। এইবেলা শিখিয়ে পড়িয়ে ছোট্রুর মনের মত করে তুলতে হবে তো? নইলে ছেলের কষ্ট হবে যে। ঈশ্বরেচ্ছায় সুবিধাও হয়েছে, কৃপাণ সিংযের মেয়েটি বেশ ডাগর— দেখতে-শুনতে ভাল, কাজকর্মও জানে সব। একটা শুভদিন ঠিক করে মেয়েটিকে ঘরে তুলতে পারলেই ব্যস। নিশ্চিন্দি। কার্তিকের শেষ ক'টা দিন ভালয় ভালয় কাটলে—বাঁচা যায় যেন।

দুয়ারের দিকে খুশ খুশ করে শব্দ হল কিসের—

কে? ছোট্রু নাকি? কিন্তু অত আস্তে তো সে চলে না কখনো। তার ভারী বুট পরা দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ দূর থেকেই শোনা যায় যে। তবে সময়ও হয়েছে, তার বাড়ি ফেরবার।

মাংসের হাঁড়ীতে জল ঢালতে ঢালতে ছোট্রুর মা ডাক দিল—কে রে? ছোট্রু এলি নাকি?

সাড়া নেই। নিঃশব্দে এগিয়ে এলো সেই লোকটা । রান্নাঘরের দুয়ারে, আলো-আঁধারের মধ্যে দীর্ঘ ছায়া ফেলে থমকে দাঁড়াল সে।

সংশয়-চকিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে চাপা গলায় সে বললে, ছোট্রু নয় মা—আমি।

—কে সুজন? ওমা। তা ওখানে কেন? ভেতরে এসে বোস না—ছোট্রু এই এলো বলে।

সুজন সিং ছোট্রুর বাল্যবন্ধু এবং সমবয়স্ক। এই রান্নাঘরে বসে ছোট্রুর সাথে আমোদ করে সে খেয়ে গেছে যে কতদিন। কিন্তু আজ পা কাঁপছিল, গা কাঁপছিল তার ভেতরে আসতে। উজ্জ্বল দীপালোকে ছোট্রুর মা দেখতে পেলে—সুজনের মুখে-চোখে কি শঙ্কিত, ত্রস্ত ভয। বেশভূষা তার বিশৃঙ্খল। পায়ে জুতো নেই, মাথায় সে বাঁকা টুপী নেই, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। পরনের হাফপ্যান্ট ও কোট ছিঁড়েও গিয়েছে কয়েক জায়গায়—খোঁচা লেগে বোধ হয়।

একজন গরীব গুর্খা হলেও এ ছোকরাটি বেশ সৌখীন গোছ, অর্থাৎ সর্বদাই ফিটফাট থাকতে

ভালবাসে। সময় সময় দু'বেলা পেট পুরে খাওয়ার অভাব ঘটলেও তার সাজ-সজ্জার ত্রুটি দেখা যায় না—কখনো। তাই আজ আশ্চর্য হয়ে সুজনের পানে তাকিয়ে ছোট্টুর মা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল—

—কি হয়েছে রে সুজন? অমন করে চুপি চুপি চোরের মত—

—চুপ।

সুজন ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে বলে উঠল—

—চুপ।—আস্তে। ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছি মা।

—কি? কি হয়েছে—বল না বাপু?

বুড়ির এই ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে সুজন সভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শুধু বললে—

—ছোট্টু কতক্ষণে আসবে?

—আসার সময় হয়েছে তার—হ্যাঁরে, বল না— তোর কি বিপদ—

—সর্বনাশ হয়েছে আমার—কি আর বলব মা?—আমি—

সুজনের ছোট ছোট চোখ দুটো আতঙ্কে যেন বুজে এলো। আপন-আপনি শিউরে উঠে এস্তকণ্ঠে ফিস ফিস করে সে বললে—

—ভীষণ কাণ্ড। এই খানিক আগে—খরগোশ শিকার করতে গিয়ে আমি—বোধহয়—খুন—

—অ্যাঁ—সর্বনাশ। বলিস কি সুজন। কেমন করে—কাকে খুন—

—চুপ। আস্তে মা, আস্তে। অন্ধকারে দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারিনি—তবে সে যে মানুষ তাতে ভুল নেই কিছু. . কাৎরানির শব্দ স্পষ্ট ...আঃ। কেন যে মরতে আজ...

সুজনের এই এলোমেলো কথাগুলো শেষ হবার আগেই যে পথে সে এসেছিল সেই পথে পদশব্দ শোনা গেল, একজনের নয়, অনেকের। সুজন তখন হঠাৎ—

—বাঁচাও মা। আমাকে বাঁচাও। ছোট্টু আমাকে নিজের ভাইয়ের মত... ওই—ওরা এসে পড়ল বুঝি।—এখুনি ধরে ফেলবে—পায়ে পড়ি মা। রক্ষে কর এ বিপদে—

বলতে বলতে—কাঁপতে কাঁপতে মা'র পা দু'খামা জড়িয়ে ধরল সুজন।

কি বিষম সমস্যা। সুজন খুনী। খুনী আসামীকে লুকিয়ে রাখা যে কত বড় অপরাধ, বুড়ি তা জানত, কিন্তু এই সুজন যে তার ছোট্টুর একান্ত প্রিয় বন্ধু! দু'জনে কত ভালবাসা—ছোটবেলা থেকেই....সে আজ 'শরণাগত'... অন্তত ছোট্টু না আসা পর্যন্ত ওকে লুকিয়ে রাখা—

পদশব্দ এগিয়ে আসে ক্রমশ। রান্নাঘরের সঙ্গে আর একটা ছোট কুঠুরী ছিল, বাইরে থেকে একেবারে বন্ধ, কোথাও একটু ফোঁকরও নেই যাতে আলো বা বাতাস আসতে পারে। কেবল রান্নাঘরের ভেতর দিকে ছোট্ট একটুখানি দরজা। এই কুঠুরীতে ছোট্টুদের সম্বৎসরের শস্য সঞ্চিত থাকে।

বাহিরের কপাটে করাঘাত হল। ছোট্টুর মা শশব্যস্তে থরথর কম্পমান সুজনকে একরকম টেনে এনে, সেই কুঠুরীর মধ্যে ঠেলে দিলে। বাইরে থেকে ডাক এলো—খুলে দাও।

ছোট্টুর মা দোর খুলতেই গাঁয়ের একজন প্রবীণ মাতব্বর ব্যক্তি এগিয়ে এলো, তার নাম বাহাদুর সিং। ছোট্টুর মা তাকে ভাল করেই চেনে, তাকে 'ভাইয়া' বলে। বৃদ্ধকে বড়ই শান্ত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল, পাঁচিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে সনিঃশ্বাসে বললে—

—ওঃ! কি ভীষণ কাণ্ডই হয়ে গেল ছোট্টুর মা। একেই বলে নিয়তি!—আমি যে কেমন করে, কোন মুখে তোমায় বলব....

ইতস্তত করবার সময় ছিল না। নিরুপায় বৃদ্ধ ছোট্টুর ব্যাকুলা জননীর বুকে বিনামেঘে প্রচণ্ড অশনিপাত করেই জড়িত কণ্ঠে বললে—

—তোমার ছোট্টুকে কে যেন গুলী করেছে বহিন।

—অ্যাঁ। গুলী করেছে?—হতভাগা।—শেষে আমার ছোট্টুকেই... কই? কোথায় সে? আমার ছোট্টু—সেকি বেঁচে... আমাকে নিয়ে চলো তার কাছে ভাইয়া।

ছোট্টুর মা ছুটে বেরিয়ে যায়, তাকে বাধা দিয়ে বাহাদুর বাইরে যারা অপেক্ষা করছিল তাদের ভেতরে আসতে বলল।

হতভাগ্য সুজন আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিল—ব্যাপার কি?—কিন্তু কিছু দেখা যায় না।

ধীরে ধীরে চারজন লোক একখানা খাটিয়ায় বহন করে নিয়ে এলো এক বস্ত্রাচ্ছাদিত মৃতদেহ। সঙ্গে চৌকীদার রামস্বরূপ, তার এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে সুজনের পরিত্যক্ত জুতো ও বন্দুক।

খাটিয়াখানা আঙিনার মাঝখানে নামিয়ে রেখে শব-বাহকেরা চলে গেল। মৃতের মুখে আচ্ছাদন ছিল না, সে মুখে দৃষ্টি পড়তেই ছোট্টুর মা আর্তনাদ করে উঠল।

ছোট্টু। ছোট্টুরে।—বেটা আবার।

অধীরা জননীর সেই বুক ফাটা ব্যাকুল আহ্বান চির নিদ্রায় নিদ্রিত ছোট্টুর কানে গেল না, কিন্তু আর এক জীবন্মৃত প্রাণীর মর্ম ভেদ করে তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলার মত সজোরে বিঁধে গেল যেন।

একটা অস্ফুট আর্তধ্বনি সুজনের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল অতর্কিতে। সে শব্দ কেউ শুনতে পেলো না, সকলেই ছোট্টুর মাকে সামলাতে ব্যস্ত তখন।

বন্দুকের গুলী ছোট্টুর বক্ষঃপিঞ্জর ভেদ করেছিল, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে তখনো—ধারায় ধারায়। সেই রক্তাক্ত, স্পন্দনহীন বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে ডাকছে হতভাগিনী মা—

—বেটা আমাব। হীবা আমাব। লাল আমার।

উঃ! কী ভয়ানক মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য!

পাশে দাঁড়িয়ে বাহাদুর ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলে সবিষাদে বললে, তোর 'লাল' কি আর আছে রে বহিন? বাছাকে এক গুলিতেই একেবারে শেষ করে ফেলেছে ঠিক 'কলিজায়', ওতে কি আর মানুষ বাঁচকে পারে? কে যে এমন কাজ...

নিদারুণ দুঃখে, ক্ষোভে, পরিতাপে সুজনের চোখ ফেটে অশ্রু ঝরে পড়ল দরদর ধারে। বিশ্বাসঘাতক বন্দুকের গুলিটা কিনা বেছে বেছে তার প্রিয়তম মিত্রের 'কলিজা'তেই বিঁধল গিয়ে! সেখানে আব কি কেউ ছিল না? উঃ! কি ভয়ানক কথা। কিরূপ অদৃষ্টের কি নির্মম উপহাস! শুধু বন্ধু হত্যাই নয়, যে তাকে দারুণ বিপদে আশ্রয় দিয়েছে তারই...

সুজনের ইচ্ছা হল তখনই কুঠুরী থেকে বেরিয়ে গিয়ে এই গুরুতর অপরাধের শাস্তি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নেয়, কিন্তু মানুষের জীবন বড়ই প্রিয়। বিশেষ করে এই তরুণ বয়সে। কোনো সাধ, কোনো আকাঙ্ক্ষাই যে পূর্ণ হয়নি তার।

ধরা দিতে পারল না সুজন। শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতে লাগল—শোকাকুলা ছোট্টুর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বাহাদুর বলছে—

তুমি একটু ধৈর্য ধর বহিন, যে গেছে সে আর ফিরবে না তো? কিন্তু যে পাষণ্ড তোমার ছোট্টুর

এই হাল করেছে, সে যাতে উচিত সাজা পায়, তাই করতে হবে এখন। গ্রামসুদ্ধ লোক ছুটোছুটি করছে। তোমার কাছে বউকে রেখে আমি এদিককার একটা ব্যবস্থা করি গিয়ে।

—থাক, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও ভাইয়া, আমি কিছু করব না। তোমরা আমার বাছাকে ঘরে তুলে দিয়ে যাও, শুধু আজকেব রাতটুকু ও আমার কাছে থাকুক।

বাহাদুর অভাগিনীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে চৌকীদারের সাহায্যে মৃতদেহ ঘরে তুলে বললে—

—রামস্বরূপ, তুমি এখানেই থাকো ততক্ষণ, আমি ফিরে এলে—

চৌকীদার রামস্বরূপ ইতস্তত করে বললে—তাহলে 'চট' করে এসো—আমাকে আবার থানায় খবর দিতে শহরে যেতে হবে তো?

ছোট্টুর মা আপত্তি করে বলে উঠল—

না না, তুমিও যাও রামস্বরূপ। আমার জন্যে ভয় করো না তোমরা। আমার কিচ্ছু হবে না।

ছোট্টুর মার দৃঢ়তায় ভরসা রেখে তারা দু'জনেই চলে গেল—যে যার কাজে না গিয়ে উপায়ও ছিল না আর।

দুয়ারে 'খিল' দিয়ে, শূন্য গৃহে, মৃত পুত্রকে আগলে একলাটি বসে রইল ছোট্টুর মা। আর একটি অসহায় আর্ত প্রাণী নিবিড় অন্ধকারে আত্মগোপন করে, বন্দী অবস্থায় মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করছিল। সুজনের মনে হচ্ছিল—সে ধরা না দিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে রইল কেন?—

তার দুর্দিনের আশ্রয়দাত্রী জীবনদাত্রী, এই ছোট্টুর মা'র পুত্রহন্তরূপে সে এখন মুখ দেখাবে কেমন করে? তার চেয়ে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেওয়াও যে ছিল ভাল।

নিভৃত ঘরে, আলোটা কাছে এনে হতভাগিনী মা পুত্রের মৃত্যু কালিমাময় বিবর্ণ মুখের পানে অশ্রুভরাকুল নিষ্পলক নয়নে চেয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর নিবিড় স্নেহে গভীর মমতায় সেই স্পন্দনহীন নিথর, শীতল মুখখানি চুম্বন করে তার দেহের আচ্ছাদন তুলে দেখল তখনো রক্ত পড়ছে—লালে লাল হয়ে গেছে সমস্ত বুকখানা। ওঃ! গুলিটা যখন বুকে লেগেছিল, কত ব্যথাই না... উহু-হু-হু। বাছারে আমার।

চকিতে মনে পড়ে গেল—যে তার বাছার এ দশা করেছে, তার বার্ধক্যের 'সম্বল', অন্ধের 'নড়ি'কে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে— সে পাষণ্ড এখন তার আশ্রয়ে, তারই করতলগত। তাকেও যদি এমনি করে—এরই পাশে শোয়ানো যায়...

কী বিষম প্রলোভন! নিজের হাতে প্রতিশোধ... এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না—এইবেলা... ।

এবার বুড়ির চোখের জল শুকিয়ে গেল নিঃশেষে। শোকাতুরার শীতল বক্ষঃশোণিতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হল। সে কী জ্বালা। পুত্রহন্তার বুকের রক্তেই সে জ্বালা নিভবে বুঝি।

ছোট্টুর মৃতদেহ সযত্নে ঢেকে দিয়ে তার মা উঠে পড়ল। ঘরের কোণে রাখা ছিল একটা বেতের 'পেটারী'। সেই পেটারী থেকে বার করে আনল ছোট্টুর বাপের 'খুকরী'খানা।

উজ্জ্বল দীপালোকে কোষমুক্ত, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বিদ্যুতের মত ঝকঝক করে উঠল। বুড়ির মনে পড়ল, ছোট্টুর আসন্ন বিবাহভোজে পাঁঠা কাটার জন্য মাত্র দিন তিনেক আগে ছোট্টুকে দিয়েই এ অস্ত্রটিতে 'সান' দিয়েছিল সে। আজ সেই অস্ত্রই তার হত্যাকারীর বুকে... ওঃ! কী নিষ্ঠুর ভবিতব্য।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছোট্টুর মা ধীরে ধীরে আঙ্গিনায়। তার এক হাতে প্রদীপ, আর এক হাতে রক্তপিপাসু কৃপাণ। যেন প্রতিহিংসার জ্বলন্ত ছবি।

কপাটের ফাঁক থেকে সে প্রলয়ঙ্করী মূর্তি দেখতে পেয়ে দারুণ আতঙ্কে, শিউরে কেঁপে উঠল

সুজন। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। শীতল স্বেদে সারা দেহ ভিজে উঠেছে। শরীরের সমস্ত শিরা, উপশিরা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসাড়, অবশ হয়ে আসে যেন—হায় রে। আর রক্ষা নাই—রক্ষা না-ই।

ওই, পুত্রশোকাতুরার উদ্যত কৃপাণ তার বুকের রক্ত পান করবে এখুনি—এই মুহূর্তে—আর পরিত্রাণ নেই গো।...

ভীষণ ত্রাসে, উচ্ছ্বসিত বেদনায় সুজনের শুষ্ক কণ্ঠনালী হতে অজ্ঞাতে বেরিয়ে গেল একটা মর্ম-বিদারী আর্তধ্বনি—

—মা।—মা গো।—

সে শব্দ কানে যেতেই চমকে উঠল ছোট্টুর মা। ও কে?—'মা' বলে ডাকে ও কে রে? ও কার বুকফাটা কাতর আহ্বান? ছোট্টুর?—না, তার ঘাতকের?

ত্বরিতে গতিরোধ করে ছোট্টুর মা সেইখানে থমকে দাঁড়াল। অগ্নিবর্ষী উদভ্রান্ত দৃষ্টি, সে দেখল উর্ধে অনন্ত স্তব্ধ নৈশাকারে অগণিত দীপ্ত তারা নীরবে জেগে আছে। আবার কানে এলো—

—ও মা গো।—

শোকোন্মাদিনী মায়ের বুকের ভিতর যেন কেমন করে উঠল। সাংঘাতিক অস্ত্রখানা হাতের মুঠোয় শিথিল হয়ে এলো। সে একি করছে আজ? সে না—নারী? সে না—একজন 'মা'?

মাতৃহীন সুজন—এতদিন যে তাকেই 'মা' বলে ডেকেছে—হোক সে পুত্রহন্তা—সেও তো এক 'ছেলে'—তাতে আবার বিপন্ন—আর্ত, শরণাগত।

'খুকরী'টা ফেলে দিয়ে ছোট্টুর মা অস্বাভাবিক কণ্ঠে ডাকল—সুজন।

অন্তিম আশায় নির্ভর করে, মাথাটা প্রায় বুকের উপর ঝুঁকিয়ে 'বলি' ভয়ে ভীত ছাগশিশুর মত সত্রাসে কাঁপতে কাঁপতে এসে হতভাগা সুজন ছোট্টুর মায়ের পদতলে লুটিয়ে পড়ল।

ত্রস্তে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে, দুয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ছোট্টুর মা দৃপ্তকণ্ঠে বললে—

—যাও!— বেরিয়ে যাও—শিগগির!—

কথা বলবার শক্তি সুজনের ছিল না। চকিত, করুণ কটাক্ষে পুত্রহারা অভাগিনীর পানে একবার তাকিয়ে, নত বদনে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। তার ছায়াটুকু অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—কোথায়!

ছোট্টুর মা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আর একবার চাইল নক্ষত্রদীপ্ত মুক্ত আকাশের পানে। তার দৃষ্টিতে সে অনলের জ্বালা ছিল না আর, ছিল শুধু সুনিবিড়, স্তব্ধ, জমাট মর্মবেদনা, আর মৃত্যুর নির্বিকার হিম-শীতলতা...।

'খুকরী'খানা আবার কুড়িয়ে নিয়ে. কপাটে শিকল তুলে দিয়ে ছোট্টুর মা ফিরে এলো তার মৃত পুত্রের কাছে।

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীসরসীবালা বসু সরস্বতী

ভোরের আলো সবেমাত্র পূর্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুকতারার উজ্জ্বল আঁখি তখনও নীলাকাশে পরিস্ফুট, মধ্যগগনে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকণা নিষ্প্রভপ্রায়, শীতল বাতাস ফোটা বেল ও মল্লিকা গন্ধে ভরপুর হইয়া বহিতেছে। গ্রামবাসীগণ গ্রীষ্মের রাত্রি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া, এখন ভোরের দিকে সকলেই প্রায় সুনিদ্রায় অভিভূত। অদূরে গঙ্গাবক্ষে সাড়ে চারিটার স্টিমের ভোঁ ভোঁ শব্দে নিদ্রিত পাখীকুলকে সচকিত ও প্রত্যুষের শান্তভাবকে উদ্বিগ্ন করিয়া জলে তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়া সদর্পে চলিয়া গেল।

অদূরে খড়ো ঘরের ছোট্ট জানালার ধারে পিয়ারী এই ভোরেই জাগিয়া উঠিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা যায়, সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছে। চক্ষে কেমন উদ্বিগ্ন ভাব, যেন কার আশাপথ চাহিয়াই সে সারা রাত্রির জাগরণ ক্লেশ স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছে, প্রভাতের এ পবিত্র শান্ত ভাব স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছে। প্রভাতের এ পবিত্র শান্তভাব তাহার হৃদয়কে মোটেই স্পর্শ করে নাই। ক্লান্ত দৃষ্টিতে গঙ্গার পানে চাহিয়া সে বুঝি তাহার অতীত কাহিনী ভাবিতেছিল।

বিশ্বের পরিত্যক্তা সে, তাহাকে স্নেহ-যত্ন করিতে আপনার বলিতে পৃথিবীতে কেহই নাই। তাহার জন্য, তাহার তরুণ হৃদয়ে ক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতে থাকিলেও সে তো কোনদিন আশা বা কল্পনা করে নাই যে একদিন তার এই পরিত্যক্ত লাঞ্ছিত জীবনে একজন নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া সযত্নে নিজের অন্তরের স্নেহ ভালোবাসা দিয়া বরণ করিয়া লইবে, তাই যদিই সে লইল, তবে তার সে ়িরবন্ধু চির আপনার হইল না কেন? মনের মধ্যে যদিও পিয়ারী—তাহাকে অসঙ্কোচে শূন্য হৃদয়-সিংহাসনে জীবনদেবতা রূপেই অধিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, পরিপূর্ণ নির্ভরতার সহিত তাহার চরণে আত্মনিবেদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বাহিরে তো তাহার কোন প্রমাণ নাই। সমাজের চক্ষে মানুষের কূটনীতির তর্কে সেই একান্ত আপনার জনকে তো আপন বলিয়া স্বীকার করিবার তার কোন অধিকারই নাই। তার সুখের সময় অবসরকালে সঙ্গিনী হইবার সুযোগ মিলিলেও দুঃখ-কষ্টের দিনে বিপদের সময়ে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার দুঃখ বিপদের অংশ গ্রহণ করিবার ন্যায্য দাবী পিয়ারী কিছুতেই করিতে পারে না। তাই হতভাগিনী—ম্লানমুখে অবসাদপূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া এখন ভাবিতেছে, এমন লোকের সহিত এ জীবনে দেখা না হইলেই বুঝি ভাল ছিল। পিয়ারী যে কবে মাতৃহীন হইয়াছিল, সে কথা তাহার মোটেই স্মরণ নাই। পিতার একান্ত প্রাণঢালা স্নেহ মমতায় সে কোনদিনই মায়ের অভাব বুঝিতে পারে নাই। পিতা মহাদেবও সুদূর ছাপরা জেলা হইতে পেটের দায়ে, স্ত্রী-কন্যা লইয়া বাঙ্গলাদেশের এই পল্লীগ্রামের চটকলে রোজগার করিতে আসিয়াছিলেন, ক্রমে এইখানেই মাটির ঘর করিয়া বেশ স্থায়ীভাবেই বসিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দেড় বছরের পিয়ারীকে কোলেপিঠে করিয়াই সে চটকলে কাজ করিতে যাইত। ঘরে নিজের হাতে ভাত রাঁধিয়া, বাসন মাজিয়া, পিয়ারীকে যথাসময়ে তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিত। এজন্য তাহার কোন অসুবিধা হইত না।

এমনি করিয়া মেয়েটাকে মানুষ করিতে করিতে সে দশ বছরে পদার্পণ করিল। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অনেকে মহাদেওকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য বিস্তর পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের জাতের সে দেশে ছিল না। সুতরাং আবার খরচপত্র করিয়া ছাপরা গিয়া 'কণিয়া'র খোঁজ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু এখন পিয়ারীকে দশ বছরেরটি হইতে দেখিয়া, এখন একবার দেশে গিয়া তাহার জন্য একটি 'দুলাহা'র খোঁজ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য বুঝিতে পারিল। সুতরাং অবিলম্বে দুই মাসের ছুটি লইয়া পিয়ারীর সাদী দিবার জন্য সে দেশে গেল, পিয়ারী কিন্তু ছোটবেলা হইতে বাঙ্গালাদেশে লালিত-পালিত হইয়াছে, বাঙ্গালা বুঝি তাহার ভাষা, বাঙ্গালা চালচলনেই সে অভ্যস্ত হইয়াছে। কাজেই নিজেদের দেশ তাহার নিকট বিদেশের মত ঠেকিতে লাগিল। তাহার উপর তাহার বাঙ্গালী বিবির মতন চালচলন দেখিয়া যখন বর্ষীয়সী আত্মীয়গণ অবাক হইয়া নাকে-মুখে হাত দিয়া বলিতে লাগিল, "আগে মাইয়া ঈতো পুরা বাঙালীন বন্ গইল, কৈসে দুলহাকা ঘরমে বৈঠী।" তাহা শুনিয়া শুনিয়া পিয়ারীর পিত্তশুদ্ধ যেন জ্বলিয়া উঠিল। আত্মীয়-স্বজনের আদর মমতা উপেক্ষা করিয়া তাহার মনে সেই বাঙ্গালাদেশের গঙ্গার ধারে খোড়ো বাড়িটির উদ্দেশ্যে ছুটিতে চাহিত, কিন্তু তাহার ইচ্ছামত তো কার্য হইবে না। তাহার বাড়ি ফিরিবার একান্ত তাগাদায় মহাদেও তাহাকে বারবার বুঝাইতে লাগিল এই তাহার আসল দেশ, এইখানে বিয়া সাদী করিয়া তাহকে জন্ম কাটাইতে হইবে। অতঃপর অনেক খুঁজাখুঁজি করিয়া পনের বছর বয়সের দেওকী লালের সঙ্গে স্নেহের পিয়ারীর সাদী দিয়া মহাদেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তবে মেয়েটা জন্মের মত পর হইয়া গেল, এই ভাবিয়া বেচারীর বুকের ভিতর আকুপাকু করিলে এই মনে করিয়া সে আবার সান্ত্বনা পাইল, এখন তো পাঁচ বছর মেয়ে তাহারই কাছে থাকিবে, তারপর 'গওনা' হইলে তবে তো সে শ্বশুরবাড়ী আসিবে। মহাদেওর বুড়ি চাচি ও আয়ী কিন্তু তাহাকে সুপরামর্শ দিল যে মেয়েকে আর বাঙ্গালাদেশে লইয়া যাওয়া উচিত নয়। এখন সে কিছুদিন দেশে তাহাদের নিকট থাকিয়া নিজেদের আচার-ব্যবহার আদয়-কায়দা শিখুক। নইলে পুরা বাঙালীন বনিয়া গিয়া এর পরে কেমন করিয়া সে আপন আদমীর ঘর করিতে পারিবে? এখানে সে ঘরের বিটিয়া, আদর-যত্নেই থাকিবে, মহাদেও তাহার খরচা হিসাবে পাঁচ-সাত টাকা মাসে পাঠাইলেই হইবে।

এই পরামর্শ মহদেওর কাছে মন্দ না ঠেকিলেও পিয়ারী কিছুতেই বাপকে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী হইল না। অগত্যা মহাদেও মেয়েকে লইয়া আবার নিজের কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিল। পিয়ারীও পরমাত্মীয়গণের আদর-যত্ন ও সৎপরামর্শের হাত এড়াইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মহদেও এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, কন্যার বিবাহে সেসব পুঁজি পাটাই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন গয়নার সময় আবার ঐ প্রকার ভারী খরচপত্র আছে। সেজন্য বেশ হিসাবী হইয়া আবার কিছু কিছু করিয়া জমাইয়া রাখিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সাধের পিয়ারীর গওনা আর হইল না। বিবাহের তিন বৎসর পরে সে দেশ হইতে খবর পাইল, যে দেওকীলাল হঠাৎ কলেরায় মারা গিয়াছে।

পিয়ারীর বয়স এখন চৌদ্দ বৎসর। সে কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের গুরুত্ব মোটেই বুঝিতে পারিল না। সুতরাং অনর্থক কাঁদিয়া-কাটিয়া মন খারাপ করিল না, যেমন হাসিয়া-খেলিয়া বেড়াইত তেমনি বেড়াইতে লাগিল। মহাদেও কিন্তু বড় ভাবনায় পড়িল। এই বিদেশ বিভুঁয়ে যুবতী কন্যা লইয়া সে কেমন করিয়া একা থাকিবে। এতদিন না হয় পিয়ারী ছোটটি ছিল, তাই থাকিতে পারিয়াছিল। তারপর সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল, মেয়ের গওনা হইয়া গেলে হয় মেয়েকে দেশে পাঠাইয়া দিবে, না হয়

তো দেওকীলালকে নিজের কাছে আনিয়া চটের কলে কাজে লাগাইয়া দিবে। রামজী কিন্তু সে সাধে বাদ সাধিয়া বসিলেন। এখন মানুষের শরীর গতিকের কথা তো বলা যায় না, যদি তার হঠাৎ কিছু একটা ভাল-মন্দ ঘটিয়া যায়, পিয়ারী তখন কার দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইবে?

ভাবিয়া চিন্তিয়া মহাদেও স্থির করিল, বছর ঘুরিয়া গেলে আর একবার সে দেশে গিয়া দেখিয়া-শুনিয়া আর একটি দুলাহার সহিত, 'সগাহী' লাগাইয়া একেবারে ঘর বসাইয়া দিয়া আসিবে, না হয় মেয়ে জামাইকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া জামাইকে এখানকার চটকলে কাজে লাগাইয়া দিবে।

কিন্তু মহদেওর সে সাধও রামজী পূর্ণ করিলেন না। বৎসরান্তে যখন সে দেশে যাই যাই করিয়া সব গোছগাছ করিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ তাহার পরপার হইতে ডাক আসিল, সুতরাং কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল। অভাগী পিয়ারী একেবারে আকুল পাথারে ভাসিল।

কিছুদিন পরে শোকের উচ্ছ্বাস কমিয়া আসিলে সে ভাবিয়া দেখিল, এখন যা হইবার তা তো হইয়াই গেল, তাহাকে যখন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তখন গ্রাসাচ্ছাদনের তো একটা উপায় করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। কিন্তু সে প্রাণ ধরিয়া কাহারও দুয়ারে খাটিয়া খাইতে পারিবে না। পাড়ার রিমি মা, রামুর মাসী তাহার ভালর জন্য উপযাচিকা হইয়া কানে কানে কি সব যুক্তি দিল কিন্তু হতভাগী পিয়ারী সেসব পরামর্শ শুনিল না সুতরাং খোট্টা ছুঁড়ীর দেমাক দেখিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখেছ, ছুঁড়ীর তেজ, ভাঙে তো মচকায় না, আচ্ছা দেখা যাক এ গুমোর কদ্দিন থাকে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।—ভাল পরামর্শ যখন কানে নিলে না তখন কপালের ভোগ আছেই"—ইত্যাদি।

পিয়ারী সে সকল কথা কানে না তুলিয়া, পাড়ার যে সকল ভদ্র গৃহস্থ বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল, বড়ি পাড়িয়া পাড়িয়া সেইসব বাড়িতে বিক্রয় ও যাঁতায় আটা পিষিয়া, ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের যোগান দিতে লাগিল। ইহাতে সকলেই তাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইল।

বাদলার দিনে খোলা বারান্দায় বসিয়া সকালবেলা যাঁতায় গম পিষিতে পিষিতে পিয়ারী ঘন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া আপন মনে গান ধরিয়াছিল—

"বাদর ঘেরি আই বাহ না সুঝাই
কেইসে যাওব সখি কানাইয়া লাগে,
এ-এ-শ্যামলিয়া।"

সম্মুখে জাহ্নবী—বক্ষে দ্রুত পবন সঞ্চালনে, ঢেউগুলা ফুলিয়া ফুলিযা উঠিয়া তীরের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। সহসা মুশুলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিবামাত্র একজন আরোহী ছাতা মুড়িয়া দিয়া ব্যস্তভাবে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িল।

সকালে সাতটার ভোঁ এইমাত্র বাজিয়া গিয়াছে। সে লোকটিকে চট কলে গিয়া হাজিরা দিতে হইবে। পিয়ারী আজ একমাস হইতে তাহাকে নিজের দুয়ার দিয়া দুইবেলা চটকলের দিকে যাইতে ও ফিরিতে দেখে। লোকটিও কি জানি কেন পথ চলিতে চলিতে যখন পিয়ারীর দুয়ারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার দ্রুত গতি কিছু মন্থর হইয়া পড়ে—সম্ভবত পিয়ারী বারান্দায় বসিয়া যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে যে গান করে সে গান তাহার মনকে আকৃষ্ট করে, কারণ পিয়ারীর গলা বেশ মিষ্ট। পিয়ারী কিন্তু এ গ্রামের কাহাকে দেখিয়া কুণ্ঠা বোধ করে না, করিলেও এই লোকটির সহিত চারি চোখের চাওয়া-চাওয়ি হইলেই কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ে, তাহার সুর ভুল হইয়া যায়।

আজ যখন পথিক ছাতা মুড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল, তখন হাওয়ার বেগে ও বৃষ্টির ঝাপটে লোকটির বিব্রত অবস্থা দেখিয়া পিয়ারীর সাধের গান থামিয়া গেল। আহা

বেচারী তো মহা বিপদেই পড়িয়াছে। চটকল এখনও অনেক দূরে, এই ঝড়-বৃষ্টিতে এতখানি পথ সে কেমন করিয়া যাইতে পারিবে। লোকটি কিন্তু নিতান্ত নির্বোধ নয়। সে দ্রুত গতিতে পিয়ারীর রোয়াকের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়া এক লাফে রোয়াকের উপর আশ্রয় লইল। খুঁটির উপরে ভিজা ছাতাটি টাঙ্গাইয়া দিয়া, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ হাত মুছিতে লাগিল। পিয়ারীর যাঁতা ঘুরান বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া কহিল, "আটা পেষা বন্ধ করলে কেন? তবে আমি চলে যাব কি?"

এ ঝড়-বৃষ্টির সময়ে শিয়াল কুকুরকে লোকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। তা একটা মানুষকে পিয়ারী কোন মুখে চলিয়া যাইতে বলিবে? তার কি চক্ষুলজ্জা নাই? সে কহিল, "এখন বড্ড জলের ছাট আসছে একটু পরে ভাঙবো" এই বলিয়া সে ঘর হইতে একখানি ছোট চৌকি আনিয়া পথিককে এক কোণে বসিতে দিল।

এক একজন মানুষের সহিত যে কি এক দিনক্ষণে আলাপ হইয়া যায়। যাহাতে তাহার সহিত হৃদয়ে এমন যোগ ঘটে যে অল্পদিনের মধ্যেই সেই অপরিচিত পথের পথিকও পরমাত্মীয়ের স্থান জুড়িয়া বসে। পিয়ারী ও পথিকের জীবনে বুঝি আজ এই ঝড়-বৃষ্টির সূত্র ধরিয়া সেই অপূর্ব ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। যেহেতু এই দিনকার আলাপের সূত্র ধরিয়া ঐ দু'টি নরনারীর ভাগ্য যে কেমন করিয়া দিনের পর দিন এক সঙ্গে জড়াইয়া গেল, তাহা নিজেই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শুধু যখন তাহাদের হুঁস হইল তখন উভয়েই এইটুকু মাত্র বুঝিল যে, এখন উভয়েই উভয়কেই ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না।

পিয়ারী ভোর হইতে কেদারের আশায় পথ চাহিয়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে জানালায় বসিয়া আছে। ও-পারের বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা পীড়িত, সেজন্য কেদার আজ কয়দিন হইতে রাত্রে আর পিয়ারীর ঘরে থাকিতে পারে না। সকালে আসিয়া পিয়ারীকে একবার দেখা দিয়া দু'-একটা কথা বলিয়া চট কলে চলিয়া যায়। সেখানে মোটে দু'ঘণ্টা কাজ করিয়াই রুগ্ন পিতার সেবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া যায়। পিয়ারী কিন্তু সমস্ত রাত্রি আনচান করিতে থাকে, ঘুম তাহার চোখে মোটেই আসিতে চাহে না। রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই সে জানালার ধারে বসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া কেদারের আগমন প্রতীক্ষা করে যদিও সে জানে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কখনই নৌকা আসিয়া কূলে ভিড়িবে না। কেদার আসিয়া এক নিঃশ্বাসে যখন তাহার পীড়িত পিতার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিয়া ব্যস্তভাবে কাজে চলিয়া যায়, পিয়ারীর বুক, ফাটিয়া যেন একটা বিরাট হাহাকার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। দুনিয়ার অপমান মাথায় লইয়া, সকলের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া, সে যাহাকে জীবন দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পিতার এই কঠিন পীড়ার সময়ে এতটুকু সাহায্য করিবার অধিকার তাহার নাই। কেদারের চোখ-মুখ দেখিয়া স্পষ্টই সে বুঝিতে পারে রোগীর পিছনে তাহাকে কি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। কেদারের মা নাই, বাড়িতে অন্য কোন এমন লোক নাই যে এক ঘটি জল ঢালিয়া বা রোগীকে এতটুকু সাগু-বার্লি তৈয়ারী করিয়া দিয়া উপকার করে। পিয়ারীব অধিকার থাকিলে সে যে বুক দিয়া আজ রোগীর সকল সেবা-সুশ্রূষা করিতে পারিত। বড় ক্ষোভে বড় দুঃখে পিয়ারীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত। নিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া সে কত কি ভাবিত। গত রাত্রে সে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কি একটা স্থির করিয়া, কেদারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

নির্দিষ্ট সময়ে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। কেদার নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে পিয়ারীর গৃহের দিকে অসিতে লাগিল। কয়দিন হইতে দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা ও নিয়মিত আহার না করিয়া পিয়ারীর শরীর যথেষ্ট দুর্বল হইয়াছিল। কেদারকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া তাহার গা, মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দরজা খুলিতে গেল।

কেদার বাড়ি ঢুকিয়াই পিয়ারীর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়াই যেন চমকিয়া উঠিল। কহিল, "একি পিয়ারী—তোমার মুখ এত শুকনো কেন? রাত্রে ঘুমোওনি বুঝি?"

হায় হায়, পিয়ারী আজ কয় রাত্রিই যে অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, সে খবর কি কেদার রাখিয়াছে? এখন কেদারের এই সস্নেহ প্রশ্নে পিয়ারীর চোখে জল আসিল। মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, "তুমি বড় নিষ্ঠুর।"

কেদার সাদরে পিয়ারীর হাত ধরিয়া কহিল, "পিয়ারী, তুমি আমার উপর রাগ করছে? কিন্তু পিয়ারী, বাবার যে বড় অসুখ, এ যাত্রা বাঁচেন কিনা সন্দেহ। বাড়িতে আমি ছাড়া তাঁকে দেখবার আর কেউ নেই, এ অকথায় তাকে ফেলে তো আমি তোমার কাছে আসতে পারিনে, তুমি তো সবই বুঝতে পারছ পিয়ারী।"

কেদারের কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া পিয়ারী কহিল, "তোমায় কি আমি ঐ রোগী ফেলে আসতে বলতে পারি? আমার কি এমনই পাথরের কলিজা? তবে বলছিলাম কি, একলাটি পুরুষ মানুষ রোগীর সেবা কর, তোমারও তো কত কষ্ট হয়, তাঁর তেমন সুবিধে হয় না। তার চাইতে দিন কতকের জন্যে যদি আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতো।"

পিয়ারী আর বেশি বলিতে পারিল না, তাহার জিহ্বা জড়িত হইয়া গেল। কেদারও পিয়ারীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইল। কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান সে, গ্রামে তাহাদের বংশ মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তিও বড় কম নহে। তাহার পিয়ারী সংক্রান্ত ঘটনা গ্রামের মধ্যে অল্প বিস্তর জানাজানি হইলেও পুরুষ ব্যাটাছেলের এ রকম বয়স দোষের কথা বড় কেউ গ্রাহ্য করে নাই। তা বলিয়া ইহাকে একেবারে ঘরে লইয়া গিয়া সকলের কাছে নিজেদের মাথা হেঁট করিতে পারে কি? অসম্ভব। লোকে তাহা হইলে এখন তাহার গায়ে ধূলা দিবে। বাবা যদিও সব কথাই জানেন তাহা হইলে এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করিবেন কেন?

কেদার আমতা আমতা করিয়া বলিল, "তা কি করে হয়?" কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল, পিয়ারী যদি যায় তাহা হইলে সত্যই সব দিকে সুবিধা হয়।

সে একা রুগ্ন পিতার সেবা তো পারিয়াই উঠিতেছে না, তাহার উপর রাত্রি জাগিয়া তাহার নিজের শরীর বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পিয়ারী কেদারের পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জায় মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিল, "ঝিও তোমাদের একটা দরকার হয়ত। তা না হয় আমি ঝিয়ের মত খেটেখুটে তোমাদের বাপ-বেটার সোবা শুশ্রূষা করে দিলামই।"

কেদার কহিল, "অচ্ছা পিয়ারী, বাবাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। তাঁকে না বলে তো তোমায় নিয়ে যেতে পারি না, তিনি যদি রাজি হন তা হলে আজই এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

সেদিন কেদার আর কাজেও গেল না, কারণ পিতার অসুখ বড় বাড়িয়াছিল। পাছে পিয়ারী ভাবে, সেইজন্য তাহাকে একবার খবরটা দিতে আসিয়াছিল মাত্র।

কেদারের পিতা গৃহিণীহীন হইয়াও স্ত্রীলোকের ন্যায় নিজে খাটিয়া-খুটিয়া বাড়ির সমস্ত দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। দু'টি গাই ছিল, উহাদিগের নিয়মিত দেখাশোনা করিতেন। একমাত্র পুত্র কেদার অল্প বয়সে বিপত্নীক হইয়াও পুনরায় আর বিবাহ করিতে রাজী না হওয়ায় বৃদ্ধের বড় দুঃখ ছিল। এ বয়সে নাতি-নাতনির মুখ দেখিবার বড় আশা ছিল। ছেলে সে সাধপূর্ণ হইতে দিল না। উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে বচসাই বা আর কত করিবেন। পরের হাতের রান্না খাইতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় বৃদ্ধ নিজের হাতে রান্না করিয়া পিতা-পুত্র উভয়ে আহার করিতেন। বহুদিনের পুরাতন দাসী মাধী

ঘরের অন্য সব কাজকর্ম সারিয়া রান্নার সব জোগাড় করিয়া দিত। বৃদ্ধের অসুখের দিনকয়েক পরে মাধীও পীড়িত হইয়া পড়ায় কেদারের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। বাড়ি ঘরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঝিও আর পাওয়া যায় নাই। পাড়ার একটা গোয়ালাদের ছোঁড়াকে ধরিয়া আনিয়া নগদ পয়সা দিয়া কোন রকমে বাসন মাজা ও ঝাঁটপাটের কাজগুলো করাইয়া লইতেছিল। কাল হইতে পিয়ারী আসিয়া এক বেলাতেই ঘর-বাড়ির আবর্জনা দূর করিয়া, রোগীর ঘর ধুইয়া, মুছিয়া, ধুনা জ্বালাইয়া, সমস্ত দুর্গন্ধ দূর করিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে ছড়ান ময়লা ন্যাকড়া ও কাপড়গুলো সাবানে কাচিয়া ধবধবে করিয়াছে। বাসনগুলো ও ঘড়া ঘটি মাজিয়া ঝকঝকে করিয়া পীড়ির উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। যথা সময়ে বৃদ্ধের জন্য সাগু ও দুধ প্রস্তুত করিয়া, কেদারের দুটি ভাত তরকারি রাঁধিবার সব গুছাইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া পিয়ারীকে গৃহে আনিবার মত দিয়াছিলেন। না হইলে ছেলেটাও খাটিয়া সারা হয়, অথচ তাহারও রোগশয্যায় অসুবিধার অন্ত নাই। মাধী এ সময় রোগে পড়ায় সংসার একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছে—ঝি হিসাবে পিয়ারী না হয় আসিলই বা। এখন কিন্তু পিয়ারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেবা ও কর্মপটুতায় যথেষ্ট প্রীত হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া ফেলিলেন, "তাই বুঝি আর জন্মে আমার কেউ ছিলি গো। নইলে এই সময়ে এমন সেবা করতে এলি কেন?" রোগীর এই বাক্যই পিয়ারীর পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার। সে অম্লান মুখে বৃদ্ধের মল, মূত্র পর্যন্ত নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া সমস্ত দিন-রাত্রি খাটিয়া-খুটিয়া, রাত্রে কেদারকে ঘুমাইতে বলিয়া, রোগীর মাথার কাছে পাখা হাতে ঠায় জাগিযা রহিল। ভোরের দিকে কেদারের ঘুম ভাঙ্গিলেই সে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "বড় ঘুমিয়ে ছিলাম পিয়ারী, ক'রাতই জেগেছি কিনা, শরীর যেন অবসন্ন হয়েছিল। তুমি একলাটি সমস্ত রাত জেগে আছ। এখন তবে একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি বাবার কাছে বসি।"

পিয়ারী বিনা বাক্যব্যয়ে, ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিবা মাত্রই ঘুমাইয়া পড়িল। সেও আজ কয়দিন ধরিয়া অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছে। উষার অলো ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেই পুনরায় ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িয়া গৃহকর্মে নিযুক্ত হইল।

এইরূপে কয়দিন কাটিল। বৃদ্ধের অবস্থা কিন্তু ক্রমশই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। পাড়ার রামগতি চাটুয্যে চিন্তামণি ঘটক, হরিশরণ বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি মাতব্বর লোকেরা নিত্য নিয়মিত বৃদ্ধকে চোখের দেখা দেখিতে আসিতে কখনই অবহেলা করিতেন না। হিন্দুস্থানী ছুঁড়িটার দিকে চাহিয়া তাঁহাদের পবিত্র ব্রাহ্মণ শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেও মেয়েটার কাজকর্ম যে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও চটপটে, সে কথা অস্বীকার করিতে পারিতেন না! কিন্তু কেদারের ভবিষ্যতের অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁহারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে বসিয়াই কেদারের অনুপস্থিতিতে তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে যখন সকলে তীব্র আলোচনা করিতেছিলেন। তখন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "কিন্তু দাদা কোনো চুলোয় কেউ না থাকলেও এই মেয়েটার জন্যেই শেষ সময়ে বেশি কষ্ট ভোগ করতে হবে না। যে সেবাটা করেছে নিজের মেয়ে আর গর্ভধারিণী মা না হলে এমন বুঝি কেউ করতে পারে না।" সে কথা অস্বীকার করিয়া কিছু বলিবার মত তখন আর কেহ দেখিতে না পাইলেও বৃদ্ধের যা হয় একটা কিছু ভাল-মন্দ হইয়া গেলে পর সমাজের পবিত্রতা ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কেদারকে যে শাসন ও সংযত করিতে হইবে, এ যুক্তি সকলেরই মস্তিষ্কে স্থান পাইল।

অনেক সেবা-যত্ন ও চিকিৎসপত্র করিয়াও বৃদ্ধকে এ যাত্রায় আর বাঁচানো গেল না। আজ বেলা দশটার সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কেদারকে কিছুক্ষণ একান্তে কাঁদিবার অবসর দিয়া পাড়ার মাতব্বরগণ একটু নিরিবিলিতে একজোটে কি পরামর্শ করিলেন, তাহার পর কেদারের নিকট আসিয়া তাহাকে সংসারের অনিত্যতা এবং সংসারে যে বাপ-মা কাহারও চিরদিন বাঁচিয়া থাকে না সুতরাং বুদ্ধিমানের শোক করা অনুচিত ইত্যাদি পরামর্শ দ্বারা তাহার সদ্য পিতৃশোকের যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "দেখ বাপু একটা কথা এ সময় বলে রাখছি। হরিহর লোকটা বড় সাধু ছিল। তার ছেলে হয়ে তুমি কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের হয়ে দাঁড়িয়েছ। তা হরিহরের মৃতদেহটার সদগতি না করলে আমাদের অধর্ম হবে, সেজন্যে তার সৎকারটা আমরা করতে যাব। কিন্তু তুমি যে অন্যায় করেছ তার একটা প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত আমরা তোমার পিতাঠাকুরের শ্রাদ্ধ শান্তি উপলক্ষে তোমার বাড়িতে জলস্পর্শ করতে পারব না—এ কথা বাবাজী, তোমায় আমরা আগে থাকতে বলে রাখছি। তুমি বুঝে-শুনে চলো।"

কেদারের তখন বোঝাশোনার মত অবস্থা ছিল না। যাহা হউক, ভদ্র সন্তানগণ যথারীতি শবদেহ শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া সৎকার শোকে কেদারকে কহিলেন, "গোটা পাঁচেক টাকা দাও। মৃতদেহ দাহ করে মিষ্টিমুখ করতে হয়, তা তোমার বাড়ি অগ্নি স্পর্শ করে ঘটক মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে জলযোগটা সেরে নেওয়া যাবে এখন।

কেদার বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের পাঁচটি টাকা দিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বাড়ি ফিরিল। তাহার আপনার বলিতে জগৎ সংসারে আজ আর কেহ রহিল না। শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া সে আজ বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পিয়ারী ম্লান মুখে সজল নয়নে একপাশে বসিয়া রহিল।

দিন কিছু মানুষের সুখ-দুঃখের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। দিন কাটিতে লাগিল, সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে অথচ পিতার শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য কেদার কোন উচ্চ-বাচাই করিল না দেখিয়া পাড়ার হিতৈষী বৃদ্ধগণের শিখা ঘনঘন কম্পিত হইতে লাগিল— কোন জাতের একটা মেয়েকে বাড়িতে রাখিয়া ছোঁড়াটার বুদ্ধি লোপ হইতে বসিয়াছে আর কি। সেই চিন্তায় তাঁহারা কেদাবকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন, "বলি বাবাজী, পিতার সদগতির জন্য পিণ্ডদান হিন্দু সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং শ্রাদ্ধ-শান্তি না করলে তোমারও অশৌচান্ত হবে না, তা তুমি কি স্থির করেছ?

কেদারের উত্তর শুনিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া হুকার টান দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিলেন। কিন্তু দেদার চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

ঘটক মহাশয়ের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি কহিলেন, "ভাবছ কি কেদার। এখনো কি ভাববার আর সময় অছে? একটা কিছু ভেবে এতদিনে ঠিক করনি? আশ্চর্য কলিকাল।"

কেদার কহিল, "দেখুন আপনারা তো বলেছেন আমার বাড়িতে শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে জলস্পর্শ করবেন না, সেই জন্যে আমিও চুপচাপ আছি। ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজনই একটা বিরাট ব্যাপার, তাই যখন হবে না, তখন আর উদ্যোগ কিসের করব? গঙ্গাগর্ভে বসে পিণ্ডদান করে অশৌচান্ত হব এই ঠিক করেছি।

ক্রোধে ক্ষোভে ব্রাহ্মণগণের মাথার রক্ত অত্যুষ্ণ হইয়া উঠিল। চাটুয্যে মহাশয় কহিলেন, "বলি কেদার এই কি সন্তানের উপযুক্ত কাজ হবে? শাস্ত্রে আছে পিতাধর্ম, পিতাস্বর্গ—তাই পিতার আত্মা যাতে শান্তি পায় তার চেষ্টা না করে, উদাসভাবে বলছ নমোনম করে গঙ্গাগর্ভে পিণ্ডদান করবো? ব্রাহ্মণ ভোজন না করলে তাঁর প্রেতাত্মা কি তৃপ্তি লাভ করতে পারে? কখখনো না।"

কেদার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তা হলে কি করব, আপনারাই বলে দিন।"

এইবার সকলেই খুশি হইয়া উঠিলেন। কেদারের এতক্ষণে সুবুদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া অনেকেই উহাকে একসঙ্গে সদযুক্তি দিতে গেলেন। সকলকে থামাইয়া ঘটকমহাশয় অগ্রবর্তী হইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দেখ কেদার, বয়স দোষে তুমি যা করছ, অমন অনেকেই করে থাকে। এমনকি এর চাইতে কেলেঙ্কারী কত জনে কত ঘরে করেছে—সেসব এই ষাট-সত্তর বছর বয়সে অনেক দেখেছি। তা সময়ে সবাই আবার সামলে যায়। তোমরা ভাল ঘরের ছেলে, এক সময়ে তোমার ঠাকুর্দা এই গ্রামে কত ক্রিয়াকর্ম করেছেন, আমার সবই হাটহদ্দ জানা আছে। তাঁদের বংশধর হয়ে তুমি যে চিরকালটা এমন বোম্বেটে হয়ে বেড়াবে, সে তো আমরা বেঁচে থাকতে দেখতে পারি না। বংশের মধ্যে তুমি একটি সন্তান। সুতরাং আবার বিয়ে থা করে সংসারী না হলে বংশ লোপ হবে, সেও একটা মহা পাপ। পিতৃঋণ হতে মুক্ত হওয়া সকল হিন্দু সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। তা দেখ কেদার ঐ নষ্ট ছুঁড়িটাকে বিদেয় করে দিয়ে, একটা সামান্য রকম প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল। ব্যস সব ল্যাটা চুকে যাক, আর তখন কারও কিছু বলবার থাকবে না। তখন তুমি স্বচ্ছন্দে পাঁচশো ব্রাহ্মণের আহারের যোগাড় কর না কেন, কোন ভাবনা নাই।

কেদার কোন উত্তর দিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চাটুয্যে মহাশয় কহিলেন, "বাবাজী ঘটকমহাশয় যা বললেন তা অতি উত্তম প্রস্তাব। এর উপর আর কথা চলে না। প্রায়শ্চিত্ত যদি না কর তাতেও কোন ক্ষতি নেই, যেহেতু শাস্ত্রে আছে পুরুষ পরশ পাথর। তবে কিনা ঐ উপসর্গটা যে তোমার ঘাড়ে চেপে থাকবে সে কিছুতেই হবে না। ওটাকে বিদেয় করে দাও। কোন চিন্তা নেই বাবাজী, আমরা তোমার জন্য চাঁদ পানা বউ খুঁজে আনবো। ও পথের আপদ ঘর থেকে তাড়ানই মঙ্গল।

কেদারকে নিরুত্তর দেখিয়া 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং', বুঝিয়া খুশি হইয় ঘটকমহাশয় কহিলেন, "তা কেদার এখন ঘরে যাও একটু ভেবে-চিন্তে দেখগে ছুড়ীকে না হয় পাঁচ টাকা নগদ ধরে দিও। ওদের ভাবনা কি, আর একজনার ঘাড়ে স্বচ্ছন্দে গিয়ে চেপে বসবে। যা হোক তোমার স্কন্ধ থেকে নামলে যে বাঁচা যায়।

কেদারের দুই পায়ের উপর মুখ রাখিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে পিয়ারী কহিতেছিল, "তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একেবারে তাড়িও না। তুমি বিয়ে করে বৌ আনো আমি তার দাসী হয়ে থাকব কিন্তু আমায় পথে বের করে দিও না।"

অভাগিনীর কণ্ঠস্বরে নিতান্ত অসহায় কাতর ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল। কেদার মনে ভাবিয়া-চিন্তিয়া যখন তাহাকে তাহার হিতৈষিগণের সদযুক্তির কথাগুলো প্রকাশ করিয়া বলিল, তখন পিয়ারী দুনিয়া অন্ধকার দেখিল—কেননা সে বেশ জানে তাহাকে অসহায় দেখিয়াও তাহার স্বভাবের গাম্ভীর্যের জোরে যাহারা এতদিন তাহাকে কুপথে আনিবার প্রলোভন দেখাইতে সাহস করে নাই আজ তাহারা অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়া তাহাকে নানারূপে উৎপীড়িত করিবেই করিবে। তাহা ছাড়া সে পাঁচজন ভদ্রলোকের দুয়ারে যে ডাল, বড়ি, আটা বিক্রয় করিয়া জীবিকা উপার্জন করিত, তাহাও আর সে পারিবে না। কারণ কেদারের সহিত পরিচয় হওয়া পর্যন্ত সে লোকালয়ে কুলটা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহার সে নিঃসঙ্গ জীবন যখন এক অপূর্ব মাধুর্য রসে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তখন সে তাহার সঙ্গীহীন ভাব বুঝিতেও পারে নাই। কিন্তু আজ যে কল্পনায় মুহূর্তের মধ্যে নিজের অবলম্বনহীন লক্ষ্যশূন্য যে নিঃসঙ্গ জীবনের ছবিখানি দেখিতে পাইল, উহা কি ভয়ানক! না না, এমন

জীবন সে কখনই বহন করিতে পারিবে না। তাই সে আশ্রয়হীনা লতার ন্যায় নিরাশ লইয়া কেদারের পা দু'খানি নয়ন জলে সিক্ত করিয়া, করুণ স্বরে মিনতি করিল। "আমায় তাড়িয়ে দিও না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় পথে বার করে দিও না।"

এখনও তাহার নিতান্ত তরুণ বয়স, সংসারের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষের তীব্র আঘাত সহিয়া কঠিন হইবার ক্ষমতা আজও তাহার হয় নাই। সুতরাং উহার কল্পনা মাত্রই তাহাকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর যে তাহার কোথাও কেহ নাই, কাহার কাছে সে আশ্রয় লইবে?

পিয়ারীর ভয়চকিত মুখখানি ও তাহার মর্মস্পর্শী করুণ মিনতি কেদারের কর্তব্যপরায়ণ চিত্তকে বিকল করিয়া তুলিল।

কিন্তু মৃত পিতার প্রেতাত্মার সদগতি বিধান আবশ্যক, পিয়ারীকে বিদায় না করিলেই বা তাহার বাড়িতে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ পাত পাড়িতে আসিবেন কেন? অথচ তাঁহারা এই ছুঁড়ীটার সম্বন্ধে যাহাই বলুন, সে তো পিয়ারীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানির প্রাণপূর্ণ স্নেহ ও সরলতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছে। সে তার অনাঘ্রাত জীবন কুসুম যে শুধু তাহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া কলঙ্কিনী নাম গ্রহণ করিয়াছে, সে কথা তাহার অন্তর্যামী ভাল রকমই জানেন। সুতরাং তাহাকে আজ নিষ্ঠুরের মত অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে তাহার মন সরিতেছে কৈ? পিতৃপুরুষ ইহাতে যদি অশান্তি ভোগ করেন তাহা হইলে অবশ্য সেই—দোষী, সেই দোষী।

কিন্তু আগে হইতে অপরাধের বোঝা সে স্বেচ্ছায় মাথার তুলিয়া লইয়াছে, আজ এই নিরাশ্রয়া নারীকে বিশ্বের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলেই কি তাহার সে ভার নামিয়া যাইবে? সে যুক্তিতে মন সায় দিতেছে না তো। সে রাত্রি অনাহারে-অনিদ্রায় অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অতিবাহিত করিয়া ফেলিয়া, প্রাতে কেদার পিয়ারীকে কহিল, "পিয়ারী দু'দিন লুকিয়ে থাকতে পারবে?"

পিয়ারী অবাক হইয়া কেদারের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন পারবো না?"

"তাহলে আমাদের এই গুদাম ঘরে তোমার দু'দিন বন্ধ থাকতে হবে। টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। দু'দিন পরে আমি তোমার সম্বন্ধে যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা [illegible]ই। তবে, তোমাকে তাড়িয়ে দেব না এটা নিশ্চয়।"

পিয়ারী প্রথমে বড় ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু কেদার যখন নিশ্চয় করিয়া বলিতেছে তাহাকে তাড়াইয়া দিবে না, তখন নিশ্চয়ই সে নিজের কথা রাখিবে সুতরাং পিয়ারী স্বচ্ছন্দে দু'দিনের জন্য গুদাম ঘরে বন্দী থাকিতে রাজী হইল। কেদারের আশ্রয়ে থাকিবার জন্য সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট সে আনন্দের সহিত সহ্য করিতে পারে। সুতরাং দুইদিন বন্দী হইয়া থাকা তো কোন সামান্য কথা। কেদারের পিতা খুব হিসাবী লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সঞ্চিত অর্থে কেদার প্রচুর উদ্যোগ আয়োজন করিয়া গ্রামের ও আশপাশের গ্রামের প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরিপাটিরূপে ভোজন করাইল। হরিসংগীতে বৃষোৎসর্গ, ষোড়শদান কিছুই বাকী রইল না। যিনি যাহা পরামর্শ দিলেন, সে নির্বিচারে তাহাই গ্রহণ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিল। কাঙালী বিদায়ও বেশ ঘটা করিয়া হইয়া গেল। পাড়ার সকলে প্রচুর পরিমাণে লুচি, মণ্ডা, ক্ষীর, দই খাইয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইয়া, ভোজনান্তে চাদরের খুঁটে একটি বৃহৎ পোঁটলা বাঁধিয়া কেদারের পিতার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। চাটুয্যে ও ঘটকমহাশয় কয়দিন ধরিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া সমস্ত দেখাশুনা করিয়া সকল কাজকর্ম বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করাইয়া, সকলের নিকট অজস্র সাধুবাদ লাভ করিলেন।

কাজ শেষ হইয়া গেল। কেদারকে সকলেই শতমুখে বাপের সুপুত্র বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল।

কাঙালী ভোজনের পরদিন ভোরের সময় ঘটকমহাশয় যখন চৌধুরীদের বাগানে নামাবলী গায়ে দিয়া শত নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পূজার ফুল সংগ্রহ করিতেছিলেন সেই সময় দুইটা মুটের মাথায় বাসন বিছানা বোঝাই করিয়া কেদারকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি কেদার কোথায় যাচ্ছ, হঠাৎ একি?"

কেদার তাঁহার পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞে গ্রামে তো বাস করবার মুখ রাখিনি, কাজেই গ্রাম ছেড়ে চললাম।"

অদূরে পিয়ারীকে দেখিয়া ঘটকমহাশয় উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "ছুঁড়ীকে যে বিদেয় করে দিয়েছিলে তা কোত্থেকে আবার এসে জুটলো?"

কেদার কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আজ্ঞে বিদেয় কত্তে পারিনি, অসহায় স্ত্রীলোক ওকে কোথায় তাড়াই বলুন, তাতে আবার যে কান্নাকাটি করতে লাগলো, কাজেই গুদাম ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছিলুম।

ঘটকমহাশয়ের ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনি পাপিষ্ঠ, নরাধম, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বিশেষণে কেদারকে সম্বোধন করিয়া অভিসম্পাত দিবার উপক্রমেই কেদার সবিনয়ে কহিল, "আপনারা ব্রাহ্মণ, কলির সাক্ষাৎ দেবতা। আপনাদের বাক্য মিথ্যা হবার নয়। আপনাদের অজস্র আশীর্বাদ আমার বাপের আত্মা এখন স্বর্গলোকে উঠে গেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। সে আত্মাকে আর মিছে কষ্ট দিয়ে নামিয়ে আনবেন না। পিয়ারীকে নিয়ে এখন কলকাতার দিকে চললাম। বাড়িতে দুটো গরু রইল, সবে বিইয়েছে, আপনি দুধ খাবেন। আর বাগানে অনেক জিনিস ফলেছে। আপনার জিম্মাতেই রইল।"—বলিয়া কেদার ঠন করিয়া চাবিটা ঘটক মহাশয়ের পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। ঘটক-মহাশয় উদ্যত রসনাকে সংযত কবিয়া কহিলেন, "তা ওপারে গিয়ে এখন কি করবে?"

কেদার কহিল, "কি আর করব। দেখি যদি ওদের জাতে কেউ স্যাঙা কি কণ্ঠি বদল কিছু করে নেয়। বোষ্টমই হতে হবে দেখছি, ওকে ছাড়তে তো আর পারছি না।"

ঘটকমহাশয় পিয়ারীর উদ্দেশ্যে কতকগুলো কটুক্তি করিয়া উহার উর্ধতন চতুর্দশ পুরুষকে গৌরব নরকে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, "বামুনের ছেলে হয়ে বোষ্টম হবে, ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও কেদার। যাচ্ছ এখন যাও। ও পেত্নী বেশিদিন ঘাড়ে চেপে থাকবে না। ঘাঁৎ বুঝে একদিন পালাবেই। ওসব ডাইনীদের ছল-চাতুরী দেখতে দেখতে আমাদের হাড় পেকে গেল। তা খুব সাবধানে থেক, তোমায় ভাল মানুষটি পেয়ে মায়াকান্না কেঁদে একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে, ওরা জাদু জানে। এখন কাঁচা বয়স, কাঁচা বুদ্ধি, তাতেই কিছু বুঝতে পারছ না, এরপর বুড়োর এইসব কথা মিষ্টি লাগবে।

মুটে ডাকিল, "বাবু শীগগীর এস গাড়ির ঘণ্টা বেজে গেল যে।"

কেদার ঘটকমহাশয়কে আবার, নত হইয়া প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া মুটের সঙ্গ লইল। ঘটকমহাশয় মাটি হইতে চাবিটা কুড়াইয়া সাজিতে রাখিতে রাখিতে ঘোর কলির অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অবাক হইয়া গেলেন—ছোঁড়া কি না অবশেষে এমন বহিয়া গেল যে বলে কি মেয়েটার সঙ্গে কণ্ঠী বদল করিবে। জাত মান কিছুরই আর মহাত্ম্য রহিল না। খ্রিস্টানী হওয়ায় দেশকাল উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে।

বারুণী

গিরিবালা দেবী

পিতৃ-মাতৃহীনা অনাথা বারুণীকে যেদিন তাহাদের ধনী কাকাদের আশ্রয় হইতে ৫০ টাকা বেতনের প্রকাশ মজুমদার নিজের বাড়িতে আনিয়াছিল, সেদিন স্বপ্নেও তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কয়েক বৎসর পরে সেই মামাত বোনের বিবাহ উপলক্ষে তাহাকে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিতে হইবে। তখন তাহার ও পত্নী শৈলবালার মনের মধ্যে একটা দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, বারুণীর সকরুণ জীবন কাহিনী শুনিয়া, তাহার সুদীর্ঘ পল্লব-বিশিষ্ট কালো নয়নের বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া কোনও শিক্ষিত উদার হৃদয় যুবক আদরের সহিত বিনাপণে তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যাইবে। কিন্তু বারুণীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল, তাহাদের কল্পিত মায়ালোক এখনও সুদূরে। দিশাহারা প্রকাশ ভগিনীদায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায় পাড়ার বয়োবৃদ্ধ নীলখুড়ো, হরিদা, চৌধুরীমশায় প্রভৃতি সকলের নিকটে একটা সদযুক্তি ও পরামর্শ চাহিলে তাঁহারা সকলেই একমত হইয়া তাঁহাদের রায় প্রকাশ করিলেন, "একখানা গাড়ি ডেকে গয়ার পাপ গয়াতে রেখে এস। মেয়ের খুড়োরা আছে, চাই বিয়ে দিক, নয় আইবুড়ো রাখুক--তোমার দায় কি বাপু?"

পাড়ার এতগুলি হিতৈষী বৃদ্ধের এ পবামর্শ গয়ার পাপ গয়ায় পাঠাইবার প্রকাশের কোন লক্ষণই দেখা গেল না—বরং পাত্রানুসন্ধানে তাহার আরও চেষ্টা ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়াই চলিল। যেখানে মণি-কাঞ্চন একত্র সমাবেশ হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই, সেখানে বরের পিতাদের'(কোন কোন স্থানে স্বয়ং বরের) মেয়ে দেখিবার আগ্রহ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না।

প্রকাশের সনির্বন্ধ অনুরোধে কয়েকটি বরের পিতা এবং দুই-একটি বরও স্বয়ং, তাঁহাদেব বলির পশু মনোনীত করিতে আসিলেন বটে, কিন্তু দীনু ময়রার রসগোল্লা ও ভীম নাগের সন্দেশের প্রশংসা ছাড়া প্রকাশ তাঁহাদের মুখে একটি ভরসার কথাও শুনিতে পাইল না। লোকটার বিস্ময়াবহ ধৈর্য — কিছুতেই সে নিরুদ্যম না হইয়া সকাল-সন্ধ্যায় নাছোড়বান্দাব মত ভদ্রলোকদের দরজায় দরজায় ধন্না দিতে লাগিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বিরক্তির সহিত কোন কোন ভদ্রলোক অন্দরমহল হইতে চাকরের দ্বারায় বলিয়া পাঠাইলেন, "বাবু বাড়ি নাই, দেখা হবে না।" কেহ আবার বেশী অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, "মেয়েটি আর একটু ফর্সা হলেই আমাদের আর আপত্তির কারণ থাকত না। ছেলে বন্ধুদের কাছে বললে, দুধে আলতা রং না হলে বিয়েই করবে না" ইত্যাদি। কোন বিবাহার্থী যুবক চশমার মধ্য হইতে প্রকাশের বেদনাতুর চিন্তান্বিত মুখের দিকে ক্ষীণ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'টাকার কথা কি বলছেন মশায়? মেয়ে পছন্দ হলে কি আবার টাকায় আটকে থাকে? আপনাদের মেয়েটি অপছন্দ নয়—তবে কি না—এই কি বলে—মুখটা ঠিক ডিম্বাকৃতি নয়। আর ঐ কি বলে, চোখ দুটো বেশ পটলচেরা নয়। নইলে—তা যাক। চেষ্টা করুন, বর পাবেন বৈকি?"

ফল কথা, অর্থহীনার জন্য কে গঙ্গাসাগরে দুই পা আছড়াইয়া কাঁদিতেছে যে বিনা কপর্দকে

বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবে? ভারী দায় পড়েছে না? যে কুমারীর পিতার কিংবা অভিভাবকদের মেয়ে তুল্য ওজনের টাকা দিবার ক্ষমতা নাই, তাদের আবার মেয়ে বিবাহ দেবার সখ কেন বাপু? বর কি খোলাম-কুচি, যে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে?

২

পাত্রের দল বারুণীর অনাদৃত রূপের দিকে ফিরিয়া না চাহিলেও, যৌবন তাহাকে উপেক্ষা করিল না। জগতে একমাত্র আশ্রয়স্থল ভ্রাতা প্রকাশের ও ভ্রাতৃজায়া মমতাময়ী সখী শৈলবালার চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডলের কালো ছায়া দেখিয়া বয়স বারুণীকে এতটুকুও করুণা করিল না। বর্ষাচন্দ্রিকা-স্নাত নদীর সলিলোচ্ছ্বাসের মত রূপ-যৌবন কুসুমপেলব কিশোরীর সুকুমার অঙ্গে, রক্তিম কপোলে লাবণ্যবিভা বিচ্ছুরিত করিয়া আপনার জয় পতাকা উড়াইয়া দিল। এ অযাচিত রূপ-যৌবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ ভঙ্গের জন্য বারুণী নিজেকে যেন আরও বিপন্ন বলিয়া অনুভব করিল। যে দুঃখিনী, পিতৃ-মাতৃহীনা, তাহার শরীরে এ নবসৌন্দর্যের সমারোহ কেন? আর পোড়া বয়স—সেও কি অনাথাকে উপহাস করিবার জন্য চতুর্দশ বর্ষ অতীতের কুক্ষিতে বিসর্জিত করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিল। বারুণী এ জগতের সকৌতুক দৃষ্টি হইতে প্রাণপণে আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল ন। প্রতিবেশিনীদের অনুসন্ধিৎসু নয়ন দ্বিপ্রহরে রৌদ্রতপ্ত নিভৃত ছাদে আলোচনার বৈঠকে, সরোবরে বিকশিত পদ্মের সুষমা স্মরণ করাইয়া দিত। চিলে কুঠারীর ছায়ায় দাঁড়াইয়া দত্তদের বিন্দু, অপর ছাদে দণ্ডায়মানা নীরদাকে ডাকিয়া কহিল, "শুনেছিস ভাই, মজুমদারদের তেপেয়ে মেয়েটা আজও বিকোয়নি।" নীরদা সখীর কথার সোৎসাহে উত্তর করিল, "আহা এখনই কি হয়েছে! সবে তিন কুড়ি পার! কালে কালে কতই হবে পুলিপিঠেরও ন্যাজ গজাবে।" চাটুয্যেদের ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই, সুতরাং বাতায়নে দাঁড়াইয়াই বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "বিয়ে দেবে কে? মামার খেতে বিয়োলে গাই, সেই সম্বন্ধে মামাত ভাই। চেষ্টা করলে আবার মেয়ে বিকোয় না, আসলে—।" কথাটা শেষ না করিয়া তিনি সঙ্গিনীদের দিকে চাহিয়া একটু নিগূঢ় রসপূর্ণ হাসি হাসিলেন।

এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা শৈলবালার কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। সে প্রকাশকে ধরিয়া বলিল, "যেমন করেই হোক ঠাকুরঝিকে বৈশাখ মাসের ভিতরেই বিয়ে দিতে হবে। আমার গায়ের গয়নাগুলি দিচ্চি। আর, ওর কাকাদের কাছে গিয়ে কিছু টাকার যোগাড় কর। ওর বাপেরও তো কিছু ছিল—ন্যায়তঃ ওই তার অধিকারিণী, সে কথাটা তুলতেও ভুলে যেও না।"

স্ত্রীর মন্ত্রণায় প্রকাশ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "সেখানে গিয়ে কোন ফল হবে না শৈল, তাঁরা তো আগেই বলে দিয়েছেন, 'কুটুম্বিতা দেখিয়ে যেমন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তেমনি বিয়ে দেবার মজা বুঝুক।' তবুও একবার যাব ভাবছি। দায় যখন আমার, তখন মান-মর্যাদার দিকে অত চাইলে চলবে কেন? একটি পাত্রের খবর পেয়ে আজ সেখান থেকেও ঘুরে এলাম।"

শৈল আবেগভরা কণ্ঠে কহিল, "পাত্রের নাম কি? কোথায় থাকে? কি করে?"

স্ত্রীর চঞ্চলতা দেখিয়া প্রকাশ সহাস্য মুখে কহিতে লাগিল, "রক্ষা কর শৈল, তুমি যতগুলি প্রশ্ন করেছ তার উত্তর আগে দিয়ে নিই, তারপর অন্য প্রশ্ন হবে। নাম হচ্ছে মনোহর সান্যাল, পটলডাঙ্গা স্ট্রিটে মেসে থেকে সিটি কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। ঘরে খাবার সংস্থান আছে। নিজের অভিভাবক নিজেই, মেয়ে পছন্দ হলে টাকা নেবে না। কিন্তু—"

প্রকাশ থামিল, শৈল উৎকণ্ঠিত হইয়া, কিন্তু বলেই থামলে যে? তবে বুঝি ছেলের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়?"

"না গো তা নয়, আমি তাদের মেসে সে খবরও নিয়েছি—স্বভাব চরিত্রের কোন দোষ নেই, তবু তোমার পছন্দ হবে না।"

এবার শৈল রাগতস্বরে মুখখানি ঘুরাইয়া কহিল, "ছেলে ভাল, লেখাপড়া জানে, তবে আমার পছন্দ হবে না কেন, আমার পছন্দ কি এতই অদ্ভুত? আমি কি বলেছি যে কাবুলের আমীর পুত্র না হলে তোমার বোনকে বিয়ে দিয়ো না?"

স্ত্রীর রাগ দেখিয়া প্রকাশের হাস্যস্রোত বাধা মানিল না, সে হাস্য ধ্বনিতে গৃহখানি শব্দময় করিয়া কহিল, "রাগ কর কেন শৈল? তোমার পছন্দ যে খুব উঁচুদরের তাই জেনেই তো এ ছেলেটির কথা বলতে একটু ইতস্তত করছি। ছেলেটির অন্য কোন দোষ নেই, তবে চেহারাটা মোটেই ভাল নয়, গায়ের রংটা বড় কালো, দাঁতগুলো উঁচু।"

শৈল ক্ষণকাল ম্লান মুখের চিন্তার পর বলিল, "চেহারা ভাল নয় তাতে আর দোষ কি? চেহারা তো ফরমাতে তৈরি হয় না, ওখানে ভগবানের হাত। লেখাপড়া জানে, স্বভাব চরিত্র ভাল, ব্যাটাছেলের এর বেশি আর গৌরবের জিনিস কি আছে? পুরুষ মানুষের আবার রূপ, মুক্তোর আবার বাঁকা সোজা!"

শৈলর মুখে পুরুষ মানুষের রূপের অপ্রয়োজনীয়তার কথা শুনিয়া প্রকাশ কিছু আশ্বস্ত হইল। অনাথা বোনটিকে যেখানে সেখানে ভাসাইয়া দিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না, যেখানে মেয়েটি সুখে শান্তিতে থাকিবে, তাহার শক্তির বহির্ভূত হইলেও সেইখানেই বারুণীকে বিবাহ দিবার চেষ্টা সে করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রাণসমা সোদর প্রতিমা ননদের সুখের জন্য শৈলর ব্যগ্রতা তাহার অপেক্ষাও অনেক বেশি। সহজে কাহাকেও তাহার পছন্দ হইত না, আজ রূপহীন ছেলেটির প্রতি শৈলর এ করুণার অজস্র ধারা বর্ষণ দেখিয়া প্রকাশ মনে মনে খুব আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিল। বিলম্বে বরের ও শৈলের মতের পরিবর্তন ঘটিতে পারে আশঙ্কা করিয়া প্রকাশ অবিলম্বে মেয়ে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

৩

দ্বিপ্রহর বেলা। আহারাদির পর হইতেই শৈল বারুণীকে লইয়া সাজাইতে বসিয়াছে। আজ অপরাহ্নে বর মনোহরবাবু তাঁহার ভাবী প্রেয়সীকে মনোনীত করিতে আসিবেন। বি. এ. পড়া রূপপিপাসু নব্য যুবকের প্রথম দৃষ্টিপাতেই বারুণী যাহাতে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পারে, এমনি করিয়াই শৈল আজ ননদকে সাজাইতেছিল, ফিরোজা রঙের শাড়িখানি পরাইয়া বারুণীর সাবান ঘষা রাশীকৃত কেশগুচ্ছ সুবিন্যস্ত করিয়া একটি লাল ফি [illegible]ব ফাঁদে বাঁধিয়া শৈল খয়ের ঘষিতে ব[illegible]। নিজের বাছা বাছা গহনা ক'খানিতে ননদের গা সাজাইয়া, খয়ের টিপ পরাইয়া, মুগ্ধ নয়নে বারুণীর সলজ্জ সুন্দর মুখখানি এদিক-ওদিক ঘুরাইয়া শৈল রঙ্গভরে মৃদু কণ্ঠে বলিল,

"কণক পঙ্কজ বনে প্রবাল আসনে
বারুণী রূপসী বসি মুক্তাফল দিয়া
করবী বাঁধিতেছিল, পশিল সে-স্থলে—

ভ্রাতৃবধূর দিক হইতে মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া একটু ফিক করিয়া হাসিয়া বারুণী কহিল, "আজ তোমার কি হয়েছে বৌদিদি, এত মেঘনাদবধ কাব্য আবৃত্তি কেন?"

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পরিপাটি বেশভূষায় বিভূষিত আতর গোলাপের স্নিগ্ধ গন্ধে বাতাস, আমোদিত

করিয়া মনোহরবাবু প্রকাশের ভবনে শুভাগমন করিলেন। অন্তরাল হইতে বরের অষ্টাবক্র-সন্নিভ অবয়ব দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই শৈলর আনন্দ উৎসাহের সুশোভন সুদীপ্ত প্রদীপ একটি ফুৎকারেই যেন নিভিয়া গেল। এই বর? ইহারই সহিত আমার সোনার প্রতিমার সম্মিলন হইবে? এ যে বানরের গলায় মুক্তার মালা!—তাহার কাহারও মনে উদয় হইল না, এও যদি উপেক্ষাভরে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়? এ কালো কুৎসিত হইলেও বর তো বটে। শুধু বর নয়, আবার বি. এ. পড়া! এ কি শৈলবালার অবজ্ঞার পাত্র? শৈল বিষণ্ণ চিত্তে বাল্যকালের পঠিত গ্রন্থপাঠের একটি কবিতা মনে মনে পাঠ করিয়া নিজের মনকে শাসিত করিতে লাগিল, "রূপেতে কি হয় বাপু গুণ যদি থাকে।" তাহার অবাধ্য উৎক্ষিপ্ত মন এ শাসন বাক্যে কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে প্রশান্ত হইল না।

মনোহরবাবু বারুণীর চলন পদ্ধতি, দৃষ্টিশক্তি বহুক্ষণ নীরবে পর্যবেক্ষণ করিয়া, উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, এবং অনুরুদ্ধ হইয়া গম্ভীর স্বরে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "মেয়ে সুন্দরী বটে, কিন্তু তেমন কিছু নয়। আর একটা দোষ দেখতে পাচ্ছি, সজীবতা ও উজ্জ্বলতার বড় অভাব—কেমন যেন নির্জীব ভাব।"

প্রকাশের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা মেয়ের শরীরে সজীবভাব হীনতার উপলক্ষে কিছু টাকা চাহিবার আছিলা। শৈলর গহনাই যে তাহাদের সম্বল, তাহারা অধিক পাইবে কোথায়? এক বারুণীর কাকাদের নিকটে সাহায্য ভিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ের কথা প্রকাশ ও শৈলর স্মরণ হইল না। তাহাদের আশা ছিল, শৈলর গহনা কয়েকখানার বিনিময় বারুণীর উদ্ধার হইবে। আজ মনোহরবাবুর কথার ইঙ্গিতে তাহাদের মুখ দুইটি বিষাদের কালো ছায়ায় আবৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি হৃদয় ক্ষোভে-দুঃখে লজ্জায়-ঘৃণায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে, বড় গোপনে বড় বেদনায় দগ্ধ হইতে লাগিল—সে হৃদয় বারুণীর।

৪

বারুণীর বিবাহ-সূত্রে তাহার কাকাদের নিকটে অর্থের সাহায্যপ্রার্থী হইতে গিয়া প্রকাশ অপমানিত ও মর্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই ঘটনায় শৈলর হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শেল বিঁধিল। তাহার স্বামী দরিদ্র বটে, কিন্তু হতমান হইবার উপযুক্ত নহেন। করুণার বশে পরের মেয়েকে নিজের গৃহে স্থান দেওয়ার কী পুরস্কার? শৈলর যত রাগ তত বিদ্বেষ, সবই মনোহরবাবুর উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতে লাগিল। নিজের যাহার ভূতের মতন চেহারা, সে আবার অন্যের অতুল্য রূপের খুঁত ধরিয়া টাকার দাবী করে কেন? সহস্র মুদ্রার আবরণ সহ অনিন্দ্য সুন্দরী এমন কুমারীকে গৃহে লইলে যে পাষণ্ড নানারূপ অছিলার উত্থাপন করিতে পারে, তাহার অপমান না হইয়া, হইল কি না আমার দেবচরিত্র স্বামীর অপমান! সুতীব্র বেদনার দুর্বিষহ জ্বালায় সমস্ত রাত্রি শৈল এপাশ-ওপাশ করিয়াও নিদ্রাদেবীর দর্শন পাইল না। প্রকাশ স্ত্রীকে চিনিত, তাই এত দুঃখে-কষ্টেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

পরদিন বেলা সাড়ে ন'টার সময় আহারাদি করিয়া প্রকাশ যখন অফিসে চলিয়া গেল, তখন শৈলর সমস্ত কর্তব্যই স্থির হইয়া গিয়াছে। সঙ্কল্পের একটা দৃঢ় ছায়া তাহার করুণ মুখখানিতে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে।

শৈল ধীর মন্থর গতিতে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অষ্টম বর্ষীয় পুত্র বিকাশচন্দ্র ইস্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্লেটের উপর বইগুলি গুছাইতেছে। শৈল স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "বিকু, একটা কাজ করবি?"

বিকাশ প্রফুল্ল মুখে মার দিকে চাহিয়া সোৎসাহে কহিল, "কাজ আবার পারব না মা? এখন তো আমি বড় হয়েছি। এই তো সেদিন বাবা তোমার চকলেট রঙের সেলাইয়ের জন্যে সুতোর কাটিম পেলেন না, আমি এনে দিলাম।"

পুত্রের মুখে তাহার বয়সের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া মায়ের বদনে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। শৈল বিস্ময়ে ভান করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, বিকু এখন খুব বড় হয়েছে, সব কাজ পারে। তুই মনোহর-বাবুদের মেস চিনিস? একটা জিনিস দিলে মনোহরবাবুকে দিয়ে আসতে পারবি?"

"খুব পারব মা, সে মেস তো আমাদের ইস্কুলের সামনে, আর বাবার সঙ্গে আমি যে সেদিন মনোহরবাবুর ঘর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আমি আবার পারব না!"

শৈল কহিল, "আজ শনিবার দুটোর সময় কিষণ যখন তোকে আনতে আসবে, তখন তার হাতে একটা জিনিস পাঠিয়ে দেব, তুই কিষণকে নিচে রেখে উপরে গিয়ে মনোহরবাবুকে সেই জিনিসটা দিয়ে চলে আসবি, বুঝেছিস?"

বিকাশ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

৫

ছুটির পর ভৃত্য কিষণ প্রদত্ত কাগজে জড়ান, লাল ফিতায় বাঁধা পুস্তকাকৃতি একটি দ্রব্য হাতে লইয়া কৌতূহলী বিকাশ কাগজের অভ্যন্তরস্থ সামগ্রীটি দেখিবার অদম্য বাসনা হৃদয়ে লুকাইয়া মনোহরবাবুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতে গিয়া দেখিল, আজ সেখানে মনোহরবাবুর পরিবর্তে অন্য একটি কুড়ি-একুশ বছরের সুন্দর সুশ্রী গৌরবর্ণ যুবক চেয়ারে বসিয়া কাগজ পড়িতেছে। যুবকটি পূর্ববঙ্গের কোন জমিদারের ছেলে, নাম অনিলচন্দ্র রায়, সম্প্রতি মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। অপরিচিত সুন্দর বালকটির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি খোকা? তুমি কোন বাড়ি থেকে এসেছ?"

বালক দিব্য সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমার নাম শ্রীবিকাশচন্দ্র মজুমদার; বাবার নাম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার। আমি মনোহরবাবুর কাছে এসেছি।"

বিকাশের কথায় অনিলের মন পড়িল, প্রকাশ মজুমদারের বোনের সহিত মনোহরবাবুর বিবাহের কথা চলিতেছে। দুপুরবেলা এতটুকু ছেলে কোন উদ্দেশ্যে মনোহরবাবুর নিকটে আসিয়াছে, তথ্যটি জানিবার জন্য অনিল উৎসুক হইয়া উঠিল। বিকাশকে সাদরে নিজের কোলের কাছে বসাইয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিসিমা মনোহরবাবুকে পছন্দ করেছেন খোকা?"

খোকা সম্বোধনে ছোট হইবার আশঙ্কায় বিকাশ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "আমায় খোকা বলছেন কেন? আমার নাম যে বিকাশ।"

"হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছিল। তোমার নাম খোকা নয়, বিকাশ। আচ্ছা, বিকাশবাবু—"

অনিলের কথায় বাধা দিয়া বিকাশ উত্তর করিল, "আপনি যে বারবার ভুল করছেন। আমি আপনার চেয়ে কত ছোট, তবে বিকাশবাবু বলছেন কেন?"

বালকের সরল কথায় প্রীত হইয়া অনিল কহিল, "এবার আর ভুল করব না। তুমি মনোহরবাবুর কাছে কেন এসেছ?"

বিকাশ হাতের প্যাকেটটি দেখাইয়া বলিল, "এইটে মনোহরবাবুকে দিতে এসেছি।" অনিল মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল, সেই অরক্ষণীয়া মেয়েটিরই এ কাজ। বাড়ির সকলকে লুকাইয়া দুপুরবেলা

একটি ছোট ছেলের হাতে তাহার ভাবী স্বামীকে কী উপহার পাঠাইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে যে কি দ্রব্য, বিকাশকে প্রশ্ন করিয়া না জানিতে পারিয়া অনিল ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বিকাশ মনোহরবাবু কি তোমার পিসিমাকে খুব পছন্দ করেছেন? আর, তোমার পিসিমা মনোহরবাবুকে দেখে কি বলেছেন?"

"পিসিমা আবার কি বলবেন? হ্যাঁ, বলেছিলেন একদিন, সেই যে সন্ধ্যাবেলা খুব বৃষ্টি হয়েছিল, তখন পিসিমা মাকে বলেছিলেন, কেউ যদি আমায় লাউ কুমড়োর মত নেড়েচেড়ে না দেখে বিনে পয়সায় ঘরে নিতে পারে, সে কানা খোঁড়া কুৎসিত হলেও আমি দেবতা বলে তাকে পূজো করব। দেখুন, আর পিসিমা খুব সুন্দর, ঠিক আপনার মত, তবু মনোহরবাবু বলেছেন চেহারায় জীবন নাই।"

বিকাশের গম্ভীর কণ্ঠের বিজ্ঞের মত কথা শুনিয়া এবার অনিল হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না, সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"অনিলবাবু, আজ আপনার ঘরে হাসির বান ডেকেছে নাকি? কাকে নিয়ে এত হাসি হচ্ছে?"—বলিতে বলিতে মনোহরবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া, বিকাশকে দেখিয়া বিস্মিত নয়নে রহিলেন। বিকাশ প্যাকেটটি মনোহরবাবুর হাতে দিয়া বলিল, "এইটে আপনাকে দিতে এসেছি।"

"এতে কি আছে?"

বিকাশের কথা বলিবার পূর্বেই হাস্যচ্ছলে কৌতুকভরা কণ্ঠে অনিল কহিল, "খুলে ফেলুন মনোহরবাবু, ওতে কি আছে তা এ ছেলেটি বলতে পারবে না। নিশ্চয়ই কোন ভাল জিনিস আছে—আপনার ভাবী পত্নী উপহার পাঠিয়েছেন।"

মনোহরবাবুর মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, হৃদয়টি সুখের কল্পনায় বিভোর হইয়া গেল। তাঁহার ভাবী পত্নী তাঁহাকে পছন্দ করিয়া প্রণয়োপহার পাঠাইয়াছে। কি পাঠাইতে পারে, বোধহয় কোন বই-টই, অথবা কবিতার খাতা, না হয় একখানা ফটোগ্রাফ। গর্বমিশ্রিত হাসিতে অধর রঞ্জিত করিয়া স্পঞ্জিত হৃদয়ে মনোহরবাবু প্যাকেটটি খুলিতে লাগিলেন।

কাগজের পর কাগজ খুলিতে খুলিতে যে জিনিসটি আত্মপ্রকাশ করিল তাহা মনোহরবাবুর পক্ষে সন্তোষজনক হইল না। সে একখানি চারি পার্শ্বের ফ্রেমে কারুকার্য বিশিষ্ট সুন্দর দর্পণ। তাহাতে প্রথমে নিজের মুখের প্রতিচ্ছায়া পড়িল।

লজ্জায় অপমানে মনোহরবাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত করিতে না পারিয়া তিনি আর্শিখানাকে সশব্দে মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন। সানের উপর পড়িয়া নিমেষের মধ্যেই তাহা ঝন ঝন করিয়া শত খণ্ডে চূর্ণিত হইয়া গেল।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, অনেক ছাত্রই কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আয়না ভাঙ্গার শব্দে তাহারা মনোহরবাবুর ঘরের সম্মুখে সমবেত হইল। অনিলের ইঙ্গিতে তাহাদের প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সবগুলি যুবকের মুখে হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া গেল। কেহ কেহ হাসিতে হাসিতে মেঝেয় শুইয়া পড়িল। অনিল টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে হাতের পার্শ্বে এক দোয়াত কালি ঢালিয়া আর একটা নব পর্যায়ের সৃষ্টি করিল।

এতগুলি লোকের হাসি কৌতুকের মধ্যে মনোহরবাবু রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "কী! আমায় অপমান? এর শোধ নেব তবে আমার নাম মনোহর! এতবড় আস্পর্ধা, আমায় আয়না পাঠিয়ে দেওয়া! বেহায়া নির্লজ্জ! এরা ঘরে না থেকে—"

এবার অনিল কথা কহিল। ধীর সংযত কণ্ঠে কহিল, "মনোহরবাবু, এত রাগ করছেন কেন? এর ভিতর তো রাগের কিছু নেই, বরং লজ্জার কথা আছে। আমরা আজকাল কুমারী মেয়েদের দেখবার সময় কত জুলুম করি, তাদেরও ধৈর্যের একটা সীমা আছে? এই মেয়েটি আপনাকে যে আয়না পাঠিয়েছে, এতে তার বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের যেমন পছন্দ বলে একটা জিনিস আছে, তাদের কি তা নেই? আমাদের নিজেদের চেহারা যাই হোক না কেন, আমরা তাদের চেহারায় খুঁত ধরতে চাই, কাজেই তাদের অসহ্য হয়ে ওঠে।"

চেহারার আভাসেই মনোহরবাবু পুনরায় আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া কহিলেন, "ওদের আবার চেহারা! যাদের কুলটার মত ব্যবহার—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই অনিল সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় গর্জিয়া কহিল, "চুপ করুন মনোহরবাবু! একটা ভদ্র ঘরের মেয়েদের এ রকম ইতর ভাষায় অপমান করবার কোন অধিকার আপনার নেই।"

"না, আমার অধিকার নেই? তোমার বুঝি আছে? তোমার সঙ্গে কতদিনের আলাপ অনিলবাবু?'

অনিল তীব্রস্বরে বলিল, "আপনি আর একটিও অসম্মানজনক কথা মুখে আনবেন না মনোহরবাবু। আমি স্বয়ং গিয়ে উপযাচক হয়ে প্রকাশবাবুর কাছে মেয়েটির হস্ত প্রার্থনা করব। তাঁরা যদি সম্মত হয়, তবে আমিই প্রকাশবাবুর বোনকে বিয়ে করব।"

৬

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। তখনও বিকাশকে ফিরিতে না দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা জননী মনে মনে নানা অশঙ্কা করিতে লাগিল। ক্ষণিক রাগের বশে স্বামীর অজ্ঞাতসারে অপরিচিত অনাত্মীয় যুবকের নিকটে দর্পণ পাঠান যে কতদূর অন্যায় কার্য হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া শৈলর হৃদয়ে অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা অনুভূতি হইতেছিল। তাহার সদা প্রফুল্ল মুখখানি মলিনতার ছায়ায় ম্লান হইয়া উঠিল।

প্রকাশ অফিস হইতে আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া জলযোগ করিতে বসিয়া ডাকিল, "ও বারী, বিকু কোথায়?"

ভিতরের সব ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বারুণী তাহার বধূঠাকুরাণীর কার্যকলাপ অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই দাদার কথার কোনও উত্তর না দিয়া সে সলজ্জ মুখে সেখান হইতে চলিয়া গেল। শৈল কম্পিত হৃদয়ে ছলছল নয়নে নতমুখে অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আজ আমি বড় একটা অন্যয় কাজ করেছি, তোমায় না বলে বিকুকে এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি।"

প্রকাশ স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ওঃ বুঝেছি, তাকে বুঝি বায়স্কোপে পাঠিয়েছ? '

"না গো বায়স্কোপ নয়।"

শৈল নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহা বিষাদময় মুখের দিকে চাহিয়া প্রকাশ যেন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রাঙ্গণ হইতে বিকাশের আনন্দ পূরিত কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল।

পুত্রকে দেখিয়া শৈলর মুখে আনন্দপ্রভা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ত্বরিত পদে নিকটে গিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আগে খেতে চল বিকু, খাবার খেয়ে কথা বলবি।"

"আমি খেয়ে এসেছি—বাবা আসুন।" বলিয়া আনন্দের আবেগে প্রায় লাফাইতে লাফাইতে বিকাশ পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বাহিরের দিকে লইয়া চলিল।

প্রকাশ বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিতে বিস্মিত হইয়া দেখিল, একটি সুশ্রী বালক চেয়ারে বসিয়া আছে। প্রকাশকে দেখিয়া যুবক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, "আমার নাম শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়। আমি আপনার কাছেই এসেছি।"

"হ্যাঁ, আপনাকে সেদিন, মনোহরবাবুদের মেসে দেখেছি।—আপনার পরিচয়ও সেখানে শুনেছি।"—বলিয়া প্রকাশ অনিলকে বসিতে বলিয়া নিজেও উপবেশন করিল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। অনিল কথা কহে না দেখিয়া প্রকাশ একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমার কাছে কি আপনার কোন দরকার আছে?"

অনিল সলজ্জ কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে একটু দরকারেই এসেছিলাম। আপার একটি বিবাহযোগ্য বোন আছেন। যদি আমায় অনুপযুক্ত"—অনিল আর কিছু বলিতে পারিল না।

প্রকাশ আনন্দ বিহ্বলকণ্ঠে কহিল, "আপনাকে অনুপযুক্ত মনে করব অনিলবাবু! ভগবান আপনাকে সুখী করুন, কিন্তু আমি বড় গরীব, টাকা-পয়সা নেই।"

"আপনার টাকা পয়সা নেই বলেই এসেছি, প্রকাশবাবু।"

"আপনার খুব উঁচু মন, তাই ওকথা বলছেন। কিন্তু আপনার বাবা কি এতে সম্মত হবেন। আমি আমার দায় থেকে উদ্ধার হবার জন্যে আপনার পিতা-মাতাকে মনঃক্ষুণ্ন করতে চাইনে।"

অনিল ধীরে ধীরে কহিল, "সে চিন্তা আপনার করতে হবে না। আপনি আমার বাবা-মাকে যখন দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন তাঁরা এজগতের মানুষ নন। আমার মন খুব উঁচু বললেন, তাঁদেব তুলনায় আমি অতি নীচমনা। তাঁদের আদর্শ আমি অনুকরণ করাবার চেষ্টাই করি, পেরে উঠিনে। আমার এ কার্জে তাঁরা অসন্তুষ্ট না হয়ে সন্তুষ্টই হবেন।"

সুখের আবেশে কৃতজ্ঞতার বসে প্রকাশের চক্ষে জল আসিল। সে গদগদ কণ্ঠে কহিল, "তুমি দেবতা! তোমায় কি বলব ভাই, চিরজীবী হও আশীর্বাদ করি। তাহলে বারুণীকে নিয়ে আসি?"

অনিলের বড় সাধ হইতেছিল, একবার দেখিয়া যায়। যে মেয়েটির এত সাহস, এত নির্ভীকতা, যে অপমনকারীকে অপমান ফিরাইয়া দিতে জানে, না জানি তাহার মুখখানি কত সুন্দর! হঠাৎ অনিলের মনে পড়িল বিকাশের কথা—"পিসিমা বলেছিলেন বাগানের লাউ কুমড়োর মতন করে না দেখে কেউ যদি বিনে পয়সায় আমায় ঘরে নিয়ে যায়" ইত্যাদি।

অনিল প্রলোভন জয় করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "না প্রকাশবাবু, আমার দেখবার প্রয়োজন নেই।"

৭

বৈশাখের শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী। বিবাহভবন রাশি রাশি পুষ্প সৌরভে আমোদিত। দক্ষিণা বাতাস উন্মাদ আবেশে আকুল। সানাইয়ে সাহানা রাগিণীর মধুর আলাপনের মধ্যে শুভদৃষ্টির সময় পুরমহিলাগণ কর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া, ফুটন্ত ফুলের মত বারুণী তাহার নয়ন দুইটি উন্মীলিত করিযা দেখিল, চন্দন-চর্চিত সরস সুন্দর একটি তরুণ দেবতা উৎসুক নয়নে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। চারি চক্ষের সম্মিলন হইল। প্রথম দৃষ্টিপাতের সঙ্গেই কিশোরী তাহার হৃদয় সঞ্চিত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি অনিলের পায়ে অর্পণ করিয়া, হর্ষোচ্ছ্বাসে নয়নদ্বয় মুদিত করিল।

রূপান্তর

শ্রীসুনীতি দেবী

গত রাতের জড়ানো খোঁপাটি কখন আলগা হয়ে পিঠের উপর দীর্ঘ বেণী হয়ে ঝুলছিল কল্যাণী তা টের পায়নি। তেমনিভাবেই শিউলিতলায় ফুল কুড়োচ্ছিল। জুতার শব্দে মুখ তুলে দেখে—বেড়ার ধার দিয়ে কে এক অপরিচিত তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চলে গেল। একটু বিস্ময় ও একটু লজ্জায় সে সরে গেল বটে, কিন্তু প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় তাপ পুষ্পকোমল মুখের ছাপ অনিলের মন থেকে সরাতে পারল না।

শহুরে ছেলে অনিল এসেছিল পল্লীতে তার এক বন্ধুর বাড়িতে ছুটি কাটাতে। সেখানে যখন বাঙালী প্রেমের দেবতা সাতকুল মিলিয়েই প্রেমে পড়িয়ে দিলেন, তখন সে কলকাতায় ফিরে বন্ধুদের দিয়ে বাপের কাছে মনের কথাটা জানাতে দেরী করল না। তার পিতা জীবনধারণ ও ছেলের পড়ার খরচের জন্যই বোধহয় ডাক্তারী একেবারে ছাড়েননি, নয় তো বিপত্নীক হয়ে পর্যন্ত সংসার ত্যাগীর মতই থাকতেন। তিনি উদাসীনভাবেই মত দিলেন। পিতৃ-মাতৃহীনা, মামাদের অন্নে পালিতা কল্যাণীর জীবনে অঘটন ঘটল। বিনা চেষ্টায়, বিনা পণে তার বিবাহ হয়ে গেল। মামারা খুশী হলেন, মামীরা টিপ্পুনী কেটে বললেন, "বুড়ো মেয়ের কত নভেলী রঙ্গ জানা ছিল, কই আমাদের একটা মেয়ে পুরুষ মানুষেব সামনে অমন ফাঁদ পাতুক দেখি। ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মবি।"—

যাক, 'চতুর্দশ বসন্তের মালাগাছি' গলায় পরে অনিল কলকাতায় ফিরল। কল্যাণী মামাবাড়ি থেকে চিরদিনের মত বিদায় হল।

লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে সরস্বতীর পূজার উপকরণগুলি অনিল অবহেলায় ছড়িয়ে ফেলল। ঝি আর ঠাকুর মিলে এতদিন যেমন করে সংসার চালাচ্ছিল, তার কোন ব্যতিক্রম হল না। অনিল কল্যাণীকে কোন কাজ করতে দিত না। কল্যাণীব জীবন এখানে স্বাধীন, মুক্ত। শ্বশুর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকেন, আর কেউ নেই যার জন্য তাকে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে, দু'টি নবীন জীবন প্রেমের স্রোতে গা ঢেলে দিল। কল্যাণীর কাছে এ একেবারে নূতন জগৎ। শুধু তারই জন্য এত আয়োজন, এত আদর—একজন লোকের সে সর্বস্ব—এ যেন স্বপ্নাতীত সুখ। অনিলের সোহাগ বাধা-বন্ধন সীমাহারা হয়ে কল্যাণীকে ঘিরে যেন এক নিমেষে যেন নিঃশেষ হতে চায়, কী সে অবেগচঞ্চল দিবস ও রাত্রিগুলি।

বন্ধুরা দু-চারদিন সবুর করে অনিলকে আক্রমণ করল। বলল, "বউ কি আর কারো হয় না কি? সব প্রেম একসঙ্গে শেষ করলে চলবে কেন? দেউলে হয়ে যাবি যে"—

অনিল তাদের সঙ্গে পেবে ওঠে না, এক একদিন সন্ধ্যায় বেরিয়ে যেত। কল্যাণীর সেদিন সারা সন্ধ্যা যেন কাটতে চায় না।

একদিন এমনি এক সন্ধ্যায় কল্যাণী গালে হাত দিয়ে জানালার ধারে বসে পথ চেয়ে আছে—হঠাৎ পিছন থেকে ঝর্ণার কলহাস্যে ঘর ভরিয়ে কে যেন বলে উঠল, "বলি ও নতুন বৌ, একা বসে হচ্ছে কি?"

কল্যাণী চমকে চেয়ে দেখে রাজ্যের রূপ দিয়ে গড়া একখানি প্রতিমা, ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে।

এবারে সে একেবারে কল্যাণীর কাছে এসে বসল। বলল, "পাশের বাড়িতে একা একা থাকি, তোমায় আসতে দেখে ভাবলাম যাহোক সঙ্গী জুটল। ওমা! তা তোমার নজরই নেই। আমিই কি আসতে ফুরসুৎ পাই? তোমার কত্তাটি তো নড়বার নাম করে না। কি তুক করেছ ভাই? আমায় একটু শিখিয়ে দেবে?"

কল্যাণী হেসে ফেলল। তারপর আর কি—নিমেষে দু'জনের মধ্যে নিবিড় প্রণয় জন্মে গেল। খানিক গল্পের পর কল্যাণী বলল,—"আমি তোমায় তাহলে স্বর্ণদি বলেই ডাকব, কেমন?"

স্বর্ণ মুখখানা ভার করে বলল, "তা তো বলবেই, না হয় আমার সাত বছর বিয়ে হয়ে গেছে, না হয় আমি তোমার চেয়ে দু'-তিন বছরের বড়, তোমার নয় সবে বিয়ে হয়েছে, তুমি না হয় কচি খুকী, তাই বলে 'দিদি' বলে আমায় বুড়ি করে দেবে? সে হবে না। এস আমরা সই পাতাই।"

বাস অমনি তাই ঠিক হয়ে গেল, আর দুই সইতে মনের কথা বলাবলির আর শেষ রইল না। ঘুরে ফিরে সেই স্বামী-সৌভাগ্যের কথা। কল্যাণী বলল, "তুমি ভাই কী সুন্দর দেখতে, তোমার বর তোমায় খুব ভালবাসে, না?"

স্বর্ণ অমনি বলল, "ও আমার পোড়া কপাল, আমি নাকি সুন্দর! তোমার বরকেই জিজ্ঞাসা কর না কে বেশি সুন্দর, তুমি না আমি?"

কল্যাণী লজ্জায় লাল হয়ে বলল, "যাও তুমি ভারী দুষ্টু।"

স্বর্ণর হাসিতে আবার ঘরের অন্ধকার কোণাগুলিও যেন হেসে উঠতে লাগল।

এমন সময় অনিলের গলার স্বর বাইরে শোনা যেতেই স্বর্ণ পালাল, বলে গেল, "আর জানালা খুলে প্রেম করো না, আমি সব দেখতে পাই কিন্তু।"

অনিল ঘরে ঢুকে বলল, "বেশ বেশ, আমি ভাবছি তুমি একা কষ্ট পাচ্ছ, তাই তাড়াতাড়ি ফিরছি, আর তুমি এদিকে এমন বন্ধুত্বে মগ্ন যে কখন ফিরেছি টেরই পাওনি। নীচে ঠাকুরের সঙ্গে কত চেঁচামেচি করে তোমাদের হুঁশ আনতে হল।"

তারপর দু'দিন অনিল বেরুল না। শেষে বন্ধুরা একদিন বাইরে থেকে ডেকে বলল, "ও বৌদি, দড়িটা একটু লম্বা করে দিন, ওকে চড়িয়ে আনি। আবার ফিরিয়ে দেব ঠিক।"

এসব শুনে কল্যাণী লজ্জায় মরে যেতো, জোর করে অনিলকে বাইরে পাঠিয়ে দিত।

একদিন কথায় কথায় স্বর্ণ বলল, "তুমি ভাই কেমন রোজ সেজেগুজে থাক, বেশ লাগে দেখতে।"

কল্যাণী বলল, "তুমি সাজলে পার।"

স্বর্ণ হতাশ ভাব দেখিয়ে বলল, "সে কথা বল কেন? সাজতে কি আমার অসাধ? বিয়ে হয়ে পর্যন্ত ভাবলাম এইবার দু'খানা গয়না-কাপড় পরবো, ভাল-মন্দ পাঁচরকম খাব-দাব, তার জন্যেই তো বিয়ে। নয়তো বাপ-মা কি শুধু শুধু অম্বলরুগী মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে? বয়সকালে একটু সখ মেটাবার জন্যেই তো বিয়ে। তাও আমার কপালে হল কই?"

কল্যাণী বিবাহ সম্বন্ধে সইর এমন হীন আদর্শের কথা শুনে দুঃখিতভাবে বলল, "ছিঃ ভাই, স্বামীর কথা অমন করে বলতে নেই? বিয়ে বুঝি শুধু সাজগোজ করা?—আর তোমার সাজতে সখ হলে কি আর তিনি বারণ করবেন?"

স্বর্ণ বলল, "তবে শোন, তোমার দেখাদেখি কাল বিকেলে দিব্যি রঙিন শাড়িখানি পরে, টিপটি কেটে, মুখে একটু পাউডার ঘসে বসে আছি। ওমা! এসে বলে কিনা, 'থিয়েটারে যাবার উদ্যোগ হচ্ছে বুঝি, ও সব আমি পারব-টারব না।'—বলেই চোখ বুজে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তবেই

বোঝ কার জন্যই বা সাজা? দেখবে না, তারিফ করবে না, শেষে উল্টো চাপ— কিনা থিয়েটারে যাবার জন্য সেজেছি। টান মেরে সব খুলে ফেলে, এমন বকুনিটাই দিলাম। আমার চেঁচানিতে বাড়িতে কাক-চিল বসতে পেল না, কিন্তু তার কানে কি কিছুই গেল?"

বিস্মিত হয়ে কল্যাণী বলল, "স্বামীকে বক?"

স্বর্ণ বলল, "বকি না? একশবার বকি। শুধু বকি, পারলে মারি। সে ছেলে ঠেঙিয়ে খায়, আমি তাকে ঠেঙিয়ে খাই।"

কল্যাণী জিভ কেটে বলল, "ছিঃ ছিঃ।"

স্বর্ণ আড়চোখে কল্যাণীর মুখের ভাব দেখে কোনমতে হাসি চেপে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, "আমায় যদি ভালবাসে তবে কি আর বকিঝকি? তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখাই, বলি অনিলবাবুর মত হও, তা কোন গ্রাহ্য করে না। আমি যা শক্ত মেয়ে, নয় তো কবে হাত-ছাড়া হয়ে যেত। তোমরা সুখী লোক, আমার দুঃখ কি বুঝবে বল।"

কল্যাণীর মন স্বর্ণর প্রতি করুণায় ভবে উঠল। সে বলল, "আচ্ছা সই, তোমায় কেমন করে না ভালবেসে থাকে?"

স্বর্ণ এবার হাসিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলল, "না, তোর সঙ্গে দুষ্টুমি করেও সুখ নেই। ঠাট্টাও বুঝিস না।"

২

স্বচ্ছন্দ জীবনগতির মাঝখানে হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। অনিলেব বাবা দু'দিনের জ্বরে মারা গেলেন। ছেলের জন্য এমন কিছু রেখে গেলেন না যাতে দিনের পব দিন বসে খাওয়া যায়। নব পরিণীত দম্পতি এক চমকে স্বপ্নরাজ্য থেকে কঠিন পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে পড়ল। অনিল বি. এ. পরীক্ষা দিতে ছুটল। বইগুলি ঝেড়েমুছে কল্যাণী বারবার তাতে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "মা ওঁকে পাশ করিয়ে দাও।" কিন্তু সরস্বতীর কৃপা হল না। অনিল ফেল হল, আর সঙ্গে সঙ্গে বহু কষ্টে এক সদাগরী আপিসে সামান্য মাইনের একটা কেরাণীগিরি জুটিয়ে নিল। অনিলের কবি-কল্পনার সঙ্গে এ জীবন খাপ না খেলেও, পেটের দায়ে তাকে এটা মাথা পেতে নিতে হল।

ঝি, ঠাকুর বিদায় নিল। এ বাড়িতেও আর চলে না। অনিল অল্প ভাড়ায় একখানি ঘর খুঁজছে শুনে স্বর্ণ বলল "আমাদের একতলার একখানি ঘর অমনি পড়ে থাকে, তোমরা সেইখানে এসো।" কল্যাণী খুব খুশী হয়ে অনিলকে রাজি করাল। অত অল্প ভাড়ায় অন্য জায়গায় ঘর পাওয়াও যেত না। ঘবের জানালার ধারে একটা শিউলি গাছ আছে। সেটা দেখে অনিল বলে উঠল, "বাঃ কি মজা, ফুল ফুটলে আবার তুমি তেমনি করে কুড়োবে, আর আমি চেয়ে দেখবো, তোমায় দেখাবে যেন মূর্তিমতী শারদলক্ষ্মী।" এমনি করে পরিবর্তিত জীবনের কষ্টটুকু তারা আনন্দ দিয়েই বরণ করে নিল। অনভ্যস্ত দুঃখের মধ্যে অনিলের সুখ—কল্যাণীর যত্নময় সেবা, সে যে এমন সুনিপুণা গৃহিণী তা অনিলের জানা ছিল না। অনিল মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করলে কল্যাণী হেসে বলত, "বিয়ের আগে পর্যন্ত কাজই তো করে এসেছি, এতে আর বাহাদুরী কি?"

অনিল বলত, "তোমার হাতের সেবা বড় মিষ্টি লাগে, তবু করতে দিতে কষ্ট হয়। আমার হাতে পড়ে তুমি একটু বিশ্রাম করতে পাও না।"

কল্যাণী ছলছল চোখে অনিলের মুখ চেপে ধরত—তার এই সুমিষ্ট প্রতিবাদটুকু অনিল প্রাণ ভরে উপভোগ করত।

কল্যাণী ভারী হিসাবী হয়েছে। অধিকাংশ দিন নিজের ভাগের তরকারিটুকুও ও-বেলার জন্য রেখে ঝাল, টক যা হয় দিয়ে পাতের ভাতগুলি শেষ করত। অনিল তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে যায়, টের পায় না। নিজের কোন ভাগ এতটুকু কমিয়ে অনিলের ভাগ বাড়ানো যায়, এই তার চিন্তা। একদিন স্বর্ণ দুটো পান দিয়েছিল, কল্যাণী কি ছুতোয় নীচে এসে সে দুটো তুলে রাখল। বাজে খরচ কমাতে গিয়ে পান আনা তাদের বন্ধ ছিল। অথচ অনিল পান খেতে কী ভালবাসে, বিকেলে অনিল পান খেয়ে কত খুশী হয়ে বলল, "আপিসে মাঝে মাঝে বাবুরা পান দেয়, তোমার খাওয়া হয় না ভাবতাম। যাক, তোমার সই থাকতে ভাবনা নেই দেখছি"—। বলেই চোখ পড়ল কল্যাণীর তাম্বুল রাগলেশহীন ঠোঁটের উপর, অনিল বলে উঠল, "তুমি বুঝি খাও না? পানের দাগ দেখছি না যে!"

কল্যাণী বলল, " সে ধুয়ে ফেলেছি। কখন দিয়েছিল।"—মিথ্যা বলতে গিয়ে হেসে ফেলতেই অনিল তাকে বাহুপাশে বন্দী করে বলল, "ও দুষ্টু। অন্যায় করে আবার মিথ্যা কথা।"

কল্যাণী বলল, "দোষের জন্য এরকম শাস্তি পেলে দোষ যে রোজই করব।"

স্বামীর জন্য এইটুকু করতে পারলে এত খুশী করা যায় ভেবে কল্যাণীর আনন্দ আর ধরে না, এমনি করে দারিদ্রের মধুরতাটুকু তারা ভোগ করত, বিষটুকু গায়ে মাখত না।

কল্যাণীর নিপুণ হাত দু'খানি অভাবের মধ্যেও লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে রাখত। অনিল একদিন বলল, "আমার মত সৌভাগ্য কারুর নেই, আমার পরিষ্কার কাপড়-চোপড় আর চেহারার চাকচিক্য দেখে আপিসের বন্ধুরা হিংসায় মরে। বৌয়ের মুখঝামটা খেয়ে অর্ধেকের দিন কাটে। তার ওপর আমাদের মতন গরীব কেরাণীরাও কতজনে বৌয়ের গয়না গড়াবার ভাবনায় পাগলপারা। আর তুমি তো একখানা কাপড়ও চাও না।"

কল্যাণী উত্তর দিল, "অভাব থাকলে তো!"

অনিল বলল, "না, অভাব আবার কিসের? রাজার হালে তোমায় রেখেছি।"

কল্যাণী বলল, "না তো কি!"

অনিল একটু চুপ করে থেকে বলল, "সত্যিই যা-ই বল, পৃথিবীতে তোমার মত কেউ নেই।"

কল্যাণী মনে মনে জানত তার মত কেন, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নারী জগতে শতসহস্র আছে, তবু এই কথাটি তার অন্তর মধুতে ভরে দিল। প্রিয়তমের কাছে সে অতুলনীয়া, এর চেয়ে সুখ তার কল্পনারও অতীত।

অনিল আবার বলল, "তোমার কোন সাধ নেই কল্যাণী?"

কল্যাণী মাথা নীচু করে বলল, "তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে পারলেই আমার সব সাধ মিটবে।"

জানি না এ কথা শুনে অদৃষ্ট দেবতা অলক্ষ্যে হেসেছিলেন কিনা।

৩

প্রথম যখন আপিসে ঢোকে তখন অনিলের বিশ্বাস ছিল, সে শীঘ্রই এই যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু অন্ন জোটাবার মত কাজ আর কোথায় পেল না। শেষে অনিল কেমন করে তার চির অবজ্ঞাত কেরাণী জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত কেরাণীকুলের সর্বনাশা নেশা রেস খেলাও তাকে পেয়ে বসল। কল্যাণী প্রথম প্রথম কত বোঝাতো, শেষে কান্নারূপ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করল, অনিল কখনও কখনও অনুতপ্ত হয়ে বলত, "আচ্ছা এই শেষ।" কখনও

জিতে কখনও হেরে কতবার যে প্রতিজ্ঞা করত, আর এ সবে সে যাবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব হত না।

এই সময়ে কল্যাণীর জগতে আবার নূতন রং ধরল, সে নাকি মা হবে। অনিল যখন আনন্দ করতে গিয়েও বলল, "খরচপত্র বড্ড বাড়বে তাই তো?"—তখন কল্যাণী অনাগত সন্তানের পক্ষ নিয়ে অনিলের উপর ভারি অভিমান করল, ও মনে মনে অজাত শিশুটিকে আদরে ডুবিয়ে ফেলল।

এই সময়টা তার স্বামীর সঙ্গ তাকেযথেষ্ট তৃপ্তি দিত না, অনিলকে কাছে পাবা র ও তার আবেগের আদর-যত্ন পাবার তৃষায় তার মন ভরে উঠত। আবার অনিল শিশুটির কথায় তেমন উৎসাহ দেখায় না বলে অভিমানে সে আলোচনা বন্ধ করে ফেলত। অনিল আজকাল ক্রমশ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে—শুধু খাওয়া আর শোওয়া বাড়িতে হয়, অধিকাংশ সময় ছুটির দিনটাও বাইরে কাটায়। যে সময় মনের শান্তি সবচেয়ে প্রয়োজন, সেই সময়টা কল্যাণীর কেবল উদ্বেগের মধ্যেই কাটতে লাগল। আর এতদিন এই শান্ত কোমল মেয়েটির স্বভাবে যা মোটেই ছিল না, সেই খিটখিটে ভাব দেখা দিল।

কল্যাণীর প্রাণপণ প্রয়াস ছিল স্বর্ণ যেন এসব জানতে না পারে। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বর্ণর চোখে অনিলের পরিবর্তন ধরা পড়তে কি দেরী হয়? স্বর্ণর বুকটা বেদনায় ভরে উঠত। স্বামীর অনন্যনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী স্বর্ণ সইর সৌভাগ্যে কত সুখীই ছিল। সে প্রথম প্রথম অনিলের অতটা আঁচল ধরা ভাব পছন্দ করত না, কিন্তু তাও যে এ অবহেলার থেকে ভাল ছিল। কেমন করে অনিল এত বদলাতে পারল তা সে ভেবেই পেত না। অনিলের মন ভোলাবার জন্য সন্ধ্যা হলেই সে নানা ছুতায় কল্যাণীকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিত। দু-একদিন আপত্তি করে কল্যাণী কিছুই বলত না, কিন্তু সুযোগ পেলেই অনিল ফিরবার আগেই সব খুলে ফেলত। অমন করে ফাঁদ করে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তার যেন মাথা কাটা যেত।

চুপ করে থেকে থেকে একদিন কল্যাণী অনিলকে বেশ দু' কথা শোনাবে ঠিক করল। অনিল তাসের আড্ডায় বেরুবার উদ্যোগ করতেই কল্যাণী বিরক্তভাবে কি বলল, অনিল পাল্টা জবাব দিল, "তুমি কেবল পেঁচার মত মুখ করে থাকবে, তাই যতক্ষণ পারি বাইরে কাটাই।"

কল্যাণী আহত পক্ষীর মত বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। অনিলও ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর বোঝাপড়ার ধুম, কল্যাণী বলল, "তুমি আর আগের মত নেই, মোটেই আমায় দেখতে পারছ না" ইত্যাদি।

অনিলও অনেক কিছু দেখিয়ে স্বপক্ষ সমর্থন করল, তার সময় কই দু'দণ্ড বাজে কথা বলবার, তা ছাড়া কল্যাণীও কি বদলায়নি, তাছাড়া বয়সও তো বেড়েছে, তাছাড়া আরও কত কী। শেষে কল্যাণীর যুক্তি —দুঃখ-দারিদ্র লাঘব করবার জন্যই তো প্রেম ও তার নিতান্ত প্রকাশ দরকার—একথা মেনে নিলেও অনিল কার্যত খুব বদলাল না।

নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে মানুষের মন যদি বদলায় তাতে দোষ কি? একদিন যে অফুরন্ত প্রেম কপালে জুটেছিল তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়াই তো উচিত, তা কেন চিরদিন থাকবে না বলে আবদার করা কি বিজ্ঞের কাজ? দর্শন শাস্ত্রের এত কথা কল্যাণীর জানা ছিল না। জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বয়সও তার তখন হয়নি, বিজ্ঞতার বালাইও ছিল না। কাজেই কল্যাণী নিজের অদৃষ্টের উপর রাগ করত, তাতে অদৃষ্টের ক্ষতি হল না, তার নিজের বুকটাই ভেঙে-চুরে শত খান হতে লাগল।

যেদিন কল্যাণীর মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হল, সেদিন স্বর্ণকেই সব ব্যকথা করতে হয়েছিল। সারাদিনে অনিলের দেখা পাওয়া যায়নি, রেসে হেরে রাত্রে যখন ফিরল তখন সংবাদ পেল কি না মেয়ে

হয়েছে। বাঙালী পিতৃপিতামহের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মনের সংস্কারটি যে মেয়ে হাওয়ার খবরে উৎফুল্ল হল না, তা বলাই বাহুল্য। টাকাও সেদিন অনেক হেরেছিল। যে কারণেই হোক শ্রান্ত কল্যাণীকে দুটো মিষ্ট কথা বলবার অবকাশ আজকার দিনেও তার হল না।

এমনি করেই ধীরে ধীরে একটি বছর ঘুরে গেল, শেফালী আপন মনে ফুটে ঝরে গেল, কেউ খোঁজ নিল না। কল্যাণীর শারীরিক দুর্বলতার উপর মানসিক অশান্তি জুটে তাকে যেন আর সেরে উঠতে দিল না। এখন ঝগড়া না করে যখন তখন কেঁদে-কেটে সে অনিলকে উত্যক্ত করে তুলত। বুঝত না, আগে এক ফোঁটা চোখের জল দেখলে যে অধীর হত, সে আজকাল এত বুক ভাঙ্গা কান্নায় কেমন করে উদাসীন থাকে। আগে অত না পেলে, না পাওয়ার ব্যথা কি এমন করে বাজত? রাণী কখনও ভিখারিণী হয়ে বাঁচে? এই রকম নানা চিন্তায়, নিরর্থক অভিমানে, আপনাকে সে আপনি কষ্ট দিত। আহা অনিল তবু যদি মেয়েটার পানে ফিরে তাকায় তাহলেও বুঝি কল্যাণী শান্তি পায়।

তারপর আকাঙ্ক্ষাও রইল না, অভিমানও রইল না—রইল শুধু বিরাট শুষ্কতা ও শূন্যতা, মরুভূমির জ্বালাও বুঝি তার মত উগ্র নয়।

কল্যাণীর অবহেলায় অনিল আরও দূরে গেল। স্বর্ণের কাছেও কল্যাণী মনের দ্বার রুদ্ধ করল। তার একান্ত আপনার রইল শুধু একটি মেয়ে। লুকিয়ে তাকে বুকে চেপে কত কথা বলত, তার শিশু তার কোমল হাতখানি মায়ের মুখের উপর বুলিয়ে ডাকত— "মাম্মা"।

কল্যাণী যখন শয্যা নিল, তখন অনিল তো দূরের কথা, স্বর্ণও ভাবেনি—প্রদীপ এত শীঘ্র নিভবে। তাই চিকিৎসার ব্যবস্থাও কিছু হয়নি। যেদিন স্বর্ণ অবস্থা সঙ্কট বুঝতে পারল সেদিন ব্যাকুল হয়ে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে বলল, "আমার সইকে বাঁচাও"। তিনি ডাক্তার ডেকে আনলেন—ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল।

উদ্বেলিত উশ্রু চোখে চেপে স্বর্ণ কল্যাণীর মুখের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, "সই, বড় কষ্ট হচ্ছে কি? অনিলবাবুর আপিসে খবর পাঠাব?"

অতি শ্রান্ত কণ্ঠে কল্যাণী উত্তর করিল, "না ভাই, স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরে সতীর স্বর্গে যাবার ইচ্ছা নাই। ভগবানের কোন দয়ার ভিখারী আমি নই"।

স্বর্ণর চোখের জল বাধা না মেনে উছলে উঠল। চোখ দু'টি ঈষৎ খুলে কল্যাণী বলল, "না না, ভগবানের দয়া আছে বৈকি। না হলে কি তোমায় পেতাম? মেয়েটাকে দেখো ভাই।"

তারপর শেফালী বনের অশীরীরী কামনা যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

লোকেরা কল্যাণীকে যখন পথে বার করে 'হরিবোল' দিল, তখন দু'টি নারী বলাবলি করে গেল, "আচ্ছা, সৌভাগ্যবতী সতী, নোয়া সিঁদুর নিয়ে চলল।"

কথাটা শুনেই স্বর্ণ শিউরে উঠে দুই কান ঢেকে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

দর ও দস্তুর

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

"পর, পর মা, গয়না পর—"

সেই গল্পটা মনে পড়ে, ছোটবেলায় শুনেছিলাম—সবটা ভাল মনে নেই। মনে হয় সেই মেয়েটা কাঁদতে লাগল। প্রকাণ্ড অজগর সাপটা তাকে জড়িয়ে সমস্ত শরীর সমস্ত হাড় অস্থি চূর্ণ করে দিতে লাগল দরজা বন্ধ—ঘরে সে আর সেই সাপ।

ব্যাকুল হয়ে কেঁদে মেয়ে বলে, 'মা আর গয়না পরব না'—বন্ধ দরজার বাইরে ঠাকুমা. দিদিমা, মা সবাই বলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'পর, পর মা, গয়না পর';—

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল—গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাদের কোণে এসে বসে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

সূর্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ—একদিকে গোটাকতক সোনালী পাড় কাপড়ের মতন পড়ে আছে। তা থাক। অন্য সময় ঐ কাপড়ের পাড়ের শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে, মেজ বোনকে ডাকে— আজকে তার চোখে ওসব শোভা হিসেবে পড়ছিল না এমনিই চেয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল, ঐ গল্পটা 'পর, পর মা, গয়না পর'। আর সেই মেয়েটা তারপর মরে গেল। গেল তো! বেশ হল, বেশ হয় সে-ও যদি মরে যায়।— রোজ রোজ আব কেউ দেখাতে পারে না।

আজকে ওরা আবার বড়রা কেউ ছিল না—সব নাকি ছেলেটির বন্ধুরা!—ওকে ইংরাজী, বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে, ও লিখতে জানে? কেন ছোটকা তো বললেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেন্ড ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি—বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়িতে নেই কিনা—, তারপর বললে, 'গান জানে?'

কাকা বললেন, 'জানে। কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কিনা—'। একটা ছেলে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, 'ছেলেমানুষই মেয়ে হয় মশাই—'

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল—ছাই হল গান। অত ছাই ও কোনদিন গায় না। এমনকি বিচ্ছিরী করে চেষ্টা করলেও ওরকম হয় না। কাকা কেন বললেন না—গান ও জানে না।

ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ওরা নাকি সভ্য—ওরা নাকি সব বিদ্বান।—. ওদের বোনকে এদের কেউ অমনি করে দেখে।—

সেজদি এসে কাপড় কেচে—ছাতে এল কাপড় শুকোতে দিতে।

'ওমা তুই বুঝি এখানে বসে।—আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন। খাবার খাসনি যে! কাঁদছিস কেন?'

ও রাগ করে বললে, 'কই কেঁদেছি'? চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এলো'।

'ওরে, এ দুঃখ সবারি করতে হয় রে! তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বললে, 'চুলটা খুলে দেখাননি কেন মশাই।' বড় খোঁপা—দেখে ভাবলে বোধ হয় গুছি দিয়ে চুল বাঁধা—

'ওতো ভাল—সেই প্রতিমা—আমার ননদের মেয়ে রে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো?—তার আবার দেখতে এসে সব বলে, 'মশাই হাতে মনে হচ্ছে 'কড়া' পড়েছে।' নন্দাইয়ের রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বললেন, 'টিপে দেখুন হাত'। ছেলেটি এম. এ. পাশ করেছেন, বাড়ি আছে নিজের, বাপ মা আছে, কি করা যায়, সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাত দুটো দেখিস তার! শাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ তাল তাল বাটনা বাটে, জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দু'খানা যেন কার!—তা বলে কড়া পড়া তখন কে যেন বলছিল—কে জানে!'

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে, 'দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে যাঁরা হাঁটালে!'

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই হাসলে, 'হাঁটালেন তো বাড়ির কেউ নয়—মামাশ্বশুর'—

নিভা আরও অবাক হয়ে বললে, 'জামাইবাবুর মামা তো! তা তুমি সেখানে গিয়ে রাগ করনি, কিন্তু বলনি কাউকে? জামাইবাবুকেও না?'

'ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে—'

নিভার রাগে গা জ্বলে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে।

পাশের বাড়ি ছাতে কে উঠলেন, বললেন, 'তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বললে?'

মেজদির উপদেশ-স্রোত থামল কথার গন্ধ পেয়ে—পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।—'হ্যাঁ, দেখে তো গেল—এখন কি বলবে, কিছুই বলেনি। (ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কিনা তাই, সহজে কি পছন্দ করে?—বাবা এই দু'টি ছোট বোনের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই।—যে দেখছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রংটি যদি একটু ফর্সা হত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখলে, কত কি—'

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গী করে বললেন, 'লেখা নিয়েই বা কি করবেন—গানেই বা কি করবেন? সেই মুনীয়ার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোট পিসিমার মেয়ে? কী চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে। তার রং তেমন ছিল না—ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে—বিয়ে তো হল—এখন শুনি না কি, বর কারুর কাছে, কোনো জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করে না। বড্ড খেঁকিয়া! ক্যাঁক করে বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি!—কোনোখানে পাঠায় না—মেয়ে-যজ্ঞিতেও গাইতে বারণ—কাজের বাড়িতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।'

মেজদি বললেন, 'অথচ মরতে সব বিয়ের সময় সব জিজ্ঞেস করে।—যার হাতে পড়বে সেই যদি ও-সব না চায় ছাই দরকারেও লাগে না।'—

'তা দরকার লাগে না বটে, কিন্তু সুনীলার মেয়েটি যে কী চমৎকার গায়—' মা এলেন, কথায় বাধা পড়ল।

'হ্যাঁরে নিভা কই?—কি সব ঢং বল তো।—খাবার খেলে না অবধি।—চিরকালকার জিনিস, তারা নিয়ে যাবে—দেখবে না? দেখছে তো মেয়ে অমনি গলে গেলেন।'

মার পিছন দিয়ে নিভা নেবে গেল।

'ভাল লাগে না মানি, তা কী করব ছাই?'—এক সঙ্গে এত কথা এবং এত রাগ গলার কাছে জড় হল যে মার আর কথা বেরুলো না মুখে—

অনেক রাত্রি।

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে। মার কাজ সারা হল।—

পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে—নিভাদের বাবা এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চুরুট খাচ্ছেন।—বেশি চিন্তিত হলেই তার সিগারেট খাওয়া অভ্যেস—অন্যমনে প্রতিদিনের দ্বিগুণ খান সেদিন।

নিভার জননী জলের ঘটি, দুধের বাটি, পানের ডিবে, মিছরী, বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।—একে একে সবগুলি যথাস্থানে নামিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

'তারপর?'—

চুরুটটা হাতে নিয়ে স্বামী বললেন, 'কিসের?'—

'এই যে গো—নিভাকে দেখে কি বললে?—পছন্দ করেছে ছেলে?'

স্বামী অন্যমনে দু'টানে সেটাকে টেনে আধখানাই ছুঁড়ে বাইরে ফেলে বললেন, 'কাল ওর বোনেরা, মা আর ঠাকুমা আসবে দেখতে— ছেলের ছোট ভাই ছিল, বলে গেল'—

মাতা-পিতা দু'জনেই—জানালার পথে রাস্তার গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

অবশেষে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে মাতা বললেন, 'মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—কতবার যে সব দেখলে'—

বাপ চুপ করেই রইলেন।

মা আবার বললেন, 'ওরা না কি বলে—আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে।'

নিভার পিতা অন্য মনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন। বললেন, 'মিছে বলে না।'

খানিক চুপ করে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা ঘুমুচ্ছে?'

মা বললে, 'হ্যাঁ'।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো, ক্লান্ত স্বামী ঘুমুলেন।

নিভার মার চোখে ঘুম এলো না। মনে হয়, বারে বারে নব নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখেছেন, অসম্মান, সম্মান, অবমাননা, অত বোঝে না মন—শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন-আত্মীয়—কত কথা।

কারও বা গহনা, কারও বা গহনার ওজন, কারও বা গহনার রং, কারও বা নিজেরই রং—কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতা-মাতা। যা হোক, তা হোক অমনিই তো হয়ে থাকে—বলে, 'লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না!'

—ছোট বোন সুধার তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগেই গহনা ওজন করে দেখেছিল তারা। ৬০ ভরিতে দেড় ভরি কম ছিল কাঁটা হয়ে ওঠেনি!—তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ত্রুটি সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয়তো তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা হোক। আজ সুধার ঐশ্বর্য দেখে কে? ছেলেমেয়ে সুখ ঐশ্বর্য ঘরবাড়ি হীরে মুক্তো!—

আহা, তা বেঁচে থাক। আহা! বাবা দেখে যাননি!

কিন্তু —

তা কি হবে —এই রকমই তো সব ঘরে —

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমুচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটির মুখের দিকে একবার

চান। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে—তারি সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায় চাদর নেই, নিভার মাথার বালিশটা কোথায় সরে গেছে। ঠিক করে দিয়ে মা শুয়ে পড়লেন।

আকাশে নিস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশ তারা ছিকমিক করে ঘুমের রাজত্বে চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভিতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল, কাকা।

পূর্বদিনের চেয়ে বেশি করে সর ময়দা সাবান, স্নো ঘষে রংটা অনেকটা খসখসে করে, মাথা ঘষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন, শাড়ীর সঙ্গে জামার রংয়ে মিল করিয়ে ভেবে চিন্তে অনেক পরিশ্রমে শ্যামা মেয়েটিকে সবাই সাজাল।

অবাধ অপমানবোধ কেবলি নিভার চোখের কোণে উপচে জল পাঠায়। আর দিদিরা ধমক দেয়।

'কাকে আবার না দেখেছে'—'কে আবার না দেখে—তোর রকম দেখে বাঁচিনে'—'চোখ মুখের কি ছিরি।' মেজদি বললে, 'বেশ দেখাচ্ছে এবার।—নিভার মুখখানি যে বেশ!'—

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত করে—, মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হল।

খোস গল্পে আসর জমে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার সমস্যা, ঘি দুধের দুর্মূল্যতা, পাশ করার নিষ্ফলতা এবং মূর্খ গেঁইয়াদের উপার্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে ছেলের মাতুল পৌঁছলেন।

'বলবেন না মশাই, রাম রাম, কি যে সব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করছি—ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না—!'

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হাঁ'—বলে সমর্থন করলেন। তারপর কন্যাদায় ও তারপর পাত্র পক্ষের নানারকম অভদ্রাতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলতে পারেন না। কে জানে যদি কারো গায়ে বাজে।

'কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই কালোকে ফর্সা করতে জানা!'—মাতুল ডাক্তার—বেশ নাম করাও—উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল—ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বলবেন না কি?

অট্টহাস্যে মাতুল বললেন, 'তা হচ্ছে মশাই এই—রং অনুপাতে রৌপ্য মুদ্রা। ওষুধ-বিষুদ নয়! এই আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি একটি যমা কালো মেয়ের বিবাহ হল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দিলে মশাই। বলব কি—আট হাজার নগদ দিলে। ছেলেটি সোনার চাঁদ—যেমন রূপ, তেমনি গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনি, বুঝলেন কি না?'—মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন।—'অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নিপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই, তবে—'

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায় অনুজ্জ্বল বর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাসবার চেষ্টা করলে, তাঁর সঙ্গে পাছে ভদ্রতার লাঘব হয়। আর তাতে মেয়ে পছন্দতে ত্রুটি ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এলো। এবার মা ওদের খাওয়াবেন ওদের। আর চোখে জল এলো না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি—এসপার কি ওসপার হলো চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ি ও বাড়ির চিনু, বিনু, রুনু, রেবা, আরো সব বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীনভাবে ছাদের অন্য এক কোণে—দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

'জানো ভাই, আমার বিয়েতে পাঁচ বা দশবার দেখাদেখি কিছু হয়নি। যেমনি শাশুড়ী দেখলেন অমনি সব কথা ঠিক হওয়া'।—

'তো ভাই তোমার বাবা যে তেমনি ছ'হাজার করে খরচ করেছিলেন। তোমাদের ঐ সুধার কেন অত নাকাল'—

'দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই।'

এইবার একটি মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, 'তা বলে তোরা যারা রূপসী তাদের সব ভাল হবে? তাহলে তোদের লীলার কেন ভাল ঘর বর হল?—'

'সে যে তার বাপের একটি মাত্র মেয়ে অত বিষয় সেই পাবে—আর কালো, তা কি—মুখখানি সুন্দর। স্বামী খুব আদর-যত্ন করে'—

মুখরা মেয়েটি শ্যামা—বিদ্রূপ হাস্যে সে বললে, 'তাই বল—আসল কথা টাকা—তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুরবাড়ির যত্ন'—

যে তর্ক করছিল সে বললে রাগ করে, 'তা টাকা তো কি? যার বাবার কাছে তিনি দেবেন না?'

কেউ হারে না—নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাদে শুয়ে ভাবে।

মনের একপাশে দাঁড়ায় আকাশ ভরা তারা—অন্যধারে পৃথিবী জোড়া অন্ধকার—সেদিন মেজদি এসেছিল। ওপরে এল তারা।

'হ্যাঁরে, ন' ওপরে একলা?'

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। মেজদি বেশ করে বসে, সান্ত্বনা দেবে ভেবে বলে, 'এমনি হয়েছে ভাই!'— সে তাদের পাড়ার কন্যাদের নিদারুণ মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে, 'কি করবি—, এমনি ঘরে ঘরে—'

তারপর মেজদি তার মামাশ্বশুরের শ্বশুরবাড়ির কার এক কৃষ্ণা কন্যাদায়ের ভয়াবহ—অথচ উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেয়; অর্থাৎ মেয়েটি বিয়ের পরে নাকি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে, 'তার চেয়ে আমাদের নিভা ঢের ফরসা' -

রাত্রিও বাড়ে—গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃ-মাতৃভক্ত স্বামীদের বাদ দিয়ে—অন্য সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ের খোঁচার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বর-পক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।—

অনেক রাত্রে মেজদি গেল ছেলে শোওয়াতে—

চুপ করে থেকে তাকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবুরাও অমনি করেছিলেন?'

মেজদি সোজাসুজিই বললে, 'দেনা-পাওনার কথা কোন বিয়েতে না হয়? হয়েছিল বৈকি। তা সে তো কিনা আমার দিদি-শাশুড়ী আর শ্বশুর করেছিলেন। উনি তার কি জানেন?'

মেজদির স্বামীকে ভাল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তাহলেও ভাই উনি তো মা-বাপের ছেলে। বলতে পারতেন না কি?'

মেজদি—'তা কি করে বলবেন? মাথার উপর গুরুজন বাপ মা, তারা যা করবেন ভালর জন্যেই তো?—আর এ তো সবাই করে।'

নিভা অপ্রস্তুতভাবে বললে, 'তাহলেও অত বিদ্বান জামাইবাবু'—

মেজদিদি বললে, 'তাতে কি'—?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষ সমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনো। সে ভাবত— বোধহয়, তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদাব, অচলের মত দৃঢ়, সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈনতা, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বললে, 'আচ্ছা ভাই, তোমার শাশুড়ী না কি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ করে রইলেন?'

'তা কি করে বলবেন?—তুই এক পাগলী। মা-বাপকে বলা যায়? হলই বা শোনালেন আমার শাশুড়ী—তাঁদের হ'ল গিয়ে ছেলে। আমার বাবার মেয়ে! লোকে কত কথা বলে, তাঁরা আর এমনকি বলেছেন?—বিয়েতে লক্ষ কথা হবে—আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হল ধারা।'

যুক্তিসঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ করে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণা-তৃতীয়ার বাঁকা সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। মা ডাকলেন, 'ওরে ও মেয়েরা, কত রাত্তির হল, ছেলেমেয়েকে খাইয়ে নে না। নিভাকেও খেতে ডাক।

নিভা উঠল।

এবারে সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দিদিভাই, তোমাদের জামাইবাবুদের ভাল লেগেছিল?'

তার ষোলো বছর পার হয়ে গেছে, গল্পের বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্য জাগতিক আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজদিদি উঠছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'স্বামীকে ভাল লাগবে না, কেন? শোনো একবার মেয়ের কথা!—হালিয়ে পাগল করতে পারে ও'!—মাগো—ওদেরও তো বিয়ে হয়েছিল সব—কই ঐসব কথা তো ভাবেওনি—'মেজদিদি, সেজদিদি এবং মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেমে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এলো।

আদর কাড়তে পায় না, আদরই পায়নি। দর থাকলে আদর থাকে। পাঁচ বোনের প্রথম নয় শেষ নয় সে। আদর কাড়তে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন মেজদিদি, সেজদিদি ঘুমুলো, ছেলেরা, ভাইয়েরা ঘুমুলো;—মার ঘটিবাটি ডিবে রাখার শব্দে নিভা উঠে বসল। সবাই ঘুমুচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল তাই, 'কিরে?'

'একটু জল খাব।'—উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।--

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়িই অন্ধকার।—

মা তখন ভাবছিলেন স্বামীর কাছে গিয়ে পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।—

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।—

'কিরে?'

'আমায় ও-রকম করে বিয়ে দিয়ো না মা!'—

'কি রকম করে'—মা ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

'ঐ কেবলি টাকা আর গয়না করে।—আমি ওদের ভালবাসতে পারব না'—তার চোখ ছলছল করে এলো।

শোনো কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে—তার সঙ্গে তোমার ভালবাসার কি?—পাগল আর কি।—এরাও তো টাকা নিয়েছিলেন।' তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা আর বললে না।—

'রাত হয়েছে, যা শুগে'—

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিভা কি বলছিল?'

মা বললেন। নিভার বাপ একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বললেন, 'তা ভালবাসার ব্যাঘাত হয় না—দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই—আমারো নেই!'

স্ত্রী একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলেন!

কথা উল্টে বললেন, 'ওরা কি বললে? জবাব কবে, দেবে? পছন্দ হয়েছে? কিন্তু কেমন ধরন যেন!'

শেষ কথার জবাব না দিয়ে স্বামী বললেন, 'ওরা বলে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের—রং ফরসা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে— সেটা হলেই ওরা বিয়ে সামনের বৈশাখ মাসে দেবে।'

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি উপায়?'

'কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু 'রকম' নেয়'—

খানিক চুপ করে থেকে পত্নী বললেন, 'তা কি করবে?'

'তাই দোব আরকি। ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য ভালো, বাপের অবস্থা ভালো—বাজারে দর আছে।—তাছাড়া মেয়েকে গয়নাগাটি দেবে—আদরও করবে'—তারপর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বললেন, 'আর তুমি তো বলেইছো ঠিকই—ভালবাসতে কোনোই তো বাধা হয় না'।—

পিতৃদায়

শান্তা দেবী

পৌষ মাসের শীতে সকালবেলাই স্নান করে এসে অলকার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। পরনের কালোপেড়ে শাড়ীখানাই পাকিয়ে পাকিয়ে গায়ের চারিধারে জড়িয়ে সে উত্তরে হাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে মনে করেছিল। উঠানের এক কোণে তখন সবে রোদ এসে পড়েছে। পোষা বিড়ালটা সেইখানে চোখ বুজে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে দেখে অলকার কি মনে হল জানি না, সেও গিয়ে সেইখানে তুলসী মঞ্চের দিকে পিছন ফিরে একঢাল চুলের আগায় একটা গিঁট বেঁধে বিড়ালটাকে কোলে করে পা ছড়িয়ে দিল। পুশির মাথায় নরম হাতের থাবড়া দিতে দিতে অলকা নিজেও সঙ্গে-সঙ্গে দুলছিল আর সেই সঙ্গে তার শাশুড়ীর দেওয়া আঁচলের কোণের চাবিটা তার বুকের উপর ঝমঝম করে তাল দিচ্ছিল।

বৈঠকখানা ঘরের পিছন দিকের বারান্দা দিয়ে অন্দরের উঠোনে ঢুকে ত্রৈলোক্যনাথ সবুজ বালাপোষখানা গায়ে জড়াতে জড়াতে সদ্যস্নাতা কন্যার রাঙা মুখখানির দিকে তাকিয়ে যেন নিজেও খানিকটা সতেজ হয়ে উঠে বললেন, "কিগো রাণী, অলকমণি, সকালবেলা উঠে বুড়ো ছেলের খোঁজখবর না নিয়ে পুষি মেনিকে আদর দেওয়া হচ্ছে যে দেখছি।"

বাবার সামনে এমন ছেলেমানুষীটা ধরা পড়ে যাওয়াতে রাগান্বিত হয়ে অলকা পুষিকে এক ঠেলা দিয়ে দূর করে হেসে বললে, "না বাবা, আজ কিনা সইয়ের সঙ্গে ভোরবেলা দীঘিতে স্নান করতে গিয়েছিলাম, তাই তুলসীতলায় একটু রোদ পোয়াচ্ছি। সই বলেছিল—ভোর পাঁচটায় নাকি পৌষ মাসে বড় দীঘির জলে কেউ স্নান করতে পারে না।"

বাবা মেয়ের রাঙা মুখে ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হাতখানা বুলিয়ে বলল, "তা বেশ মা, এখন আমার খাতাপত্রগুলো একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দাও দেখি। আর কাউকে দিয়ে তো আমার এ কাজ হয় না।"

গৃহিণী রাজেশ্বরী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘড়া-কাঁকালে রাগান্বিত হয়ে বিরক্ত মুখে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, "বলি হ্যাঁগা, সকালবেলাই উঠে তো মেয়েকে নিয়ে খুব আদর সোহাগ হচ্ছে, এদিকে জলটি আনতে দোরের বার হতে না হতে লোকে যে আমায় হাড়-মাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। মেয়ে কি তোমার আজও কোলে করে আদর করবারই মতন আছে? বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে মেয়ের বয়স তের আর পার হয় না, বললে লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তাদের কি আর মাথায় এক কড়ার বুদ্ধি নেই। বলে, পরের মেয়ের বয়সের হিসেব করতে আবাগীদের এক বেলার ভুলও হয় না। এইবেলা খুঁজে পেতে একটা দেবে তো দাও, নইলে আমায় এই খানে মাথা খুঁড়ে মরতে হবে। লেখাপড়া নিয়ে শামলা মাথায় ধিঙ্গি হয়ে বেড়ালে, কি কথায় কথায় ঝাঁকি নিয়ে নাক ঘুরিয়ে দাঁড়ালেই তো আর মেয়েমানুষের চলবে না।"

কর্তা বললেন, "বড় মেয়ের বিয়েতেই তো হাতে মালা হবার জোগাড় হয়েছিল, এরি মধ্যে আবার পয়সা কোথায় পাব? শুধু হাতে খুঁজতে বেরুলে তো আর বর মেলে না।"

গিন্নি বললেন, "সব তো বুঝি! কিন্তু তার বিয়ের সময় এ মেয়ে যে জন্মায়নি, এমন তো আর

নয়। তবে তখন থেকে এইটি মনে ভেবে দেখনি কেন যে গলায় আর এক বোঝা ঝুলছে, তাকেও একদিন পার না করলে লোকে ঘরে আর পা-ও দেবে না, মরণকালেও হাঁড়িমুদ্দফরাসে ছোঁবে না!"

অভিমানে গৃহিণীর চোখ ছলছল করে উঠল, তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। মা-বাবার কথায় অলকার প্রফুল্ল মুখ অপমানের ঘায়ে যেন কালি হয়ে গেল। সে-ও ঘাড় হেঁট করে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু ত্রৈলোক্যনাথ। শীতের বাতাস যেখানে গাছের মাথায়-মাথায় নিঃশেষে উজাড় করে পাতার মাশুল আদায় করে নিচ্ছিল, তাঁর শূন্যদৃষ্টি তখন সেইখানে উদাসভাবে চেয়ে রইল। তিনি নিশ্চয় জানতেন, তাঁর এ আদরিণী মেয়েটির মুখ সহজে হেঁট হয় না। সে সব দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখেই সইতে পারে, কেবল পারে না তার নারী মহিমার অপমান সইতে। তাঁর দুঃখের সংসারে অলকার হাসিমুখের আলোকছটাই দারিদ্রের অন্ধকারকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিল। জমিদারবাড়ির মেয়ের বিয়েতে শুধু কাচের চুড়ি আর লালপেড়ে শাড়ি পরে যেতে মা লজ্জবোধ করাতে যে মেয়ে দৃপ্তমুখে মাথা উঁচু করে তার নিরলঙ্কার দেহের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে সতেজে গিয়ে পাল্কীতে উঠেছিল, আজ সেই কালি-পারা মুখ দেখে বৃদ্ধের মনে কেবলই তার সেই সেদিনকার সগর্ব হাসিটুক্ ফুটে উঠছিল। তিনি বুঝেছিলেন কত বড় কঠিন অপমানে সে আজ বিমুখ হয়েছে। তাই বৃদ্ধ পিতার ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই সেই মুখ ভুলে অন্য কাজে লাগতে পারছিল না।

মেয়ের বিয়ে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মান-অভিমানের পালা এ বাড়িতে চার-পাঁচ বছর ধরেই চলছে, কিন্তু মেয়ের সামনে বড় বেশি হয়নি। ত্রৈলোক্যনাথের ইচ্ছা মেয়ের বিয়ে এমন ঘরে হয়, যেখানে একদিনের জন্যেও তার মানের একচুল হানি না হয়। কিন্তু হাতে একটা কাণাকড়িও না থাকাতে কল্পনাটা এতদিন ধরে তাঁর মনের ভিতরেই থেকে গিয়েছে। বড় মেয়ের বিয়েতে বড় ঠকেছেন, তাই এবার পণ করে বসে আছেন, কিছুতেই ঠকবেন না। অথচ বিধাতা তাঁর পণকে নিঃশব্দে পরিহাস করে মেয়ের বয়সটা আশ্চর্য রকম বাড়িয়ে তুলেছেন! আজ মেয়ের সামনে এমন নির্লজ্জ কাণ্ডটা হয়ে যাওয়াতে তিনি সেটা পরিষ্কার দেখতে পেলেন। মনে হল—তাই তো, আমার অলকমণি যে বড় হয়ে উঠেছে, আর তো তার কাছে কিছু লুকোনো যাবে না। অথচ তার জন্যে আমাদের অপমান সে কিছুতেই সইবে না। মেয়ে যে রকম আশ্চর্য জেদী, না জানি কি করে বসে! আজকাল যে রকম দিনকাল! সত্যিই, যেমন করে হোক আসছে মাঘ-ফাল্গুনের মধ্যে একটা কিছু করে ফেলতে হবে।

কি একটা অমঙ্গালের আশঙ্কায় ত্রৈলোক্যনাথ শিউরে উঠলেন। বালাপোষখানা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ হাতের কাছের গাড়ু গামছা ফেলে রেখেই অন্যমনে আমতলার রাঙা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

২

অরুণকুমারের বন্ধুর বাড়ি সেই গ্রামে। বড়দিনের ছুটিতে সে কলেজের বইখাতাগুলো একটু বিশ্রাম দিয়ে দু'-চারদিনের জন্যে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছে। শহরে ছাত্রমহলে তার বেশ নামডাক। ছাত্রসভায় যেদিন যুদ্ধে সে একপক্ষের মহারথী হয়ে দাঁড়ায় সেখানে বাক্যজালের ঘনঘটায় অপর পক্ষের দৃষ্টি কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারে না। স্বপক্ষের দলের মধ্যে অনেকে তার আড়াল থেকে মেঘনাদের মত দুটো-চারটে বড় অস্ত্র প্রয়োগ করে তর্ক শেষে হল কাঁপিয়ে কল কল করতে করতে বিপক্ষদের শুকনো মুখের দিকে সগৌরবে দৃষ্টিপাত করে বড় রাস্তার উপরের কোনো পরিচিত দোকানে গিয়ে দ্বিতীয় আর একটা সভা জাঁকিয়ে বসে। তখন মুখের কাজ দুইভাবেই চলে। কথার অবকাশে যে সময় পাওয়া যায় টেবিলের উপর সাজানো গরম গরম লুচি তা তখনি পূর্ণ করে তোলে। অরুণের

ভাষার, তাদের ভাবের ও সাহসের প্রশংসা বন্ধুরা যেখানে কথায় কথায় মত প্রকাশ করে উঠতে না পারে, সেখানে পরস্পরকে চাপড়িয়ে ও হাসির ফোয়ারা তুলেই সেটা সেরে নেয়, অরুণের বুক তখন দশ হাত ফুলে ওঠে। সাময়িক এই আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করবার পক্ষে আর সকলে যখন পিছনে হাঁটে অরুণ তখন চট করে একবার পড়ে সবার আগেই দস্তখতটা করে আসে। মাঝে মাঝে যুবক বন্ধুদের ভীরুতার জন্যে দুটো-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেয় না তা নয়। এছাড়া অরুণের আর অন্য গুণও ছিল। সে আধুনিক সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে টাটকা রকমের অনেক খবর রাখত। তার মত লোক খুঁজলে দুটো-চারটেও মেলে কি না সন্দেহ। নিজে যে সে বড় কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, কি সামাজিক সমস্যা পূরণের চেষ্টা করেছিল তা নয়, তবে সনাতন যুগে যে যেখানে যা কিছু নূতন কথা বলেছে সে সবের খবর রয়টারের তারের আগেই অরুণের কাছে এসে পৌঁছত। তরুণ অরুণের মতই আমাদের অরুণ প্রথমে তাঁর সংহূতির নূতন খবরের আলোকে উদ্ভাসিত করতেন। তার একটা বড় দুঃখ ছিল যে এত রকম বিষয়ের উপর টান থাকা সত্ত্বেও হাতে-কলমে সে আজ অবধি কিছুই করে দেখাতে পারেনি। তার যা কিছু কীর্তি সবই কল্পনালোকের স্বপ্নপুরীতে হাওয়া খেয়ে নধর সুন্দর হয়ে উঠছে, বড় জোর মাঝে মাঝে মা সরস্বতীর কাঁধে ভর দিয়ে ছাত্রের মত একবার চকিতের দেখা দিয়ে যায়, মর্তালোকের কঠিন মাটির উপর সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোর সামনে আজও তারা কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি। তাই শুধু 'থিওরির' মহাপুরুষ অরুণের মনে কেবলই বড় রকম বেদনা অহর্নিশি খোঁচা দিয়ে দিয়ে তাকে চাঙা করে তুলেছে। সে ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে প্রকৃত যশ পাওয়া তার পক্ষে শক্ত। কেন না তার দীপ্তিমান যৌবনের পক্ষে স্থির ধীর বৃদ্ধের মত বসে দশ পাতা লেখা অসম্ভব, তা যতই কেন না তার বিন্যাসের মধ্যে ভাবরসের প্রাচুর্য আর ভাষার বিন্যাস থাকুক। আর সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো গবেষণা কবা তো আরোই কঠিন। কারণ বড় বড় পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে নিতান্ত চুনোপুঁটি পর্যন্ত লোকের যে যে বই সে পড়েছে সবগুলোই বেশ জলের মতই সে বুঝেছে এবং সভাসমিতিতে সেসব কথা অনেক উদগার করেছে, কিন্তু তার উপরে নূতন কিছু আব তো সে খুঁজে পায় না। সব কথাই তো তারা সেখানে বলে শেষ করে দিয়েছে। কাজেই করবার মধ্যে যদি থাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিম্বা সৎসাহসের কাজ। এটা বোধহয় সকলেই অনায়াসে বুঝবেন যে মনস্তত্ত্ব দেহতত্ত্ব যার ব্যবসা, সে কি আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নবীন কলকব্জা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে? কাজেই সে স্থির করেছিল বিনাপণে দরিদ্রের কন্যা গ্রহণ, কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু একটা সোজাসুজি উপায়ে নিজের অসাধারণত্ব প্রকাশ করবে। এতে খুব বেশি বিদ্যা-বুদ্ধি- পাণ্ডিত্য কোনোটারই দরকার হবে না। ভগবান দয়া করিয়া তাকে যে পুরুষ জন্ম দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে বিজয়গৌরবও সেই আজন্ম-লব্ধ পৌরুষেই অনায়াসে লাভ করা যায়। অক্লেশে এই যে মহাকীর্তি স্থাপন সে করবে বিশ্বের দরবারে দুন্দুভি বাজিয়ে কোনো হিতৈষী বন্ধু যদি সেটা তাকে নাই করে দেয় তবে সেটাও না হয় তরুণ স্বয়ং একটা ছদ্মনামে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় তুলে বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু বেচারা অরুণ! সে যে এত বড় ত্যাগ স্বীকারটা করবে তার বিনিময়ে সে কেবল খবরের কাগজের রূপরস-শব্দগন্ধ-স্পর্শহীন ফাঁকা বাহবাটুকুই পাবে? অন্তত জয়মালাটা রূপসী ষোড়শীর পদ্মহস্তে তার কণ্ঠে এসে যদি না পড়ে তবে তো সবই বৃথা। তার অন্তরের সৌন্দর্য পিয়াসী তরুণ প্রাণটি এটুকু দাবী ছেড়ে দিতে পারছিল না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের জোরে সে তো মুখের একটা কথা ফেললেই সোনায়-রূপায় মোড়া একটি পত্নী এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মোটামুটি খোরাক-পোষাকটা পেয়ে যেতে পারে। এমনকি ও ছাপটুকু না থাকলেও কোন কম-সম

দু'-চার হাজার সে না পেত? তাই যখন সে মানসচক্ষে তাব অদূর ভবিষ্যতের বিবাহবাসর কল্পনা করে তখন সেই তরুণী বধূর অঙ্গে অঙ্গে স্বর্ণ আভরণ ঝিলিক দিয়ে না উঠলেও তাব লজ্জারুণ মুখ আর ক্ষীণ দেহলতার অপূর্ব সুষমাতেই সভা উজ্জ্বল হযে ওঠে।

মনের মধ্যে ঐ লোভটুকু গোপন রেখে দরিদ্রকে কন্যাদায থেকে উদ্ধার করবাব ইচ্ছায তার এই বয়সেই অরুণ অন্তত বার দশেক কনে দেখতে গিয়েছে। কিন্তু বিধি এমনি বাম যে খোঁপায় জরি-মোড়া নোলক নাকে বিবাহ বাজারের এই সুলভ পণ্যগুলির মধ্যে সে আজও তার কল্পনালোকের মানসী বধূর একটুখানি আভাস পায়নি। এদের কারো মধ্যে যদি বা একটুখানি সহজ শ্রী উঁকি দিতে দেখা যায়, তাও প্রসাধনের কঠিন শাসনে আধমরা হয়ে আছে। অগত্যা অরুণকে হতাশ মনে কোনো একটা বাজে ছুতা দেখিয়ে দশ-দশবারই ফিবতে হয়েছে। বন্ধুমহলে ঠাট্টা তামাসার ধুয়া উঠলে সে মুখ উঁচু কবে বলত, "আবে দূব, ওসব ফন্দিবাজের বাড়ি আবার বিয়ে করে, টাকাব ঘড়া মাটিতে পুঁতে গবীব সাজবার চেষ্টা। আমি যার মেযে বিয়ে করব সে আমাব মত সোজাসুজি নির্ভীক হবে, তবে না। আর মেয়েটাও নেহাৎ অমন ছিঁচকাঁদুনে ধাঁচেব হলে আমার জীবনটাই যে ব্যর্থ হযে যাবে।"

এমনি করে অরুণেব খ্যাতিলাভের দিনটা ক্রমেই ভবিষ্যতের ছাযালোকে মিলিযে যেতে লাগল। এমন সময় নিতান্ত নিরাশ হযে সে একদিন বন্ধুমহলেব আদব-অভ্যর্থনা ঠাট্টা-তামাসা এবং শহবেব নানা উত্তেজনা ছেড়ে তাব অমন অবসবহীন জীবনেও একটা ছোটখাট অবসব কবে নিয়ে পাড়াগাঁযেব শান্তশ্রীতে মনটা একটু জুড়িয়ে নিতে বেরিযে পড়ল। কিন্তু বিধি যে কার উপর কখন কেমনভাবে সদয় হয়ে ওঠেন তা তো বলা যায় না।

৩

বাঙালীপাড়ায় হঠাৎ একটি পাত্র নামক জীব যদি নূতন দেখা দেন তাহলে পাড়ার এ-মোড় থেকে ও-মোড়ের মধ্যে তার খবর প্রচার হতে দু'-দশ মিনিটই বোধহয যথেষ্ট হয়। বিশেষত তিনি যদি যোগ্য পাত্র হন তবে তো কথাই নেই।

ত্রৈলোক্যনাথ সংসারে চেনেন শুধু নিজের বইগুলি আব অলকমণি। গিন্নি যে কখন কিসেব জন্য তাঁর উপর খড়্গহস্ত হন আব কেনই বা অকস্মাৎ হাসিমুখে পুরাতন প্রেম জাগিযে তুলে সেকালেব মত মান-অভিমানের পালা শুরু কবেন তা বুঝে ওঠা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকব। তাই তিনি সরস্বতীব সেবা কেরে আর অলকার সেবা পেয়ে তৃপ্ত হৃদয়ে ঘবেই দিন কাটান। কেবল মাঝে মাঝে গৃহিণী যখন কথার ঘাযে চেতনা দিযে বুঝিয়ে দেন যে অলকার সত্যিকারেব বযস অনেক বছব আগেই তেরর কোঠা পার হয়ে গেছে তখন ভদ্রলোকেব ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বিশুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে পাত্রেব সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। দিনকতক অনেক খোঁজাখুজি কবে যাকে পাওয়া যায কন্যা তাকেই দেখানো হয় বটে এবং তাঁদের মেয়ে পছন্দও হয়, কিন্তু মেয়ে-বাপেব শীর্ণদেহ আর শূন্যমুষ্টিটা কোনোমতেই তাঁরা বরদাস্ত করে যেতে পারেন না। অগত্যা ঘরের মেয়ে ঘরে রেখে তাঁদের বিদায করে দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আবার ঘরের মধ্যে অচল আসন গ্রহণ করেন।

তাই সেদিন শীতের সকালে ম্লান মুখে আমতলার পথ দিয়ে যেতে যেতে ভটচায্যি মশায়ের মুখে নবাগত পাত্রটির রূপ-গুণ বর্ণনা শুনে ত্রৈলোক্যনাথ যখন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "কোন ছেলেটি হে?" তখন দীর্ঘ শিখা দুলিয়ে ভট্টাচার্য বললেন, "রামঃ! মেয়ের বাপ হয়েছ কি করতে? পা বাড়ালেই যে হরিষখুড়োর বাড়ি এসে পড়ে, সেখানে আজ তিনদিন ধরে অমন সাগর-ছেঁচা মাণিকের মত

ছেলেটা এসে রয়েছে, আর তুমি কোন মুলুকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে হে? আবার শুনছি নাকি ছেলেটা সভা-সমিতি করে লেখাপড়া করে দিয়েছে যে বিয়েতে টাকা নেবে না। এইবেলা গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে পায়ে ধরে পড়, এ যাত্রা উদ্ধার হয়ে যাবে, মেয়েও সৎপাত্রে পড়বে।"

ত্রৈলোক্যনাথ গলায় কাপড় দিয়েছিলেন কি না বলা যায় না, তবে অরুণ এই নিয়ে একাদশ বার দেখতে বেরিয়ে পড়ল। ত্রৈলোক্যনাথ এবার সত্যি বুঝেছিলেন যে প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে মেয়ের বয়স বাড়তে থাকবে এবং তাই নিয়ে তার সামনেই নিত্যনূতন সব অভিনয় হবে। কাজেই তিনি আদরিণী অলকমণির মান রক্ষার জন্য আজই কন্যা দেখাবার প্রস্তাব করে বসেছিলেন। অপরিচিত বৃদ্ধের এই প্রস্তাবে অরুণও বিশেষ কিছু আওয়াজ করলে না। সেও বোধহয় ভেবেছিল অজানা মুহূর্তে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখা যাক না। রোমান্টিক রকম কিছু একটা ঘটে যেতেও তো পারে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় মেয়ে দেখানো হবে। মেয়ের মা খবর শুনে আহ্লাদে আটখানা। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মন উথলে উঠল, যদি টাকা থাকত তবে বিয়েতে মেয়েকে জমিদারের মেয়ে বিধুর মত হালফ্যাশানের পুষ্পহার, হাতে আটগাছা বসন্তবাহার চুড়ি গড়িয়ে দিতেন। তা কপালে তো আর অত সুখ লেখা নেই, যাক দু'গাছা আঙ্গুরদানার ফারফোর ফাঁপা বালা গড়িয়ে দিলেই হবে। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহিণী বাইরের ঘরের কুলুঙ্গির ছেঁড়া মলাটের আবর্জনাগুলো একটানে বিদায় করে দিয়ে, কর্তার তক্তপোষের ছেঁড়া তোষকখানার উপর নিজের গায়ের পুরানো শালখানা ঢাকা দিয়ে, ঘরখানাকে একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টায় লেগে গেলেন। ঘরদোর গোছানো খাবার করা হতে না হতে অরুণ এসে উপস্থিত।

মা ডাকলেন, "আয় মা অলক, তোর চুল ক'গাছা বেঁধে দি। সন্ধ্যে হয়ে এল গা ধুয়ে নীলাম্বরী কাপড় পরে আয়।"

মা জানতেন, কেউ দেখতে এসেছে বললে মেয়ে কখনই সাজসজ্জা করতে রাজি হবে না, তাই সত্যিকারের খবরটা মেয়ের জানা থাকলেও মিথ্যা কথা বলেই তার প্রসাধন দিতে হয়। আজ কিন্তু অলকা বলে বসল, "না মা, আমার এখন চুল বাঁধতে ভাল লাগছে না। আমার মাথা ধরেছে।"

মা মনে মনে ভাবলেন —থাক, আমার মায়ের অমনি রূপে জগৎ ভুলে যাবে। তবে কপাল ঢেকে চুলটা বেঁধে দিলে মস্ত কপালটা আর খাঁড়ার মত নাকটা একটু কম দেখাত। যাক, ভাগ্যে থাকে তো এইতেই হবে। টাকার যোগান থাকলে কি আর কিছু ভাবতাম। মেয়ে এতদিনে তবে রাজরাণী হয়ে মোতির মালা গলায় দিয়ে সোনার খাটে পা ঝুলিয়ে দিন কাটাত।

বৈঠকখানা ঘর থেকে ডাক এল, "মা অলক, পান নিয়ে আয় দেখি মা।"

ঘরের ভিতর অরুণ তখন সুখস্বপ্নে বিভোর। একটি সুন্দর উজ্জ্বল মসৃণ মুখ আর একজোড়া ডাগর সলজ্জ হাসি আবছায়াভাবে কেবলি তার মনের মধ্যে ফুটে উঠছে। মেয়েটি একহাতে নীলাম্বরীর একটুখানি কোণ মুখের কাছে টেনে ধরে ঘাড় হেঁট করে আর এক হাতে পানের ডিবেটা তার কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। প্রথম প্রণয় কাব্যের গোপন পুলকের স্পর্শও প্রথম দর্শনের লজ্জার মধুর মিশ্রণে তার তরুণ কোমল মুখখানি রক্তাভ হয়ে উঠেছে, মাধুরী যেন ফেটে পড়তে চায়। পায়ের মলের মৃদু শব্দ সেই রূপমাধুরীর সঙ্গে একটুখানি মোহন সুরের আমেজ বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অরুণের এই স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে অলকা এসে দাঁড়াল। অলঙ্কারের নূপুর নিক্কণ কি মাথাঘসার স্নিগ্ধ গন্ধ তার আগমনী ঘোষণা করেনি। দেবতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের মত সে হঠাৎ উদয় হয়ে স্বপ্নবিভোর অরুণকে সচকিত করে তুললে। অরুণের দিকে পাশ ফিরে পানের ডিবেটা তার বাবার হাতে তুলে

দিয়ে সে এমনভাবে ফিরে দাঁড়াল যেন শুধু ডিবেটা দেবার জন্যই তাকে নেহাৎ একবার এসে পড়তে হয়েছে। ঘরে যে আর একজন নবাগত তৃতীয় প্রাণী রয়েছে সেটা অলকার চোখে পড়েও যেন পড়েনি। এই নূতন প্রাণীটির আগমনের সঙ্গে যে বিশেষ করে তারই একটা সম্পর্ক আছে সেটা মনে করে তার মনে তরুণ স্বভাবসুলভ যে লজ্জা আসন বিস্তার করবার চেষ্টা করছিল, তার এই স্পর্ধায় অলকা আরও লজ্জিত হয়ে উঠছিল। এই দরিদ্রের মেয়েটির গৌরব কি অহঙ্কার করবার কোনো কিছুই প্রায় ছিল না, কিন্তু তার তেজস্বী মনটি পরাভবকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারত না। এমনকি লোকের চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি যে তার বাহিরের আবরণ ভেদ করে অন্তরের দৈন্য কি দুঃখের দিকে একটু কটাক্ষ করবে তাও তার অসহ্য ছিল। তাই সে নিজের স্বাভাবিক লজ্জাতেও লজ্জিত হয়ে শক্ত সারথির মত উচ্ছ্বসিত লজ্জার রাশ টেনে ধরে রেখেছিল। জোর করেই সে মাথাটা খাড়া করে রেখে সশব্দে চাবির গোছা পিঠের উপর ফেলে ঘর থেকে বাহিরে যাবার উপক্রম করতেই ত্রৈলোক্যনাথ বললেন, "অলকা, অরুণবাবুকেও না হয় তুমিই পানটা দাও।"

অলকা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ঘাড় ফিরিয়ে অরুণের হাতের কাছে পানের ডিবেটা এগিয়ে ধরলে। প্রসাদদাত্রী দেবীর মত সে অকম্পিত হস্তে অরুণের হাতের প্রায় উপরেই পানের ডিবেটা তুলে দিলে। কৃপাভিক্ষুর মত, দেবীর করস্পর্শে, অরুণেরই হাত কেঁপে উঠল। কৃপাভিখারিণী হলেও অলকা যে মহিমাময়ীর মত অরুণের এত উর্ধ্বে দাঁড়িয়েছিল, তাতে অরুণের মনটা আপনি যেন কেমন নত হয়ে পড়ল। অগ্নিবরণা অলকার নিরাভরণ হাতের লাল কাচের চুড়ি দু'টিই আজ তার চোখে পদ্মরাগ মণির মত জ্বলে উঠল। মনে মনে এতদিন সে যে কুসুমকোমলা আনতমুখী কিশোরীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের আশার পথ চেয়েছিল—অলকার প্রশস্ত কপাল, খাঁড়ার মত নাক, আর আগুনের মত জ্বলজ্বলে রং তার কাছ দিয়েও ঘেষে না। অরুণের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ, বিবাহ কল্পনায় লজ্জা কি ভয়ের লেশ—সে মুখে কোথাও একটু ছায়া ফেলতে পারেনি। আগুন যেমন বিশ্বগ্রাস করেও সেই এক রক্ত মূর্তিতে বিরাজ করে, কোনো পরিবর্তনের দাগও তার গায়ে পড়ে না, তেমনি এই মেয়েটির মনে সুখ-দুঃখ লজ্জা-ভয় আনন্দ কি নিরানন্দ যারই স্রোত বয়ে থাকুক না কেন বাইরে তার কোনো প্রকাশই হয়নি। কিন্তু কেন জানি না এই মেয়েটিই আজকার মত অকস্মাৎ অরুণের হৃদয়ে জুড়ে বসল। তার কল্পনার কিশোরীর রূপ কোথায় মিলিয়ে গেল। একটি আঙুলও না হেলিয়ে রাজলক্ষ্মীর মত এই তরুণী সে সিংহাসন আলো করে আপনার দখল জানিয়ে দিলে।

অরুণের ভাবুক মন ভেবে কোনো কাজ কখনও করে না। ভাবের প্রবাহ যখন তাকে যেদিকে ঠেলে নিয়ে যায়, নিশ্চিন্ত মনে মহানন্দে সে তখন সেইদিকেই ভেসে চলে যায়। নিজের মনকে সে কখনও কোনো কাজে বিশেষ বাধা দেয়নি। এই অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র গৃহস্থের বয়স্কা কুমারীটি যেই তার মনে একটা তরঙ্গ তুলে দিয়ে সগর্বে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল, অমনি সে বলে উঠল, "তবে আর কি! আমার তো কোনো আপত্তির কারণ দেখছি না, আপনি যা মনে করবেন তাই হবে।" তখনও অলকার আঁচলের কোণটা দরজার আড়ালে মিলিয়ে যায়নি, এরি মধ্যে বিবাহ স্থির হয়ে গেল। খবরটা বোধহয় সে শুনেই গিয়েছিল।

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে অরুণের মনে গর্বও কম হয়নি। সে শুনেছিল—অলকা আজ যে লাল কাচের চুড়ি আর কালোপেড়ে শাড়ী পরে দেখা দিতে এসেছিল, বধূবেশে তার লজ্জা এর চেয়ে বেশি হবে না। বড়জোর শাড়ীখানার রং লাল হবে এবং যে সোনা-রূপাটুকু না হলে মেয়ের বিবাহ হয় না,

সেইটুকুর স্পর্শ তার অঙ্গে থাকবে। সভায় বরাভরণ কি দানসামগ্রী ঘটাও যে খুব হবে এমন কথা এই জীর্ণ কুটীরখানীর অধিবাসীদের দেখে মনে করা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় বহা কল্পনার রথে চড়ে এলেও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অরুণ ভাবছিল—এতদিনে আমি একটা কীর্তি স্থাপন করতে চললাম। দরিদ্রের অরক্ষণীয়া কন্যাটিকে এককথায় উদ্ধার করে দিচ্ছি, একী কম কথা! ঐশ্বর্য দেখাবার জন্যে ভগবান যে এদের হাতে এককণা সোনাও দেননি, সে আমার পরম ভাগ্য। কারণ, আমি না চাইলেও, যার আছে সে তার মেয়েকে শূন্য হাতে পরের বাড়ি পাঠাত না। কিন্তু কন্যার হাত যত পূর্ণ হয়ে উঠত, আমার যশের জয়ধ্বজা সোনার ভারে ততই ধূলায় লুটিয়ে পড়ত। আজ সে বাধাহীন আনন্দে আকাশে মাথা তুলে উড়তে পারবে।

অলকার অতলস্পর্শ মনের মধ্যে সেদিন বেশ তোলপাড় লেগে গিয়েছিল। বিবাহ যে শুধুই সানাই বাঁশি শাঁখ আর ফুলের মালার মেলা নয়, শ্বশুরবাড়ি যে নিছক কাঁদাবার একটা কল নয়, একথা বোঝবার বয়স তার যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নবযৌবনের বাসন্তী রঙে দেহ তার কল্পনা উজ্জ্বল। বালিকার পিতৃগৃহমুখী মন শুধু আর তার নয় বটে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে পরগৃহের সব দায়িত্ব ভাবনা ও বিভীষিকাও তার মনে প্রবেশ করেনি। মানুষ যে বহুরূপী, তার মন যে নদীর জলের স্রোতের মত কত আঁকে-বাঁকে ঘুরে চলে সেসব কথা আজও অলকার অজানা। আজ মুহূর্তের জন্যে যে মানুষটিকে সে দেখেছিল, যার কথা সে আড়াল থেকে একটিবার মাত্র শুনেছিল, তার সদয়তায় অলকার মন তখন পরিপূর্ণ। অলকার মনে হচ্ছিল, এই মানুষটি যেন তার আজন্ম পরিচিত, তার রূপ-গুণের যেন তুলনা হয় না। এইটুকুতেই যে মানুষের সমস্ত পরিচয় হয়ে যায় না সে কথা অলকা আজ ভুলে গিয়েছিল। যাকে আজ সে বরণ করতে দাঁড়িয়েছে, তার রূপও যে অলকারই মনের রঙে রাঙা তাও সে আজ বোঝেনি।

অরুণের প্রতি অলকার মন সম্ভ্রমে মাধুর্যে পরিপূর্ণ হলেও সেইসঙ্গে তার মধ্যে একটা গোপন ব্যথা তাকে অনুক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল। যার কাছে আজ সে একবার মাথাও নোয়ায়নি, এমনকি পাছে কোনো মনের কথা ধরা পড়ে এই ভয়ে যার দিকে সে ভাল করে একবার তাকায়ওনি, সেই নিতান্ত পরের কাছেই পিতা হয়ত দারিদ্রের দোহাই দিয়ে করুণা ভিক্ষা চেয়েছেন। হয়ত সেই কাতর ভিক্ষার বলেই আজ তার এ সৌভাগ্য। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় অলকার মাথা হেঁট হয়ে আসছিল, অপমানে দুঃখে ক্ষোভে তার রাঙা মুখ ফেটে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। তার পিতা কন্যার বিবাহ ক্রয় করবার উপযুক্ত মূল্য দিতে অক্ষম! এই কথা আজ আনন্দের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাকে বলে যাচ্ছিল—অরুণের গৃহে তোমার অধিকার নেই। অরুণ মহৎ বটে, কিন্তু তোমার দেনা পরিশোধ না করে কোন মুখে তুমি সে মহতের গলায় চির-প্রেমের মালা দেবে? শুধু প্রেমে হবে না, মূল্য চাই যে।

অলকা দরিদ্রের মেয়ে বলেই বোধহয় আজ পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচে কারো ভালবাসার উপহারও গ্রহণ করতে পারেনি। তার মনে হত করুণা যেন ভালবাসার ভড়না তার সঙ্গে ছলনা করতে এসেছে। এমনকি যে সে আজন্ম প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছে সেই সই তার সই পাতানোর উপলক্ষ্য করে তাকে আঁচলাদার হয়ে কাপড় দিয়েছিল, সেবার ভাবনায় তিনদিন তার ঘুম হয়নি। কেবলি মনে হত বিজয়ার সময় সই বোধহয় তার পুরানো ঢাকাই পাড় বসানো ঝিনুকের শাড়ীর ছলটা ধরে ফেলেছে, তাই এই দয়া! নিজের হাতে শিউলি ফুলের রং করে সেই কাপড়খানাই একটু চেহারা ফিরিয়ে সইকে ফেরত দিয়ে তবে সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। দেবার সময় বলেছিল, "সই এ কাপড়খানা প্রায় তোমার খানারই মতন, কেবল সুন্দর দেখাবে বলে আমি যা একটু রং করে দিয়েছি।"

৪

ত্রৈলোক্যনাথের অলকমণির বিবাহ। মায়ের এত সাধের পুষ্পহার কি বসন্তবাহার চুড়ি কিছুই গড়ানো হল না। এমনকি চিড়িতন চুড়ি, কি আঙুরপাতা বালাও জুটল না। জমিদার কন্যা বিধুর সভা উজ্জ্বল করা গহনার বাহার আজ তাঁকে কেবলি উন্মনা করে তুলছিল। ওই মেয়ের গায়ে অত হীরেমোতির ছটা, আর আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মত মেয়ের গায়ে কিনা সোনার আঁচড়টুকুও পড়ল না। অলকার গহনা হল—আটগাছা ডায়মন্ড কাটা রূপোর মল, আর একজোড়া হাল্কা রকম ইহুদি মাকড়ি। হাতে চারগাছা দিল্লিদরবার কাচের চুড়ির সঙ্গে একজোড়া শাঁখা পরিয়েই কনের অলঙ্কার শেষ হয়ে গেল। কোথায় রইল মোতির মালা, কোথায়ই বা হীরার মালা। শুনেছিলেন অরুণের বাবা খুব মস্ত বড়লোক, লাখপতি বললেই হয়। অরুণ এখন সেখানে খবর দিতে কিছুতেই রাজি হল না। একেবারে জয়শ্রী ও জয়মাল্য সঙ্গে করে বিজয়গৌরবে সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। সকলকে এমন একটা চমক দেবে যা আর কেউ কখনও দেয়নি। আগে থেকে এমন কীর্তিটা সে ফাঁস করতে চায় না। তাই আজ একমাস হল সেখানে সে বিশেষ কোনো খবর দেয় না। কেবল মাসের গোড়ায় একবার জানিয়ে রেখেছিল যে সে কিছুদিনের মত দেশভ্রমণে বেরিয়েছে।

হাতে টাকা নেই, কাজেই অরুণ নিজেও কিছু দিতে পারেনি। তবে শাশুড়ী জামাই দু'জনেরই আশা ছিল অমন রূপের বউ পেলে শ্বশুর কোন পাঁচ-দশ হাজার টাকার গয়না না দেবেন।

ছোট উঠানে জন-পঞ্চাশ ষাট লোকের মাঝখানে গোটা দশেক আলো জ্বেলে কোনো রকমে অলকার বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েরা সানাই বসাতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু টাকা কে দেবে? তাই ঘন ঘন উলু দিয়ে আর একজোড়া শাঁখ বাজিয়েই সে সাধটুকু মেটাতে হল।

অরুণের মনটা আজ কেমন যেন একটু খুঁৎ খুঁৎ করছিল। শীতের সন্ধ্যায় একে দেশটাই কেমন ম্লান, গাছপালাগুলো নিঝুম, বেড়াল-কুকুরগুলো জড়সড় হয়ে কোণে কোণে পড়ে আছে, মানুষের চেহারাও এখন কেমন যেন ফাটা চটা। তার উপর আলো সানাই লোক-লস্কর কিছুরই সমারোহ নেই, বিয়ে বলে মনে হয় কি করে? বড়লোকের ছেলে কল্পনায় দরিদ্রের বিবাহটা যেমন করে এঁকেছিল, দেখলে বাস্তব তার চেয়ে ঢের বেশি ম্লান বিষণ্ণ। সে ভাবত কনের গায়ে গয়না না থাকলেও পুষ্প আবরণের অভাব হবে না। সানাই না বাজলেও বাসর আলোয় উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে থাকবে। গালিচা না থাকলেও পদ্মহস্তের নিপুণ আলপনায় স্নিগ্ধ দেখাবে। কিন্তু গরীবের বাড়ি অত করে কে? কোনো রকমে একটু পিঁড়ির উপর আলপনা দিয়ে আবার তখনি অন্য কাজে ছুটতে হচ্ছে। সবদিক থেকে দারিদ্র আজ ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায়।

অরুণ আজ নিজেও তাই একটু ম্লান মুখেই বিবাহ সভায় এসেছিল। শুভদৃষ্টি মাল্যদান সব হয়ে গেল। অরুণের মন খুব যে খুশী হয়ে উঠল তা মনে হল না।

কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অবসানে যখন অলকার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হল তখন তার চোখের সম্ভ্রমপূর্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অরুণের মন আবার যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। আজ প্রায় একমাস হল অরুণের সঙ্গে অলকার বিয়ের কথা হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের ঘাটে পথে নির্জনে দেখাও হয়েছে, কিন্তু অলকা একদিনও তো তার দিকে ভাল করে চায়নি, কথা বলা তো দূরে থাক! যদি বা কখনও চেয়েছে তাও নেহাৎ পথের পথিক পথিককে চেয়ে দেখার মত। আজ প্রথম তাকে নিতান্ত আপনার জেনে সে তার কৃতজ্ঞতার উৎস চোখের দৃষ্টিতে ভরে এনেছিল। অন্যের সামনে তার যে অসীম কৃতজ্ঞতা সে জানাতে চায়নি। শুভদৃষ্টির দৃষ্টি তার একেবারেই নিরর্থক শূন্যদৃষ্টি।

দরিদ্রার প্রেম কি সভার সামনে সে স্বীকার করবে? উদাসিনী তেজস্বিনী অলকা তাই আজ একমাস পরে আপনার জেনে নিজের অনধিকারের দাবীর কথা ভুলে গিয়ে কল্যাণী বধূর বেশে স্বামীর পায়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নিয়ে এসেছে। অরুণের বিমুখ মন তাই দেখে ক্রমে প্রসন্ন হয়ে এল।

৫

দিন সাতেক শ্বশুরবাড়িতে কাটিয়ে অরুণ মহা ফাঁপরে পড়ল—কী করে হঠাৎ বউ নিয়ে বাড়ি গিয়ে হাজির হবে? অথচ এখন না গেলেও নয়, বিয়ে যখন করেছে তখন নিয়ে একদিন যেতেই হবে। কিন্তু যে বেচারা এতকাল কেবল কথার ব্যবসা করে, কথায় কথায় বিশ্বসংসার ছেয়ে বেড়িয়েছে, সত্যি কাজ করবার শক্তি তার বড় বেশি বাকি ছিল না। এমনকি একটা উপায় ভেবে বের করবার মত মস্তিষ্কের জোরও তার ছিল কিনা সন্দেহ। তার মনে হচ্ছিল—এই সাতটা দিন যেমন পরিপূর্ণ আনন্দে কেটেছে, তেমনি নিশ্চিন্তে নিছক আনন্দসুধায় জীবনটা যদি ভবে থাকত, যদি কোনো ভাবনা কোনো চিন্তা না থাকত, তবে সে তার চির-আকাঙ্ক্ষার ধন যশোগীতিব বাসনাও তুচ্ছ বলে ভাসিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু সে তো হবাব নয়। এ বিশ্বে নিবালায় লুকিয়ে আনন্দ সম্ভোগ করবার জায়গা কোথাও মিলবে না।

অলকার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ছেড়ে, ওই পাষাণপ্রতিমার অন্তরেব সুধা-নির্ঝরে শুধু ক্ষণিকের মত স্নান করে তাকে উপায়ের সন্ধানে একদিন কলকাতা যাত্রা করতে হল। যাবার সময়ে সে প্রতিজ্ঞা করে গেল—অলকাকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখবে।

সত্যিই প্রতিদিন সকালবেলা স্নান-আহারের পর অলকার নামে একখানা করে চিঠি আসত। যেমন তার এত স্থির জানা ছিল যে একদিনও বোধ হয় ডাকহরকরাকে ডেকে চিঠি দিতে হয়নি। কোনো না কোনো কাজের ছলে অলকা ঠিক সেই সময়টা বাইরের ঘরে হাজির হত। তার দুর্ভাগার যত কিছু নিদর্শন ছিল সে এতদিন ধরে লোকের চোখের আড়াল করে রেখে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজ পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনেও— কোনো মানুষ যে তাকে অতখানি ভালবাসে সে সৌভাগ্যের কথা সে লোককে জানতে দিতে চায় না। বোজ যে তার চিঠি আসে এবং তার জন্য যে সে এত ব্যগ্র একথা তার বাড়ির লোকেও জানত কিনা জানি না। এমনকি যে পিয়ন নিত্য সেই আনন্দের বার্তা বহন করে আনত, সেও বোধহয় অলকাব প্রাত্যহিক উপস্থিতিটা একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করত।

অলকার আনন্দখনি ওই চিঠিখানি সারাদিন সে নীরবভাবে তার বুকের কাছে ঘুমিয়ে থাকত। অনেক সময় পাড়াসুদ্ধ ঘুমের কোলে ক্লান্ত শরীর আনন্দে বইয়ে দিত, যখন তাদের মেটে ঘরে পাশের খাটে তার পিসির কোলের ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে লেপের তলায় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত, তখন প্রদীপের ওই অতটুকু আলোকের স্পর্শে সেই ঘুমন্ত চিঠিখানি শতকণ্ঠে তাহার হৃদয়ের সমস্ত গোপন কথা নিয়ে জেগে উঠত। ঘুমোবার আগে রোজ অলকা ওই সুখস্পর্শটুকু নিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ত।

এমনি শান্তভাবে বুকের মধ্যে কোমল সুখের অনুভূতি নিয়ে যখন অলকার দিন কাটছিল, তখন একদিন হাজার দুই টাকার নানা অলঙ্কার সঙ্গে করে হাসিমুখে অরুণ এসে হাজির। বাবার একজন পুরাতন বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে সে তার প্রেয়সীর জন্য বহু আভরণ সংগ্রহ করে এনেছে।

আর দেরী করা চলবে না। কালই অলকার শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। সারাদিন বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে একরকম অনাহারে দিন কাটিয়ে পরদিন স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের জন্য ভবিষ্যতের কোনো ভাবনা-চিন্তা না করে ম্লান মুখে অলকা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। কন্যার বিদায়ের চিরন্তন ব্যথা নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আপনার ঘরের কোণে নীরবে বসে রইলেন। সরস্বতীর সহস্র রূপও আজ সেই ম্লান অশ্রুধৌত মুখের শোভা ভোলাতে পারলে না। শুধু ক্ষণে ক্ষণে কাঁদছিলেন, আর ভাবছিলেন আমিও একদিন এমনি করে মাকে কাঁদিয়ে এসেছি।

৬

অলকার শ্বশুর মস্ত বড়লোক। দু'-তিন পুরুষের সঞ্চিত ধনের উপর তিনি নিজে যা রোজগার করেছেন, তাতে এক পয়সাও না উপার্জন করে আরো চার-পাঁচ পুরুষ পরম নিশ্চিন্তে আরামে খেতে-পরতে পারে।

অনেককালের বুনিয়াদী ঘর বলে সে বাড়ির আদব-কায়দাও একটু উঁচু রকমের। মেয়েমহল আর পুরুষমহল সেখানে কোনোদিনও কাছাকাছি হয়েছে বলে বাইরের লোকে টের পায় না। যে মায়ের কোলে জন্মেছে, সেই মাকে দশ-বার বছর যেতে না যেতেই ছেলেরা মধুপান বলে, হাজার ঠাট্টার সম্পর্ক হলেও বয়সে ছোট বলে ভাজকে দেওররা কোনোদিন হেসে দুটো কথা বলে না। মেয়েদের বাইরের সম্মান সে বাড়িতে খুব বেশি। কাদের সঙ্গে কি বিষয়ে কেমন ব্যবহার করতে হয়, সে সম্বন্ধে বাঁধা আইনকানুন আছে বললেই চলে। চৌধুরীবাড়ির কোনো মেয়ে-বউ কখনও পুরুষের বকুনি খেয়েছে বলে প্রায় শোনা যায় না।

তাছাড়া এ বাড়ির কুটুম্বিতাও প্রায় গোনা গাঁথা কয়েকটা বাড়ির সঙ্গে ছাড়া হতে দেখা যায় না। বুনো, জংলী অসভ্য লোকেদের উপর এদের এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তাই অচেনা-অজানা মানুষকে চৌধুরীদের বড় তাচ্ছিল্য।

ঘণ্টা চারেক আগে একখানা টেলিগ্রামে খবর দিয়ে এহেন বাড়িতে বউ নিয়ে অরুণ যখন এসে উঠল, তখন বাইরে প্রশান্ত মূর্তি হলেও ভিতরে ভিতরে বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের মনে যেন আগুন জ্বলছিল। চৌধুরী পরিবারের এমন অপমান আজ পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে কেউ শোনেনি। অরুণ এই বাড়িরই ছেলে, বাইরের নানা আন্দোলনের স্রোতে সে কথাটা ভুলে গেলেও বাড়িতে পা দিলেই এ বাড়ির সমস্ত বিধান তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ বাড়ির চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে তার একবিন্দুও গোলমাল হয়নি। অপমানের প্রচ্ছন্ন আগুনই যে তাদের মধ্যে জ্বলছিল তা নয়, আর একটা কিসের আভাসও যেন তাদের মুখের চেহারায় পাওয়া যাচ্ছিল। অরুণ ভেবে পাচ্ছিল না, বাড়িতে এমনকি দুর্ঘটনা ঘটেছে যাতে সমস্ত বাড়ির উপরেই একটা ঘন অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। কাউকে সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতেও তার সাহস হচ্ছিল না, কারণ এতদিন পরে বাড়ি ফিরে আসার পরও কেউ তার সঙ্গে একটাও কথা কয়নি। দারোয়ান-চাকরেরা নিঃশব্দে গাড়ির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল। একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আর একটি দাসী এসে বৌকেও ঘরে নিয়ে গেল, তবে তার মধ্যে কোনো আদর-অভ্যর্থনার চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু অরুণকে কেউ ঘরে ঢুকতেও বললে না।

বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অরুণ দেখলে, তিনি শয্যাশায়ী। আজ একমাস হল সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা পক্ষাঘাতে অচল হয়ে আছে। তবে জ্ঞান বেশ টনটনে, কথা বলবার শক্তিও ভাল রকম। বাবাকে প্রণাম করে অরুণ জানতে পারলে, যাঁর কাছে সে দুই হাজার টাকা ধার করেছিল সেই বন্ধুই তাঁর রোগের চিকিৎসক। অরুণের ধারের কথাটা তবে জানা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পিতার রোগশয্যার কথা সে ইতিপূর্বে ঘূণাক্ষরেও জানত পায়নি। অরুণ বলবার কোনো কথা না পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

আজ অরুণের অবস্থা যেন দুকুলহারা। খবরের কাগজে তার সুকীর্তির খবর দিয়ে জয়ডঙ্কা বাজাবার সাহস কিম্বা ইচ্ছা আজ তার আর বিশেষ নেই। বাড়ির লোকের চোখে তো সেটা দুষ্কীর্তি বলেই ঠেকেছে, তার উপর কঠিন পীড়াগ্রস্ত পিতার এতদিন খোঁজখবর নেয়নি বলে লজ্জায় তার মুখ কালি হয়ে গিয়েছিল। কলেজের ছেলেদের সামনে তার যে বক্তৃতার স্রোত বিনা বাধায় হু হু করে বয়ে যেত, যে তর্কযুক্তির জালে অপর পক্ষকে সে আধমরা করে ফেলত সেসব আজ এমন নিঃশেষে কোন অতলে যে ডুব দিয়েছে তার ঠিক নেই। নিজের কাজটাকে যতখানি সমর্থন করা নিতান্তই, সেটুকুও আজ সে পেরে উঠছে না। তাছাড়া সমর্থন করবেই বা কার কাছে? কেউ তো তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেনি।

অলকা সারাদিন নিরানন্দ বাড়ির এক কোণে দু'টি একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে একটু আধটু ভাব করে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় মনটাকে একটু খুশী করবার জন্যে এবং অরুণকেও একটু আনন্দ দেবার জন্যে তার নূতন অলঙ্কারগুলি পরে, ভাল করে এলো খোঁপা বেঁধে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ কেটে একখানা সোনালি রঙের শাড়ী পরে নিজের ঘরে যাবার উদ্যোগ করছিল। তার সাজসজ্জাটা বাড়ির ছোট মেয়েরাই বিশেষ উৎসাহে করে দিয়েছিল। কারণ তারা জানত বাড়িতে নূতন বৌ এলে সারাদিন তাকে ঘিরে আনন্দ করতে হয়। বধূবিশেষকে নিয়ে যে করতে নেই, এ বুদ্ধিটা তাদের মাথায় ঢোকেনি এবং তাদের এ বিষয়ে কেউ কোনো উপদেশও দিয়ে যায়নি। ছোট একটি ভাসুরঝির হাত ধরে সলজ্জ হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে এ বাড়িতে তার একমাত্র আপনার জন অরুণের ঘরে গিয়ে যখন সে উঠল, তখন রাত প্রায় দশটা। মেয়েটি তাকে রেখে চলে যেতে অলকা দেখলে অরুণ টেবিলের পাশে কি একখানা কাগজ নিয়ে মহা চিন্তাকুল হয়ে বসে আছে।

সেখানা অরুণের পিতা চৌধুরীমহাশয়ের জবানী পত্র। পত্রে তিনি অরুণকে জানিয়েছেন যে যখন তাঁর মত না নিয়েই অরুণ তার জীবনের এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছে তখন বুঝতে হবে যে সে এখন সব বিষয়ে উপযুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর অনুরোধ যে পিতার কাছে পাবার আশায় যে ঋণটা সে করেছে, সেটা যতদিন না নিজে শোধ করে ততদিন যেন সে এ বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখে। এবং কোনো কাজে তাঁর পরামর্শ নেওয়া যখন সে দরকার মনে করেনি, তখন গলগ্রহের মত পিতার উপার্জিত অন্ন ধ্বংস করতেও বোধহয় সে লজ্জাবোধ করবে। বৌমা দরিদ্র গৃহস্থের নির্দোষী কন্যা, ইচ্ছা করেন তো এই বাড়িতেই কিছুদিন কাটাতে পারেন। দরিদ্রকে অন্নদান এ বাড়ির সনাতন ধর্ম। পুত্র যাঁকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছেন তাঁকে কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য পীড়া দিতে চৌধুরীবংশ কখনও অগ্রসর হবেন না। সুতরাং এতে যদি বৌমার অপমান হয় তবে তিনিও স্বামীর সঙ্গ নিতে পারেন।

অলকা চিঠির খবর কিছুই জানত না। তার ইচ্ছা ছিল আজকের তার এমন মনোমোহন সাজ দেখে

খুব তারিফ করে অন্তত দুটো কথা বলে। সে হাসিয়া এগিয়ে এসে অরুণের কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে বলে, "কাগজখানা নিয়ে কি এমন ভাবনা ভাবছ যে একবার ফিরে তাকাবারও অবসর হ'ল না।"

অরুণ কি করে এই সংবাদটা স্ত্রীকে দেবে সে সময় অনেক সুশোভন বক্তৃতা ঠিক করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বড়লোকের ছেলে সে, আজও তার কলেজের কোনো পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, অর্থোপার্জন কাকে বলে সে সব কিছু তাকে একদিনও ভাবতে হয়নি, আজ অকস্মাৎ গোপন ঋণের বোঝাটা এমন নির্দয়ভাবে ঘাড়ে চেপে বসাতে তার আর কোনো কথা মনেই আসছিল না। অগ্নিবরণা অলকার রূপ আজ তার চোখে গাঢ় অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অলকার কথার উত্তরে সে হঠাৎ বলে বসল, "ভাবছিলাম অন্য কোথাও বিয়ে করলে আজ আমি পাঁচ-দশ হাজার টাকার মালিক হতাম, আজ তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে, দু'হাজার টাকার ঋণ মাথায় তুললাম আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘর সব হারালাম।"

অলকা চমকে উঠে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল। এমন কঠিন কথাগুলো বলবার ইচ্ছা অরুণের মোটেই ছিল না। কিন্তু যখন বলে ফেলেছে তখন আর উপায় নেই। দরিদ্রের দুঃখ তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দিয়েছিল। চিঠিখানা অলকার গায়ে ফেলে দিয়ে সে সেইখানেই চুপ করে বসে রইল।

চিঠি পড়ে অলকার যৌবনস্বপ্ন এক মুহূর্তের মধ্যে টুটে গেল। নিজের প্রতি ধিক্কারে তার মন ভরে উঠল। ছিঃ ছিঃ, কী নির্লজ্জ, কী কাঙাল সে! শুধু দয়া করে, শুধু দরিদ্রের দুঃখ মোচন করবার জন্য যে তাকে বিবাহ করেছে, তার কাছে সেইটুকু উপকার পেয়েই তৃপ্ত না থেকে, সে শুধু পথের কাঙালের মত ভালবাসা ভিক্ষা করতে গেছে! সাজসজ্জার ছলনায় ভুলিয়ে ফুসলিয়ে দয়ালুর কাছ থেকে তার সর্বস্ব আদায় করে নিতে এসেছে। ভিখারীর পক্ষে সে, তার এত স্পর্দ্ধা! অলকা ভুলে গেল যে, কাউকে ভোলাতে সে আসেনি, আনন্দ পেয়ে আনন্দ দিতেই সে এসেছিল। কিন্তু এই তীব্র বেদনা তাকে নিজের উদ্দেশ্যও ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই তার সমস্ত আভরণ প্রসাধন তাকে ঘিরে ধরে ধিক্কার দিচ্ছিল। সোনালি শাড়ীখানা যেন বেড়া আগুনের মত জ্বলে উঠে তার প্রতি অঙ্গ জ্বালাময় করে তুলেছিল।

অলকা বললে, "তবে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

অরুণ বললে, "তুমি থাক না, তুমি বউ, তোমার তো অধিকার আছে। কিন্তু ঘরের ছেলে আমি, পরের দুঃখ সইতে পারিনি, তাই যত দোষ তো আমারই।"

অলকা খাড়া দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে, "আমার আবার কিসের অধিকার? আমার খাওয়া-পরার দাম আগাম না দিয়ে কেবল নিরন্নের শুকনো মুখ দেখিয়ে অমনি ঢুকেছি, এখানে থেকে পিতৃঋণ আর বাড়াতে চাইনে।"

কথা বলবার সময় অলকার মুখে একটু দুঃখের রেখা কি চোখে একবিন্দু জলও দেখা যায়নি, আগুনের জ্বালার মত সমস্ত মুখটাই রাঙা হয়ে উঠেছিল। যদি তার মুখে একটু বেদনা ফুটে উঠত, যদি চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের দাবী নিজের অধিকার ব্যক্ত করত, তাহলে হয়ত অরুণ দুঃখের মধ্যেও তাকে সঙ্গিনী করে সুখ পেতে চাইত, হয়ত বা তাতে ফলও পেত। কিন্তু আজ যশোগীতি ধ্বনিত হবার আশাও টুটল, প্রেমের আলোও বুঝি নিভে গেল, রইল শুধু অপমান, দারিদ্র আর দুঃখ! কেন তবে সে অন্যের মুখের দিকে চাইবে?

নিজেকে চাপা দেবার শক্তিটা, রুদ্র তেজের আগুনটা অলকার মন থেকে তখনকার মত যদি সরে যেত, তবে হয়ত বা সবাই অন্য রূপ ধরত, এই আঘাতে তার হৃদয় ছিন্ন না হয়ে ব্যাকুল আগ্রহে শেষ অবলম্বনটুকু আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরত। কিন্তু অলকার সমস্ত মন সে মুহূর্তে তাকে ঝাঁকি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল—তোমার কোনো অধিকার নেই, যেচে আর অপমানের ভার বাড়িও না। তাই সে সেই কুমারী অলকার মত দৃপ্তমুখে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে দাঁড়াল। একবার মুখ তুলে চাইলেও না। অরুণ মুখে বললে না, মনে মনে ভাবলে, "ভিখিরীর মেয়ের এত তেজ!"

* * * *

পরদিন অলকা আর অরুণ একসঙ্গে চৌধুরীমহাশয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় হল। বাড়ির লোকে ভাবলে—একসঙ্গেই যাচ্ছে।

অলকাকে রেখে যখন ঋণশোধের পথ খুঁজতে যাবে তার আগে অলকা শুধু একটা অনুরোধ করেছিল, "দেখ, তোমার উপর আমার কোনো অধিকার না থাকলেও, একটি অনুরোধ আমার রেখ। রোজ না হোক, দু'-চারদিন অন্তর অন্তত একখানা শুধু খামের উপর আমার নাম লিখে পাঠিও। কারণ তোমার কাছে আমার অধিকার নেই বললেও আর কারুর কাছে সেটা স্বীকার করতে আমি পারব না।" এছাড়া আর কোনো কথাই অলকা বলেনি। অরুণ ভাবলে—আমার খরচের জন্যে নয়, কেবল নিজের মান বজায় রাখবার জন্যেই এ অনুরোধ! ঠিক সেই মুহূর্তে কোনটা যে অলকার মনে বেশি ছিল, তা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। যা হোক অরুণ রাজি হয়েই গেল।

৭

প্রতি সপ্তাহে দু'-চারবার এক লাইন লেখা কিম্বা শূন্য কাগজভরা একখানা খাম অলকার নামে আসত এবং অলকার তরফ থেকে কেবলমাত্র কুশল প্রার্থনা করে সেইরকম চিঠি অরুণের নামে প্রায়ই যেত। এবার ডাকহরকরা প্রতিদিনই ডেকে চিঠি দিয়ে যায়। এবারও অলকা সকলের চোখের আড়ালে চিঠি খোলে, কিন্তু সে অন্য কারণে। মাঝে মাঝে চিঠি পেতে দেরী হলে বার বার শূন্য চিঠির তাগিদ দিয়ে অলকা চিঠি আনিয়ে তবে ছাড়ে।

তার অত তেজ, অত মান যে কোথায় গিয়েছিল জানি না। চিঠি খুলে বসলেই সেই প্রথম দেখা অরুণের প্রসংশমান দৃষ্টি তার মনে পড়ে যেত, ইচ্ছা করত অনধিকারের সমস্ত শাস্তি নিয়েও একবার সেখানে ছুটে চলে যায়, একবার দেখে আসে নির্মমের মত এই অর্থহীন শূন্য চিঠি পাঠাবার সময় তার মুখখানা কেমন হয়। এ তারই অনুরোধ হলেও অরুণ ইচ্ছা করলে দুটো কথা লিখতে পারে না? আগেকার সেই চিঠির মত না হোক, তার শতাংশের একাংশ আনন্দও কী দিতে নেই? একদিন চিঠি এল—এরকম ছেলেখেলা করবার সময় অরুণের নেই। সে নিজের অঙ্গীকার থেকে মুক্তি চায়। তাকে এখন জীবন সংগ্রামে দারিদ্রের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে।

শূন্য চিঠির নিষ্ঠুর খেলাও অল্পদিনেই শেষ হয়ে গেল। ভাষাহীন তাগিদে আর ফল ফলে না। অলকার মান বুঝি আর বাঁচে না! কিন্তু যেমন করে হোক সে তার উপায় করবেই।

চোখের জলে অনেক খাম কাগজ নষ্ট করে একদিন সে একটা উপায় স্থির করলে। নিজের হাতেই খামের উপর অরুণের হাতের লেখা নকল করে একাধারে অরুণ আর অলকা দু'জনের কাজই সে এবার থেকে করবে।

পাড়ার যে নিরক্ষর ছেলেটিকে ধরে সে চিঠি ডাকে দেওয়াত, এখন তার কাজ আরো বেড়ে গেল। কারণ এখন পালা করে দু'জনের চিঠিই তাকে ডাকে দিতে হয়!

পুরোনো চিঠি কখানা খুলে কতদিন অলকা মনে করত—একখানা এই চিঠি খামে করে নিজের নামে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কি জানি কেন সে সেগুলো খোয়া যাবার ভয় তার প্রায়ই হত। তবু সেইগুলো নূতন করে ডাকঘরের ছাপ নিয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে হয়ত সেই হারানো দিনের আনন্দ আবার জেগে উঠতে পারত!

হাত তুলে খামে ভরতে গিয়ে কতদিন সে ফিরে এসেছে। ভেবেছে, এমন করলে চলবে না—আমাকে পাথরের মত কঠিন হতে হবে! স্বামীর সেইসব চিঠিতে আর তাঁর মুখের কথাতেও অলকা একদিন শিক্ষা পেয়েছিল যে মানুষের মন বদলায়। তখন সেটা তত্ত্বকথার মত ছিল। নিজের ক্ষেত্রেও যে একদিন লাগবে তা সে ভাবেনি। শুনেছিল মানুষের মন নদীর স্রোত, সে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। কিন্তু মন যদি চিরকাল এক জায়গায় নাই থাকে, যদি একদিনের পরিচয় চিরদিনের না হয়, তবে মানুষ অত নিষ্ঠুরের মত অন্যের মন নিয়ে খেলা করে কেন? কেন সে বলে অন্যের সেসব দিনের কথা শুধু সেইসব দিনেরই? নিজের মনে মীমাংসা করে উঠতে পারত না। যদি নদীর স্রোতই মানুষের মন হয়, তবে দু'টা নদীর স্রোত কেন একইভাবে এ বয় না।? দু'টা মানুষের মন কেন একই সঙ্গে বাঁধে না? ভগবানের এ বড় অবিচার! তিনি যদি মনটা গতিশীল করেছেন, তবে তার গতি অমন এলোমেলো কেন? সে কেন তাল কাটিয়ে এমন বেতালা চলে যায়?

মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা করত, স্বপ্নের বিভীষিকার মত সব দূর হয়ে যাক। কিন্তু সে জানত, বিধির বিধান অতি বড় কঠোর, এ বিধানে অসম্ভব সম্ভব হয় না। তবু মানুষের মন তারি পথ চেয়ে থাকে, নিজেকে সে ওই তুচ্ছ আশার মোহেই ভুলিয়ে রাখে।

নিজের এইসব দুর্বলতায় অলকা নিজের উপর রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। কেন সে পরের জন্যে অমন করে কেঁদে মরবে? তার নারী গৌরবে অত বড় ঘা সে কিছুতেই সইবে না।

ভাবতে ভাবতে অলকার শরীর মন উদ্যত বজ্রের মতন হয়ে উঠছিল। এ বজ্র যে কার বুকে পড়বে, কার সর্বনাশ করবে, তা সে নিজেই ভেবে পাচ্ছিল না। তার মনে হত হয়ত, আর কাউকে না পেয়ে সে নিজেকেই সংহার করবে, নিজের অন্তরের অমূল্য ধন স্নেহ প্রেম সব সে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলবে।

যখন তার অন্তর চাইত স্নেহে প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠতে তখন সে বসে বসে মনে মনে সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করে মনের সঙ্গেই লড়াই লাগিয়ে দিত। বাস্তবিক স্নেহ প্রেম ভালবাসা এসবের প্রয়োজন কি? কেন, এমনি কি দিন চলে না? মানুষ যদি নিজের কাজগুলো করে ফেলে কেউ যদি কারুর জন্যে না তাকায়, কেবল প্রয়োজন বুঝে কর্তব্য দেখে করে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? লোকে বলে বটে অমন করলে আর সৃষ্টি চলে না! তাই অলকা কখনও কখনও ভাবত—আচ্ছা, নাই বা চলল সৃষ্টি। এতদূর পর্যন্ত ভাবতেও তার বাধা পড়ত না—মনে হত, হ্যাঁ, হয়ত এসবের প্রয়োজন আছে। হয়ত স্নেহ প্রেমই জগতের কেন্দ্র। দুরন্ত ঝড়ের ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ। তবে ঐ প্রেমকে মানুষ ঠেলতে পারে না। প্রেমে যে বেদনা আছে তারি তীব্র মধুর আনন্দ শূন্য হৃদয়ের দঃখহীন নিশ্চন্ততার চেয়ে বরণীয়। কিন্তু থাকলই বা প্রয়োজন, সৃষ্টি জগতের কেন্দ্র! জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি! যে জগৎ তাকে অস্পৃশ্যের মত দূরে ঠেলে রেখেছে, জগতের সঙ্গে ছন্দে তালে ঐক্য রেখে সে কেন চলতে যাবে! সে সৃষ্টিছাড়াই হবে। কেউ যা হতে পারেনি, আর পারবেও না, তাই সে হবে। আর এত

করে ঠেকা দিয়ে, তালি দিয়ে নিজের অবস্থাটা জগতের ছাঁচে ঢালাই নিটোল সুন্দর করতে চাইবে না। এইরকম সব ভাবনা ভেবে ভেবে অলকা দেখত মনটা যেন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠছে, কোনোরকম ভাবের কি রসের লেশ খুঁজে পেতে বের করা কষ্টকর। নিজের মনের এই শুষ্ক কঠিন বেদনায় সে বেশ একটা নিষ্ঠুর আনন্দ বোধ করত। তার পাষাণ প্রাণে বেদনা দিয়ে কেউ কাঁদাতে পারবে না। এমনি করেই মাথাটাকে চিরদিন উঁচু করে চলা ভাল। নত হবার আর কোনো ভয় থাকছে না।

অলকা তার মনটাকে কেবল বিচারবুদ্ধি দিয়ে সাজিয়ে পাগলের মত অনন্দহীন কঠিন করে তুলতে পারলেই সে বাঁচত। বিচারবুদ্ধির উপরে প্রয়োজনের অতীত কোন একটা হৃদয়ের রাজ্য আছে, আজ সেটাকে অস্বীকার করতে পেলেই তার মুক্তি। সে রাজ্যের বেদনা ও ব্যথার আনন্দ আর পরাজয়ের সুখ আজ তার অসহ্য। সে নিজে এখানে জয়ী হতে চেয়েছিল, স্বেচ্ছায় যেখানে সে মাথা নত করেনি, ঘাড় টিপে সেখানে তাকে ধূলিশায়ী করে দিলে সে সইতে পারবে না। আনন্দে যদি সে পরাজয় স্বীকার করতে পারত তবেই ছিল তার সুখ। ফলে ফুলে শস্যক্ষেত্রে সকল শোভার মধ্যে সেই যে হৃদয় রাজ্যের সুখভোগের জন্য ডালি সাজানো, সকল জিনিসের রঙে, সকল গানে গন্ধে যে রাজ্যের অধিকার, অলকা আজ হৃদয়ের রাজ্য ছেড়ে মুক্ত হতে চায়। সে চায় শুষ্ক কঠিন হৃদয়ে শুধু সত্য আর প্রয়োজন দেখতে।

এমনি ভাবে সময় মানুষের মিষ্টি কথার, প্রিয়জনের আদরের মূল্য বুঝে উঠতে পারত না। তার স্বামীর লেখা পুরানো চিঠিগুলো তখন তার কাছে অর্থশূন্য হাস্যকর জঞ্জাল মনে হত। সে ভেবে পেত না, সময় নষ্ট করে, অকারণে এই রকম কতকগুলো পাগলামির উচ্ছ্বাস করে মানুষের কী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সেই কোন্ আদি যুগ থেকে মানুষের এই যে চিরন্তন বিরহবেদনা, যা নিয়ে যুগে যুগে কালে কালে কবিরা কত গান গেয়ে গেছেন, একদিন সেইসবের মাধুর্যে সে ডুবে থেকেছে, তাতে কত আনন্দই পেয়েছে। কাব্যের মত অত বড় সত্য আর কোনো জিনিসকে ভাবেনি। কিন্তু আজ ভাবছে -- তার মধ্যে আছে কি? আশ্চর্য এই, এত বড় একটা মিথ্যা কি করে অনাদিকাল ধরে তেমনিভাবে মানুষের মনকে ঘিরে আছে। তার অন্ধ চোখ কি কোনোদিনই খুলবে না।? ঝড়-ঝঞ্ঝার কঠোর নিষ্ঠুর মূর্তিই তো জগতে সত্য। তাই তো চোখে কানে ঠেকে, আর কিছুই তো নেই।

অলকা এত তর্কযুক্তি করেও কিন্তু নিজেকে পরাস্ত করতে পারছিল না। মনটা তার কঠিন হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সযোগ পেলেই সে সেই দুঃখের রাজ্যেই ছুটতে চাইত। কঠিন নিগড়ে বাধা হয়ে দুঃখহীন লোকে থাকতে সে কেমন হাঁপিয়ে উঠত। দুঃখ নির্বাণ করাবর এ উপায়টা সে ভাল করে মানিয়ে নিতে পারছিল না।

৮

সেদিন সকালে অলকার চিঠিখানা বেশ ভারী ভারী ঠেকছিল। তাছাড়া সেটা যে তার নিজেরই জাল নয়, তা এক নিমেষেই অলকা বুঝে ফেলেছিল। আজকে যে তাতে কি থাকতে পারে অলকা অনেক ভেবেও ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সারাদিন চিঠিখানা লুকিয়ে রেখে রাত্রে দেখলে—স্বামী তাকে মস্ত একখানা চিঠি লিখে ফেলেছেন। অতবড় চিঠি দেখেই আনন্দে অলকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কি মনে করে তখনি আবার আগের মত ঔদাস্যমাখা স্থির হয়ে গেল।

অরুণ এতদিনের অনাদরের জন্য ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছে, দারিদ্র তার হৃদয় এতদিন কঠিন চাপে চেপে রেখেছিল। আত্মীয়বন্ধু সব সে ভুলে গিয়েছিল। আজ পিতা তার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এই

দীর্ঘকালে দু'হাজারের মধ্যে পাঁচশত টাকা মাত্র শোধ হয়েছে, তবু তার চেষ্টা ও পিতৃ আদেশে অচলা নিষ্ঠা দেখে পিতা খুশি হয়ে সব দোষ মার্জনা করেছেন। তাই অরুণ দু'দিনের মধ্যে অলকাকে নিতে আসছে। এবারে আর কোনো অনাদর হবে না। তার দারিদ্রেব অপমান মুছে যাবে।

বারো-চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠিতে এই কথাগুলিই নানাভাবে নানা সুরে সাজানো ছিল। অলকা চিঠি শেষ করে একবার হাসলে। তারপর আর না দেখে তুলে রেখে দিলে।

জামাই শ্বশুর-শাশুড়ীকেও মেয়ের দ্বিবাগমনের খবর দিয়েছিলেন। এত বড় মেয়ের যে দ্বিরাগমন করতে হল এই তাঁদের ক্ষোভের কারণ ছিল। যাক তবু যে এতদিনে বেয়াই-এর বৌ নেবার সময় হল এই ঢের।

জামাই এলে পাড়ার যত মেয়ে মিলে মহা কলরবে অলকাকে সাজাতে বসল। সে কী পাতাকাটা চুল টেপার ঘটা! আলতা কাজলেরই বা কী বাহার! সিঁদুরেব টিপ সাতজনে সাত রকম পরিয়েও পছন্দ করে উঠতে পারছিল না। শাড়ীর বাহারও কম হয়নি। অলকা মনে মনে হাসছিল। সেদিনকার তার প্রসাধনের অপমানের ব্যথা আজও তো সে ভোলেনি।

ঘরে ঢোকবার আগে আড়ালে সমস্ত কাজ গুছিয়ে ফেলে শুধু একখানা কালোপেড়ে শাড়ী আর চারগাছা কাচের চুড়ি পবে অলকা স্বামীদর্শনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলে।

অরুণ কাছে এগিয়ে আসতেই তার গায়ে প্রণাম করে অলকা বললে, "আমাকে রেখে যাবাব দিন তুমি কেন জানি না আমার গযনাগুলো চাওনি, আমিও তখন লজ্জার মাথা খেয়ে নিজে হাতে দিতে পারিনি, পাছে লোকে আমার অপমানের কথা জেনে যায়। আজ আমি এইসব ধবে দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও।"

অরুণ গহনাব পুঁটুলি ঠেলে ফেলে বললে, "ওকি! আমি তো ও নিতে আসিনি। আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

অলকা বললে, "সে তো এখন হবার জো নেই। যদি কোনোদিন ঋণ শোধ করতে পারি তবেই যাব। তুমি পিতৃ আদেশ পালন করে পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছ, আমি পিতৃঋণ শোধ না কবে তোমাব সংসার দখল করি কি বলে?"

নদীব স্রোতের মত আজও মানুষের মন বদলেছিল, কিন্তু সে অন্য দিকে।

জামাইবাবু

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

ঝম ঝম! গাঢ় আঁধারভরা রাত্রি। দ্বিপ্রহর বোধহয় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আট নম্বরের ডাউন এক্সপ্রেসখানা ঝাঁ ঝাঁ শব্দে আসিয়া আলোকোজ্জ্বল দানাপুর স্টেশনে ঢুকিল। গাড়ির একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে একটি তরুণী মুখ বাড়াইল। নিদ্রাবেশ জড়িত চক্ষু মুছিয়া, স্টেশনের নাম পরিচয়টা জানিবার জন্যই বোধহয়, ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। সহসা একটা দমকা ঝাঁকুনি দিয়া। ক্রমশ মন্থর গতিশীল গাড়িখানি একটা আলোক স্তম্ভের গায়ে লেখা স্টেশনের নামটা পড়িল। নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার পাশে বসিয়া পড়িল। অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া সেই বিপুল জনাকীর্ণ কোলাহলমুখর স্টেশনের শোভা দেখিতে লাগিল।

সামনে দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল, পান সিগ্রেট, বাবু—পান সিগ্রেট।

দায়ে পড়িয়া তরুণী উদাসভাবে সরিয়া বসিল। লোকটা অদৃশ্য হইতেই আবার স্বস্থানে আসিয়া, প্লাটফরমে লোকজনের ছোটাছুটি দেখিতে লাগিল।

অদূরে পুলের নীচে চশমা চোখে সৌখীন ধরনের সজ্জা পরিহিত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, এক হাতে কোঁচা, এক হাতে গ্লাডস্টোন ব্যাগ ধরিয়া তিনি চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতেছিলেন। সহসা তরুণীর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারকতক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, হঠাৎ দ্রুতপদে সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার দিকে ঝুঁকিয়া যেন অতি কষ্টেই খানিকটা কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদেরই মহালক্ষ্মী যে!"

তরুণী অন্যদিকে চাহিয়াছিল—হঠাৎ এই আকস্মিক সম্ভাষণে চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময় দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া রহিল—সম্ভবত চিনিতে পারিল না। ভদ্রলোকটি ততক্ষণে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও বাবা! অকথা শোচনীয়! আজকাল কাউকে চিনতে-টিনতে পার না দেখছি!"

পরিচিত মুখ এবং ততোধিক পরিচিত সেই শ্লেষই বটে!—মুহূর্তে তরুণী সসৌজন্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে নমস্কার করিল। সবিনয়ে বলিল, "জামাইবাবু! আসুন, আসুন—অনেক দিনের পর দেখা। গাড়িতে আসবেন না কি?"

"তবু ভাল! দয়া করে চিনতে পেরেছে, এই ঢের! যা গরবী চাল শুরু করেছ—আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল।" অপ্রস্তুত এবং কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াই তরুণী বলিল, "মাপ করুন, সত্যিই চিনতে পারিনি। আমার ভয়ানক মন্দ অভ্যাস—চেনা লোকদের মুখ ভুলে যাই। গরীবের ত্রুটি ক্ষমা করুন অনুগ্রহ করে। তারপর, কোথায় যাচ্ছেন?"

"আসানসোল। তোমরা?"

"হুগলী।"

"একলা?"

"উহু—এলাহাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষয়িত্রী সঙ্গে আছেন। ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি, উনি অসুস্থ।"

গাড়ির ভিতর উঁকি দিয়া, নিদ্রিতা ভদ্রমহিলার দিকে চাহিয়া, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "তবে তো এ কামরায় ওঠা হয় না। তাতে আবার থার্ড ক্লাস।"

"আপনার ইন্টারের টিকিট বুঝি? আচ্ছা, তাহলে আসুন। আসানসোল আবার তা হলে—"

"ঐ যা! হুইসেল দিচ্ছে যে! ধর ধর ব্যাগটা! পরের স্টেশনে নামব না হয়।"—জানালার ভিতর দিয়া ব্যাগটা পার করিয়া, ভদ্রলোক একটানে দুয়ার খুলিয়া উঠিলেন। পরমুহূর্তে গাড়ি "চলি চলি পা পা" শুরু করিল। ছোট কামরা দু'খানি মাত্র বেঞ্চি। একটিতে রুগ্না ঘুমাইতেছিল, অন্যটি জিনিসপত্র, মোট পুঁটলিতে পূর্ণ। তরুণী তাড়াতাড়ি জিনিস সরাইয়া লইল। ভদ্রলোকটি ব্যাগটি পাশে রাখিয়া বসিলেন। বিনা ভূমিকায় শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তারপর নিরলা দেবী! তুমি না কি কোন স্কুলের মাস্টারনি হয়েছে? খুব না কি সুখ সম্পদ ভোগ করছ?"

তরুণী জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে উদাসভাবে বলিল, "তা হবে।"

"হবে কি রকম? শুনলাম ভাগ্নের ভাত তোমার পছন্দ হয়নি, তাই মাস্টারী করে, কুলোজ্জ্বল করতে গেছ! বলিহারি বাবা, যা হোক।"

গম্ভীর হইয়া তরুণী বলিল, "কি করব? অন্নবস্ত্রের সমস্যা তো মেটাতে হবে?"

"কেন? ভাগ্নের সংসারে তো থাকলেই হোত।"

"ছিলাম তো অনেকদিন। ঝিগিরি, রাধুনীগিরি, সবই তো করেছি! কিন্তু আত্মীয় তারা—গরীবের ভার নিয়ে কত আর জ্বালাতন হবেন? তাই নিজের ভার নিজেই বইবার চেষ্টা করছি।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বিশেষ বিজ্ঞভাবে জামাইবাবু বলিলেন, "দ্যাখো, আর যা কর তা কর—মেয়েমানুষ হয়ে কখনও ঐ কাজটি কর না। শক্ত শাসনে না থাকলে মেয়েমানুষ কখনও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। স্বাধীন হলে মেয়েমানুষ উচ্ছন্নে যায়।"

নিরলা ধীরভাবে বলিল, "উচ্ছন্ন যাবার পথে স্বাধীনতা চাইলে শুধু মেয়েমানুষ কেন জামাইবাবু, পুরুষ মানুষরাও উচ্ছন্নে যায় আপনারা আশীর্বাদ করুন সে দুর্মতি ঘটবার আগেই যেন ভগবান আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেন। কিন্তু অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও একটা স্বাধীনতার দাবী করবার অধিকার মেয়েমানুষের আছে।"

"আচ্ছা-হা, স্বাধীনতার দাবী করবার অধিকার মানুষের আছে বটে—কিন্তু 'মেয়েমানুষ' যে আলাদা জাত গো।"

নিরালা বলিল, "অর্থাৎ? তারা মনুষ্যত্ব-বর্জিত?"

জামাইবাবু উষ্ণ হইয়া বলিলেন, "দ্যাখো, আমাদের শাস্ত্র বলেছে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রম অর্হতি!—"

নিরলা অধিকতর ধীরভাবে বলিল, "মনুসংহিতাখানা জামাইবাবুর সমস্ত পড়া আছে কি? 'শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনাশ্যতাশু তৎকুলম্' এ কথাও মনু বলে গেছেন, দেখেছেন কি?"

উত্তেজিত হইয়া জামাইবাবু বলিলেন, "মনুসংহিতা-ফংহিতা বুঝি না বাপু—শাস্ত্র ঐ কথা বলে গেছে তাই জানি। সীতাদেবী লক্ষ্মণের নিষেধ এড়িয়ে স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই রাবণ তাকে হরণ করতে পেরেছিল, শুনেছ?"

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল, "শুনিনি—এই শুনলুম। এমনভাবে কুতর্কের জের টানলে, আমায় জোড় হাত করে বলতে হবে, 'পরাভব মানিলাম মূর্খের নিকটে!—' কিছু মনে করবেন না। শাস্ত্র

সম্বন্ধে আপনারা যেভাবে নজীর উদ্ধার করেন—সে ভাবগুলো যেন একটু 'কেমন কেমন' লাগে। আমিও শাস্ত্রের ক খ গুলোর একটু খবর রাখি। রাগ করবেন না তাতে।—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধস্বরে জামাইবাবু বলিলেন, "করব বৈকি! মেয়েমানুষ শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি বোঝে যে শাস্ত্রের খবর রাখবে? দু'কলম লেখাপড়াই না হয় শিখেছ—তাই বলে শাস্ত্রের খবর তুমি রাখবে? বড় আস্পর্ধা হয়েছে তোমাদের।—মেয়েমানুষের এত 'বাড়' হওয়া ভাল নয়।"

"তা হতে পারে, কিন্তু তাতে আপনার বিদ্বেষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠবার কোন কারণ নেই। কেন না, জ্ঞানের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তিনি স্বয়ং মেয়েমানুষ। আর সুলতা যোগিনী যিনি যোগ শক্তিবলে জনক রাজা হেন মহাযোগীকেও একদা বিস্মিত, চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন, তিনিও মেয়েমানুষ। গার্গী, লোপামুদ্রাও আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান চর্চা করে গিয়েছিলেন। তাতে ঋষিরা কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন কিনা জানিনে—তবে জ্ঞান চর্চা অপরাধের জন্য তাঁদের যে ফাঁসির হুকুম হয়নি সেটা বোধহয় সত্যি। আর লীলা, খনা প্রভৃতি মেয়েরাও জ্যোতিষশাস্ত্র নাড়াচাড়া করে গেছেন—শুনে থাকবেন বোধ হয় লীলার অদৃষ্ট ভাল। ভাস্করাচার্য নিজে পণ্ডিত ছিলেন, সত্যিকার পণ্ডিতই তিনি, তাই লীলার হিংসে করে—নিজের পাণ্ডিত্য প্রতাপ জাহিরে চেষ্টা করেছিলেন বলে শোনা যায় না। কিন্তু খনা বেচারার বরাৎ জোর এমনি চমৎকার ছিল যে, খনার জ্ঞান চর্চা অপরাধের জন্য তাঁর জ্যোতিষ জ্ঞানাভিমানী শ্বশুর হিংসায় অন্ধ হয়ে—না—না মাপ করুন জামাইবাবু, এতবড় শক্ত সত্যকে সহ্য করা আপনাদের কোমল ধাতে সইবে না হয়তো। বরাহ ঠাকুর হিংসায় অন্ধ হয়ে নয় আহ্লাদে গদ গদ হয়েই ও পরম স্নেহভরে পুত্রবধূর জিভটি কেটে ফেলেন, ঠিকই করেছিলেন। পুত্রবধূর সাধন শক্তি যদি শ্বশুরের পাণ্ডিত্য গৌরবকে ছাড়িয়ে উঠত, তাহলে কী সর্বনাশ হত বলুন দেখি এই জগৎটার! দুনিয়া শুদ্ধ মানুষের জাত ধর্ম তাহলে রসাতলেই যেত আর কি। খনা যদি জগতে আরো জ্ঞান প্রচারের সুযোগ পেত, তাহলে শুধু বিদ্যাভিমানী বরাহের কেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জ্ঞানের আয়রন চেষ্টগুলো পর্যন্ত নীলেমে চড়িয়ে দিয়ে ছাড়ত। কেন না, আপনাদের মতে জ্ঞান রাজ্যের জমিদারীখানা এতই ছোট যে দৈবাৎ কোন মেয়ে ওর দু'পয়সার এক পয়সা শরিকদার হলেই – পুরুষদের যোল ইজ্জৎ নষ্ট হয়ে যায়। হায়রে ভগবানের জ্ঞান রাজ্য, আর হায়রে সে রাজ্যের জরিপি মাপের চৌহদ্দি।—"

জামাইবাবু এসব কথার অর্থ কি বুঝিলেন বলা যায় না। তবে তাঁর মুখভাবে স্পষ্টই বোঝা গেল—যা বুঝিলেন তার ভাষাগত সংজ্ঞার নাম সমস্তই অস্পষ্ট দুর্বোধ্য।

খানিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিবার মত কথা কিছু খুঁজিয়া লইয়াই বোধহয়—তিনি হঠাৎ বলিলেন, "মেয়েদের গুণের বড়াই সবই জানা আছে। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাবার জন্য মেনকা---"

বাধা দিয়া নিরলা বলিল, "তাতে মেনকার কোন স্বার্থই ছিল না জামাইবাবু—ছিল স্বার্থপর ইন্দ্রের নীচ ঈর্ষা। ইন্দ্র যত ডিগ্রী সাধনের জোরে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিল, বিশ্বামিত্রের সাধনার ডিগ্রী তার ওপরে যাচ্ছে দেখে ইন্দ্র মেনকার ওপর হুকুম জারী করে বসেন? মেনকা পরাধীনা তার স্বাধীনতা থাকলে সে কি করত বলা যায় না, এক্ষেত্রে কিন্তু পরাধীনভাবেই সে আসরে নেমেছিল। তারপর পবন দেবতার বজ্জাতির কথা মনে করুন। কিন্তু আপনাদের বিচার এমনি চমৎকার যে কেলেঙ্কারীটা আসলে করলেন যাঁরা তাদের নাম ধামাচাপা পড়ল। কেন না তাঁরা পুরুষ। কিন্তু তাঁদের হুকুম তামিল করে—তাঁদের স্বার্থের জন্য যে আত্মবলি দিয়ে মরল তার অখ্যাতি জগৎ জুড়ে রহিল, কেন না—সে মেয়েমানুষ! রাবণের রাক্ষুসে বজ্জাতির কথাটাও তেমন তীব্রভাবে আলোচিত হয় না, যেমন সীতার—

ধর্মের খাতিরে গণ্ডির বাইরে পা বাড়ানোর কথাটার ছল খোঁজা হয়। উঠুন বড়দি—ওষুধ খান।" হঠাৎ প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীকে জাগাইয়া তরুণী ঔষধ খাওয়াইতে ব্যস্ত হইল। জামাইবাবুর কোন মন্তব্য শুনিবার অপেক্ষা করিল না।

জামাইবাবু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দু'জনে নিম্নস্বরে কি কথাবার্তা হইল। ঔষধ খাইয়া প্রৌঢ়া গায়ে ঢাকা দিয়া জড়সড় হইয়া শুইলেন। তরুণী হাই তুলিয়া বলিল, "জামাইবাবু, বাঙ্কে উঠে ঘুমের চেষ্টা দেখুন না।"—

মস্ত জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রৌঢ় হতাশভাবে বলিলেন, "আর ঘুম। আজ একমাস ঘুম কাকে বলে জানি না। তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীটি মারা গেছে। আহা, মেয়েগুলো যদি যেত, তা'র বদলে।"

"সে কি! আপনার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও মারা গেছেন। মোটে চার বছর ঘর করেছেন, নয়? আহা কি হয়েছিল।"

"বহুদিন থেকে ভুগছিল। দ্বিতীয় মেয়েটা হবার পর থেকেই সুতিকা ধরছিল—তার ওপরেই ছোট মেয়েটা হল।"

তরুণী বাধা দিয়া বলিল, "তার ওপরই!"

প্রৌঢ় উগ্র বিরক্তিভাবেই বলিলেন, "হাঁ হাঁ ভগবানের দেওয়া। মানুষের তো হাত নয়। না হলে বারণ করতুম। ওই মুখপোড়া মেয়ে তিনটির জন্যই সে অসময়ে মারা গেল। তরুণী অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "বটে। তারপর—ছোট মেয়েটি কত বড়?"

"তা মাস ছয়েক এর হবে। সেও আজ মরে কাল মরে, পুঁয়ে যাওয়া চেহারা। মরে তো আপদ যায়, তা মরছে না তো।"

"অন্যায়!—আশ্চর্য স্পর্ধাও বটে, তাকে মানুষ করছে কে?" তাচ্ছিল্যভরে প্রৌঢ় বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "কে আর করবে? ওর বোনগুলোই করছে।"

"তারাও তো বাচ্চা! কচি বোনটাকে সামলাতে পারে?"

"না পারলে চলবে কেন?" প্রৌঢ় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিলেন। যেন তরুণীর প্রশ্নটা ভয়ানক নীতি বিগর্হিত, ভীষণ অমঙ্গল দুষ্টা, সুতরাং তার উত্তরটা কঠিন শাস্তিযুক্ত না হইলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে। অতএব রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তোমরা কেউ এসে মানুষ করবে কি? তার দিকে কেউ এগোয় না। একটা বিধবা শালী ছিল—তাকে বললুম? সে বললে চরক কেটে দিন গুজরান করছি— ছেলে মানুষ করতে পারব না।" একটু থামিয়া অধিকতর উত্তেজিতভাবে তিনি তীব্র শ্লেষভরে পুনশ্চ বলিলেন, "সব আপ্ত সযালীর দল! বুঝেছ মেয়েগুলো সব আপ্ত সয়ালী। ওদের জুতোর তলায় পিষে রাখাই ঠিক—না হলেই ওরা উচ্ছন্নে যায়।"

২

তরুণী স্তব্ধ।

জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রৌঢ় সশব্দে 'হ্যাক থুঃ' করিয়া থুতু ফেলিলেন, মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আর এই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো! দু'চক্ষে দেখতে পারি না, এসব ফ্যাশান। লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষ দেখলে আমার শরীর জ্বলে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল, "আমায় দেখে আপনার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।—আর সেই রাগের ঝালটা এমনিভাবেই নানা ছুতোয় বর্ষণ করছেন। বুঝতে পারছি সব জামাইবাবু। এ সবের জবাব

স্পষ্ট করে সত্যি কথায় বলতে হলে—সকলের আগে বলতে হয়—হেথা দুষ্টু সরস্বতী, খানিকক্ষণের জন্য দয়া করে কাঁধে ভর দাও। যেন মিথ্যা আর ভণ্ডামির অত্যাচারকে এক হাত ঠুকতে পারি, যা, এইটুকু কর।"—

প্রৌঢ়ের দু'চক্ষু কপালে উঠিল। হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "নিরু! তোমায় হতে দেখেছি আমি জানো? গুরুজনদের সঙ্গে কিরকম করে কথা কইতে হয় সেটা শিক্ষা করো। গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বল।"

তরুণী স্মিতমুখে, বিনীতভাবে বলিল, "দেখুন জামাইবাবু, রাগ করবেন না। সত্যের খাতিরে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি—কথাটা মনে রাখবেন। গুরুজনরা যদি নিজেদের গুরুত্ব—সম্মানটা বাঁচিয়ে চলতে না জানেন, তাহলে কোন লঘুজনের ঠাকর্দারও সাধ্যি নেই—তাঁর সম্মান বাঁচিয়ে রাখে। অনেকক্ষণ থেকেই বসে বসে অনেক রকম ডেঁপোমি করছেন, চুপচাপ বসে বসে শুনছি সবই—"

"কি! ডেঁপোমি করছি?—"

"তবে কি বলব? ভণ্ডামি, না ন্যাকামি? কোন বিশেষণটা শুনলে আপনি খুশী হবেন বলুন, তাই বলছি। কিন্তু মাপ করুন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার মোটেই ইচ্ছা নেই। ঝগড়া বা রাগারাগির চেষ্টা ছেড়ে দিন। কিন্তু সত্যের খাতিরে যদি সত্য আলোচনায় একটু এগিয়ে আসেন—তাহলে বড় বাধিত হই। আপনি শিক্ষিত লোক— আপনার শিক্ষার সম্মানটা একেবারে ভুলে গেছেন। এ কথাটা মনে করতে পারি না। পারি কি?"

জামাইবাবু একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিলেন, "অত ভনিতার দরকার কি? মেয়েদের বেশি জ্যাঠামো আমি বরদাস্ত করতে পারি না জানো? ওসব আস্পর্ধা দেখে আমার ইচ্ছা করে, পা থেকে জুতো খুলে পটাং পটাং বসিয়ে দিই!—"

"বাহবা! বাহবা! এমন না হলে ইউনিভার্সিটির বি. এ. ডিগ্রীর বাহার খোলে। বা জামাইবাবু! দিন আপনার পা দু'খানা এগিয়ে পেন্নাম করে একটু পায়ের ধূলো নিই।"—তরুণী সত্য সত্যই গলবস্ত্রে হেঁট হইয়া ভদ্রলোকটির পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া মাথা ঠুকিল। সবিদ্রূপ হাস্যে বলিল, "নিন, জুতা খুলুন, পায়ের ধুলো নিই।"

অটল গাম্ভীর্যে উত্তর হই, "তোমার ভক্তি থাকে নিজ হাতে জুতা খুলে পায়ের ধূলো নাও।

"তাহলে ভক্তির মাত্রা হ্রাস করে হাত গুটোতে হচ্ছে!"

—শ্লেষ ভরে প্রশ্ন হইল, "কেন? গুরুজনদের পায়ে হাত দিলে তোমার জাত যাবে?"

"আজ্ঞে না। আপনি আমার পূজনীয় গুরুজন সেটা সত্যি! তা বলে আপনার জুতোটাও যে আমার পূজনীয় গুরুজন একথা মনে করা যায় না। বিশেষ করে আপনার ঐ জুতোর তলায় কুটে রোগীর রক্ত-পুঁজ মিশানো ধূলো থেকে শুরু করে বাজ্যের সমস্ত নোংরামির বিষ জমা হয়ে রয়েছে। আপনার ওপর ভক্তি দেখাতে গিয়ে—ও বিষকে দু'হাতে তুলে ভক্তি ভরে মাথায় স্থাপন করলে আমার কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ ঘটাই বেশি সম্ভব। আপনাকে তাতে সম্মানের নামে অপমান করাই হয়। নয় কি?"

কদর্য মুখভঙ্গী করিয়া দাঁত খিঁচাইয়া মান্যবর জামাইবাবু ভেঙচাইয়া বলিলেন, "নয় কি? অ-হ-হ! কী কথাই বললেন। আমার অপমান! আমার অপমান কিসে হবে শুনি? আমি পুরুষ মানুষ! আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে....।"

অতি অশ্লীল ইতর ভাষায় তিনি এমন কদর্য উক্তি উচ্চারণ করিলেন, যা ভদ্র সমাজে অকথ্য!

তরুণীর আপাদ-মস্তকে উগ্র বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝনা বহিয়া গেল। রুগ্না, নিদ্রাচ্ছন্না শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ তীব্র বেগে উঠিয়া বসিলেন! তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "শিক্ষিত ভদ্রলোক না কি আপনি? কেমনই যে আপনার শিক্ষা, কেমনই যে আপনার ভদ্রতা—বুঝতে পারছি নে! নেমে যান গাড়ি থেকে, নামুন এখুনি!—ইতর সমাজে গিয়ে আপনার ইতরামো প্রকাশ করুন গে, যথেষ্ট আদর লাভ করবেন।"

উঞ্ছপ্রবৃত্তি শৃগালের অন্তঃসারশূন্য গর্বচাতুর্য আস্ফালন যেন অকস্মাৎ কোন তেজস্বিনী সিংহিনীর দৃপ্ত হুঙ্কারে স্তব্ধ হইল! মাথা হেঁট করিয়া জামাইবাবু হঠাৎ নিস্পন্দ হইলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তরুণী বলিল, "জামাইবাবু, গুরুজন আপনি সত্যিই। কিন্তু আপনার এই নীচতা আমাকে কতটা আঘাত দিলে, বলতে পারছি নে। ছিঃ এত জঘন্য ইতর অন্তঃকরণ আপনার। ইতর কাপুরুষ দর্পের নাম আপনাদের কাছে 'পৌরুষ'? আপনার জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল না নিজেকে এতটা অপমান করতে?"

জড়িত স্বরে, তোৎলাইয়া তোৎলাইয়া জামাইবাবু বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, "কথাটা......কথাটা......ঠাট্টা মাত্র। ঠাট্টা....সিনসিয়ারলি বলছি....কিছু মনে করবেন না। মাপ করুন অ'মায়"—একটু থামিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া, উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "নিরুর বড় বোন আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী—"

বাধা দিয়া নিরলা—অর্থাৎ তরুণী বলিল, "তার জন্য আমার মাথাটা আপনি এমন করে কিনে রাখেননি, যাতে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবার মত 'বোল' ঝাড়তে পারেন। অপ্রিয় সত্যকে চেপে যাওয়াই মঙ্গল। দুঃখময় অতীত স্মৃতির যন্ত্রণা ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু আত্মীয়তা সম্পর্কের দম্ভটা যখন বড় দম্ভভাবেই উচ্চারণ করলেন—তখন বড় দুঃখেই স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি জামাইবাবু—সম্পর্কটা মনে আছে, আর সে সম্পর্ক দম্ভের শাস্তি লাঞ্ছনাটা চিরদিন খুব ভাল করেই মনে থাকবে।"

যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য হইয়া পরম নিরীহভাবে জামাইবাবু বলিলেন, "কেন? কিসের শাস্তি লাঞ্ছনা?"

ম্লান বেদনায় হাসি হাসিয়া তরুণী বলিল, "আর সে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি? আপনার অনুগ্রহে আমার বাপ-মার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধারটা বহুদিনই হয়ে গেছে। বাপ-মাও আজ স্বর্গে। দিদিও আপনার পাশব নির্যাতনের অনুগ্রহে অকালে দেহরক্ষা করে বেঁচেছে।—কার জন্যে বলব, আর—"

চোখ লাল করিয়া জামাইবাবু ধমকাইয়া বলিলেন, "কী? পাশব নির্যাতন? জানো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটায় পশুভাবের কথা আসতেই পারে না।—হিন্দুর ঘরে সেটা পবিত্র দেবভাবপূর্ণ!"

বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, "শুধু পবিত্র নয়, অতি পবিত্র, সুন্দর—আদর্শ, স্বর্গীয় গৌরবপূর্ণ—মহা পবিত্র দেবভাব, একটু অনধিকার চর্চা করতে বাধ্য হচ্ছি। ক্ষমা করবেন আমায়। আপনাকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যা নির্লজ্জ ভণ্ডামি শুরু করেছেন, অত নির্লজ্জতা সহ্য করা সম্ভব নয়। পবিত্র দেবভাবের নামে দম্ভ জাঁক-জমকের বক্তৃতা তো দিলেন।—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এত পবিত্রতা জ্ঞানই যদি মনে আছে, এত দেবভাবই যদি হিন্দুর ঘর উজ্জ্বল করে রেখেছে—তাহলে কার্য ক্ষেত্রে তিন তিন দফায় আপনি স্বয়ং কসাইয়ের ব্যবসা করলেন কেন?"

ব্যথিত স্বরে নিরলা বলিল, "কসাইয়ের ব্যবসা এর চাইতে ঢের ভাল বড়দি—ঢের ভাল। কসাইয়েরা দাম দিয়ে জানোয়ার কিনে এনে জবাই করে। কিন্তু এই যে বাংলার হতভাগা মেয়ে জবাই করবার ব্যবসা।—যে ব্যবসা বাংলার বাবার দল ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে চালাচ্ছেন—এ নৃশংস ব্যবসার কোথাও তুলনা নাই। বাংলার বাবাদের বুক হাতুড়ীর ঠোক্করে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে— প্রতিদিন হাজার হাতুড়ীর ঘা সে বুকে বাজছে—কিন্তু এমন অগাধ আলস্যপরায়ণ, উদার ধর্মশীল 'বাবার দল' আর

কোনো দেশে নাই। ধর্মের নামে এত অধর্মকে অত্যাচার আর কোনখানে এমন অবাধে চলে নি, যেমন বাংলার বাবারা চালিয়েছেন। না জামাইবাবু আপনাকে আমি কিছু দোষ দিচ্ছিনে—কিসের দোষ আপনার? লাথির উপর লাথি, ঝাঁটার উপর ঝাঁটা, জুতোর উপর জুতো বর্ষণে, করায়ত্ত অসহায় ·দুর্বল নারীর ওপর নৃশংস শাসন ক্ষমতা প্রচারের নাম যদি দেবত্ব মহিমা হয়, তবে একবার কেন, এক লাখবার আপনি, দেবতা—আপনাদের এ দেবত্ব, এ হেন স্বর্গীয় দেবভাব...."

নিদারুণ যন্ত্রণা নিষ্পেষণে নিরলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। ঠোঁটে তার অসাধারণ সংযমহীন পরিহাসের হাসি এখনও জাগিতেছিল—কিন্তু চোখ দিয়া উচ্ছল উচ্ছ্বাসে সহসা দরদর জলস্রোত বহিয়া সে হাসির উপর ঢেউ খেলিয়া গেল।

চট করিয়া জামার আস্তিনে চোখের জল মুছিয়া সে আবাব সোজা হইয়া বসিল। অনুত্তেজিত ধীর কণ্ঠে বলিল, "জামাইবাবু, বুঝি সব, জানি সব—কিন্তু আছি বোকা হয়ে! জানি না কি জামাইবাবু, যেখানে আপনার মত মহৎ, উন্নত রুচিসম্পন্ন, মহাপৌরুষমন্ত্র, বীরের দল দাঁড়িয়ে আছেন—সেখানে আপনাদের মা-বোন স্ত্রী-কন্যার সম্বন্ধে— সমস্ত ন্যায় জুতার তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে সত্যি সত্যিই কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই। ভদ্র, মহৎ, স্বাধীন, উদার, পূজার্হ দেবতা আপনারা। আপনাদের ঘরে পবিত্র দেবভাব সেই লাথি-ঝাঁটা জুতোর সম্বন্ধটার মধ্যে পশুভাবের গন্ধ আছে বলে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে—রাগে আপনাদের চোখ লাল হয়ে উঠবে বৈকি? কিন্তু যখন আমার বড় বোন ঐ পবিত্র দেবভাবের মাহাত্ম্যে সিফিলসের বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ল। পবিত্র দেবভাবের মহত্ত্ব হানির অজুহাতে যখন তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করার মত যন্ত্রণায় মাসের পর মাস দু'-দু'টি বছর ভুগিয়ে মারা হল তখন? না দেবতা আপনি সত্যিই। এই তো নির্জলা দেবত্বের আদর্শ। পৃথিবীর কোন দেশ এ আদর্শের জুড়িদার আদর্শ দিতে পারবে না।—তারপর—আরও একটু বলছি, অতিশয় ক্লেশের সঙ্গেই বলছি—আমার দিদি আপনাকে জ্যান্ত দেবতা বলেই মনে কবতেন, সেটা সত্যি। আপনাদের ভণ্ডামির সম্মোহন মন্ত্রে তিনি এমন নিখুঁত দীক্ষালাভ করেছিলেন যে, আপনাব সমস্ত পশুত্ব, অন্যায় তাঁর চোখে ন্যায় ছিল। এমন ন্যায় যে আপনি আপনার ভাজ-ভাইপো—সেই নাবালক আর বিধবাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়টুকু জাল-জোচ্চুরির সাহায্যে ঠকিয়ে নিলেন। দিদি আমার সেটাও দেবত্ব বলে অকপট চিত্তে মেনে নিলেন। এবং সেই সূত্রে পাড়ায় পাড়ায় কোঁদল করে আপনার পক্ষ সমর্থন করে এলেন। আদর্শ সহধর্মিনী তিনি সন্দেহ নেই। তারপর সে সম্পত্তি আপনি যখন বদমাইসিতে ফুঁকে দিলেন, তখন দিদি সেটাও দেবলীলা মেনে নিলেন; এবং পতিব্রত্যের মহিমা প্রচার করবার জন্য, না না ভুল হোল আপনার ঐ দেবভাবের মহিমা বলেই আপনার কুৎসিত ব্যাধির অংশ ভাগিনী হলেন। পুরুষ আপনি স্বাধীন! পয়সার থলি আপনার নিজের হাতে! তাতে আপনি স্বয়ং দেবতা, আপনি নিজের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী? না— সে স্ত্রীলোক, পরাধীনা। তার অর্থ সঙ্গতিহীনা, আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশী। তার ওপর দেবতার সহধর্মিনী 'দাসী' সে। সুতরাং তার চিকিৎসার কথাটা কেউ মুখে আনলেও না। সে যখন বিছানায় পড়ে শুযছে, তখন অন্য স্ত্রী সংগ্রহের সশব্দ আয়োজন উৎসব শুরু হয়ে গেল। সে শুনতে পেয়ে গভীর বেদনা ভরে কাঁদলে! মূর্খ সে। বুঝলে না, দেবভাবের চরমোৎকর্ষ ফলই ফলছে। এ মধুরোজ্জ্বল দেবত্ব, এ মহামহিম দেবভাব—এই পশুভাবপূর্ণ প্রকাণ্ড পৃথিবীটার আর কোথাও নাই, যা আছে শুধু আপনাদের ঘরেই। ঠিক কথা।"

ঝাঁ ঝাঁ শব্দে গোটাকতক স্টেশন পার হইয়া, গাড়ি সেই সময় আর একটা স্টেশনে আসিয়া

থামিল। অপ্রসন্ন মুখে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে জামাইবাবু মরিয়া রকমের এক লাফ দিলেন, দুয়ার ঠেলিয়া দ্রুত নামিয়া পড়িলেন। কোন সৌজন্যের খাতিরে বিদায় সম্ভাষণসূচক একটা শব্দও উচ্চারণ করিলেন না।

৩

জামাইবাবু প্ল্যাটফর্মে পা দেওয়া মাত্র সহসা পিছন হইতে আর এক প্রৌঢ় আসিয়া তাঁর কাঁধ ধরিলেন সহাস্যে বলিলেন, "কিহে অনিলবাবু যে! দাঁত বাঁধিয়ে চুলে কলপ লাগিয়ে—দানাপুর যাওয়া হয়েছিল চতুর্থ পক্ষ ঠিক হল দাদা? কবে বিয়ের দিন?"

তীরবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরার ভিতর একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, জামাইবাবু প্রায় তাবস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখানো অমৃত!—সাত ঝাঁটা মেরে এই লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষেব মুখে।" ঈষৎ হাসিয়া অমৃতবাবু বলিলেন, "তার চাইতে এক ঘুষিতে তোমার বাঁধানো দাঁতগুলোর বংশ ধ্বংস করেই ফেলি না! ইউনিভার্সিটির আহাম্মক, বিয়ের বাজারে মোটা ঘুষ খাবার জন্যে বি. এ. পাশ করে কি সেই আদিম বর্বরতা তোমার মধুর জানোয়ারত্বটা এক ইঞ্চিও ছাড়তে পারনি দাদা, লজ্জা করে না তোমার?"

তৃতীয় শ্রেণীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া, হাসিমুখে তরুণী বলিল, "নাতির গলার আওয়াজ যে! কি বলছেন বাবাজী? ওঁব লজ্জা করে কিনা জানতে চাইছেন? না না না! লজ্জা কিসের? নির্লজ্জ ইতব বর্বরতা প্রকাশেব নামই যে এদেশের বাজারে 'পৌরুষ প্রকাশ।"

গর্জিয়া জামাইবাবু বলিলেন, "কি! নিরু!—তুমি আমার সাক্ষাতে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ রকছ? এই তোমার শিক্ষা? দাঁড়াও তোমার আত্মীয়দের কাছে তোমার বিদ্যের পরিচয় জানাচ্ছি। এই সব খ্যামটাউলীপনা করবার জন্য তোমাদের শিক্ষে চাই, স্বাধীনতা চাই, কেমন?"

প্রৌঢ় অমৃতবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "দিদিমা, ভদ্রলোকটি আপনার কোন আত্মীয় হন কি?"

তরুণী হাসিমুখে বলিল, "নিশ্চয়! আত্মীয় না হলে এমন জেল কীপারের শাসন গৌরব কেউ দেখাতে পারে কি? উনি আমার বড় ভগ্নিপতি। তবে সৌভাগ্যের বিষয় বড় বোনটি আজ দশ বছর হল দেহত্যাগ করে, ওর হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।"

"তাহলে একটু কুকুর শাসন কবব না কি?"

হঠাৎ ট্রেন ছাড়িল। অমৃতবাবু, জামাইবাবুর মতামতের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর উঠিলেন। তরুণী জিনিসপত্র সরাইয়া তাঁহাদের স্থান দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল—অমৃতবাবু বাধা দিলেন। নিজ হাতেই জিনিসপত্র সরাইয়া জামাইবাবুকে পাশে টানিয়া লইয়া বসিলেন। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই যে বড় দিদিমাও রয়েছেন। নমস্কার আজ মার চিঠিতে আপনার অসুখের খবর পেলাম। এখন একটু ভাল আছেন তো।"

সংক্ষেপেই উভয় পক্ষই কুশল বিনিময় হইল। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী স্মিতমুখে বলিলেন, "মাঝ রাস্তায় হঠাৎ আপনার দেখা পাব, জানতুম না। কোথা যাচ্ছেন?"

অমৃতবাবু বলিলেন, "কলকাতা। পরশু মাগাদ এলাহাবাদে ফিরব। আমার মা কেমন গিন্নীপনা করছে বলুন দেখি।"

হাসিয়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "খুব। এইসব মোটঘাট বাঁধা ছাঁদা থেকে শুরু করে গাড়ি ডাকিয়ে আমাদের বিদেয় করা পর্যন্ত, সব কর্তৃত্বই তার হাতে। আপনার ম্যানেজারমশাইকে সঙ্গে দিলেন, তিনি টিকিট করে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন।"

নিরলা স্নেহময় স্বরে বলিল, "সার্থক মা পেয়েছেন আপনি! শিক্ষিত পিতা ঢের আছেন; কিন্তু মেয়েকে এমন শিক্ষায় গড়ে তুলতে মনোযোগ খরচ করবেন—এমন সা-খরচে পিতা এদেশে খুব কম। আপনার মত একটি পিতার মুখ দেখতে পেলেও আনন্দ গৌরবে আমাদের বুক দশ হাত হয়ে ওঠে বাবা।"

আর্দ্রকণ্ঠে অমৃতবাবু বলিলেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন মা—আমার 'মা'টাকে আমি যেন জগতের মা হবার যোগ্যতায় গড়ে রেখে যেতে পারি। এই অধঃপতিত দেশে মাতৃশক্তির যে লাঞ্ছনা ঘটছে তার বিরুদ্ধে আমার মাটাকে যেন মূর্ত তিরস্কারের মতই উদ্যত বজ্রের মতোই—উগ্র কঠিন হয়ে দাঁড়াতে দেখি। লক্ষ্মীছাড়া দেশ, লক্ষ্মীশক্তিকে নির্যাতন করে তুমি লক্ষ্মীশ্রী লাভ করবে? ভগবানের বিচার এতই বেহিসেবী ভেবেছ?"

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হাঁ—এদেশ তাই ভেবে রেখেছে। এদের বিচারে তাই ভগবান শুধু বেহিসেবী নন তিনি রীতিমতই ভণ্ড, জোচ্চর, প্রতারক। এদের সুখ সম্পদ ভোগের অধিকারটা ভগবান শুধু জোচ্চুরি করে কেড়ে নিয়েছেন তা নয়, তিনি নেহাৎ শয়তানী করেই এদের শক্তিগুলো চুরি করে নিয়েছেন! নইলে—শক্তি থাকলে এরা, মানুষগুলোর—অর্থাৎ 'মানুষ' বলতে যাদের বোঝায়—তাদের মাথা হাতে কাটত।"

তরুণী হাসিল, বেদনা ভরে বলিল, "বড় দুঃখ বাস্তবিকই, এ দেশের মানুষের মন বুদ্ধি হৃদয়কে বিচার করতে গেলে, বড় মর্মান্তিক দুঃখেই আমাদের প্রাণটা পিষে যায়। ছিঃ এদের বিচার বুদ্ধি এত জঘন্য নীচ হয়ে পড়েছে। এত ইতরতা মানুষের। 'সত্যঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম সনাতনঃ' শুনেছি বাবাজী—কিন্তু কুপৌরুষ দম্ভ বলে, কদর্য মিথ্যাকে এমন নির্লজ্জ ইতরামোর সঙ্গে প্রচার করাও যে 'সনাতন ধর্ম' তা জানতুম না।"

জামাইবাবু এতক্ষণ ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতেছিলেন। এবার হঠাৎ হাত-পা ছুড়িয়া মহাক্রোধে গর্জিয়া বলিলেন, "দ্যাখো নিরু! পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করবার জন্য যে তোমরা লেখাপড়া শিখেছ। তাও জানতুম না। কি খেয়াতিই রাখলে তোমরা লেখাপড়া শিখে। ঐ একজন। বুড়ি...."

প্রৌঢ়ার উদ্দেশ্যে তিনি কি বলিতে উদ্যত হইলেন মুহূর্তে অমৃতবাবু উঠিয়া বিনা বাক্যে জামাইবাববুর গলাটি টিপিয়া ধরিলেন। দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "জিভ সামালো! নইলে তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব। কাপুরুষ, পশু, তোমার গুণের কাহিনী—আমি কি কিছু জানি নে? পীরের কাছে মামদোবাজী করতে এসেছ?"

জামাইবাবু গাঁক গাঁক শব্দে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "ছাড় ছাড় ?—তোমার পায়ে পড়ি গো।"

"এইবার পায়ে পড়ি! পথে এস।" অমৃতবাবু গলা ছাড়িয়া দিলেন। উগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "লম্পট ব্যভিচারীর দল, ব্যভিচারের দাস খতে নাম লিখিয়ে—মনুষ্যত্বকে দেউলে করে বসে আছ—ছাগল, ভেড়ার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছ—আবার বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা সাজবার সখ। জানো না, তোমাদের ঘাড় ভাঙবার সিংহগুলো এখনো মরেনি সবাই? তোমাদের মূর্খতার অত্যাচার চুপ করে সয়ে যাই বলে বড়ই বাড় বাড়ন্ত হয়েছে, নয়?"

ফোঁস ফোঁস করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জামাইবাবু সক্রোধে বলিলেন, "তোমায় আমি কিছু বলিনি—তুমি কেন অপমান করলে? আমি মানহানির দাবিতে নালিশ করব।"

"এই মুহূর্তে করগে। এই নাও, আমি খরচ দিচ্ছি", পকেট হইতে তিনখানা নোট বাহির করিয়া জামাইবাবুর সামনে ফেলিয়া দিয়া, অমৃতবাবু বলিলেন, "যাও মামলা রুজু করগে, আর যা খরচ লাগে জানিও, পরে দেব। আপাতত তিন শত্রু দিয়ে রাখলুম।"

৪

তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন।

মিনিটকতক সব চুপচাপ।

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "বড় দুঃখিত হচ্ছি—"

বাধা দিয়া অমৃতবাবু ধীরভাবে বলিলেন, "কিসের দুঃখ? মানুষকে সম্মান করার নামে, মানুষের ইতরামো ব্যাধিকে আমি পূজা করিনি বলে? ভুল আপনাদের। মারাত্মক ভুল এই—মানুষকে খাতির করার নামে মানুষের মনুষ্যত্ব গ্লানিকে খাতির করা।"

"কে সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝছে বলুন? মাঝখান থেকে এই কথাটা দাঁড়াবে, আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আপনাদের বন্ধুত্বের মাঝে একটা অপ্রিয় বিচ্ছেদ।"

হাসিয়া অমৃতবাবু বলিলেন, "এই কৃষ্ণের জীবটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে—চিরকাল থাকবেও—আমি এটুকু অন্তত মনে জানি। কিন্তু ওঁব অন্যায়েব সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কোন কালেই ছিল না। সেই কালেই থাকবে না। সেই অন্যায়টাকে আমি গলা টিপে ধরেছি মাত্র, বন্ধুকে কিন্তু আমি চিরদিন যেমন ভালবেসেছি—এখনো তেমনি ভালবাসছি।"

উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া জামাইবাবু বলিলেন, "যাও যাও, ঢের হয়েছে তোমার ভালবাসাও আমার দরকার নেই। তোমার বন্ধুত্বেও আমার কাজ নেই। অসময়ে তুমি একদিন আমার ঢের উপকাব করেছিলে, আজ তার শোধ নিলে। যাও আজ থেকে তোমার সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকল।"

হাসিমুখে অমৃতবাবু বলিলেন, "মনে কর না সেটি। তোমার প্রকৃতির ব্যাধি— তোমাব অন্যায়, তোমার নীচতা, তোমার জঘন্য ঈর্ষাকে তুমি যতক্ষণ না ছাড়ছ ততক্ষণ আমার পাওনা শোধ হবার নয়। ভূতের ওঝারা রোগীকে পিটিয়ে ভূত তাড়ায়, জানো বোধ হয়?—বন্ধু তুমি! ভূতের হাতে তুমি মরবে, এটা সহ্য করা যায় না। বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য বন্ধুর ঘাড়ের ভূতকে আমি—"

অমৃতবাবু হাসিমুখে থামিলেন। নিরলা সহাস্যে বলিল, "কথাটা শেষ করেই ফেলুন না।"

"ও কথা—শুধু কথায় শেষ কবলে তো হবে না দিদিমা—ওর জন্য কাজ চাই যথেষ্ট, আপনারা যা দিদিমার দল—আপনাদের এই কুসন্তান কুপৌত্র কুদৌহিত্রগুলোকে সায়েস্তা করবার কাজে লাগুন দেখি।—দেশটার একটা মহৎ উপকার হয় তাহলে।"

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হয়েছে তাহলেই! মা সরস্বতীর মন্দিরের ধূলো মাথায় তুলে নিলে, যে দেশের মেয়েদের জাতধর্ম রসাতলে যায়, ইতরামি আর মূর্খতার পূজায় আত্মনিবেদন না করলে যে দেশের মেয়েরা 'দেবী' হতে পারে না—সেই দেশেব মেয়ে হয়ে আমরা ওসব কাজ করব। ব্যকথা খুব ভাল বটে, কিন্তু অকথা আমাদের কি হয়ে রয়েছে, চেয়ে দেখেছেন কি? ঐ যে এক ভগবানের জীব আপনার পাশে বসে রয়েছেন—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, নারীর বিশেষত্ব কি?—ক্ষমা করবেন আমায়—"

তিনি মুদ্রিত চক্ষে নতশিরে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "তিক্ত কঠোর সত্য আমি প্রকাশ করছি, মার্জনা করবেন আপনাদের এই দুর্ভাগা মায়ের অপরাধ!—নারী আজ ওঁদের বিচারে কী হয়ে দাঁড়িয়েছে জানেন? শুধু দেহেন্দ্রিয় মাত্র। এই ইতর দেহেন্দ্রিয়গত সংজ্ঞা ছাড়া নারীর আর কোন অস্তিত্ব, কোন স্বাতন্ত্র, কোন মৌলিকতা নাই। শরীর, মন, শক্তি ওদের বিচারে মনুষ্যত্বহীন, নারীর বুদ্ধিমত্তা ওঁদের কাছে ধোবার বোঝা বহনকারী গাধা মাত্র, নারীর আত্মাকে জুতোর চাপে পিষে গুঁড়ো করাই ওঁদের কাছে মহা পৌরুষের পরিচয়। কারণ কি জানেন? ওঁরা অন্ন-বস্ত্রের মূল্যে নারীর হৃদয়ে মন বুদ্ধি আত্মার সমস্ত শক্তি, সমস্ত স্বাধীনতা কিনে নিয়েছেন, শুধু অন্ন-বস্ত্রের ঋণে এ দেশের নারীশক্তি 'দেউলে' হয়ে গেছে—এই তাদের প্রকৃত অবস্থা।"

অমৃতবাবু তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বলেছেন। এক বর্ণও অত্যুক্তি নয়। এই অন্ন-বস্ত্রের ঋণকে যে নারী এড়িয়ে চলেছেন, তিনি সমাজের বিচারে সমাজচ্যুত। কেন না যাকে হাতে মারবার বা ভাতে মারবার না থাকে তার ওপর অবাধ অত্যাচারটা চলে না, চলে শুধু কুৎসিত দুর্বাক্যের অত্যাচার। কিন্তু এই প্রতারক, ভণ্ড, নীচ, ক্রূরচেতা কাপুরুষদের বিধান শিরোধার্য করে চলবার দিন আর আপনাদের নাই মা। এ সমাজের কাছে সম্মান চাইবেন না। এ সমাজে কুক্কুরী-শূকরীদের সম্মান আছে কিন্তু সিংহবাহিনীদের সম্মান নাই। আপনাদের জন্য এখানে শুধু অবজ্ঞা, ঘৃণা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন; আপনাদের অবস্থার পক্ষে এইটেই ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করুন, ডাকুন আজ বজ্র নির্ঘোষে রুদ্র আহ্বানে নিজের অন্তরাত্মাকে—আব দেশের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্জীব নারী শক্তিকে বলুন—ওরে চিরলাঞ্ছিত, চিরপ্রতারিতের দল, তোরা মিথ্যাবাদী কাপুরুষের কথাকে ভয় করে মাথা নোয়াস নে। কথার অত্যাচারকে যতই ভয় করবি অত্যাচার ততই বেড়ে উঠবে। কেন না, এদেশ শুধু কথার দেশ, এদেশ কাজ করতে জানে না। কিছু বুঝতে চায় না, শুধু নির্ভাবনায়—যা খুশী তাই কথা কইতে জানে। একথা গ্রাহ্য করবার নয়। তোরা ভয়কে আজ জয় করে নেবার জন্য প্রস্তুত হ। বিবেকের হাতে আত্মসমর্পণ করে, আজ তোরা মনুষ্যত্বের গ্লানিকর সকল অত্যাচারের বিরুধে, রুদ্রশক্তিতে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়া। ভগবানের জাগ্রত রূপের পূজায় আজ তোরা আত্মোৎসর্গ কর।"

গাড়ি আর এক স্টেশনে ঢুকিল, কুলির দল চীৎকার করিল, "আসানসোল, আসানসোল।"

সকলে চমকিয়া উঠিল! কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই বাহিরে রাত্রির আঁধারে কখন ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়াছে—অজ্ঞাতেই যখন ভোরের আলো বাহিরের উদার, উন্মুক্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। গাড়ির বাতির আলো ম্লান করিয়া, দিনের আলো ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনজন বাহিরের আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিলেন। গাড়ির গতি ধীরে থামিয়া গেল।

হঠাৎ সশব্দে গাড়ির দুয়ার বন্ধ হইল। তিনজন দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন জামাইবাবু নিঃশব্দে কখন অন্তর্ধান করিয়াছেন, খোলা দুয়ারটা একজন টিকিট কালেক্টর বন্ধ করিয়া দিতেছে।

অমৃতবাবু হাসিমুখে বলিলেন, "ঐ যাঃ। চতুর্থ পক্ষের নিমন্ত্রণটা চাওয়া হল না যে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "ওসব অভিশপ্ত নিমন্ত্রণের লোভ ছেড়ে দিন বাবা, ওগুলো ভদ্রলোকের ধাতে সহ্য হবে না।"

স্মৃতি রক্ষা

সীতা দেবী

১

শম্ভুচরণের বাল্যকালে সে যে পরে অতবড় আচারনিষ্ঠ হিন্দু হইয়া উঠিবে তাহার কোনো লক্ষণই দেখা যায় নাই। গোব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি তাহার একেবারেই সাধারণ ছেলের চেয়ে বেশি ছিল না এবং নিষিদ্ধ দ্রব্য খাইতেও তাহার উৎসাহের অভাব কখনও চোখে পড়িত না। পাড়ার শুচিবায়ুগ্রস্ত মজুমদার গৃহিণীর তপস্যার বিঘ্নকারীরূপে ইন্দ্রদেব যে কয়টি দেবদুত পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শম্ভুর জায়গা সবার শেষে নিশ্চয়ই ছিল না।

শম্ভুর বাপ-মা নিতান্তই সাধারণ মানুষ ছিলেন। যতটা করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল তার বেশি উৎপাত সনাতন হিন্দুধর্মে সম্বন্ধে তাঁহারা কোনোদিনই করিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের চিত্ত বিশেষ সজাগ ছিল না। ভাত খাওয়া এবং ঘুমাইতে যাওয়ারই মতো না ভাবিয়া তাঁহারা অবশ্য কর্তব্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মাদি করিয়া যাইতেন। অতএব শম্ভুর যৌবনের অত্যুগ্র হিন্দুয়ানীটা তার পৈত্রিক সম্পত্তিও ছিল না।

পলাশপুর গ্রামটি ছোট। তাহাতে এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়িবার কোনো সুবিধা ছিল না। কাজেই গ্রাম্য সরস্বতীর কৃপা নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়া নব বিদ্যালাভের জন্য তাহাকে সুদূর কলকাতা যাইতে হইল। সেখানে তাহার এক দূর সম্পর্কীয় খুড়া তাহার ভার লইলেন।

কলকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর এক স্যাঁৎসেঁতে ছোট দোতলা বাড়িতে শম্ভুর কয়েকটা বছরই কাটিয়া গেল। এগুলোর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। খুড়াখুড়ীর আদর অথবা অনাদর কোনোটাই উল্লেখযোগ্য নহে। স্কুলের পড়াটাও আর পাঁচটা ছেলের যতখানি সুবিধাজনক লাগে শম্ভুরও তাহাই লাগিত।

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া কলকাতায় আসার দরুণ শম্ভুর বয়স একটু বেশি হইয়া পড়িয়াছিল। এন্ট্রান্স পাশ করিতেই তাহার কুড়ি বছর পার হইয়া গেল। এতদিন তাহার জীবনটা নেহাৎই একঘেঁয়েভাবে কাটিতেছিল। বিধাতা এইবার ক্ষতিপূরণের ভার লইলেন।

কলেজে উঠিয়াই শম্ভু টেরী মুছিয়া টিকি রাখিল, একজোড়া খড়মও যোগাড় করিয়া ফেলিল। সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঘটা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল এবং সকালে উঠিয়া খুড়া খুড়ীকে প্রণাম করাটাও একটা নিত্যকর্ম করিয়া তুলিল। ভাসুরপোর এহেন ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া খুড়ী ব্যস্ত হইয়া দেশে জাকে চিঠি লিখিলেন, "দিদি, তোমার ছেলে দিনদিন কি রকম হয়ে যাচ্ছে, ওর শিগগির বিয়ে দাও। তা না হলে ও কোনদিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে।" খুড়া একে সওদাগর আফিসের বড়বাবু ও ছোটসাহেবের লাঞ্ছিত কেরানি, তার উপর তিনটি অবিবাহিতা কন্যার পিতা। কাজেই তাঁহার ভাইপোর বিচিত্র

ব্যবহার লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। কিন্তু তাঁহার ছেলে অতুলের এ বিষয়ে কোন ত্রুটি দেখা যায় নাই। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া এবং এক ক্লাসে পড়িয়া—তাও আবার ক্লাসে অতুলই সর্বদা শম্ভুর উপরে থাকিত—মেজদা যে কেবল একজোড়া খড়ম, একটা টিকি এবং কতকগুলো অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা কথার তোড়ে পাড়ায় এতখানি নাম কিনিয়া ফেলিবে, এ অতুলের ন্যায়পরায়ণ মনে অত্যন্তই অন্যায় বলিয়া ঠেকিল। এও সহ্য করিতে পারিত, যদি মা তাহাকে মেজদার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অহরহ সদুপদেশ না দিতেন। অতুল নিজে সংস্কৃত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল না। সে একদিন সন্ধ্যায় নিজেদের সংস্কৃত ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়' সুরেশকে আনিয়া লুকাইয়া শম্ভুর সংস্কৃত শুনাইয়া দিয়া, পরদিন সগর্বে প্রচার করিল যে শম্ভুর আগাগোড়া ভণ্ডামী, কারণ স্বয়ং সুরেশ বলিয়াছে শম্ভুর উচ্চারণ তো সমস্ত ভুল হয়ই, তার উপর অধিকাংশই তার স্বরচিত। তাহাতেও, মাতাকে এবং পিসীমাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া সে একদিন বাড়িতে খবর দিল যে মেজদার অকস্মাৎ ধর্মবুদ্ধি হইবার কারণ একমাত্র এই যে একদিন ক্লাসের বড়লোকের ছেলের সঙ্গে হোটেলেখানা খাইতে গিয়াছিল, তাহাতে ছাগ মাংস খাইতে গিয়া জিভ কাটিয়া ফেলায় সকলে তাহাকে এত ঠাট্টা করে যে সে আর কোনো উপায় না দেখিয়া সাধু সাজিয়াছে। শম্ভুর কানে একথা আসাতে সে রসনা সম্বন্ধে কি একটা প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল। তাহার আশ্চর্য ক্ষমাগুণে তাহার যশ ও অতুলের অযশ বাড়িল বই কমিল না।

শম্ভুর হিন্দুয়ানিতে তাহার পরকালের সুবিধা কত হইল তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহকালে যে একটা কিছু হইল তাহা চোখেই দেখা গেল। শম্ভুর মা ছোট জায়ের চিঠি পাইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিল। ফলে গ্রীষ্মের ছুটিতে শম্ভু বাড়ি আসিবামাত্র নিকটেরই গ্রামের বেচারাম চক্রবর্তী সদলবলে আসিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন এবং মাসখানেকের মধ্যেই ভদ্রলোকের একটি ক্ষীণকায়া অল্প ভাষিণী কন্যা এবং সঙ্গে তিন টাকা এই বাড়িতে আসিয়া পড়িল।

ইহার পর শম্ভুর কলকাতাবাস বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাহার শরীর আর ভাল থাকিতেই চায় না। শহরের জলবায়ু তাহার পক্ষে বিষের মতো অনিষ্টকারী হইয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্য যে কত ভাল তাহা সে সময়ে-অসময়ে প্রচার করিতে লাগিল।

বিধাতা এবারেও দয়া করিলেন। পরীক্ষার একদিন আগে পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাহাকে কলকাতা ছাড়িতে হইল এবং দিন দশ পরে পিতা পরলোক ক্রিয়া করাতে কলকাতা আসার পথও চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল। পিতার মৃত্যু ও পড়াশুনা অকালে শেষ হইয়া যাওয়াতে শম্ভুর মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহাকে অবিমিশ্র দুঃখ বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হয় না।

শম্ভুচরণ এখন বাড়ির কর্তা। তাঁহার পিতা জমিজমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই দেখিয়া-শুনিয়া চালাইতে পারিলে খাইবার-পরিবার ভাবনা থাকে না। শম্ভুচরণ সেই কাজেই মন দিলেন। সেইসঙ্গে তাঁহার নিষ্ঠা আরও বাড়িয়া উঠিল। স্ত্রীর বাক্সে নিতান্ত আধুনিক দু'খানা নভেল দেখিয়া তাঁহাকে এমনি শাসন করিলেন যে ভদ্রমহিলার নভেল পড়ার সখ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইল এবং প্রতিবেশিনী সরলাকে যে কলকাতা হইতে লেস-লেস গোলাপী সেমিজ আনাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে প্রত্যাহার করিলেন।

শম্ভুচরণের প্রথম যখন কন্যা হইল তখন তিনি প্রসূতির যথোচিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাহার নাম রাখিলেন মণি। পত্নীর প্রতি ভরসা করিয়া অন্তত আর একটি সন্তান হয় কি না তাহা দেখিবার

সাহস তিনি কবিতে পাবিলেন না। শিশু-কন্যাব মা কিন্তু এ নাম স্বীকাব কবিলেন না। পবম হিন্দু স্বামীব ঘবে যে ক্ষুদ্র মানুষটি তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহাকে এ বকম একটা ছেলেব নামে ডাকিতে তাঁহাব মন কিছুতেই উঠিল না। কন্যাব মা মেয়েব নাম বাখিলেন উমা এবং এই নামটাই তাব হইয়া গেল।

ক্ষুদ্র উমা সংসাবে কিছুদিন বাস কবিযাই বুঝিযা লইল যে মা ছাডা তাহাব আশ্রযস্থল কেউ নাই। পাবতপক্ষে বাবাব কাছে সে যাইতে চাহিত না, কাবণ তিনি উমাকে তাহাব উপযুক্ত কবিযা গডিবাব চেষ্টা বিশেষভাবে কবিতেন। অল্প বযস হইতেই উমাব একটা ধাবণা হইযাছিল যে তাহাব যা কিছু কবিতে ভাল লাগে সে সবই কবে না, কাবণ সবেতেই বাবাব কাছে বকুনি খাইতে হয। এমনকি বাপেব সামনে খাইতে দিলেও সে সাহস কবিযা খাইতে পাবিত না, সেটাও হিন্দুকন্যাব কবা কর্তব্য নয সে বিষযে সে মনেব সন্দেহ দূব কবিতে পাবে না। তাহাব মা স্বভাবতই কম কথা বলিতেন, স্বামীব ব্যবহাবে সে কম কথা আবও কমিযা গিযাছিল। উমাব তাব এই অল্পভাষিণী মাযেব কাছে বক্তৃতাব অবধি ছিল না। তাহাব শিশু ভাইকে নিতান্তই শিশু মনে কবিযা সে কোনোদিন তাহাকে নিজেব খেলাব সাথী কবিতে চাহিত না। বালকজাতিব সম্বন্ধে তাহাব অবজ্ঞাব সীমা ছিল না। পুতুল খেলিতে গেলে যে জীব বেনে বৌ এব ছাপানো কাপড দিযা বল তৈযাবী কবে এবং বাখিবাব হাডিকুডি লইযা গুলিডাণ্ডা খেলিতে চায, তাহাকে কোন মেযে কবে শ্রদ্ধা কবিতে পাবে? কাজেই উমাব মা ই উমাব একমাত্র সম্বল ছিলেন। খাওযা দাওযাব উৎপাত চুকিযে গেলেই তাঁহাকে উমাব সঙ্গে খেলিতে বসিতে হইত। পুতুল খেলাব সাথী তো হইতে হইতই, এমনকি মাঝে মাঝে পুতুলও সাজিতে হইত। স্বহস্তে বিচিত্র সেলাই কবা পুতুলেব তোযোকখানি পাতিযা দিযা উমা বলিত "মা তুমি আমাব খুকি তুমি শোও।" মাকে সেই বুমালেব সমান তোযোকে একবাব অন্তত শুইতেই হইত, তা না হইলে ক্ষুদ্র জননীটিব আব অভিমানেব সীমা থাকিত না।

এইবকম কবিযা উমাব জীবনেব সাত আট বছব কাটিযা গেল। একদিন সে সকালে উঠিযা দেখিল বাডিতে মহা ধূমধাম, বাহিবে বাজনা বাজিতেছে, লোকজনেব কোলাহলে বাডি একেবাবে সবগবম। সবচেযে আশ্চর্য হইল সে ইহাই দেখিযা যে আজ সকলেই তাহাব প্রতি মনোযোগী। বাত্রি হইযা আসিল, পাডাব যত কিশোবী ও তবুণী মিলিযা তাহাকে লাল কাপড সোনাব গহনা, ফুলেব মালা, কত কি দিযা সাজাইতে বসিযা গেল। উমাব ইহাতে খুশী ছাডা অখুশী হইবাব কোনো কাবণ ছিল না। মা ছাডা আব কাহাবও কাছে সে এত আদব কোনোদিনই পায নাই। এমন সমযে ঘবে মা আসিযা ঢুকিলেন মেযেব লক্ষ্মীপ্রতিমাব মত মুখশ্রী তাঁহাব চোখে পডিল মা'কে দেখিযা উমাও সাজেব গর্বে উৎফুল্ল হইযা তাহাব মুখেব দিকে তাকাইল। মাযেব মুখে হাসি দেখা গেল না, তিনি ঘব হইতে বাহিব হইযা গিযা মুখে আঁচল চাপা দিযা কাঁদিযা উঠিলেন।

শম্ভুচবণ গৌবীদান কবিতেছিলেন। স্বর্গেব সিঁডিব প্রায সব কটা ধাপ এক লাফে ডিঙাইবাব ইচ্ছায তিনি এক মহা কুলীনেব সঙ্গে মেযেব বিবাহ স্থিব কবিযাছেন। সকল দিক দেখিতে গেলে এমন ভাল সম্বন্ধ খুঁজিযা পাওযা ভাব। বব টাকা অল্পই লইবেন এবং তাব পত্নীব সংখ্যা ও ববেব বযসও যে খুব বেশি তাও নয, শম্ভুচবণেব অপেক্ষা বছব চাবেব যদি বড হয। ইহাই তো পবমেব পক্ষে উপযুক্ত বযস। এমন জামাই পাইযাও গৃহিণী যদি স্ত্রীলোকেব স্বাভাবিক নির্বুদ্ধিতাব গুণে কাঁদিতে বসেন, তাহা হইলে তিনি আব কি কবিবেন? মেযেমানুষেব দু'ফোঁটা চোখেব জল দেখিযা তিনি কি এমন স্বর্ণসুযোগ ছাডিযা দিবেন নাকি?

লগ্ন রাত বারোটারও পরে। সজ্জিতা উমা পিড়ির উপর ঢুলিতে ঢুলিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মা পাশেব ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, বিয়ে বাড়িব কোলাহলে যোগ দিতে তাঁহাব আব ক্ষমতা ছিল না।

হঠাৎ একটা তুমুল বাজনাব শব্দে এবং সেইসঙ্গো অনেকেব গলায় তাহাব নাম একসঙ্গো শুনিয়া উমাব ঘুম ভাঙিয়া গেল। অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় সে বুঝিল যে এইবাব তাহাব বিবাহ হইতেছে। সাত পাক ঘোবানো প্রভৃতিতে তাহাব কোনো আপত্তি হয নাই। তবে মাথাব উপব একখানা চাদব ঢাকা দিযা যখন সকলে তাহাকে ভাল কবিযা চোখ চাহিতে বলিল, তখন সামনে তাকাইযা একজোড়া লাল লাল চোখ দেখিতে পাইযা সে ভযে চোখ বন্ধ কবিযা ফেলিল।

উমাব শ্বশুববাড়ি বেশি দূবে নয, সেখানে তাহাকে বেশিদিন থাকিতেও হইল না। যে ক'দিন ছিল তাহাতেই তাহাব প্রাণ ভযে শুকাইযা উঠিযাছিল বাপেববাড়ি ফিবিযা আসিযা মাথাব ঘোমটা ফেলিযা দিযা সে হাঁপ ছাড়িযা বাঁচিল। তাহাব পুতুলেব সংসাব আবাব তাহাব অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ কবিযা লইল। সেই কালো মুখে লাল চোখেব ভীষণ দৃষ্টিব বিভীষিকাও ক্রমে তাহাব মন হইতে মুছিযা গেল।

সেদিন তখন সন্ধ্যা হইযা আসিযাছে। বেশি বাতে বাড়িব অন্য সকলে যখন খাইতে বসিত, উমা তাহাব ঢেব আগেই ঘুমাযা পড়িত বলিযা তাহাব মা তাহাকে সন্ধ্যাবেলাই খাওযাইযা দিতেন। বান্নাঘবেব দাওযায পিঁড়ি পাতিযা সে খাইতে বসিযাছে, মা ঘবেব ভিতব তখনও কাজে ব্যস্ত। উমা মুখেব দু'বকম ব্যবহাবই একসঙ্গো কবিযা চলিযাছিল। ভাত খাওযা তো হইতেইছিল, তাহাব সঙ্গো সঙ্গো বাধাবাণীব নূতন মাকড়ীব গড়ন, সইয়েব জবিপেড়ে কাপড়, শৈলীব আশ্চর্য নির্বুদ্ধিব জন্য তাহাব মাযেব অবশ্যজ্ঞাতব্য সব বকম খবব দিতে দেবী কবিতেছিল না।

এমন সময বাহিবে . ৩াব খড়মেব আওযাজ পাওযা গেল, সঙ্গো সঙ্গো উমাব বাক্যস্রোতও একেবাবে বন্ধ হইল, মা দবজাব কাছে আসিযা দেখিলেন, কর্তা এই দিকে আসিতেছেন।

'একবাব এদিকে শুনে যাও তো গো।''

স্বামীব ডাক শুনিযাই গৃহিণী বাইবে আসিযা বলিলেন, ''বোসো, উমাকে এই মাছেব ঝোল দিযে আসছি।''

''থাক, আব মাছ দিতে হবে না, এ দিকে এসো।''

উমাব মা কম্পিত পদে স্বামীব কাছে গিযা দাড়ায। স্বামীব সব কথা কানে পৌঁছিবাব আগেই মাটিতে পড়িলেন। উমা অবাক হইযা একদৃষ্টে মাযেব দিকে চাহিযা বহিল। শম্ভুচবণ দ্রুতপদে আসিযা মেযেব হাত টানিযা পিঁড়ি হইতে উঠাইযা দিলেন।

ভযে উমাব হাত-পা ঠান্ডা হইযা গিযাছিল। এবং সে বুঝিল যে তাব খাওযাটাও বাস্তবিক অন্যায়, তা না হলে বাবা অমন কবিবেন কেন? তাহাব বাপ সেখান হইতে চলিযা যাইতেই মা চীৎকাব কবিযা কাঁদিযা উঠিলেন। উমা কাঁদ কাঁদ মুখে মাযেব কাছে আসিযা দাঁড়াইল। এক হাত দিযা মাকে জড়াইযা ধবিযা বলিল, ''মা, তুমি কেঁদ না, বাবা অমনি শুধু শুধু সবাইকে বকেন। এবপব আমি ভাত সিন্দুকেব আড়ালে লুকিযে খাব এখন, তা হলেই বাবা দেখতে পাবেন না।''

২

রাত্রির অন্ধকার তখনও একেবারে দূর হইয়া যায় নাই। ভোরের ধূসর আলোর সবেমাত্র একটুখানি আভাস পাওয়া যাইতেছে। শম্ভুচরণের বাড়ির খিড়কী দরজা দিয়ে একটি তরুণী লঘুপদে বাহির হইয়া আসিল। বাড়ির দূরেই নদীর ঘাট, মেয়েটি সেইদিকে চলিল। আলোয় তার চেহারার আর কিছু বোঝা গেল না, দেখা গেল বিধবার সাদা কাপড় আর কালো কোঁকড়ান একরাশ চুল।

নদীর ঘাটে তখনও একটিও পল্লিবাসিনীর আগমন হয় নাই। উমা নিজের মনে অনেকক্ষণ জলে পা ডুবাইয়া রহিল। পূর্বাকাশ ক্রমে রাঙা হইয়া উঠিল। বৈরাগী ঠাকুরের বৈতালিক খঞ্জনির শব্দ কানে যাওয়া মাত্র সে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া গোটাকতক ডুব দিয়া উঠিয়া পড়িল। এক কলসী জল তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল।

ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়া আসিয়া দেখিল মায়ের ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। ফিরিয়া গিয়া রান্নাঘরের কাজে গেল, কারণ এ কাজটা এখন তাহারই। উমা যাহাতে একেবারে অবশ্যকর্তব্য কোনো কাজে অবহেলা না করে সেদিকে শম্ভুচরণ অতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ঘরের কর্ম সারা হইয়া গেলে উমার যেটুকু সময় থাকিত তখন শুধু তাহাকে লইয়া রামায়ণ, মহাভারত পড়িয়া যাইতেন এবং ব্রহ্মচারিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বেশভূষা আহার-বিহার কিছুতেই তিনি বিন্দুমাত্র অবহেলা সহ্য করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার নির্মলকুলে কোনো ছিদ্র দিয়া কখন শনি প্রবেশ করিবে তাহা তো বলা যায় না। একটা সামান্য মেয়ের প্রাণ অপেক্ষা কুলগৌরব অনেক বড় জিনিস এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্র ছিল না। তাহার ছোট ভাই বিষ্ণুচরণ রান্নাঘরের উঠানে একটি গাছ লাগাইয়াছিল তাহা অজস্র ফুলে আলো হইয়া আছে। ভোরের বাতাসে শিশিরের সঙ্গে ফুলগুলি টুপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, উমা রান্না চড়াইয়া আসিয়া গাছতলা হইতে ফুলগুলিকে সযত্নে কুড়াইতে লাগিল।

হঠাৎ সশব্দে একটা দরজা খুলিয়া গেল, একজন গৌরকৃষ্ণলাঙ্গী মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন। হাই তুলিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। উমার দিকে চোখ পড়িবামাত্র কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ লা উমি, সকালে উঠেই ও কি ন্যাকামি, আজ আর রান্না-বান্না চড়বে না?" উমা ব্যথিত তাড়াতাড়ি গাছতলা হইতে উঠিয়া পড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "মা রান্না তো আমি অনেকক্ষণ বসিয়েছি, ভাত ফুটছিল, তাই একটু বাইরে এসে বসেছিলুম।"

মা গজেন্দ্র গমনে আবার গিয়া ঘরে ঢুকিলেন। এটি শম্ভুচরণের দ্বিতীয় পক্ষ, উমার মা মেয়ে বিধবা হইবার এক বছরের মধ্যেই মারা যান। বিধবা বালিকা কন্যার ব্রহ্মচর্যের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া শম্ভুচরণ দুই মাস কাটিতে না কাটিতেই প্রতিবেশি নরোত্তম ভট্টাচার্যের বয়স্কা কন্যা শতদলবাসিনীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। তিনি স্বামীর ঘরে আসিয়াই উমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। আর বছর ফিরিতে না ফিরিতেই সংসার রক্ষার ভার উমাকে গ্রহণ করিতে হইল। অতবড় মেয়ের শুধু বসিয়া থাকা ভাল নাকি? তাহা হইলেই লুকাইয়া নভেল পড়িতে শিখিবে এবং মনে যত কুচিন্তার উদয় হইবে। বিধবা মেয়ে লইয়া ঘর করা যে কি যন্ত্রণা তাহা পরে কি বুঝিবে যাহার করিতে হয় সেই জানে। এদের শাসনে না রাখিলে কি আর রক্ষা আছে?

আঁচলে শিউলি ফুলের রাশ লইয়া উমা রান্নাঘরে ঢুকিয়া বসিয়া পড়িল, তার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। বিমাতার ব্যবহারটা তাহার এতদিনেও অভ্যস্ত হইয়া ওঠে নাই, তাহার বাক্যের জ্বালা এতদিনেও তাহার সহিয়া যায় নাই। তাহার নিজের মা মারা যাইবার পর হইতে গত ৬।৭ বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রতিদিনই তাহাকে তিরস্কার সহ্য করিতে হয় আর পরলোকগতা মাকে মনে করিয়া তাহার চোখের জলও শুকাইতে চায় না।

উমার কোলের ফুলগুলি আগুনের তাপে কখন শুকাইয়া উঠিয়াছিল সেদিকে তাহার লক্ষ্যও ছিল না। সেও যেন তাদেরই একটি বড় বোন, একরাশ রূপ লইয়া অকালে মায়ের কোল হইতে খসিয়া পড়িয়া সংসারের তাপে শুকাইয়া উঠিয়াছে।

গৃহিণীর ডাকে উমা চোখের জল মুছিয়া বাহিরে আসিল। বেশি কিছু নয়, মা বলিলেন, "ও উমি, বেশি করে চাল নিস, আর একজন লোক খাবে।" উমা ঘরে ঢুকিয়া ভাবিল, "নিশ্চয়ই মার সেই ভাই আসবে। বাবা, তার জন্যে তো বেশ বেশি করেই চাল নিতে হবে। ভাত যে হয়ে গেছে, আবার চড়াতে হবে।"

এমন সময় বই বগলে করিয়া লাফাইতে লাফাইতে বিষ্ণুচরণ আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শম্ভুচরণের আমলের মিডল ইংলিশ স্কুল এখন হাইস্কুল হইয়াছে, কাজেই বিষ্ণুচরণকে বিদ্যালাভ করিবার জন্য কলকাতা যাত্রা করিতে হয় নাই। সে আসিয়াই ধপ করিয়া বইখাতা চৌকাঠের উপর ফেলিয়া বলিল, "দিদিভাই, আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ভাত দিতে হবে, আজ আমাদের নতুন মাস্টার আসবে কিনা তাই আমরা সব আগে থেকে গিয়ে হাজির হব।"

উমা থালায় ভাত বাড়িতে বাড়িতে বলিল, "এত সকালেই খাবি? এখনও যে কিছু রান্না হয়নি। তোদের আবার নতুন মাস্টার কবে এল?"

"আহা তাও ছাই জানো না? আজই এসেছেন, আর তিনি যে আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। জমিদারবাবুর চিঠি নিয়ে সকালে যখন এলেন তখন আমি নিজের চোখে দেখলাম।" বিষ্ণুচরণ সহপাঠীদের কাছে নূতন মাস্টারের সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও অজ্ঞাতব্য খবর সবার আগে দিবার লোভে কথা বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি মস্ত মস্ত ডেলা পাকাইয়া গরম ভাত গিলিতে আরম্ভ করিল।

দুপুরে শম্ভুচরণ স্নানাদি শেষ করিয়া অতিথিকে লইয়া খাইতে বসিলেন। বাড়িতে আর লোক নাই। গৃহিণী অসুস্থা, উমাই পরিবেষণ করিতে চলিল। বাপের খড়মের শব্দ পাইয়াই সে একবার বাহিরে উঁকি মারিয়া নূতন মাস্টারকে দেখিয়া লইল। স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার হরিশবাবু পীড়িত হইয়া পড়ায় কিছুদিন ছুটি লইয়াছেন, তাঁহারই জায়গায় এই নূতন মাস্টারের আগমন। বৃদ্ধ হরিশবাবুকে উমা ভাল করিয়াই চিনিত, সে যে তাঁহার রাঙাদিদি। কিন্তু তাঁহার পদে একি মাস্টার আসিল? এর বয়স তো চব্বিশ-পঁচিশের বেশি হইবে না।

শম্ভুচরণ অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো। তুমি ঘরের ছেলে, এত লজ্জা কিসের? উমা ভাত নিয়ে এসো।"

শম্ভুচরণ স্বভাবত এমন মিষ্ঠভাষী এবং অমায়িক প্রকৃতিব মানুষ নন, কিন্তু আজ তাঁহার মধুর ব্যবহারের একটু কারণ ছিল। বিশ্বনাথ স্থানীয় জমিদারের ভাগিনেয়। স্বয়ং শম্ভুচরণও ঐ জমিদারেরই একজন প্রজা, তা ছাড়া নানা দিকেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। জমিদার মামা থাকিতে বিশ্বনাথের চাকবী করার কি দরকার অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু জন্মাবধি কি চেহারা এবং চরিত্র জমিদারের ভাগ্নে হইবার অনুপযুক্ত ছিল। সযত্নে রক্ষিত ফুলের বাগানে এক একটা আগাছা যেমন বিনা যত্নে নিজের মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, বিশ্বনাথের দশা ছিল সেই রকম। বিধবা জননীর সঙ্গে আবাল্য জমিদার-এ মানুষ হইয়াও সেখানকার হাওয়া তাহাকে কাবু করিতে পারে নাই, সিল্ক-সাটিনে সজ্জিত মোটাসোটা জমিদার পুত্রদের দলে তাহার দীর্ঘাকৃতি রোগা শ্যামবর্ণ চেহারা কিছুতেই মানাইত না। নিজের কোঁচার ফুল এবং টেরী ঠিক রাখার অপেক্ষা তাহার দৃষ্টি গাছে চড়া, সাঁতার দেওয়া এবং হা-

ডু-ডু খেলার দিকে বেশি ঝোঁক। কাহারও উপর সর্দারী করা অথবা কাহারও সর্দারী করা, কোনটাই তাহার অভ্যাস ছিল না।

এইভাবে দিন কাটাইয়া যখন একদিন সে যেই এম.এ. পাশ করিয়া অন্তত কলেজে পড়াটা শেষ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন হইতে বাড়িতে সে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। চাকরীর জন্যে বিদেশে যাইবার জোগাড় করাতে বিধবা মা আকুল হইলেন। মামাও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সব দিকে বাধা পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে যত মুচী ও মুসলমানের ছেলেকে নিজের ঘরে আনিয়া পড়াইতে বসিয়া গেল। মানুষের শাসন সমাজের শাসন কোনোটাই তাহার কাছে কোনো কিছু গ্রাহ্যের জিনিস ছিল না, কাজেই জমিদারবাবুকে রোজ হাঁড়ী ফেলা নিবারণ করিতে হইলে অন্য রাস্তা দেখিতে হইবে। কাছাকাছি সকল গ্রামের সকলে তাঁহার অনুগত, তাহারা সাহায্য করিতে ত্রুটী করিতেন না। ইতিমধ্যে পলাশপুর ইস্কুলে মাস্টারের কাজ হইল। জমিদারবাবু তৎক্ষণাৎ কাজটা ভাগিনের জন্য জোগাড় করিলেন এবং শম্ভুচরণের বাড়িতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার বাড়ির সকলেরই মনের মত হইল। বিশ্বনাথ বসিয়া খাওয়া হইতে নিস্তার পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তারপর ঠিক হইল যে ছেলে নিকটেই থাকিবে, সপ্তাহে একদিন ইচ্ছা করিলে বাড়ি আসিতেও পারিবে এবং পরিচিত গৃহস্থের বাড়িতে থাকিবে, কাজেই তাঁহার প্রমাণ বিশ্বনাথ ভাত খাইতে ভুলিয়া গেলেও তাহারা ডাকিয়া খাওয়াইবে। মামা খুশী হইলেন একটা আপদের শান্তি হইল বলিয়া। শম্ভুচরণ মনে মনে খুশী হইয়াছিলেন, কারণ খানিকটা জমি ব্রহ্মোত্তর করিয়া লইবার চেষ্টা তিনি কিছুদিন যাবৎ বিশেষভাবে করিতেছিলেন। এই সংসারে তাহার কিছু সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া তিনি বিশ্বনাথকে সাদরেই অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

বিষ্ণুচরণ এমন আশ্চর্য নূতন ধরনের মাস্টারকে তার এত কাছে পাইয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া গেল। উমা প্রথমে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু বিশ্বনাথের আহারে সে ক্রমে মনে মনে কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিল। যেন এক আলাদা রাজ্যের মানুষ। কোনো নিঃসম্পর্কীয় পরপুরুষের সঙ্গে তাহার যদিও কিছু সংস্রব কখনও ছিল না, তবুও গাঁয়ের সকল ছেলেকে সে চোখে অন্তত দেখতে পাইত এবং যতটুকু দেখিয়াছিল তাহাতে তাহাদের প্রতি উমার শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। ঐ লোকগুলির মধ্যে টেরী চুরুট এবং পরালোচনা ছাড়া আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। কিন্তু বিশ্বনাথের এ তিনটার কোনোটাও ছিল না। চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক অতি ক্ষীণ ছিল। আর যে মানুষ ভাত খাইতেই ভুলিয়া যায়, তাহার মনে করিয়া চুরুট খাইবার কথা নয়। ইস্কুলের কাজ করিয়া সে যেটুকু সময় পাইত, তাহা হয় বই পড়িয়া নয় ছাত্রদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলিয়া কাটাইয়া দিত।

উমাকে রোজই পরিবেষণ করিতে হইত। সে ঘোমটার আড়াল হইতে প্রায়ই লক্ষ্য করিত এই রোগা ছেলেটি ভাল করিয়া খায় না, বিশেষ করিয়া শম্ভুচরণের পাশে তাহাকে নিতান্তই অল্পাহারী মনে হইত। বিশ্বনাথ যাহা খাইত তাহাও নিতান্ত দায়সারাভাবে, কোনো বিশেষ তরকারীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া অথবা তরকারীর আস্বাদ অনুসারে খাওয়া তাহার দ্বারা হইবার জো ছিল না। উমা নিজের হাতের রান্নার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়া মনে মনে পীড়িত হইয়া উঠিত, কারণ তাহার বাপ-ভাইয়ের হাজার দোষ থাকিলেও এ দোষটা ছিল না। উমা ইচ্ছা করিত অন্যমনস্ক ছেলেটিকে ঠেলা দিয়া নিজের খাওয়া সম্বন্ধে একটু সচেতন করিয়া তোলে।

শম্ভুচরণ একদিন খাইতে বসিয়া মাছের তরকারীটা বড়ই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। উমা চাহিয়া

দেখিল বিশ্বনাথ ঠিক আগেরই মতো খাইয়া চলিয়াছে, তাহার মুখে বিশেষ কোনো তৃপ্তির চিহ্ন নাই। কর্তা বলিলেন, "উমা, বিশ্বনাথকে আরও একটু মাছ দাও তো।" বিশ্বনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না দরকার নেই।" উমা নিষেধ সত্ত্বেও খানিকটা তরকারি তাহার পাতে ফেলিয়া দিল। বিশ্বনাথ হঠাৎ সহাস্য মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন দিলেন? মিথ্যে ফেলা যাবে।"

উমার সঙ্গে তাহার এই প্রথম কথা। উমা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। রান্নাঘরে আসিয়া ভাবিল, "মাগো, ছেলেটা যেন কি! কি রকম হাসলে, যেন ও খেলে কি না খেলে তাতে আমার কতই বয়ে যাচ্ছে।" ঠিক করিল কাল হইতে না চাহিলে উহাকে কখনই কিছু দেওয়া হইবে না। জমিদারের ভাগ্নে কি না, তাই গরীব মানুষের রান্না পছন্দ হয় না।

কিন্তু কাল হইবামাত্র সে আবার যথাসাধ্য সযত্নে রাঁধিতে বসিল। বিশ্বনাথের হাসির অপরাধ সত্ত্বেও তাহার মনে এই ইচ্ছাই প্রবল হইয়া উঠিল যে আজ তাহাকে যাহা দেওয়া হইবে সব সে যেন ভাল করিয়া খায়। বিষ্ণু যখন আসিয়া বলিল, "দিদি, আমার সঙ্গে মাস্টারমশায় তাঁকেও ভাত দিতে বললেন, রুটিন বদলে গেছে কিনা বাবাব সঙ্গে খেলে তাঁব দেবী হয়ে যাবে" তখন উমা রান্না শেষ না হওয়ার জন্য দুঃখিত হইয়া যাহা ছিল তাহাই বাড়িয়া দিল। বাকি রান্নার জন্য তাহাব আর কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

কিন্তু আজ এ লোকটির হইল কি? কিছু বান্না হয় নাই, তবু আজই ইহার এত খাইবার উৎসাহ কেন? কাল উমার তরকারীকে অবহেলা করিয়া বিশ্বনাথের একটু অনুতাপ হইয়াছিল। খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, তাহার ব্যবহারটা ঠিক হয় নাই, বেচারী ছেলেমানুষ, তাহাব রান্নার অপমানে নিশ্চয়ই দুঃখিত হইয়াছে। তাই আজ সে ঠিক করিয়া আসিয়াছে জোর কবিয়াই চাহিয়া খাইবে। অন্য জিনিসের অভাবে আজ সে যখন বলিয়া বসিল "আর একটু ডাল দিন"। তখন উমা তাহার বাটিতে এতখানি ডাল ঢালিয়া দিল যাহা পেটুক দামুর পক্ষেও অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য হইত।

রান্না খাওয়ার মধ্য দিয়া যে পরিচয় আরম্ভ হইল তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। উমার বাবা জমিব ভাবনায় ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কন্যাব ব্রহ্মচর্য্য পালনেব তত্ত্বাবধান তত ভাল করিযা কবিতে পারিতেন না। উমার মা নভেল পড়ার জন্য কঠিনভাবে শাসিত হইয়াও মেয়েকে লিখিতে-পড়িতে শিখাইযা গিয়াছিলেন। পিতার অনবসরে উমা দুপুরে নিজেই রামাযণ পড়িতে বসিত, বইখানাব প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশত নয়, আর কোনো বই হাতের কাছে ছিল না বলিয়াই।

বিষ্ণু একদিন 'হাফ হলিডে' পাইয়া সকাল সকাল বাড়ি আসিযা দিদির হাতে বামাযণ দেখিযা নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "কি যে দিদি দিনের পর দিন একই বই পড়, আমার কাছে মাস্টাবমশাযেব কেমন সুন্দর একখানা বই আছে, সেইটে দেবো এখন, পড়ে দেখো, রামাযণের চেযে ঢেব মজার।" *মজার বইখানি আর কিছু নয়—বঙ্কিমের আনন্দমঠ। উমা বই লইয়া পড়িতে বসিয়া গেল, গৃহিণীর কলকণ্ঠের ঝঙ্কার কানে আসিবার আগে কিছুতেই উঠিতে পারিল না।*

সন্ধ্যাবেলা বইয়ের অধিকারী ঘরে ফিরিয়া বইয়ের খোঁজ করাতে বিষ্ণু অম্লান বদনে বলিল, "*আমি সেটা দিদিকে পড়তে দিয়েছি।*" বিশ্বনাথ অনাবশ্যক উৎসাহেব সহিত বলিযা উঠিল, "ও তোমার দিদি বই পড়েন নাকি? আচ্ছা আমার কাছে আরও ঢের বাংলা বই আছে, সব তাঁকে দিও।" বই দিদির কাছে খুব বেশি না পৌঁছিলেও বিষ্ণু অনুমতি পাইয়া সাহিত্যচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করিল।

বিশ্বনাথের অন্যমনস্ক মন এই মাস দুয়ের মধ্যেই এ বাড়ির অন্তত একটি লোক সম্বন্ধে ক্রমেই বেশ সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। এই যে সুন্দর মেয়েটি সারাদিন মুখ বুজিয়া সংসারের সকল খাটুনি খাটিয়া যায় আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সকলের গঞ্জনা সহ্য করে, ইহার জন্য বিশ্বনাথ মনে ভারি একটা বেদনা অনুভব করিত। তাহার জন্য শম্ভুচরণ অথবা তাঁহার পত্নী উমাকে কতদিন কঠোর শাসন করিতেন, কারণ বিশ্বনাথকে এখন তাঁহারা একজন বলিয়াই মনে করিতেন, তাহার সামনে মুখ ঢাকিয়া কথা বলাটা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ দেখিতে পাইত উমার চোখে জলে ভরিয়া আসিতেছে, রৌদ্রতপ্ত ফুলের মতন শুকাইয়া উঠিয়াছে। নিষ্ফলতায় তার সারা অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত, সে তাড়াতাড়ি বাড়ি হইতে সরিয়া যাইত। প্রতিকারের চেষ্টায় যে উমার প্রতি অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না ইহা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। কিন্তু দুর্বলের প্রতি অত্যাচারটা বসিয়া বসিয়া দেখা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। এটা শুধু দুর্বলের করুণাবশতই যে নয় "এইরকম একটা সন্দেহ তাহার নিজের মনেও জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার কি মনের তাপ সোজা পথ না পাইয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত অন্যভাবে বাহির হইয়া পড়িত। বিষ্ণুচরণ এবং তাহার বৈমাত্রেয় ভাই বিশ্বনাথের সঙ্গে একই ঘরে শুইত। কাজ করার ত্রুটি লইয়া একদিন গৃহিণী উমাকে আক্রমণ করিল "হ্যাঁ লা, পরের ছেলে বাড়িতে রয়েছে তার এ কাজ করতে নেই? হাত-পা কি এই বয়সেই খসে পড়ল তোর?" বলা বাহুল্য পরের ছেলে বিশ্বনাথ এ স্থলে উপলক্ষ মাত্র ছিল। তাহার কানে কথাটা পৌঁছিল। সে ঘরে আসিয়া খাট হইতে বিছানাটা ছুড়িয়া ফেলিল। বিষ্ণুকেতাহার দিকে অত্যন্ত অবাক হইয়া চাহিতে দেখিয়া বলিল, "আমার বিছানায় শুতে ভারী গরম হয়, আজ থেকে শুধু খাটেই শোব।"

উমার মনও অল্পদিনেই এই বাহিরের লোকটিকেই বাড়ির মধ্যে একমাত্র আপন বলিয়া চিনিয়া ফেলিল। সে যে সর্বদাই কোনোপ্রকারে উমাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিত, তাহা উমার চোখ কোনো এড়াইত না।

গৃহিণীর পুত্রকন্যা নানু এবং টুনুর ভোরে উঠিয়া খাবার জন্য চিৎকার একটা নিত্যকর্ম ছিল। দ্বাদশীর দিন উপবাসক্লিষ্টা উমা সকালে উঠিয়া খাবার করিতে পারে নাই, তা লইয়া বাড়িতে তুমুল গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। উমার কাছে খাবার চাইয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বিশ্বনাথ অন্দরের একটু কাছে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল। তাহার অপমান করিতে লাগিল। ঐ হাঁ করিয়া চিৎকারপরায়ণ ছেলেমেয়ে দু'টার গালে খুব জোরে দুই চড় লাগাইয়া দেয়। কিন্তু চিৎকার বন্ধ করার সেটা প্রকৃষ্ট উপায় নয় জানিয়া সে না বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইল এবং প্রায় তিন মাইল মাঠে ঘুরিয়া আসিল।

শীতের দ্বাদশীর ভোরে উমা জোর করিয়া নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানা হইতে টানিয়া তুলিল। মায়ের গালাগালি শুনবার অপেক্ষা তাহার উনানের আগুনে পুড়িয়া মরাও সুখের মনে হইতেছিল। দরজা খুলিয়া বাহির হইতে যাইবে এমন সময়ে বাহিরে বিশ্বনাথের গলা শুনিয়া সে থমকিয়া গেল। সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি নানুকে ডাকিতেছিল, "এই নানু, টুনু, দেখ তোদের জন্যে কি এনেছি, আর সেই যে বড় পুকুরে কাল পদ্মের কুঁড়ি দেখে এসেছিলাম না, সেগুলো আজ ভোরে ফুটে কি সুন্দর হয়েছে, চল তোদের তুলে দিই গিয়ে।" নানু এবং টুনুর ইহাতে আপত্তি কিছুই ছিল না, তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। উমা নিজের ঘরের মেজের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে, সেও যে একটা রক্তমাংসের গড়া মানুষ তাহা তো সকলেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে যে মানুষটিকে কি মা মেয়ের দুঃখ দেখিয়া এখানে এনে দিয়াছেন?

সে গলবস্ত্র হইয়া লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল, সে প্রণাম যে কাহার উদ্দেশ্যে তা সে নিজের মনেও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল না।

স্নান করিয়া রান্নার জন্য এক কলসী জল লইয়া ফিরিবার পথে উমা দেখিল, বিশ্বনাথও একটা কি কাঁধে করিয়া সেই পথেই ঘাটের দিকে চলিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়াই আবার উমার চোখ সজল হইয়া উঠিল। এই একটুখানি অযাচিত করুণা তাহাকে কেন এত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া একবার এই মানুষটিকে প্রণাম করে, কিন্তু সঙ্কোচে অগ্রসর হইতে না পারিয়া জড়সড় হইয়া সে পথের একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথ একটু ইতস্তত করিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "এই সকালেই জল টানতে বেবিয়েছেন কেন? আপনার নিশ্চয় এখনও খাওয়া হয়নি।"

উমা শেষ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তা না হলে ইস্কুলের ভাত দেবো কি করে?"

"অমন মানুষ খুন করে ভাত খাওয়া আমার কোনোদিন অভ্যাস নেই, তাছাড়া আজ আমার একটু জ্বর হয়েছে, ভাত হয়ত খাবই না"। এই কয়েকটা কথা বলিয়াই সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

উমা ত্বরিতপদে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বিশ্বনাথের হঠাৎ জ্বর হওয়ার কারণ সে আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল।

সুখের দিনে দেখা হইলে হয়ত এ দু'টি মানুষ পরস্পরের জীবনে কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাইত না, কিন্তু দুঃখের বাঁধন তাহাদের বড়ই কাছাকাছি আনিয়া ফেলিল।

৩

"উমি, শুনছিস, আরাম ছেড়ে উঠে একটু সকাল সকাল উনুনে আগুন দে, আজ সুরেশ আর দিদি আসবে, এসে কি শেষে মুখে জল দিতে পাবে না?"

উমা ঘরে বসিয়া কি আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, তা সেই জানে। ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, রান্নাঘরে গিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বিশ্বনাথ ইস্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, একটি লোক তাহার খাটে বসিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে তামাক খাইতেছে। তাহার মাথার সামনে টেরী এবং পিছনে টিকি, পরিধানে খুব সৌখীন ধুতি এবং পাঞ্জাবী। লোকটার দিকে একবার চাহিয়াই বিশ্বনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুরেশ হুঁকা নামাইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই বুঝি তোদের নতুন মাস্টার? খান তো ছেলে পড়িয়ে, কিন্তু জমিদারবাড়ির চাল ছাড়তে পারেননি, মানুষকে যেন চোখেই দেখেন না।"

গৃহিণীর এই ভাইটির নানা কারণে বাড়ি ফিরিতে অনেক রাত হইত। এখানে আসিয়াও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। ছেলে-পিলেদের খাওয়া হইয়া গেলে গৃহিণী উমাকে বলিলেন, "সুরেশের খাবার আমার ঘরে ঢাকা দিয়ে রাখ, বিশ্বনাথেরও রাখ, দু'টি এক বয়সী, বেশ একসঙ্গে খাবে এখন।"

রাত দশটার পর সুরেশ যখন সান্ধ্যভ্রমণ সারিয়া বাড়ি ফিরিলেন, তখন বাড়ি একেবারে চুপচাপ, উমা সব কাজ সারিয়া নিজের রাত্রির আহার মুড়ী ও গুড় লইয়া খাইতে বসিয়াছে। সুরেশ আস্তে আস্তে দরজার কাছে আসিয়া দু'পাটী দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "কি গো, আছ কেমন, এবার যে আর চিনতেই পারলে না।"

উমা চমকাইয়া উঠিল। তীব্র দৃষ্টিতে একবার দরজার দিকে চাহিয়াই খাওয়া ছাড়িয়া সশব্দে কপাট

বন্ধ করিয়া দিল। সুরেশের মুখে একটা পৈশাচিক হাসি খেলিয়া গেল, সে সরিয়া গিয়া দিদির ঘরে হাজির হইল।

ডাক পড়াতে বিশ্বনাথ আসিয়া দেখিল এই নরপুঙ্গবটির সঙ্গে আজ তাহাকে খাইতে হইবে। স্বয়ং গৃহিণী আজ পরিবেষণকারিণী। যে কারণেই হোক ভাইয়ের সামনে উমাকে তিনি বাহির করিতে চাহিতেন না।

সুরেশ খাবারের থালা সামনে আসিতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ কি, ভাত কেন? রাত্রে যে আমি ভাত খাই না তা এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি? এত রাতে ভাত খেলে কাল সকালে আর আমায় উঠতে হবে না।"

গৃহিণী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। তাঁহার বিধবা ভগিনী কপাটের আড়াল হইতে বলিলেন, "সুরুর আমার যে শরীর, ওর কি কোনো অনিয়ম সয়, মেয়েকে দু'খানা লুচি করে দিতে বললে না কেন?"

গৃহিণী উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তা কি আর আমি বলিনি দিদি? বড়মানুষের বৌ কি আমার কথা কানে তোলেন? ও মুখপুড়ি গেল কোথায়? এর মধ্যেই পিণ্ডি গিলতে বসেছে, আর কেউ খেলে কি না খেলে সে দিকে চোখ নেই? উঠে আয় বলছি এখুনি। সরু, আর একটু বোসো ভাই, আমি লুচি এখুনি ভাজিয়ে দিচ্ছি।"

উমা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া ঢুকিল। গৃহিণীর দিদি তাহাকে দেখিয়াই আবার মুখ খুলিলেন, "ও বাবা, মেয়ের রাগ দেখ! একেবারে ফরকাতে ফরকাতে গিয়ে ঘরে ঢুকল। বিধবা মানুষের আর সারাদিন অত নিজের আবাম নিয়ে থাকলে চলে না! আমরা আছি, সারাদিন মুখ বুজে কাজ করছি, কথাটি বলিনে।"

বিশ্বনাথ একবার উমার মুখের দিকে চাহিল, দু'এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া ভদ্রতার খাতির সম্পূর্ণ করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বাহির হইতে শুনিতে পাইল দু'ভগিনীর বক্তৃতার স্রোত উমাকে লক্ষ্য করিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

বিশ্বনাথ সারারাত ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিল শেষ রাত্রে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। প্রায় দেড় ঘণ্টা বেড়াইয়া নদীর ধার দিয়া বাড়ির দিকে চলিল। এখনও লোকজন আসে নাই বোধহয়। কিন্তু ঘাটের নীচের ধাপে শাদা কাপড় পরিয়া কে বসিয়া, কালো চুলের রাশ কঠিন পাথরের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মুখ দেখা যায় না। বিশ্বনাথ ঘাটের প্রথম সিঁড়িতে নামিয়া ডাকিল "উমা।"

উমা এতক্ষণ নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মতো বসিয়াছিল। বিশ্বনাথের ডাক কানে পৌঁছিবামাত্র সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে তাহার মাথার কাছে আসিয়া বসিল। কথা বলিয়া উমাকে সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতা যেন তাহার লোপ পাইয়াছিল। সে মুখ না তুলিয়াই বুঝিতে পারিল বিশ্বনাথের চোখের দৃষ্টি তাহার খোলা চুলের রাশে ঝরিয়া পড়িতেছে।

একটু পরে বিশ্বনাথ জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার ডাকিল, "উমা।" এবারও উমা উত্তর দিল না। হঠাৎ তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দেহে তার এ কার স্পর্শ? চুলের রাশ ভেদ করিয়া যেন শরীরে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল।

উমার মাথায় হাত রাখিয়াই বিশ্বনাথ বলিল, "তোমার এ যন্ত্রণা আর আমি চোখে দেখতে পারি না। তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি বড়লোক নই, কিন্তু আমাদের বিবাহ হলে তোমার অন্তত মনের শান্তি থাকবে।"

উমার সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া আসিল। সেই মুহূর্তেই সে উঠিয়া বসিয়া একবার ভয়চকিত দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের দিকে চাহিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। তার ঘরে পৌঁছিবামাত্র মূর্ছিতের মতো মাটিতে লুটাইয়া গেল।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিবামাত্র একটা প্রচণ্ড ধিক্কারে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। ছিঃ, ছিঃ। নিজেকে সে কোথায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে! তাহার আবাল্য ব্রহ্মচর্যের আর তার বাবার এত শিক্ষার ফল কি এই? হিন্দু বিধবা হইয়া সে একটু কষ্ট সহিতে পারে না, আর তার এই দুর্বলতা লোকের কাছে সে এমন ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের ঘরে ব্রাহ্মণ বংশের বধূ সে, একজন তাহার কাছে স্বচ্ছন্দে বিবাহের প্রস্তাব করিল। ছিঃ, ছিঃ, এ কথা শুনিবার আগে তাহার মরণ হইল না কেন? আর, যে তাহাকে এমন কথা বলিতে পারিল, সেই বা কেমন?

উমা মনের সমস্ত রাগ ঘৃণা পুঞ্জীকৃত করিয়া অপরাধী বিশ্বনাথের বিরুদ্ধে চিত্তকে কঠিন করিযা তুলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়রে অপমানিত ব্রহ্মচর্যের অহঙ্কার! আমার দুঃখে বিশ্বে একমাত্র যে মুখ ব্যথায় কাতর হইয়া উঠিত সেই মুখ উমার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিবামাত্র তাহার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। সে যতই অন্যায় করুক, উমার মন যে তাকে দণ্ড দিতে একেবারেই অসমর্থ। নিজের চিত্তের দুর্বলতার এই আর একটা পরিচয় পাইয়া উমার মন নিজেরই বিরুদ্ধে আরও কঠিন হইয়া উঠিল। নিজের দুঃখ এত করিয়া জাহির করিয়া সেই তো এই ভীষণ অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিয়াছে। দোষ তো আর কাহারও নয়! শাস্তি যেন সে একলাই বহন করে। তাহার প্রায়শ্চিত্তে যেন সব পাপ দূর হইয়া যায়।

হঠাৎ তাহার জানলার কাছে বিশ্বনাথ আসিয়া দাঁড়াইল। ধূলি-লুণ্ঠিত উমার দিকে চাহিয়া ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিল, "উমা"। উমা মাথা তুলিয়া তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "যাও, যাও, আমায় আর পাপের পথে টেনো না।"

বিশ্বনাথের মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল। সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। আর একজন লোক এতক্ষণ উভয়ের অলক্ষিতে দুজনকে খুব মন দিয়াই দেখিতেছিল, সেও এখন সরিয়া গেল।

গৃহিণীর দিদি তখন সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। মালা হাতে করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিবামাত্র সুরেশ দাঁত বাহির করিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিরে, এত হাসি কেন?"

"না, হাসি আর কিসের। এই কতই দেখছি, চিরকাল আমিই পাজী বদমায়েস জানতাম, এখন দেখি সবাই এক গোয়ালের গরু।"

দিদি হরিনাম একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কেন রে, কি হয়েছে?"

"কি আবার হতে বাকী আছে, এই যে তোমাদের সাধু বিশ্বনাথ,...." সুরেশ জমকাইয়া বসিয়া বক্তৃতা সুরু করিল।

৪

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন কালো মেঘের ছায়ায় আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। বাতাসের চিহ্নমাত্রও ছিল না, সমস্ত প্রকৃতি যেন কিসের ভয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল।

শম্ভুচরণের বাড়িতে একটা কিসের যেন চাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। সকলেই নিজের নিজের কাজ করিতেছিল, কিন্তু সে কাজগুলোয় মন কাহারও ছিল না। কেবল নানু আর টুনু উঠানে অকৃত্রিম মনোযোগ সহকারে কাদার ঘর গড়িতেছিল। আকাশের দিকে চাহিয়া গৃহিণী হঠাৎ তাঁহার ঘরের সভা ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার দিদি ঘর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "তাহলে ঐ ঠিক রইল তো?" গৃহিণী উত্তর দিলেন, "ঠিক না করে আর করি কি? সব দিক তো দেখতে হবে।"

ঝড়টা দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবকটা দরজা জানালা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। কেবল উমা নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ গৃহিণী কি জানি কেন তাহাকে সকল কাজ হইতে অব্যাহতি দিযাছেন, তাঁহার দিদি আজ রান্নাঘরে গিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

আকাশ বাতাস যেন দারুণ আক্রোশে গর্জন করিতেছিল। উমা একেবারে অনাবৃত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। নদীর পথে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া, আবার কি মনে করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের কাজে ডুবিয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকার পথ আজ তার বন্ধ। বাহিরের এই প্রলয়রূপ তাই আজ তাহার মন ভুলাইয়া পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

বাড়ির ঝি বামা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা তোমাকে ডাকছেন।" উমা তাঁহার ঘরে পৌঁছিয়া দেখিল তাঁহারা দুই বোনে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন। উমা ঘরে ঢুকিবামাত্র গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "তোমার জিনিসপত্র কি আছে গুছিয়ে নাও বাছা, কাল ভোরের গাড়িতেই তোমাকে বিদায় হতে হবে।" উমা বজ্রাহতের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, "কেন মা, আমায় বিদায় করছ কেন? আমি কোথায় যাব, কার সঙ্গে?"

গৃহিণীর দিদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ন্যাও বাপু আর ন্যাকা সাজতে হবে না, তোমার সব বিদ্যেই জানা গিয়েছে। আমি পৈরাগ হয়ে কাশী যাচ্ছি। তুমিও সেইখানে যাবে। পৈরাগে মাথা মুড়িয়ে ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে সব পাপ ধুয়ে যাবে, তারপর কাশী বাস করবে, বিধবা মানুষের এছাড়া আর আছে কি? তোমার বাবাই বলেছেন বাছা, আমার দিকে অমন করে তাকালে কি হবে? আমি তো আর সাধ করে তোমার মতো গুণবতীকে ঘাড়ে নিচ্ছি না।"

উমা নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাট আসিয়া ঘরের মেঝেয় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া সে আস্তে আস্তে জানালার কাছে গিয়া বসিল। বিদ্যুতের আলোয় একবার চাহিয়া দেখিল সামনের ঘরের-দরজা জানালা বন্ধ। ও ঘরের দরজা যে তাহার কাছে চিরদিনের মতো বন্ধ হইয়া গিয়াছে এই কথাটাই নিজের অপলক্ষিতে তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। বিচ্ছেদের দুঃখ আর সেই দুঃখ-পাওয়ার অপরাধ দুই যেন তাহার মনে গঙ্গা-যমুনার মত মিশিয়া গিয়া প্রয়াগতীর্থ রচনা করিয়াছিল।

বাহিরে একটা কিসের গোলমাল ঝড়ের শব্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। শম্ভুচরণ দ্রুতবেগে ভিতর বাড়িতে ছুটিয়া আসিলেন। উমা তাহার বিমাতার গলার স্বর শুনিতে পাইল, "হ্যাঁগা কি হয়েছে, অমন করছ কেন?"

পিতা উত্তর করিলেন, "হয়েছে আমার মাথা। পরের বোঝা ঘাড়ে করে আমি এখন মরি। জমিদারের কাছে কি জবাবদিহি করব এখন?"

গৃহিণী বলিলেন, "কে জানে বাপু, আজ তো তার যাবার কথা, তাই হয়ত গেছে, সকাল থেকে দেখিনি।"

"দেখবে কোথা থেকে, এজন্মে তাকে আর দেখতে পেলে হয়। বাড়ি যাবে তো নৌকা করে, তা হলে তো হয়ে গেছে, একখানা নৌকা ডুবেছে বলে শুনে এলাম। কর্তা যেমনভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে চলিয়া গেলেন।

বিমাতার সামান্য কটু কথায় যে উমার চোখে জল আসিত, সে আজ নিশ্চল পাষাণ-প্রতিমার মতো যেন আকাশের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। মাঝ রাত্রে বিষ্ণু ছুটিয়া তাহার ঘরে আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও ভাই-দিদি, বিশ্বনাথদা জলে ডুবে গিয়েছেন। সে আমাকে বললে, আমি ভিজতে ভিজতে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। সবাই বললে নৌকা উল্টে যাবার পর তিনি একটা ছোট মেয়েকে জল থেকে তুলতে গিয়ে একেবারে তলিয়ে গেলেন।" বিষ্ণু সেই ভিজে মেঝের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উমা দুই-হাতে জানালার লোহার গরাদ জোর করিয়া ধরিয়া সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভোর হইবার আগেই সুরেশ ও তাহার দিদি স্নান করিয়া বাহির হইবেন। গৃহিণী উমার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর বিষ্ণুচরণ পড়িয়া ঘুমাইতেছে ... আর কেহ নাই। ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া সকল খুঁজিলেন, কোথাও সে নাই। তখন নিজের ঘরে আসিয়া ঠেলা মারিয়া শম্ভুচরণকে তুলিয়া দিলেন।

গোলমালে ক্রমে বাড়ির সকলেই উঠিয়া পড়িল। ঘরের বাহিরের কোন জায়গাই খুঁজিতে বাকী রহিল না। অবশেষে বামা ঝি চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "একটু আগে কে যেন খিড়কীর দোর খুলে বেরিয়ে গেল আমি তখন ঘুমের ঘোরে ভাবলাম বুঝি বেড়ালটা।"

আঁধারের ঘোমটায় তখনও চারিদিক ঢাকা। শম্ভুচরণ একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া বলিলেন, "যেখানে থাকুক সে, আমি তাকে খুঁজে আনছি, কাউকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না।" তিনি বাহির হইয়া যাইবামাত্র বিষ্ণুচরণও অন্ধকারে তাঁহার পিছনে চলিল।

শম্ভুচরণ নদীর ধারের এবং পথের সমস্ত ঝোপঝাড় দেখিয়া শেষে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লণ্ঠন লইয়া এধার-ওধার তাকাইতে লাগিলেন। ঘাটের সিঁড়ির একেবারে শেষে, জলের প্রান্তে একটা সাদা কি দেখা গেল। শম্ভু নামিয়া আসিয়া দেখিলেন উমাই বসে। পায়ের কাছে মৃত্যুর স্রোতের মত নিবিড় কালো জল গর্জন করিয়া ছুটিয়া যাইতেছে, মাথার উপর মেঘের কালো আবরণ, ঝড়ের হাওয়া তাহার ক্ষীণ তনুকে লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পাগলা হাওয়ার টানে যেন সন্ধ্যাতারা আকাশের কোল ছাড়িয়া পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।

শম্ভুচরণ গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "উমা, উঠে এস, যাবার সময় হয়েছে।" উমা উঠিয়া দাঁড়াইল, কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শম্ভুচরণের পিছন পিছন চলিল। বাড়ির কাছে আসিবামাত্র বিষ্ণু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দিদি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" শম্ভুচবণ তাড়াতাড়ি তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দিদির সঙ্গে কথা বলো না, ঘরে যাও।"

ভোর হইবার আগেই, উমা আজন্ম পরিচিত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ট্রেনেব সংকীর্ণ মেয়েদেব গাড়িতে বসার স্থানের অকুলান হওয়াতে তাহার সঙ্গিনী অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন। উমা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ চোখে বাহিরে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে পলাশপুর চোখের আড়াল হইয়া গেল।

৫

ত্রিবেণীর ঘাটে লোকের ভিড় এখনও কমে নাই। তবে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে বলিয়া যাত্রিণীরা ঘরে ফিরিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। তিনটি বাঙ্গালীর মেয়ে ঘাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনজনই বিধবা। একজন সে কি তাহার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতেছিল। অন্য দু'জনের মধ্যে একজন স্থূলাঙ্গী পৌঢ়া, মুখ অতিশয় গম্ভীর, আর একটি তরুণী, তার বিস্ফারিত চোখ যেন পৃথিবীর দিকে কিছু না বুঝিয়াই তাকাইয়া আছে।

প্রৌঢ়া ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন, "পাণ্ডা মিন্সে গেল কোথায়? নাপিত আনতে গিয়ে তার আর দেখা নেই, বাড়ি ফিরব কখন?" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোটা সোটা পাণ্ডাজী এক হিন্দুস্থানী নাপিত সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। সে নিজের থলি খুলিয়া চট্‌পট্‌ চিরুণী, ক্ষুর, কাঁচি প্রভৃতি বার করিতে লাগিল। প্রৌঢ়া তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওগো মেয়ে, এগিয়ে এস, আর দেরী করো না, রাত হয়ে এল।"

যমুনার কালো জল গঙ্গার সাদা জলে মিলিয়া যেখানে কল্লোল তুলিয়াছিল, তরুণী একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিল, সে নড়িল না। প্রৌঢ়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। নাপিত কাঁচি বাহির করিল, তরুণীর ঘন কালো চুলের রাশ মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, সে হাত দিয়া তাহা তুলিয়া ধরিল।

নাপিতের হাত তাহার চুল স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সমস্ত শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। "আমার চুলে কেও হাত দিও না", বলিয়া সবলে নিজের চুল নাপিতের হাত হইতে ছাড়াইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহার সঙ্গিনীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। পাণ্ডা একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে যুবতীর দিকে অগ্রসর হইল।

ব্যাধবেষ্টিত হরিণীর মতো চকিত চোখে একবার সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। চারিদিকে শুধু হিংস্র কঠোর চাহনি, বিশ্বসংসারে তাহার জন্য আর একবিন্দুও করুণা অবশিষ্ট নাই।

পাণ্ডা তাহার কাছে আসিবামাত্র সে তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই আকাশ ভ্রষ্ট তারার মতো তীরবেগে জলে ঝাপাইয়া পড়িল। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার রক্তহীন শুভ্রমুখ যমুনার কালো জলে একবার শ্বেতপদ্মের মতো ফুটিয়া উঠিল, তারপর যম-ভগিনীর গভীর আলিঙ্গনে সে চিরদিনের মতো তলাইয়া গেল।

মূক সাথী

শ্রীরাধারাণী দেবী

হেমন্তের কুহেলিগুণ্ঠিত রাত্রি।

শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় এতটুকু উজ্জ্বলতা নেই—হিমকুয়াশায় শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্রকিরণ ম্লান, নিষ্প্রভ।

নির্জন ছাদের কোণে মিণ্টু কোলের ভিতরে আঁচল চাপা দিয়ে কি যেন একটা জিনিস সযত্নে লুকিয়ে নিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে আঁচলের ভিতরে নিজের ছোট্ট কচি হাতখানি পুরে—তার গায়ে সযত্নে বুলিয়ে দিচ্ছিল।

নীচের তলা থেকে তখন ডাকাডাকি শোনা যাচ্ছে—মিণ্টু মিণ্টু—ও মিণ্টু—কোথায় গেল বল্ তো হতভাগ্য মেয়েটা—

ছাদের কোণে মিণ্টুর কানে সে ডাক যে পৌঁছায়নি তা নয়—কিন্তু তার নীচে নামবার আগ্রহ ছিল না বলে এই ডাকের কোনও সাড়া দিলে না—বরং আঁচল ঢাকা জীবটিকে দ্বিগুণ স্নেহে নিজের বুকটির কাছে চেপে—নেড়েচেড়ে দোলা দিয়ে—গায়ে হাত বুলিয়ে তারই প্রতি মনোনিবেশ করলে।

ছাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং তার পরই একটি কিশোরী মূর্তি ছাদের উপরে এসে দাঁড়াল।

ঝাপসা চাঁদের আলোয় ছাদের একটেরে কোণটিতে নীলাম্বরী পরা ছোট্ট মানুষটিকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েই সে উৎসাহিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, ও ছোড়্দা—মিণ্টু এই যে ছাদে বসে রয়েচে- তুলোকে নিয়ে—

অদৃশ্য হিমকণা বর্ষণে সমস্ত ছাদ বেশ সিক্ত ও ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে উঠেছিল।

মিণ্টুর দিদি সরলা এগিয়ে গিয়ে কঠোর শাসনের সুরে বললে, এই দারুণ হিমে যে ছাদে বসে রয়েছিস—জ্বর হলে কে তোকে দেখবে?...

সরলা মিণ্টুর চার বৎসর মাত্র আগে পৃথিবীতে এসেছে! এই চার বৎসর পূর্বে আসার বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার দাবী নিয়ে সে যখন তখন তার ছোট দুটি ভাই-বোন মিণ্টু ও মঞ্জুর প্রতি শাসন ও উপদেশ সমপরিমাণেই বর্ষণ করে থাকে।

আজও তাই সরলা ডান হাতখানি বাড়িয়ে পাঁচটি আঙুল দিয়ে মিণ্টুর ছোট্ট কানটিতে সজোরে পাক দিয়ে দিলে।

অত জোরে কানমলা খেয়েও মিণ্টুর নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। গোঁ ভরে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, তোমরা সবাই মিলে কেন আমার তুলুকে মারলে? ও কক্ষণো ক্ষীরপুলি চুরি করে খায়নি! নিশ্চয় আর কেউ খেয়েছে!..

ইতোমধ্যে সরলা কর্তৃক আহূত 'ছোড়্দা'ও ছাদের উপর উঠে এলেন।

—আবার বুঝি সেই হতভাগা বেড়ালটা এসে জুটেছে?

রোসো, দেখাচ্ছি মজা—বলতে বলতে ছোড়্দা সদর্পে মিণ্টুর দিকে অগ্রসর হলেন!

মিন্টু নিঃশব্দে ব্যাকুলতায় আঁচল ঢাকা বিড়াল শিশুটিকে নিজের বুকের নীচে সন্তর্পণে দু'হাত দিয়ে আগলে রেখে মিনতি-করুণ কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, ছোড়দা, দু'টি পায়ে পড়ি তোমার— তুলুকে আর মেরো না!....

ছোড়দা মিন্টুর একখানি হাত ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে ধরে ধমকের সুরে বললে, শীগগীর নেমে আয় তাহলে নীচে—

মিন্টু কাঁদতে কাঁদতে বললে,.ছেড়ে দাও—আমি আপনিই নীচে যাচ্ছি!... কিন্তু তোমরা তুলুকে আর ঠ্যাঙাবে না বলো?—

ছোড়দা রুখে উঠল—ঠ্যাঙাবো কেন?... এইবার একদিন ওকে গুলি করে আপদ চুকিয়ে দেব।

সরলা ব্যঙ্গস্বরে বললে—না, ঠ্যাঙাবে না, আরও বেশি করে ক্ষীরপুলি তৈরী করে খাওয়াবে!...

আট বছরের মিন্টুরাণী তার প্রিয় বিড়ালছানার গাটি তুলোর মত কোমল ও ধবধবে সাদা দেখে নাম রেখেছিল—তুলো বা তুলু।

নবনীত শুভ্র কোমল সুন্দর কাবুলি বিড়াল। গায়ের নরম লোমগুলি যেন ব্রাশ করা সুবিন্যস্ত সাদা তুলা।

চকচকে উজ্জ্বল চোখ দু'টি মাণিকের মত জ্বল জ্বল করে।

গোলাপ ফুলের পাঁপড়ির মত গোলাপী রংয়ের পাতলা জিভখানির আগাটুকু দিয়ে চুক চুক শব্দে দুধ খায়।

ফুটন্ত যুঁই ফুলের ঠাস গোড়েমালার মত মোটা শুভ্র লেজটির অহরহ সচঞ্চল লীলায়িত ভঙ্গীটুকু অতি সুন্দর!

তুলুতে ও মিন্টুতে অগাধ প্রণয়।

সকালবেলা মিন্টু বাইরের ঘরে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে মাদুর পেতে পড়তে বসে। তার ডুরে শাড়ীর আঁচলের কোণে বাঁধা ক্ষুদে ক্ষুদে চাবিগাছা ছোট্ট রিংটি পিঠের উপরে দুলতে থাকে।

তুলু মিন্টুর পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে তার চাবি বাঁধা আঁচলখানি নিয়ে খেলা করে।

মিন্টু পড়ায় ভুল করলেই তুলুকে ধমকে দিয়ে ওঠে—এই তুলো—পড়তে দিবিনে নাকি? রোস দেখাচ্ছি মজা—

তুলুর কান ধরে পিঠের দিক থেকে সামনে টেনে নিয়ে এসে নিজের ছোট কোলটির ভিতর ফেলে—তার মাথায় গোটা দুই থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বলে, চুপ করে শুয়ে থাক—একটুখানি নড়বি যদি—কান মলে ছিঁড়ে দেব!

মিন্টুর কোলের মধ্যে কুণ্ডুলি পাকিয়ে তুলু বাধ্য শান্ত শিশুটির মতো চুপ করে পড়ে থাকে!

হঠাৎ দেখলে ভ্রান্তি হয়—পেঁয়াজী ডুরের শাড়ীর উপরে বুঝি খানিকটা পরিষ্কার ধোনা তুলোর ডেলা পড়ে আছে।

শরৎকালে ভোরবেলায় বাগানের বেড়ার ধারে শিউলীগাছের তলায়—মিন্টু চুবড়ি হাতে ফুল কুড়ুতে যায়। সঙ্গে থাকে তুলু।

শিশির ভেজা সবুজ দূর্বাদলের উপরে ঝরে পড়া টাটকা ফুলের নিবিড় আলপনা আঁকা। সাদা পুষ্পাস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে দূর্বার সবুজ রং উঁকি দেয়।—শিউলি বৃন্তেরা সাদা ও সবুজের মাঝে বাসন্তী রংয়ের বুটি ফুলিয়ে ফুলবাসরের সৌন্দর্যে অনিন্দ করে তোলে।

মিণ্টু আঁচল ভরে ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে তুলুর সাথে অনর্গল বকতে থাকে।

—তুল তুল—এতবড় হয়েছিস কিন্তু একটুও কাজকর্ম করতে শিখলি না আজও! তোর দ্বারা বাপু আমি একটিও কাজ পাই না—আর কি ছোটটিই আছিস? এখন একটু বুদ্ধি-বিবেচনা করতে শেখ—

তুলু মিণ্টুর সদুপদেশে বিশেষ কর্ণপাত না করে ঝরা ফুলগুলির উপরে ছুটাছুটি করে ইঁদুর শিকারের ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে খপ করে হয় তো একটা শিউলি ফুল তুলে নেয়। তারপর সেটিকে সাগ্রহে সোৎসুকভাবে নেড়েচেড়ে শুঁকে ফেলে দিয়ে—আবার আর একটা ঝরা শিউলি শিকারে মন দেয়।

মিণ্টু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, শুঁকছিস কি রাক্ষুসি!... ও কি মাছ, যে কৃপ কৃপ করে খাবি?

তারপর রোষভরে ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে

এই, সরে যা বলছি! ফের যদি ফুল নষ্ট করবি তো খুন করে ফেলবো।

মিণ্টুর বৌদিদি রাগ করে এসে শাশুড়ীর কাছে নালিশ করে—মা, ছোটঠাকুরঝির আদরের বেড়াল আমার খোকার দুধে মুখ ঠেকিয়েছে! ঠাকুরপোকে দিয়ে একদিন ওকে মার না খাওয়ালে ওর অস্পর্ধা দিনদিন বেড়ে চলেছে।

শাশুড়ী বলেন, দুধ একটু সাবধানে রাখতে হয় মা। ঢেকে রাখলেই ল্যাঠা থাকে না।

বৌমা মুখ ভারী করে চলে যান।

সন্ধ্যাবেলায় মিণ্টুর ছোড়দা বীরু এসে—হঠাৎ তুলুকে খুঁজে বেড়ায়। হাতে লম্বা ছিপটি।

মিণ্টুর শোবার ঘরে মিণ্টুর বিছানার ভিতরে তুলুকে আবিষ্কার করে দরজা বন্ধ করে বীরু ছিপটি দ্বারা তুলুর শাস্তি বিধান করে।

তুলুর আর্তনাদ শুনে মিণ্টু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে বুদ্ধ দ্বারের উপর আছড়ে পড়ে। ব্যাকুল কান্নায় কাকুতি-মিনতি করতে থাকে—ও ছোড়দা—তোমার পায়ে পড়ি—তুলুকে আর মেরো না গো—মরে যাবে—

মিণ্টুর ছোটভাই মঞ্জুর টাইফয়েড হয়েছে।

মায়ের ম্লান মুখখানির উপরে চিন্তার নিবিড় কৃষ্ণ ছায়া ঘনিয়ে আছে।

বাড়িশুদ্ধ সকলেই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

মিণ্টু সদা সর্বদা তুলুকে আগলে কাছে কাছে রাখে। পাছে সে রোগীর ঘরের দিকে যায়—কিম্বা ডাকে। বিড়ালের ডাক অমঙ্গলের লক্ষণ।

নির্জন স্থানে তুলুর সাথে নিভৃতালাপ করতে করতে মিণ্টু তাকে সতর্ক করে দেয়—তুল তুল - খবরদার! টুঁ শব্দটি করবি না! বুঝেছিস? মঞ্জুর ভারী অসুখ করেছে—এখন যদি তুই ডাকিস—ছোড়দা আর দাদা তোকে গলা টিপে মেরে ফেলবে! বুঝতে পারছিস তো?

তুলু সে কথা বোঝে কি না বোঝা যায় না। তবে পরম আরামে পালয়িত্রীর ক্রোড়ের ভিতরে পদচতুষ্টয় গুটিয়ে গোলাকার ভঙ্গীতে শুয়ে গম্ভীর মুখে কান খাড়া করে শোনে। মাঝে মাঝে মাথাটি নত করে কোলের উপরে নাক মুখ ঘষে মনের খুশি জানাবার চেষ্টা করে।

রৌদ্রোজ্জ্বল স্তব্ধ মধ্যাহ্নের সুদীর্ঘ অবসরক্ষণ মিণ্টু বিড়াল শিশুর সাথে চঞ্চল ক্রীড়ায় আনন্দে অতিবাহিত করে।

তুলুর বসা, হাঁটা, ছুটাছুটি, কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমানোর ধরনটুকু, সর্বাঙ্গ ধনুকের মত বাঁকিয়ে উঁচু হয়ে উঠে রোমাঞ্চিত দেহে হাই তুলে আলস্য ভাঙার মধুর ভঙ্গীমাটি, উড়ন্ত মাছি শিকারের বিচিত্র লম্ফঝম্ফ—যা সব কিছুই মিণ্টুর নয়নে অপরূপ মনোমুগ্ধকর রূপে প্রতীয়মান হয়।

দুপুরবেলা একদিন মা কি যেন দরকারে মিণ্টুর খোঁজ করেন।

মিণ্টু তখন বাগানের দিকে কুঁয়ার সান বাঁধানো উঁচু চাতালে বসে তুলুর সাথে বিশ্রম্ভালাপে তন্ময়।

মিণ্টুর দিদি সরলা সারা বাড়ি খুঁজে হয়রাণ হয়ে—বাগানের ধারে কুঁয়ার পাড়ে মিণ্টুকে বিড়ালসহ দেখতে পেয়ে তখনই উদ্দীপ্ত রোষে মিণ্টুর পিঠে ঘা'কতক কষিয়ে দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—অতবড় মেয়ে—দিন-রাত্রি খালি বেড়াল নিয়ে খেলা করা!—চল, মা ডাকছেন—আজ তোর খেলা করা একেবারে ঘুচবে।

মিণ্টু অশ্রুনিষিক্ত অপরাধ কুণ্ঠিত মুখে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই—ছোটদাদা বীরেন তার কানটি ধরে টেনে নরম ফুলো ফুলো গাল দু'টির উপরে ঠাস ঠাস করে দু'-তিন ঘা চড় কষিয়ে দিয়ে বললে, বুড়োধাড়ি মেয়ে ছোট ভাইটির এত অসুখ।—এখন দিনরাত বেড়াল নিয়ে খেলিয়ে বেড়ানো হচ্ছে!... আপদের মূলে বেড়ালকে বাড়ী থেকে না বিদেয় করলে হবে না!—

মাও আজ মিণ্টুকে তীব্র ভর্ৎসনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রহৃতা মিণ্টুর অশ্রুআপ্লুত করুণ মুখখানির পানে তাকিয়ে তাঁর অপ্রসন্নতা ছায়ার মত মিলিয়ে গেল।

স্নিগ্ধ চক্ষে কন্যার মুখের পানে চেয়ে বললেন, বড় হচ্ছ মা—সব সময়েই কি খেলা করতে হয়? ছোট ভাইটির অসুখ।—তার কাছে এসে বসতে হয়, সেবা-যত্ন করতে শিখতে হয়। মেয়েমানুষ যে তুমি!

ছোটদাদা এবং দিদির তীব্র ভর্ৎসনা ও প্রহারের চেয়ে মায়ের এই মিষ্ট সস্নেহ উপদেশে মিণ্টু মনে মনে অপরাধকুণ্ঠিত অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

বীরু অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলে, মা আর দাদার অতিরিক্ত আদরে-আদরেই তো মেয়েটি উচ্ছন্নেয় যাচ্ছে।

- টাইফয়েড ব্যারাম সংক্রামক।

মঞ্জু ভাল হয়ে উঠলো কিন্তু মিণ্টু জ্বরে পড়লো।

জ্বরে টাইফয়েডের দুর্লক্ষণগুলি দিনের পর দিন ক্রমশ প্রকাশিত হতে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা মিণ্টু মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সবেমাত্র একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে!.. মা তার মাথায় বরফের ব্যাগটি ধরে বসে আছেন।

ঘরের দরজার বাইরে দালানে করুণ স্বরে ডাক শোনা গেল—মাঁ—য়ু—

মা তাড়াতাড়ি সন্তর্পণে বরফের ব্যাগটি মিন্টুর মাথা হতে নামিয়ে রেখে পা টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, চাপা গলায় তাড়না করলেন—হুট—হুট—দূর হ—

তুলু নিঃশব্দে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। মা ফিরে এসে আবার মেয়ের মাথায় বরফের ব্যাগ ধরে বসলেন।

কিন্তু আবার খানিক বাদে দরজার বাইরে হতে শব্দ এলো—মীঁ—উ—

মা উঠে গিয়ে বড় ছেলে নরেনকে ডেকে বললেন, নরু, অলুক্ষুণে বেড়ালটাকে মেরে বিদেয় করে দে তো বাবা! দিন-রাত ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডেকে ডেকে বাড়িতে ছেলেপিলের রোগ ধরিয়ে তবে ছাড়লে!

নরেন বললে, কিন্তু মিন্টু যে এখুনি ওকে খুঁজবে মা! তুলোকে দেখতে না পেলে সে কেঁদে কেটে অস্থিব হবে। শেষে টেম্পারেচার বেড়ে মাথায় রক্ত উঠে যাবে!.. ওকে তাড়িয়ে কাজ নেই।

মা অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন, কিন্তু বেড়ালের ডাকে বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হয়ই—এ একেবারে নিঃসন্দেহ কথা! তার উপরে ঐ হতভাগা বেড়ালটা আবার এমন কান্নার সুরে ডাকে যে, আমার শুনলে বুক কাঁপে! বেড়াল-কাঁদা ভাবী অকল্যাণ।

নরেন লাঠী দিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে তুলুকে মারধর করে তাড়িয়ে বাড়ি ছাড়া করলে।

কিন্তু আবার গভীর নিশুতি রাত্রে মিন্টুর ঘরের ভেজানো দরজাটির বাইরে মৃদুচ্চাবিত কণ্ঠের সকরুণ সুরে ডাক শোনা গেল—মী—উঁ-উঁ-উ—

মিন্টু ঘুমোয়নি। যাতনায় ছটফট করছিল।

'মিউ' শব্দ কানে যাওয়া-মাত্র সচকিতে উৎকর্ণ হয়ে চোখ মেলে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—মা, তুলু ডাকছে, নয়? তুলুকে আমার কাছে আসতে দাও মা—ও আমার জন্যে কাঁদছে—

মা অপ্রসন্ন মুখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তুলু মা'র পানে তার উজ্জ্বল চোখের জ্বলন্ত মণি দু'টির দৃষ্টি স্থির রেখে, লেজটি ও কান দু'টি খাড়া করে দ্বিধাপূর্ণভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভিতরে ঢুকলো না।

তুলুর দিকে রোষ-তিক্ত দৃষ্টি হেনে—মা বিরস মুখে নিঃশব্দে পুনরায় মিন্টুর পাশে গিয়ে বসলেন।

অনেকক্ষণ নিষ্কম্পভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তুলু আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দ পদক্ষেপে—সতর্ক ভঙ্গীতে সামনের দিকে তাকতে তাকাতে মিন্টুর খাটের কাছে গিয়ে, একেবারে তার বিছানার উপরে উঠে পড়লো। মিন্টুর পাঁজরার পাশটি ঘেঁষে তার গায়ের বালাপোষখানিতে নিজের মাথা ঘষতে লাগল।

রুগ্না মিন্টুর সামনে তুলুর সম্বন্ধে কোনও আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করতে কেউই পারে না। বাড়িশুদ্ধ জানে তুলু মিন্টুর কতখানি প্রিয়।

রোগীর ঘরের বাইরে মিন্টুর ছোড়দা বীরেন বলে, রুগীর বিছানায় অমনতর লোমওয়ালা বেড়াল রাখা ভাল নয়!

মা শঙ্কিত মুখে বলেন, কী করবো বাবা! হতভাগা বেড়াল মোটে নড়তে চায় না। আজ ন'দিন মিন্টুর অসুখ করেছে—তা ও একরকম খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে!... কাল দুপুরে বৌমাকে বললুম, না খেয়ে শেষে কি বাড়িতে একটা জীব হত্যে হবে? ওকে এক বাটী গরম দুধ দাও! বৌমা

দুধ এনে দিলে, কিন্তু সে দুধ মোটেও ছুঁলে না। শুঁকে সরে গেল। ক'দিনই কিছু খাচ্ছে না দেখে আজ সকালে বৌমা মিণ্টুর বিছানার পাশে টেবিলের উপর এক বাটী দুধ রেখে এলো। মিণ্টু আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, তুলু দুধ খা—তখন দেখি আস্তে আস্তে টেবিলের উপরে উঠে চক চক করে সব দুধটা খেয়ে বাটিটা চেটে ঝকঝকে করে তুললে।

সরলা বললে, ওঁর নবাবের মতো মুখ। আমি সেদিন পাতের মাছের কাঁটা নিয়ে খাওয়াবার জন্যে এত চেষ্টা করলুম, মোটে ছুঁলে না।

বড় ভাই নরেন গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বললে, না না, টাইফয়েড রোগীর বিছানায় বেড়াল রাখা ভাল নয়।

নরেন ফোর্থ ইয়ারে ডাক্তারি পড়ে।

মা চিন্তিত মুখে বললেন, তাহলে বাপু ওকে তোরা নদীর ওপারে বিদেয় করে দিয়ে আয়! বাড়িতে থেকে মিণ্টুর কাছে যেতে না পেলে, ও কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ বাধাবে।

তার পরদিনই তুলুকে মিণ্টুর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে চুপি চুপি নদীর ওপারে বিদেয় করে দেওয়া হল!

মিণ্টু সদা সর্বদাই তুলুকে খোঁজে। সকলে মিলে তাকে নানান মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রেখে দেয়।

সতেরদিনে মিণ্টুর জ্বর ছাড়ল। জ্বর ছাড়ার পরে সে তুলুর জন্য আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তুলুর বিরুদ্ধে এরা যে একটা কিছু ষড়যন্ত্র করেছে, তার একটা অস্পষ্ট অনুমান তার মনের ভিতর দৃঢ় হয়ে ওঠায় সে শঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠল।

রাত্রি তখন প্রায় দু'টা বাজে। মিণ্টুর শিয়রের কাছে পাখা হাতে মা নিদ্রাবেশে ঢুলে পড়েছেন। উপর্যুপরি বহু রাত্রি উৎকণ্ঠাপূর্ণ জাগরণের পর এখন কতকটা নিরুদ্বিগ্ন হওয়ায় তাঁর সর্বাঙ্গে নিদ্রা যেন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে এসেছে!

মিণ্টুও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিস্তব্ধ অবশভাবে পড়েছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ ভেসে এলো—মিঁ—উঁ—উঁ—

যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে মৃদু কুণ্ঠিত সুরে দূর থেকে কে তাকে ডাকছে!

মুহূর্তেই মিণ্টুর পাতলা তন্দ্রাটুকু ভেঙ্গে গেল এবং সে সচকিতে চক্ষু মেলে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

আবার অত্যন্ত আস্তে আস্তে মৃদু অথচ স্পষ্ট ডাকটি শোনা গেল!—মিঁ-উ-উ-উ--

সে সুরে যেন ভীরু কুণ্ঠা ও ভয় জড়িয়ে আছে!

মিন্টু নিঃসন্দেহ হল এ তুলুরই গলার আওয়াজ।

ঘরের ভিতরে ল্যাম্পটা নীল কাচাবরণের ভিতর হতে মৃদু স্নিগ্ধ নীলাভ আলো সারা ঘরখানি আধ- আলো আধ-ছায়ায় ভরে রেখেছে! ঘড়ির 'টিকটিক' শব্দ ছাড়া আর কোথাও কিছু সাড়া শব্দ নেই।

মিন্টু আস্তে আস্তে বাহুতে ভর দিয়ে বিছানার উপরে উঠে বসলো।

তার রক্তলেশশূন্য বিবর্ণ পাণ্ডাশ মুখখানি ও কোটরপ্রবিষ্ট নিষ্প্রভ চক্ষু দু'টি তখন অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।....আবার শব্দ এলো—মিঁ—উ—

মিণ্টু খাট হতে আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে মেঝেয় নামল। নামতে গিয়ে মাথা একবার টলে গেল! খাটের বাজু ধরে কোনও রকম পতনের বেগটা সামলে নিয়ে তারপর দেয়াল ধরে ধরে—টলে টলে এলোমেলো পাদবিক্ষেপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। পায়ের আঙুল থেকে উরু পর্যন্ত থর্‌থর্ করে কাঁপছে—সর্বাঙ্গ অবশ বোধ হচ্ছে।

বিপুল মানসিক উত্তেজনাবশে ঘরের বাইরে বেরিয়ে মিণ্টুর দুর্বল শরীর ঝিমঝিম করে অসাড় হয়ে এলো—চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো—

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়ির দিক হতে সকরুণ কাতর শব্দ এলো—মীঁ—যু—

বহমান বাতাস স্পর্শে কচি কলাপাতার মত, মিণ্টুর শীর্ণ তনুখানি তখন থরথর করে কাঁপছে!—পা দু'টি প্রায় দুমড়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে—কানে ঝিঁঝির ডাকের মত শব্দ—চোখের সামনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলদে বিন্দু ঘুলিয়ে উঠছে!—

তবুও সে প্রাণপণ আগ্রহে ও উত্তেজনায় কেবলমাত্র মনেরই শক্তিতে সিঁড়ির দিকটাতে এগিয়ে গেল।

দেয়ালের অবলম্বন ছেড়ে সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই —পা টলে, মাথা ঘুরে, একেবারে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

ভারী বস্তু পতনের একটা শব্দ --ও সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠের একটি অস্ফুট আর্তনাদ –

মায়ের নিদ্রা টুটে গেল।

চমকে জেগে উঠে দেখেন—বিছানা শূন্য—মিণ্টু নেই।

যে দুর্বল রোগী অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজের শক্তিতে পাশ ফিরে পর্যন্ত শুতে পারে না—সে যে বিছানা ছেড়ে উঠে—ঘরের বাইরে চলে যেতে পারে এ যেন কল্পনারও অতীত!

মা পাগলিনীর মত বিস্রস্ত বেশ-বাসে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মায়ের ভীতিব্যঞ্জক চীৎকারে বাড়ির সবাই জেগে উঠল।

নিরুদ্বিগ্ন দ্বিপ্রহর রাতে সুষুপ্তিমগ্ন অন্ধকার বাড়িখানি সচকিতে জাগ্রত ও আলোকিত হয়ে উঠল।

তারপর ছুটাছুটি—শঙ্কাব্যাকুল কণ্ঠের ডাকাডাকি—ডাক্তারের বাড়ি দৌড়ানো ডাক্তার আসা প্রভৃতি পর্ব প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চলল।

ভোরের সদ্য বিকাশ লগ্নে—পূর্বদিক যখন সবেমাত্র স্বচ্ছ হয়ে উঠছে -মিণ্টুর মায়ের বুকফাটা কান্না সুষুপ্ত পল্লী সচকিত করে তুললো।

পাঁচ-ছয় ধাপ গড়িয়ে, সিঁড়ির বাঁকের মুখে চাতালে ঘাড়-মুখ গুঁজে মিণ্টু পড়ে গিয়েছিল। দুর্বল দেহে মাথায় প্রবল আঘাত লেগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে নাক দিয়ে বেগে রক্ত ছুটতে থাকে। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ!

মিণ্টুকে দাহ করে তার ভইয়েরা যখন বাড়ি ফিরে এলো—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে! সারা বাড়ি অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। চারিদিক যেন দারুণ ফাঁকা ফাঁকা!

শুধু একতলার একখানি কোণের ঘরের ভিতর হতে শোকাতুরা মায়ের শ্রান্ত অবসন্ন কণ্ঠের ক্ষীণ করুণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে—ওমা মিণ্টু—ফিরে আয় মা—আর আমি তোকে রেখে ঘুমিয়ে পড়বো না! আর তোকে তোর তুলুর জন্যে বোকবো না মিণ্টু—ফিরে আয়—

সন্ধ্যার পরে সদ্য শোকাহত আত্মীয় ক'টি—ভাই, বোন, বধূ সকলে মিলে একত্রিত হয়ে এক জায়গায় বসে গত রাত্রির দুর্ঘটনার সম্বন্ধে বিষণ্ণ মন্থর আলোচনা চলছিল।

প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে গভীর শোকের ছায়া সুস্পষ্টতর।

এমন সময়ে সিঁড়ির থেকে আর্ত কান্নার সুরে বিড়ালের ডাক শোনা গেল।—ম্যাঁ—ও-ও-ও—ম্যাঁ—ও-ও-ও—

মিণ্টুর বড়দাদা নরেন আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, ঐ সেই সর্বনেশে বেড়ালটা আবার এসেছে

মিণ্টুর বৌদিদিরও মুখে আতঙ্কের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ক্রোড়ে শায়িত শিশুটিকে সন্তর্পণে বুকের উপর তুলে নিয়ে স্বামীর দিকে একটু এগিয়ে ঘেঁষে সরে গিয়ে ভীতিবিহ্বল অস্ফুট কণ্ঠে বললে-- -উঃ, কী ভয়ানক ডাক ডাকছে—

সরলা উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ও বেড়াল নয়, যমদূত এসেছে! আমাদের সবাইকে খাবে তবে এই বাড়ি ছাড়বে!

সরলা সিঁড়িতে গিয়ে দেখলে—সিঁড়ির যে চাতাল'টার উপরে মিণ্টু গত রাত্রে দোতলা থেকে গড়িয়ে এসে পড়েছিল—সেই চাতালটিতে চঞ্চলভাবে ঘুরে ঘুরে দেয়াল ও সিঁড়ি শুঁকতে শুঁকতে তুলু অদ্ভুত স্বরে অনবরত এক সুরে ডাকছে—ম্যাঁ—ও-ও ও—ম্যাঁ—ও-ও-ও—

তার সেই ভীষণ অদ্ভুত ডাক যেন আর্তনাদের চেয়েও ভয়াবহ এবং কান্নার চেয়েও করুণতর!

তুলুর কণ্ঠে এমনধারা ডাক এর আগে আর কখনও শোনা যায়নি।

সরলা একটা ভাঙা খড়ম তুলুকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারলে। তুলু আঘাত পেয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন সমস্ত রাত্রি কখনও তেতালার ছাদে—কখনও ছাদের কার্নিসে—কখনও উঠানে—কখনও সিঁড়িতে—কখনও বাগানের ধারে, তুলু অবিশ্রান্ত ঘুরে ঘুরে সেই শোকার্ত কান্নার ডাক ডাকতে লাগল।

এক জায়গা হতে তাড়না করে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়—সেখান থেকে সরে গিয়ে ক্ষণকাল বাদেই আবার অন্য আর এক জায়গায় কাঁদতে আরম্ভ করে।

এমনি করে কিছুদিন কেটে গেল। দিনেরবেলায় তুলুর চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না। কোথায় যে সে থাকে কেউই ঠিকানা পায় না। কিন্তু সন্ধ্যার পব থেকেই সেই অদ্ভুত আর্তস্বরে কান্না—সমস্ত রাত্রি আর থামে না—সারা বাড়িটি ঘুরে ঘুরে ব্যাকুল কান্না কেঁদে ফেরে।

সে কান্নার শব্দে মিণ্টুর মা এবং বাড়ির আর সবাই রাত্রে ঘুমুতে পারেন না— আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে বিনিদ্র নেত্রে রাত কাটান!

চারদিনের দিন রাত্রি তখন সওয়া ন'টা হবে। তুলুর সেই বিকট কান্না শুরু হল।

বীরুর হাতের কাছে ভারী লোহার একটি ডাম্বেল পড়েছিল। সেইটি তুলে নিয়ে কান্না লক্ষ্য করে সে উত্তেজিতভাবে ছুটে চললো।

সিঁড়ির সেই চাতালটার কোণে তুলু লেজ উঁচু করে গায়ের সমস্ত রোমগুলি ফুলিয়ে কাঁটার মত খাড়া করে ঘুরে ঘুরে ভীষণ স্বরে কাঁদছে! সে কান্নায় সত্যিই যেন বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!

বীরু দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে গিয়ে হাতের নিরেট লোহার ভারী ডাম্বেলটি তুলুকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারল।

ডাম্বেলটি সজোরে গিয়ে ঠিক তুলুর মাথায় লাগল। লাগামাত্রই একবার খুব জোরে আর্তনাদ করে উঠেই তুলু নিস্তব্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বীরু স্পন্দিত বক্ষে সত্বর নেমে গিয়ে দেখলে—টকটকে লাল রক্তে তুলুর দুধের মত ধবধবে মুখখানি সিক্ত হয়ে উঠেছে! ভলভল করে তার নাক, কান, মুখ দিয়ে রাঙা রক্ত ছুটছে!

নরেন দ্রুতপদে ছুটে এসে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো, হায় হায় কী করলি বীরু? খুন করলি জীবটাকে?

বৌদি ছুটে এলো—সরলা ছুটে এলো—বাড়িতে যে যেখানে ছিল সকলেই ছুটে এসে সিঁড়িতে জড়ো হয়ে তুলুকে ঘিরে 'হা-হুতাশ' করতে লাগল।

তখনই বরফ প্রভৃতি এনে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করা হল—সিঁড়ি থেকে উঠিয়ে এনে তুলুকে বাঁচাবার জন্য সকলেই একান্ত প্রয়াস করতে লাগলো। কিন্তু সে সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে তুলুব শুভ্র-সুন্দব নরম বুকের মৃদু ধুকধুকুনিটুকু কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্তব্ধ স্থির হয়ে গেল।

তিন রাত্রি আগে মিণ্টু যে জায়গাটি তার তপ্ত রক্তে সিক্ত করে পরপারে চলে গেছল—ঠিক সেই জায়গাটিই তুলুও নিজের টাটকা রক্তে ভিজিয়ে মিণ্টুর কাছে চলে গেল।

তুলু আর নেই—তবুও বাড়িশুদ্ধ সকলকারই কানে গভীর নিশীথে কিম্বা নিস্তব্ধ দুপুরবেলায়-- যখন তখন যেন বিড়ালের করুণ কান্নার শব্দ ভেসে আসে!

তারা জানে এটা তাদের মনের বিকারমাত্র। কিন্তু তবু তারা এক একদিন রাত্রে ভাল করে ঘুমুতে পারে না। চমকে চমকে জেগে ওঠে।

তার পরে বহুবর্ষ কেটে গেল। দুই যুগেরও অধিক। মিণ্টু ও তুলুর ঘটনা যারা জানত—তাদের জনকতক পরপারে চলে গেছে—যারা আছে, তারা বহুকাল পূর্বেই দুর্ঘটনার বেদনা ভুলেই গিয়েছে ক্ষীণ স্মৃতিটুকু মাত্র মনের কোনও এক কোণে চাপা পড়ে আছে।

শুধু প্রৌঢ় বীরেন আজও কোনওখানে বিড়ালের কণ্ঠের 'মিঁউ' শব্দ শুনলে হঠাৎ অস্বাভাবিক আতঙ্কিত কিম্বা উত্তেজিত হয়—তার পরেই নিতান্ত দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

চিকিৎসকেরা বলেন, ও না কি স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত এক প্রকার হিস্ট্রীক ম্যানিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়।

কুলির অদৃষ্ট

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কয়েকদিন দারুণ বর্ষার পরে আকাশটা আজ একটু পরিষ্কার বোধ হইতেছিল।

সরযূয়া সকালে কাজে গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই। মাহিন তাহাব অপেক্ষায় বসিয়া আছে, ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে নাই। কে জানে সে কখন আসিয়া হয়তো তাহাকে দেখিতে না পাইয়া রাগিয়া যাইবে। তাহার প্রকৃতি এক রকমের, একবার রাগ করিলে আর যদি কিছুতেই ঠাণ্ডা হয়।

সখীয়া প্রত্যেক দিনকার মত তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, মাহিনের কথা শুনিযা তাহার মুখে হাসি আর ধরে না—ছিঃ সরযূয়াকে নাকি আবার ভয় করিয়া চলিতে হইবে। সে যখন খুশি যেখানে যায়, রামলালের সাধ্য কি যে তাহাকে একটা কথা হলে? রাগ করা অমনি আর কি? কথা অমনি বলিলেই হইল—কথা বলিলে কথা শুনিতে হয় তাহা বুঝি মনে নাই?

কিন্তু মাহিন তাহার কথা শুনিয়া গেলেও মনে গাঁথিতে পারে নাই। রামলাল রাগ করিলে সখীয়ার কিছু না হইতে পারে, সরযূয়া রাগ কবিলে মাহিনেব মাথায যে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ল্যাংটিংয়ের নিকট রেললাইন খারাপ হইয়া গিয়াছে, সর্দার জন কত কুলি লইয়া সে স্থান মেরামত করিতে গিয়াছে, এই জন কত কুলির মধ্যে সবযূযাও একজন।

কাল রাত্রে শয়নের সময়ও তাহারা জানিত না সবযূযাকে ভোরবেলায় সেখানে যাইতে হইবে। কয়দিন পরে সে আজ পথ্য করিবে, কয়দিন অসুখে ভুগিযা সে আহারের জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে। কাল অর্ধেক রাত্রি সে ঘুমাইতে পারে নাই, আজ কি দিয়া সে ভাত খাইবে এই কল্পনা লইয়া জাগিয়াছিল। বাত জাগিয়া আবার অসুখ হইবে, আর আহার কবিতে পারিবে না এই বলিযা মাহিন তাহাকে ঘুম পাড়াইয়াছিল।

আজ প্রভাতেই সর্দারের কঠোর কণ্ঠস্বরে উভয়ে সচকিত হইয়া জাগিয়াছিল। সবযূযা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই সর্দার জানাইল তাহাকে এখনই সাহেবের নিকট যাইতে হইবে, জরুরী তলব।

এত বেলা পর্যন্ত ঘুম লইয়াও সে খানিকটা বকিল, সরযূয়া অপ্রস্তুতভাবে জানাইল কয়দিন সে অসুখে ভুগিয়াছে সেইজন্য কাল রাত্রে তাহাব ঘুম না হওয়ায় আজ বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমাইয়াছে।

সে একটু বেলা হইলে যাইবে বলায় সর্দার রাগিয়া উঠিল। কর্কশ কণ্ঠে বলিল, সাহেব হুকুম দিয়াছেন এখনই যাইতে হইবে, না গেলে ধরিয়া লইয়া যাইবার আদেশ আছে।

বিমর্ষ মুখে ঘরের মধ্যে সরযূয়া পত্নীকে বলিল, "শুনে আসি সাহেব কি বলছে। তুই রেঁধে রাখিস মাহিন, আমি খানিক বাদেই ফিরব। আমার বড় ক্ষিদে রে, বাড়িতে এসে আব দেবী কবব না।"

মাহিন তাড়াতাড়ি ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিয়া উনানে আগুন দিল। সরযূয়া যাহা খাইতে চাহিয়াছিল সব রাঁধিয়া রাখিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সরযূয়া ফিরিল না, নিত্যকার মত সখীয়া দুপুরে বেড়াইতে আসিলে প্রথম সে তাহারই মুখে শুনিতে পাইল সর্দার কয়েকজন কুলীকে লইয়া ল্যাংটিংয়ে রেল লাইন সারিতে গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সরযূয়াও একজন।

সখীয়া বিদ্রূপ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরও সে খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাব পর হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পথে দেখা হইল ভিখনের সহিত।

ভিখন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "কোথায় চলেছিস মাহিন?"

মাহিন বলিল, "সরযূয়ার খোঁজ কিছু জানিস ভিখন?"

একটু ভাবিয়া ভিখন বলিল, "সে যে লাইনে কাজ করতে গেছে রে, তোকে কিছু বলে যায়নি?"

উদগতপ্রায় অশ্রু চাপিতে চাপিতে মাহিন বলিল, "আমায় বলে যাবে কি করে, সে যে ভেরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই চলে গেছে। সর্দার এসে বললে সাহেব ডেকেছে—কেন ডেকেছে তা তো কিছুই বলেনি। সে আমায় ভাত-তরকারি রেঁধে রাখতে বলে চলে গেছে—"

অশ্রুজল সে আর সামলাইতে পারিল না, চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ভিখন ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "কেঁদে কি করবি মাহিন, ঘরে ফিরে যা, রাস্তায় রাস্তায় কোথায় ঘুরবি! সাহেব তার অসুখের কথা শোনেনি, জোর করে পাঠিয়েছে। কখন আসবে তাও বলতে পারিনে, তুই খেয়ে নে গিয়ে, তার জন্যে কেন শুকিয়ে মরবি?"

রুদ্ধকণ্ঠে মাহিন বলিল, "আজ পাঁচদিন তার খাওয়া নেই, সে কি কাজ করতে পারবে ভিখন?"

বেদনার হাসি হাসিয়া ভিখন বলিল, "সে কথা কে শুনবে বল দেখি? কাজ তাকে করতেই হবে। না করলে পরে—"

সে চুপ করিয়া গেল। ব্যগ্রকণ্ঠে মাহিন বলিল, "না করলে কি করবে রে ভিখন—মারবে?"

ভিখন বলিল, "কি করে বলব বল দেখি? দয়া-মায়া কি ওদের আছে রে, ওরা যে কসাই, ওরা সব পারে।"

ভিখন নিজের কাজে চলিয়া গেল।

শ্রান্ত চরণ আর দেহভার বহিতে পারে না, তবুও মাহিন ফিরিল।

দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল, সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ঘরের মেঝেয় ভাত-তরকারি সাজানো, সরযূয়া আসিয়া আহার করিবে।

ভিখন তাহাকে আহার করিবার পরামর্শ দিল, তাই কি পারে সে? স্বামী, আজ কয়দিন খায় নাই, আজ সে খাইবে কাল সেই আনন্দে সে রাত্রে ঘুমাইতে পারে নাই, সে যে অনেক আশা করিয়া গিয়াছে বাড়ি ফিরিয়া যাইবে। তাহার বড় আশার ভাত-তরকারি মাহিন মুখে তুলিবে কি করিয়া?

সম্মুখে মাঠ, উঁচু-নীচু, যেন ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। অদূরে গগনস্পর্শী পাহাড়। মাহিন সেইদিকে তাকাইয়া সরযূয়ার কথাই ভাবিতেছিল।

সে যখন মাত্র দুই বৎসরের, সরযূয়া পাঁচ বৎসরের, তখন তাহাদের বিবাহ হয়। মাতৃহীনা বালিকা বধূ শাশুড়ীর নিকটেই মানুষ হইয়াছিল। সরযূয়াকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, সরযূয়াও তাহাকে ঠিক ততখানি ভালবাসিত। আজ সে যুবতী, সরযূয়া যুবক, কেহ কাহাকেও একদিন ছাড়িয়া থাকে নাই।

মাহিনার বুকের মধ্য হইতে কান্না ঠেলিয়া উঠিতেছিল, হায় রে, যদি মুখের ভাত দুইটা খাইয়া যাইতে পারিত।

সূর্য অল্পে অল্পে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। মাহিন তখনও সেই স্থানে আড়ষ্টভাবে বসিয়া, আশাপূর্ণ চোখে পথের পানে তাকাইয়া।

ক্রমে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কালো আকাশের বুক চিরিয়া ধরার বুকে অন্ধকার ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশে যে দুই-একটি তারা উঠিয়াছিল মেঘে তাহা ঢাকিয়া গেল, আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জন হইতেছিল। তাহার পরই ঝর ঝর করিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

সরযূয়া ফিরিল না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাহিন ঘরে গেল। ঘরের মেঝেয় ভাত-তরকারি তখনও তেমনি পড়িয়া। আলোটা জ্বালাইয়া মাহিন কতক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। নিজেও সেদিন অনাহারে রহিল।

সমস্ত রাত্রি সে চোখের পাতা মুদিতে পারিল না, ছটফট করিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলিল। ইহারই মধ্যে তাহার কতবার মনে হইতেছিল সরযূয়া বুঝি আসিয়াছে, বুঝি ডাকিল। ধড়ফড় করিয়া সে কতবার উঠিয়া বসিল, কতক্ষণ উৎকর্ণ থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, কাঁদিয়া সে উঠিয়া বসিল।

দরজার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল।

রামলালও তো কাজ করিতে গিয়াছিল, সে কি ফিরিয়াছে? একবার দেখা যাক।

মাহিন রামলালের কুটিরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সখীয়া ঘুম হইতে উঠিয়া বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। এত ভোরে মাহিকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকালে যে মাহিন ? তোর চেহারা অমন দেখাচ্ছে কেন, অসুখ করেছে?"

মাহিন শুষ্কমুখে বলিল, "না, রামলাল ফিরেছে?"

সখীয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঘুমুচ্ছে।"

রামলাল ফিরিয়াছে, সরযূয়া ফিরিল না কেন? মাহিনের বুক পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিল, সে বলিল, "কখন ফিরে এসেছে?"

সখীয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কে জানে তখন কত রাত হবে, বোধহয় অনেক রাত হবে। যত পেরেছে তাড়ি খেয়ে এসেছে, দরজা খুলে দিতেই সেই যে শুয়ে পড়ল কিছুতেই উঠল না। একটা কথাও বলেনি, কিছু খায়ওনি, দেখ না, অমনি পড়ে আছে।"

মাহিনের দেখিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিল, "এখন বোধহয় উঠবে না?"

সখীয়া বলিল, "আজ দিন যে সাহেব ছুটি দিয়েছে, একদিনে পাঁচদিনের কাজ করিয়ে নিয়েছে, আজ কি নড়বার ক্ষমতা আছে? সরযূয়া ফিরেছে?"

মাহিনা শুধু মাথা নাড়িল। জোর করিয়া দাঁতে ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়াছিল, পাছে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া পড়ে।

সখীয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "ফেরে নি? যারা গিয়েছিল সবাই তো কাল রাতে ফিরেছে, তবে—"

বলিতে বলিতে মাহিনের সাদা মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে থামিয়া গেল, বলিল, "কোথাও হয় তো তাড়ি খেয়ে পড়ে আছে। এ উঠুক, তুমি ততক্ষণ বাড়ি যাও, আমি তোমায় খবর দিয়ে আসতে বলব এখন।"

তাহাই ভিন্ন আর উপায় কি?

কান্না চাপিতে চাপিতে মাহিন আবার নিজের কুটিরে ফিরিয়া আসিল।

সকলে ফিরিয়া আসিল, সে ফিরিল না ইহার কারণ কি? সে তো কখনও কোথাও থাকে না, সে যেখানেই থাক ফিরিয়া আসিবেই। সে যে জানে মাহিন তাহার জন্য বড় বেশি রকম ভাবে, কাঁদে।

বারান্দায় বসিয়া মাহিন তাহার কথাই ভাবিতে লাগিল। সে যে বড় দুর্বল শরীরে কাজ করিতে গিয়াছে, ভাত খাইবে—বড় আশা লইয়া গিয়াছে যে।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। গতকল্য উপবাস গিয়াছে, আজও এতখানি বেলা হইয়াছে, মাহিনের তথাপি ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না।

অনেক বেলায় রামলাল দর্শন দিল। তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল তাহার আসিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল সখীয়ার তাড়নাতেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

মাহিন তাহাকে দেখিয়া সন্ত্রস্তভাবে বসিতে জায়গা দিল, শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আমি ভোর হতেই তোমার কাছে গিয়েছিলুম রামলাল, সখীয়া বললে তুমি উঠলে তোমায় এখানে পাঠিয়ে দেবে। কাল তুমিও তো লাইনে গিয়েছিলে, সরযূয়া তোমাদের সঙ্গে ফিরেছে তো?

ব্যগ্রভাবে সে রামলালের পানে চাহিয়া রহিল।

রামলাল বিশুষ্ক মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইল, কি বলিবে তাহা সে তখনও ঠিক করিতে পারে নাই।

সে কথা যেমন করিয়া বলা যায়? মাহিন যে সরযূয়াকে কতখানি ভালবাসিত তাহা না জানিত এমন লোকই নাই। মেয়েরা মাহিনকে এবং পুরুষেরা সরযূয়াকে এ জন্য কত না বিদ্রূপ করিত। কিন্তু ইহারা দুই জনেই বিদ্রূপ হাসিয়া সইয়া যাইত।

সেই সরযূয়া—সে আর নাই। কাল দুর্বল শরীর লইয়া সে সকলের সমান কাজ করিতে পারিতেছিল না, সাহেবের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল। তাহার পদাঘাতে কাল বৈকালে সেই যে সে পড়িয়া যায় আর উঠিতে পারে নাই। হায় অভাগা, তাহার জন্যই কাল অন্য সকলের ফিরিতে অত রাত্রি হইয়া গিয়াছিল।

তাহকে নীরবে দেখিয়া মুখখানা শুকাইয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে সে ডাকিল—"রামলাল—"

রামলাল শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আমি কি বলব মাহিন?"

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, মাহিন তথাপি জোর করিয়া বলিল, "বল রামলাল, সরযূয়া—আমার সরযূয়া—"

"সে নেই মাহিন, কাল বিকেলে সে মারা গেছে।"

"নেই—নেই—"

বদ্ধদৃষ্টিতে মাহিন রামলালের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখখানা নিমেষে মরা মানুষের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

তাহার মুখ দেখিয়া রামলাল ভয় পাইল—ডাকিল—"মাহিন"—

"সরযূয়া—আমার সরযূয়া নেই—ওগো, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো গো—"

আর তাহার মুখে কথা ফুটিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিতে গিয়া রামলাল দেখিল সে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সেই মূর্ছাই তাহার শেষ মূর্ছা। একদিন একরাত্রি জীবন্তে মৃতাবস্থায় থাকিয়া নিঃশব্দে সে সরযূয়ার অনুগমন করিল। তাহার মৃত্যুতে একটি নারীর শুধু চোখের জল ঝরিয়া পড়িল—সে সখীয়া।

কুলিরা তেমনই খাটে—কোন কাজে কেহ দ্বিরুক্তি করে না। তাহারা জানে তাহাদের জীবন এইরূপেই টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাহাদের কেহ নাই, ভগবানও তাহাদের উপর বিরূপ। তাহারা বুকের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়া শুধু কাজ করিয়াই যাইবে, এতটুকু ত্রুটি হইলেই, প্রহার ও উৎপীড়ন।

লাইনে কাজ করিতে আসিয়া মুহূর্তের জন্য তাহারা দাঁড়ায়, হতভাগা সরযূয়া যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানটার পানে একবার তাকায়, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহারা কাজে লাগে, এইভাবেই দিন যায়।

দিবাকরের বিবাহ

লীলা মজুমদার

আমার সেজমামার ছেলে দিবাকরের আর কিছুতেই বিয়ে হয় না। ছেলে কিছু মন্দ নয়, বরং অনেক দিক দিয়ে দস্তুরমতো ভালো। দিব্যি পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, ফর্সা না হলেও খুব কালো বলা চলে না। আর চোস্ত দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, টেরি কেটে, হওয়াই শার্ট পরে দাঁড়ালে দস্তুরমতো সুদর্শন বলা চলে। লেখাপড়াতেও কম নয়, আমার নিজের মামাতো ভাই, কম হবেই বা কেন। বিলেত থেকে কিসব ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে, ভালো কাজ পেয়েছে। বাপের অকথাও কিছু ফেলনা নয়! ঐ একটিই ছেলে, আর একটি মেয়ে, তার আবার বেশ ভালোই বিয়ে হয়েছে। বাপ সারাজীবন ডাক্তারী করে দু'পয়সা জমিয়েছে বলে তো আমার বাপের বাড়ির সকলে সন্দেহ কবেন। আব কথাবার্তা চাল-চলন দিব্যি হাল-ফ্যাশানের কায়দা-দুরস্ত।

অথচ এ হেন দিবাকরের কিছুতেই বিয়ে হয় না।

দিবাকরের নিজের যে বিয়েতে খুব আপত্তি আছে, তাও নয়। বরং আমাদের বিশ্বাস মনে মনে বেশ একটু আগ্রহই আছে। তবু কেন যে বিয়ে হয না, তার প্রধান কারণ পছন্দমতো মেয়েই নাকি পাওয়া যায় না।

শুনে আমাদেব সকলেবই একটু হাসি পায়, আবার একটু বাগও হয। পৃথিবীসুদ্ধ সকলেব যুগ্যি কনে পাওয়া যায, আর দিবাকরই বা কি এমন কার্তিক ঠাকুর যে ওর বেলা পাওয়া যাবে না।

দিবাকবেব বড় বোন হৈমন্তী শেষ পর্যন্ত একদিন বলে বসল, "কি বাবা তুই এমন সাত বাজাব ধন এক মানিক হয়েছিস যে তোর বৌ পাওয়া যায় না? আমাদের ওনাদের সব টপাটপ বিয়ে হযে গেল আর তোর হয নাই বা কেন?"

দিবাকর কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, "কিসে আর কিসে! তোমাদেব ওনাদেব কথা আব বল না। ভাগ্যিস তোমরা জন্মেছিলে সব, ওনাদের কি দশা হোত বল তো?"

হৈমন্তী রেগে টং। সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেও কথাটা শুনে খুশি হইনি। আমার মেজমামীমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বললেন, "আহা! ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়! সেজবৌয়ের সবটাতেই বাড়াবাড়ি, মেয়ের বিয়ের সময়ে শুনতাম ছেলে পাওয়া যায় না, ছেলের বিয়ের সময়ে শুনি মেয়ে পাওয়া যায় না! এর কোনো মানে হয়? বাংলাদেশে কি কারো বিয়ে হয় না? আমার ভাইঝি রাধারানী কি মন্দ ছিল?"

সেজমামীমা বললেন, "কি যে বল মেজদি, তোমাদের রাধারানীর নাকের ডগাটা কি রকম মোটা দেখতে, ওর সঙ্গে যে কি করে কথা পাড়তে পারলে, এই আমি ভাবি।"

হৈমন্তী বলল, "আমার পিসতুত ননদ মিনাক্ষীর নাকের ডগা তো আর মোটা নয়, তাকে কেন পছন্দ হোল না শুনি?"

সেজমামীমা বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই থাম তো হিমি। ঐ মীনাক্ষী রেগে গেলে তোতলামি করে, ওকে বিয়ে করলে আমার দিবাকর সুখী হোত না।"

হৈমন্তী রেগে বলল, "তোমার দিবাকরটি অসুখী হোত, না মীনাক্ষী অসুখী হোত—সেই হোল

কথা। আমার মতে মীনাক্ষী ভারী বেঁচে গেছে। দিবাকরের চেয়ে কত ভালো বরের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে, ভালোই হয়েছে।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দিবাকরের বিয়ে হচ্ছে না বলে বাড়ির সুখ-শান্তি নষ্ট হবার জোগাড়। সেজমামা সংসারের ব্যাপারে বড় একটা নাক ঢোকান না, কিন্তু দিবাকরের বিবাহ ব্যাপার নিয়ে সেজমামী তাঁকে এমনি অতিষ্ঠ করে তুললেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে পাড়ার তাস খেলার ক্লাবে নাম লিখিয়ে রোজ রাত এগারোটার সময় বাড়ি ফিরতে শুরু করলেন।

ব্যাপার দেখে, ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য আমার ভালো মানুষ মা পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। দিবাকরের একটা বিয়ে না দিলেই নয়। মা বললেন, "দিবকরের বিয়ে হয় না মানে? মেয়ে পাওয়া যায় না, একটা কথা হল নাকি? মাঝখান থেকে আমার ভাই বেচারা, এক রকম বাধ্য হয়ে গোল্লায় যেতে শুরু করেছে। আজ তাসের আড্ডায়, কাল গাঁজার আড্ডায়, এর শেষ যে কোথায় হবে কে জানে! এর ফল ভালো হবে না বলে দিলাম, মেজবৌ। আমি এক্ষুণি পাঁচ-সাতটা মেয়ের সন্ধান দিচ্ছি, ভালো চাও তো এর থেকে একটা ঠিক করে ফেল।

সেজমামীমা ননদের বকুনি খেয়ে রেগে কেঁদে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, কিন্তু দিবাকর নিজে এসে বলল, "কে পাঁচ-সাতজন ভালো মেয়ে শুনি, পিসিমা।" আমরা একটু মুচকি হাসলাম।

মা বললেন, "কেন, ছেলেদের স্কুলের হেডমাস্টারের বড় মেয়ে কুন্তী।"

দিবাকর বলল, "সে বড় খাটো করে কাপড় পরে, ও চলবে না।"

মা বললেন, "হেডমাস্টারের মেজ মেয়ে মন্দাকিনী।"

দিবাকর বলল, "ও বাবা! সে ডাকসাইটে ঝগড়াটি।"

মা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমার ভাসুরঝির মেয়ে ইরা।"

দিবাকর বলল, "ওরে বাসরে! হাতী বিশেষ।"

মা আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, "খেঁদির ননদ বিনু।"

দিবাকর বলল, "বড্ড রোগা।"

আমি এগিয়ে এসে বললাম, "পাশের বাড়ির গোপা।"

দিবাকর বলল, "ওরকম সাহেববাড়ির মেয়ে মনে ধরলে তো আমি বিলেত থেকে আদি অকৃত্রিম মেমসাহেবই আনতাম।"

আমি বললাম, "আমার মেজখুড়ির বোনঝি ইন্দ্রানী।"

দিবাকর বলল, "বড্ড হিন্দু প্যাটার্নের।"

আমরা তখন বাড়িসুদ্ধ সবাই রেগেমেগে বললাম, "যা তোর বিয়ে হবে না। তুই আইবুড়ো থাকবি। যা না কোনো মিশন-টিশনে নাম লেখা।"

মাঝে মাঝে এমনও হয় বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গেল বলে। আবার শেষ মুহূর্তে কোথা থেকে এক ফ্যাকড়া জুটে সব পণ্ড করে দেয়। সেজমামীমা এইসব অবস্থার জন্য প্রমাণ সাইজের একজোড়া জড়োয়া বালা গড়িয়ে রেখেছিলেন। দিব্যি মকর মুখ দেওয়া, লাল সবুজ নানান রঙের পাথর বসানো খাসা বালাজোড়া।

বালাজোড়ার আবার প্রয়োজন অনুসারে নানান অদল-বদল হতে থাকে। যেমন, যখন সেজমামীমার সইয়ের মেয়ে ডলির সঙ্গে বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে এল, বালার মুখে দু'টি ছোট ছোট ঘুণ্টি লাগানো হোল, কারণ ডলি যে কেবল সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা তা নয়, ইয়া জাঁদরেল গড়নের।

তারপর যখন সইয়ের সঙ্গে কি একটা ছোট কথা নিয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল, তখন

সইয়ের বড় জার মেয়ে নেলির সঙ্গে বিয়ে প্রায় হয় হয় বলে। এবার ঘুণ্টি কেটে ফেলে মকর মুখটাকে টেনে ছোট করা হল। কারণ নেলি লম্বায় পাঁচ ফুটেরও কম। গড়নে বেড়াল বাচ্চা। কিন্তু নেলির সঙ্গে কেন জানি হোল না।

ক্রমে যেমন দিন যেতে লাগল সেজমামীমা মরিয়া হয়ে কেবল বালা কেন শাড়িও কিনে ফেললেন। শাড়ি কেনার পর জামা, সেমিজ, পেটিকোটও করিয়ে রাখলেন। দর্জিকে বলে সেলাইয়ের জোড়ায় জোড়ায় দু' ইঞ্চি করে কাপড় রাখলেন, যাতে ইচ্ছামতো ছোট-বড় করা যায়।

মোট কথা সবই হোল কনে পছন্দ করা ছাড়া। সেজমামীমা একাজোড়া জরির কাজ করা দিল্লীর স্যান্ডেলও কিনে ফেলেছিলেন, শেষ মুহূর্তে দিবাকরই বাধা দিল।

শেষ অবধি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, আত্মীয়স্বজন সকলেই হাল ছেড়ে দিয়ে যে যার নিজের কাজে মন দিলেন। সেজমামীমার খুড়শাশুড়ী, আমার ছোট দিদিমা বলে বসলেন, "আমার কথা শোন সেজ-বৌমা, দিবুর বিয়ে যদি দিতে চাও, একটা পুজো-আচ্চার ব্যবস্থা কর। আমি বলছি বিঘ্নদেব ওর পিছু নিয়েছেন। আর তোমরা তো কী ভাই, কী খাই করে জীবনটাই কাটিয়ে দিচ্ছ।"

এই সময়ে দিবাকরের বন্ধু শঙ্কর একদিন আমাকে বলল, "কি দিদি, তোমরা কি দিবাকরকে ব্রহ্মচারী করে রাখবে স্থির করেছ নাকি?" শুনে আমার তো রাগ হবার কথা! বললাম, "রেখে দাও তোমার দিবাকরের বিবাহ। আমরা আত্মীয়-স্বজনরা কম করে একশ একষট্টি বিয়ের প্রস্তাব এনেছি, এবং প্রত্যেকটা হয় দিবাকরের মা, নয় দিবাকর নিজে ভেস্তে দিয়েছে। আর ওর বিয়ে-টিয়ে হবে না, ওর যুগ্যি মেয়ে আজকাল তৈরীই হয় না।"

শঙ্কর বললে, "তোমরা আসল ব্যাপারটা কিছু বোঝনি। দিবাকরের এদিকে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ব্রিজ ক্লাবে আজকাল তাস না খেলে কেবল দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে। এইজন্য কি ও বিলেতে সারি সারি বিশালাক্ষী সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে এসেছে? তাদের সব নাকি দুধে আলতায় গাযেব বং, রেশমের মতো চুল, মুক্তোর মতো দাঁত। যেমনি তারা দেখতে সুন্দর, তেমনি তারা কাজে পটু। আমাদের বাঙালী মেয়েদের মতো নয় যে, একবেলা রাঁধবে তো ঝুলকালি মেখে একাকার। আহা। তাদের হাতে তৈরী সেইসব চপ কাটলেট ডেভিল ওমলেট যেন কোন বিগত জীবনেব স্মৃতি বলে মনে হয়।"

তাদের বাধা দিয়ে আমি বললাম, "এই সমস্ত কথা নিশ্চয় দিবাকর তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। দিবাকরকে বল এত বক্তৃতা করতে শিখেছে আর নিজের একটা বৌ জোগাড় করতে পারে না! ওর চেয়ে আমাদের চাকর ঘনশ্যাম ঢের ভালো সে তিন বছরে দু'-দুটো বিয়ে করে ফেলেছে। বল দিবাকরকে।"

শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে বলল, "আহা, চট কেন দিদি, আমি বলেছিলাম কি, ঐ রকম সময় ঠিক করে সাজিয়ে-গুজিয়ে মেয়ে দেখলে, কোন জন্মে ওর পছন্দ হবে না! ও একটু রোম্যাণ্টিক কিনা, একটু কবি কবি ধরনের, একটা ভালো পরিস্থিতি তৈরী করে, তবে মেয়ে দেখাতে হয়।"

আমি বললাম, "আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! শঙ্কর দিবাকরের জন্য এমন পরিস্থিতি রচনা করি আর কি!"

শঙ্কর ভাবিত হয়ে সেদিনকার মত বিদায় নিল।

এই ঘটনার দিন পনের বাদে দিবাকর দিন দশেকের ছুটি পেয়ে শঙ্করদের সঙ্গে হাজারিবাগ বেড়াতে গিয়েছিল। আমি আবার যাবার সময় শঙ্করকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম, "এবার রোম্যান্টিব পরিস্থিতি রচনা করার ঢের সুযোগ পাবে শঙ্কর।"

সেজমামীমার মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল, পারলে উনি সঙ্গে যান, কিন্তু শঙ্কররা সে কথা উত্থাপন না করাতে, দিবাকর অনেক কষ্টে তাঁকে ঠেকাল।

দিবাকরের সুটকেস গুছিয়ে দিতে দিতে বারবার তাকে সেজমামীমা সাবধান করে দিলেন, "দেখিস বাবা, চারিদিকে চোখ রাখিস। লোকের কথায় আবার যেন তা ভুলে না যাস। সুন্দর মুখ দেখলেই আবার ভেড়ু বনে যাস না। আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো বিষয়ে মনস্থির করবি না। শঙ্কররা ভালো লোক হতে পারে, কিন্তু দেখছিসই তো, আমার যাওয়ার কথা একবারও বলল না। অথচ ওদের সঙ্গে আমার পঁচিশ বছরের জানাশোনা। কীই বা অসুবিধা হত আমি গেলে। দু'বেলা দুমুঠো না হয় খেতাম, এক কোণায় পড়ে থাকতাম, কিছু এসে যেত না ওদের মত লোকেব। তা একবার বলল না। আমার বাপু, একটা আত্মসম্মান আছে, আমি কেন বলতে যাব। নিশ্চয় ওদের কোন মতলব আছে। খুব সাবধানে থাকবি।"

দিবাকর বিরক্ত হয়ে বলল, "আচ্ছা মা বিলেতে তো তুমি আমার সঙ্গে যাওনি, সেখানে কে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করত বল দিকিনি। সেখান থেকে যখন অক্ষত শরীরে ও অবিবাহিত অবস্থায় ফিরেছি তখন হাজারিবাগ থেকেও ফেরাটা আশ্চর্য নয়।"

হাজারিবাগ গিয়ে কিন্তু দিবাকর একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল, সম্ভবত দীর্ঘকাল সাবধানে থাকার ফলে একটু ক্লান্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। বহু দূরে দূরে একা একা বেড়াতে চলে যেত। বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত। শঙ্কর এতে কোনো আপত্তি করত না, ববং খুশিই হত। কারণ দিবাকবের বিবাহ নিয়ে সকলে বিব্রত, শঙ্করের কথা অতটা কারো মনে হয়নি। সে বেচারার বিয়ে ঠিক কবে দেবার জন্য কারো বিশেষ আগ্রহও দেখা যায় নি। অবস্থা বুঝে শঙ্কর নিজেই নিজেব ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। দিব্যি খাসা একটি মেয়ে আবিষ্কার করে বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলেছিল। ঐ মেয়ের বাবার সুন্দর বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেখানে রোজ বিকেলে শঙ্করের চাযের নেমন্তন্ন থাকে। প্রথম দু' একদিন শঙ্কর দিবাকরকে সঙ্গে নিযে গেল। কিন্তু দিবাকব গিয়ে দেখল সেখানে দিবাকবের থেকে শঙ্করের আদর বেশী। আস্তে আস্তে দিবাকর সরে দাঁড়াল। লম্বা সম্বা বেড়াতে যাওযা ধরল। বাত করে বাড়ি ফেরা ধরল।

এমনি একদিন বেডাতে গেছে, বাডি ফিরছে বেশ রাতে, ফুটফুটে চাঁদেব আলো, কি একটা বুনো ফুলের মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ দিবাকর থমকে দাঁড়াল। মনে হল নারীর ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে উঠছে পড়ছে। স্পষ্ট শুনতে পেল কোনো একটি মেয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। উদ্বিগ্নভাবে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করতে লাগল। অবশেষে কান্নার শব্দ অনুসরণ করে এক গাছতলায উপনীত হল। সেখানে দেখতে পেল একটি রূপসী মেয়ে পা ছড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

মেয়েটির বয়স মনে হল সতের-আঠার হবে। একগাছি কালো কোঁকড়ানো চুল আলগোছে বাঁধা। পরনে তার বাসন্তী রঙের শাড়ি, কপালে একটি কুমকুমের টিপ। গাছের পাতাব ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো করে চাঁদের আলো তার সর্বাঙ্গে এসে পড়ছে।

দিবাকর মহা বিপদে পড়ে গেল। কি যে করবে ভেবে না পেয়ে বার বার ঢোক গিলে গিলে তার পেট ঢাক হয়ে এল। মেয়েটি এক মুহূর্তের জন্য কান্না থামিয়ে, বেশ ভালো করে তার মুখখানা দেখে নিয়ে, আবার নিবিষ্ট মনে কাঁদতে লাগল। তখন দিবাকর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কবল, "কি হয়েছে, ব্যাপার খুলেই বল না, মিছিমিছি অত চেঁচাচ্ছ কেন?"

মেয়েটা এবার সত্যি সত্যি কান্না থামিয়ে একটু যেন রেগেই বলল, "মোটেই মিছিমিছি নয়, যথেষ্ট কারণ আছে।"

দিবাকর বলল, "যথেষ্ট কারণ আবার কি?"

তখন মেয়েটা ডুকরে কেঁদে বলল, "তোমার মামা যদি ভুঁড়িওয়ালা সোনা তালুকদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করত, তাহলে তুমিও এর চাইতে ঢের জোরে চেঁচাতে।"

শুনে দিবাকরের দয়া হোল, একটু রাগও হোল, বলল, "আমি যদি এক বছরে একশ সাতান্নটা বিয়ের সম্বন্ধ পণ্ড করে দিতে পারি, তুমি ঐ সামান্য একটা ভুঁড়িওয়ালা সোনা তালুকদারকে মেরে তাড়াতে পার না?"

মেয়েটি তাই শুনে মাথা নেড়ে বললে, "সোনা তালুকদার যে মামাবাবুর ছোটবেলাকার বন্ধু, তাকে মেরে তাড়ালে সে কি মনে করবে?"

দিবাকর বললে, "তাহলে পষ্টাপষ্টি বলে দাও ওসব হবে না।"

"সেই না বলতে গিয়েই তো মুস্কিল হোল। আমার নিজের বলতে গিয়ে লজ্জা করল বলে আমাদের ছোকরা চাকরকে দিয়ে বলে পাঠালাম। তাই নিয়ে বাড়িসুদ্ধ সে কি হৈ চৈ! ওঁরা নিজেরা ওঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নেন তার বেলা কিছু হয় না, আমি একটু দরকারী কথা বলে পাঠিয়েছি তাতে মামাবাবু-মামীমা রেগেমেগে, আমাকে বকে-টকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিলেন। সারাদিন আমি ঘরে বন্ধ ছিলাম, তারপর বিকেলবেলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেলাম। আর আমি বাড়িতে ফিরব না। শুধু যে জোর করে বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায় তা নয়, আমি একটু আচার খেলে সবাই রাগ করে।"

নিজের দুঃখের কথা বলতে বলতে মেয়েটি আবার কাঁদতে লাগল। দিবাকর ভাবল, এত চোখের জল রাখে কোথায়? ব্যস্ত হয়ে বলল, "আহা, আর কেঁদো না, আর কেঁদো না, এখানে যে একটি ছোটখাট দামোদর বচনা করে ফেলছ। এখন কি করতে চাও তাই আমাকে বল।"

মেয়েটি বলল, "কিছু করতে চাই না, পালিয়ে যেতে চাই, যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যেতে চাই। আমার পা ব্যথা করছে বলে একটু বিশ্রাম করছি।"

বলে সে উঠে পড়ে। দিবাকর উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, "এই সন্ধ্যেবেলা এই বনে-জঙ্গালেব কোথায় যাবে? তার চেয়ে বরং এক কাজ কর, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল। সেখানে গিয়ে সবাই মিলে পরামর্শ করা যাবে তুমি কোথায় যাবে। ঐ ভুঁড়িওয়ালা সোনা তালুকদাবেব সঙ্গে তোমার যে বিয়ে হতে পারে না, এটা নিশ্চিত। এখন চল তো।"

অগত্যা মেয়েটি রাজী হল। দিবাকর তাকে শঙ্করের বাড়ি এনে তুলল। তাব কবুণ কাহিনী শুনে শঙ্করের মন গলে যাওয়া তো স্বাভাবিকই। শঙ্করের মাও তাকে আদর করে থাকবার জায়গা দিলেন। দিবাকর বার বার বলতে লাগল যে পাঁচদিন পরে কলকাতায় গিয়ে সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

মেয়েটির নাম মিনু, চমৎকার রাঁধে, বেড়ে গানের গলা, শরীরে কোথাও একটু রাগ নেই, বেশ মেয়ে।

মনে মনে দিবাকরের ভীষণ সাহস বেড়ে গেল। কলকাতায় নিয়ে গেলে মা যদি খেঁচাখেচি করেন তো মাকে বলব, "কী বলছ! জান, আমার প্রায় ছাব্বিশ বছর বয়স, আমি সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি করি, আমাদের আপিসের লোকেরা আমাকে কত খাতির করে, দেখলেই সেলাম করে, আর তুমি আমাকে এইরকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর, ও চলবে না।"

আবার ভাবে, না, একটা সাপোর্ট দরকার, পাশে একটা লোক চাই। ভেবে, আমাকে এক লম্বা চিঠি দেয়, তাতেই তো আমি এত কথা জানতে পারলাম। লিখলাম, মিনুকে আমার কাছে নিয়ে

আসিস, আমাদের পাড়ার গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস করে দেব, নয় তো মেয়ে পুলিশে ঢুকিয়ে দেব। নিদেন পাটনায় আমার জানা খুব ভালো চাকরি আছে, তার একটা জুটিয়ে দেব। তুই নির্ভয়ে নিয়ে আয়।

আমার বাড়ির লোকেরা তো ভীষণ আপত্তি করতে লাগল। ঐ দিবাকরের ব্যাপারে নাক ঢুকিও না বলছি, শেষটা তোমাকে পস্তাতে হবেই। তখন আমাদের টেন না।

আমার চিঠি পাবার দু'-একদিন বাদেই দিবাকর এসে হাজির। যেন একটু চিন্তিত মনে হল। বললাম, "এনেছিস?"

"কি এনেছি? কিছু আনবার কথা তো বলনি।"

"ন্যাকা। আরে সেই মিনুকে এনেছিস? ডিব্রুগড়ে একটা ভালো চাকরি খালি আছে।"

দিবাকর বলল, "তোমার কাছে দু'দিন রাখতে তোমার এতই অসুবিধা হয় যে, দিল্লী লাহোরের চাকরি খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে, তাহলে সে কথা স্পষ্টই বললে হয়।"

আমি তো অবাক। "সে কিরে! দিবাকর রেগে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে? তুই তাকে আন তো, তারপর যা হয়।"

দিবাকর চিন্তিতভাবে বাড়ি চলে গেল।

তারপর বহুদিন দিবাকরের দেখা নেই। একদিন সন্ধ্যেবেলা সেজমামীমা এসে কেঁদে বললেন, "দিবু আমার বাঁচবে না। খাওয়া-দাওয়া, সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ ভ্রূকুটি করে বসে থাকে। ঐ শঙ্করদের বাড়িতে মিনু বলে কাকে দেখে এসেছে। বেশ বাবা, সেখানেই বিয়ে হোক, ঘরে বৌ এলেই আমি খুশি। শঙ্করকে একবার জিজ্ঞাসা করিস মেয়েটার সাইজ কি রকমের। বালাটাকে আবার কেটে—"

বলতে বলতে শঙ্কর সশরীরে এসে উপস্থিত, "কি দিদি, কি খবর? আরে মাসিমা যে? দিবাকর কেমন আছে? এবার যে বাড়িতে রসুনচৌকি বসাবার দরকার হবে মনে হচ্ছে!"

দিবাকর নাকি তাকে লম্বা চিঠি লিখেছে, এখন সেজমামীমা মত করলেই হোল। মেয়ে খুব ভালো, চমৎকার পরিবার, মাসিমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে, এ কথা শঙ্কর জোর করে বলতে পারে।

সেজমামীমা চোখ মুছে একগাল হেসে বললে, "তাহলেই ভালো। দিবাকরের যে পছন্দ হোল এই আশ্চর্য।"

"আশ্চর্য? আশ্চর্য আবার কিসে? সাক্ষাৎ আমার আপন মাসির মেয়ে। শিখিয়ে-পড়িয়ে তাকে হাজারিবাগ নিয়ে যাওয়া। দিবাকরের পছন্দ হবে না, মানে? ওর বাবার পর্যন্ত—যাক্ গে মাসিমা, বালাটা কাটাতে হবে না, মেয়ে প্রমাণ সাইজের।"

মেঘনামতী

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো কালো ঢেউ। আকাশের মুখ কালো হলেই মেঘনার বুক টিপ টিপ করে। কেমন যেন থমথমে দেখায়। কালো মুখ ঝামটানো ঢেউ তুলে মেঘনার অথৈ জল তাতা থৈথৈ করে নেচে ওঠে।

আর আকাশ কালো হলেই, মেঘনার গায় রঙ ধরলেই একটি কালো মেয়ের চোখে স্বপ্ন নামে। বর্ষার স্বপ্ন। তার ঢেউ খেলানো চুলের ডগা যখন ভিজে হাওয়ায় দোলে যখন তার আঁচলের খুঁট দমকা হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়ায়, ঘন হয়ে আসে ভেতরটা, তখন ভারি ইচ্ছে জাগে মনে। স্বপ্ন আর ইচ্ছে।

বর্ষা নামলে পাড় ধসবে। পাড় ধসলে ঘর ভাঙ্গবে। নৌকো ডুববে। তবু বর্ষার 'কামনায়' মেঘনা গুমরোয়, পাড়ের কালো মেয়ে ছটফটিয়ে মরে। আর জমি? জমির বুক তেষ্টায় হা হা করে । বড্ডো তেষ্টা। বর্ষার তেষ্টা।

সারাটা গ্রীষ্ম আকাশ তবু রেগে টং হয়ে থাকে। তেষ্টা পাক। চেয়ে চেয়ে মরুক না সব। মরুক মেঘনা রাক্ষসী। আর মরুক মেঘনা পাড়ের কালো মেয়েটা।

আকাশে রী রী করে সূর্য। তবু মরে না কেউ। দগ্ধায় আর বর্ষার আশায় আশায় বেঁচে থাকে। মেঘনার বুক সূর্যের দাপটে ফ্যাকাশে দেখায়। গরম হাওয়ার ঝাপটায় ঝিরঝিরে ঢেউয়ের ওপর সাঁই সাঁই শব্দ। মেঘনা সহ্য করে। ভেতরটা শুধু গুমরোয়। বড়ো ইচ্ছে জাগে মেঘনার। স্বপ্ন আর ইচ্ছে।

'ম্যাঘ্। আরে, আরে, অসমান পানে চাইয়া দ্যাখ্। ম্যাঘ্ জমছে কালা কালা।'

ওসমান কথাগুলো বলার আগেই মেঘনা পাড়ের সব মানুষগুলো আকাশের দিকে না চেয়েই জেনে ফেলেছে যে মেঘ জমছে আকাশে।

বাঁশের লকড়ি দিয়ে কয়েকখানা ঘর বাঁধা আছে এলোমেলো। মেঘনার পাড়ের সব ঘরই রণ-পায়ে চড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মেঘনার ভয়ে। বর্ষার ভয়ে। তবু মেঘনাকে, বর্ষাকে তাদের না হলেই নয়।

এঘরে ওঠার মইটা বেয়ে তরতর করে নেমে এলো সেই কালো মেয়েটা। জেলেদের মেয়ে।

ওসমান উসখুস করে ওঠে—

'ম্যাঘ্ জমছে, দ্যাখ্ছস?'

কালো মেয়েটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তার নিঁখুত টানা নাকের ওপর সামান্য জোড়া ভুরুটা ধনুকের মত বাঁকালো মাত্র। তাপর মুখ ঘুরিয়ে মেঘনার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

মেঘ, মেঘ। মেঘের কোলে মেঘনা। মেঘনার কোলে কালো মেয়ে কাজলি। ওসমান পায় পায় এসে ডাকলো—'কাজলি!'

কাজলি উত্তর দিল না। সামনের মাঠ পেরিয়ে ওদিকটায় নমপাড়া। সেখানে একবার যেতে হবে কাজলিকে সব্জি কিনতে। তখন ও'পাড়ার মেয়েদের ডেকে আনবে একবার। ওরা দল বেঁধে সাঁতরাবে খেপা মেঘনার বুকে।

ওসমান আবার ডাকলো—'কাজলি!'

যেতে যেতে মুখ ঝামটা দিয়ে কাজলি বললো—'কি একশ'বার কাজলি ডাকস্?'

'তোরে সাদি করুম কাজল!'

'ফের! মোছ্লার পোলা—সখ দেইখ্যা বাচি না—।'

ওসমান হাসে—

'মোছলা মানুষ না?'

কাজলি ততক্ষণে মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলে গিয়েছে নমপাড়ায়। কাজলি চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত ওসমান কাজলির চলে যাওয়াটুকুকে নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকে বলে—"দুৎ তেলি নি্যকুচি করছে।"

ঘোর বর্ষা নামল মেঘনার বুকে। জেলেদের মুখে হাসি ধরে না। কিন্তু সে হাসি দেখবে কে?

সবাই যেন নিঃশ্বাস ফেলার সময়টুকু অপব্যয় করতে চায় না। মেঘনা কখন কোথায় পাড় ধসাবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। সব সময় একটা আতঙ্ক নিয়ে পাড় বাস করতে হয়। সতর্ক দৃষ্টি মেলে থাকে পাড়ের জমিনে। অন্ধকার হলেই অবশ্য রূপোলি ইলিশের লোভে যেখানে যত জেলে আছে লম্বা নৌকো আর জাল নিয়ে নদীর বুকে পাড়ি জমাবে।

সেদিন ভোরবেলা মাঠ পেরুতে গিয়ে কাজলি থমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মাটির দিকে খানিখক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কালো সুতোর মত সরু চিড় ধরেছে জমিয়ে। উবু হয়ে বসে পড়ে কাজলি মাটি পরখ করে সোজা গুমোট আকাশেব দিকে চেয়ে যেন কি শুঁকলো। তারপর ভূতে পাওয়ার মত ছুটলো পাড়ের দিকে।

ভাঙন! মাটির পৃথিবী গ্রাস করতে আসছে মেঘনা। যে সব স্থলচব তাব সব চাইতে নিকট, সেই জেলেদের রণ-পায় চড়া বাড়িগুলো আত্মসাৎ করতে আসছে। তাদের ঐ রূপসী মেঘনা।

খববটা ছড়াতে কযেক মিনিট সময়ও লাগলো না কাজলির। জেলেবা সবে ভিজে গা মাথা মুছে ঘবে যাবার কথা ভাবছে। অঢেল ইলিশ ধবেছে তারা। ওসমানেব তামাটে পেশিগুলো ভোরেব আলোয় ইলিশের গায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝমঝম করছে। কাজলির হাঁক শুনে তড়াক করে লাফিযে উঠলো সে।

এক মুহূর্ত নষ্ট করা যায় না। এমন শক্ত জমিন—তা দেখতেই শক্ত। ভেতরটা কুবে কুবে খেযে নিযেছে মেঘনায়। বর্ষায় তার খিদে বড়ো সাংঘাতিক আকার নেয়। কবে পাড় ধসবে তা যেমন কেউ বলতে পারে না, তেমনি একথাও কেউ জানে না কবে প্লাবন আসবে, কবে উপচে পড়ে নিজেকে নিজে ভাসিয়ে দেবে মেঘনা।

যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়বে পাড়টা। আর সঙ্গে সঙ্গে চুপিয়ে, নাইয়ে, ডুবিয়ে দেবে সব ক'টা বাড়ি, সব ক'টা মানুষ। পাড়ের যে অংশগুলো ধসে না, সে বছর রণ-পায় চড়া বাড়ির তলাগুলো জলে ডুবে যায়। নৌকোয় এ-বাড়ি ও-বাড়ি করতে করতে অনেকেই হাঁটতে ভুলে যেতে বসে।

ওসমানের মা হাঁড়িকুড়ি গুছোতে ব্যস্ত। তাব বাবা করিম বাঁশের ঘরের গাঁটে গাঁটে বাঁধা বাঁশগুলো তাড়াতাড়ি খুলতে শুরু করে দিয়েছে। হতের কাজ পুরোমাত্রায় চালু রেখেই এবাড়িব লোক অন্য বাড়ির সঙ্গে হেঁকে হেঁকে কথা বলছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা মস্ত মৌচাকে কে ঢিল মেরে সরে পড়েছে।

ওসমান বাড়ির আর একটা দিকে বসে বাঁশের বাঁধন খুলতে ব্যস্ত, কিছু ফেলে যাওয়া যাবে না।

কেননা ঠিক এমনি ঘর তাদের দু'-একদিনের মধ্যেই বানিয়ে ফেলতে হবে অন্য কোনো এক জায়গায়।

কাজলিদের ঘরে কাজলি একা মেয়ে। তার মা আর বাপের বয়েস নেহাৎ কম নয়। বুড়ো বয়েসের বহু সখের পালিতা মেয়ে কাজলি। লোকে বলে, 'হু, বাইগ্য কইর‍্যা আশ্‌ছিল বটে সনত জাউল্যা।' কেন না কাজলি একাধারে ছিল সনত জেলের ছেলে আর মেয়ে। তাই মাছ ধরা ছিপ্ নৌকোয় কাজলিকে দেখলে কেউ অবাক হত না। বাপের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে কাজলি 'জাউল্যা' বৃত্তিতে হাত পাকাতো।

আজও কাজলি তার বাপ-মার আগেই তরতর করে করে মই বেয়ে উঠে বিদ্যুৎ গতিতে পালাবার বন্দোবস্তর কাজে লেগে গেল। বুড়ো মাকে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করে দিল বাপ-বেটিতে। কাজলি সনতকে বললো—"বাবু তুমি মারে পৌছাইয়া দাও গিয়া। আমি বাঁশগুলা খুলি ততক্ষণ।"

ওসমানদের সমস্ত কাজ শেষ। এমনকি চিহ্নিত এলাকার বাইরে জিনিসপত্র পৌছান পর্যন্ত। কাজলির বাড়ির নিচে এসে একটু ইতস্তত করে সে সোজা উপরে উঠে গেল। কোনো কিছু না বলেই বাঁশ খোলার কাজে হাত লাগালো ওসমান।

হাতের কাজ না থামিয়ে কাজলি বললো, 'তোগো কাম শ্যাষ নাকি বে?'

'হ', ভারি তো কাম।'

'এইখান আইলি যে বড়?'

ওসমান হাসলো—

'কমু?'

'না না, আবার কতগুলা বাজে বকবি তো? দরকার নাই শুইন্যা।' কাজলি ব্যস্ত হয়ে নিচে নামতে গিয়ে পা হড়কে জিনিসপত্র সমেত পড়ে গেল মই থেকে।

'কি অইলো, কি অইলো' করে মুখ বাড়ালো ওসমান। তারপর আঘাত গুরুতর নয় দেখে হেসে উঠে বললো—

'আরে বাবা, বেশি দেমাক অইলে অমন অয় মান্‌ষের।'

দুপুর গড়িয়ে যাবার আগেই কাঠকুটোটি পর্যন্ত গুছিয়ে নিয়ে গাঁয়ের অনেক ভেতরে, চিহ্নিত এলাকার ভেতরকার জেলেরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেল। প্রায় বিশখানা ঘর খুলে গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে তাদের গোটা দিনটাও লাগলো না।

সরু সুতোর মতো লাইন কাটা ধ্বংস চিহ্নের এলাকার খানিকটা দূরে একটা মস্ত বটগাছ। গাছের গোড়াটায় একটা ছোট্ট মন্দির। একেবারে নতুন। গোপালের একটা বিগ্রহ ফুলে-চন্দনে সাজানো আছে মন্দিরটার মধ্যে। ছিমছাম পরিষ্কার মন্দিরটার চারধারের নিকোনো মাটি এখন ভিজে সপসপে হয়ে আছে।

সন্ধ্যের একটু আগেই কাজলি এসে বসলো মন্দিরের গা ঘেঁষা মোটা একটা শেকড়ের উপর। সবে ঘরে হারানো বাসিন্দাদের অনেকেই এসে জড় হলো গাছটার চারিধারে। দু'-একটা টুকরো টুকরো কথা। বেশিরভাগ চোখই মেঘনার জলে তাদের দৃষ্টি ডুবিয়ে বসে আছে।

বৃষ্টি পড়ছে না। কিন্তু বৃষ্টির আশঙ্কায় থমথমে হয়ে আছে গোটা আকাশটা। হাওয়া নেই।

গুমোটে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বিনা কারণেই মেঘনার গজরানি আছড়ানিতে পরিণত হচ্ছে। মেঘনা পাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে চায়। সেই চাওয়ার গতি কেটে দিয়েছে সে। নিস্তার নেই।

হঠাৎ গুমোটের বুক ফাটিয়ে কাজলি গান ধরলো। বোষ্টমীদের কাছে শেখা কীর্তন। এমন দরাজ গলা এ তল্লাটে আর কারও নেই। জেলেরা গর্ব করে। কাজলির গলার সঙ্গে পাল্লা দিতে নাকি পারে একা মেঘনা।

সনত জেলের বাঁজা বউ যে বছর কাজলিকে এমনি এক বর্ষার রাতে এ গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল সে সময়ের কথা অনেকরই মনে আছে। মেঘনার ওপারে নমপাড়ায় কোন এক বামুনের ছেলের কেলেঙ্কারীতে নাকি অল্পবয়সী একটি বউয়ের এই কালো মেয়ে জন্মেছিল। সনতের বউকে খবর দেওয়া ছিল আগে থেকে।

অন্ধকার বর্ষার সে রাতে বিপদ বুঝে মাঝি হেঁকে হেঁকে উঠেছিল—'আল্লা পার কর!' ছইয়ের মধ্যে বসে জেলে বউ বুকে আঁকড়ে ধরেছিল ছোট্ট মেয়েটাকে জলের ঝাপটা থেকে তার প্রাণটুকু আড়াল করে করে পারাপার হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। আদর করে মেয়ের নাম রেখেছিল—'কাজলি।'

লোকের কাছে জেলে বউ বলতো কাজলি তার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে—দেবতায় দিয়েছে। ভগবান তার দেহে ফল দেয়নি তাই পথের ফল কুড়িয়ে নেবার অধিকার দিয়েছেন তাকে। কাজলি যদি ছেলে হতো তবে, সনত বলে, সে তার নাম রাখতো—কেষ্ট। কেননা এমন দুর্যোগের রাতে নতুন মা-বাপের কোলে আসা গত জন্মের পুণ্যি ছাড়া আর কি?

শুনে লোকে হাসতো। এসব কথা চাপা থাকে না। চেপে রাখা যায় না। তারা বলতো, বামুনদের রক্ত আছে বলেই কি আর কাজলিকে কেষ্ট ঠাকুরের বংশধর বলা চলে?

কাজলি বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তার জন্ম রহস্যের কথা। কিন্তু সনত জেলে ভোলেনি। যেদিন কাজলিকে এক গণক ঠাকুর বললো যে এ মেয়ের কপালে বামুনের মেয়ের ভাগ্য লেখা আছে সেইদিন থেকে সনত জেলে মনে মনে মেয়েকে সমাজে সবার উপরে ঠেলে দেবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে পড়লো।

বোষ্টমীদের কাছে কাজলি নিজের তাগিদেই কখানা গান শিখেছিল। ওর বাবা বলে বেড়াতে লাগলো—'মাইয়ার আমার বড় ভগবৎ ভাবনা। ওর পুজায় মন দেখলে চোখে জল আসে হরদম।'

লোকে গান শুনলো—সত্যিই আশ্চর্য গলা কাজলির। যদিও ছেলেছোকরারা কাজলির বাপের আশার কথা সম্পর্কে আলোচনা করে হাসতো তবু তাদেরই আবার দেখা যেতো শ্রোতার ভীড় বাড়াতে। বুড়োরা এবার কানাকানি করতে লাগলো। মাথা নেড়ে নেড়ে বলাবলি করলো—

'বলি নাই! সনত জাউল্যা কপাল কইর‍্যা আইছিল বটে!'

একটা পোড়ো মন্দির ছিল গাঁয়ে। একদিন সাহস করে সনত জেলে সেই মন্দিরে কাজলিকে দিয়ে পুজো করানোর প্রস্তাব তোলাল। ইতিমধ্যে কেবল এ গাঁয়ের লোক নয়, দূর দূর গাঁয়ের লোকেরা পর্যন্ত কাজলির গলায় নামকীর্তন শুনে ধন্য ধন্য করে গেছে।

প্রস্তাব শুনে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠলো—'জীবব্যা কাইট্যা দিমু না ছেমড়ির।'

এবার কাজলির পেছনে গুনগুন করে উঠলো হিন্দু আর মুসলমান গ্রামবাসীরা গলা—

'জ্যাউল্যা মাইয়া মানুষ না! ভগবান ওর গলা দিছে ক্যান্ যদি পূজা করতে দিবার না থাকবে ভগবানের? আর ও হগল মন্দিরের কত যত্ন তা তো দেখত্যাছি। বিগ্রহ পর্যন্ত নাই। ঠাকুর আইলে এখনে যামু আমরা তার কাছে। দেখি ঠাকুর কি কয়।'

গাঁয়ের মাথারা বুঝে উঠলো—

'বেশ, ঠাকুর এবার মেলায় আইলে দীক্ষার লেইগ্যা পাঠাইস্ গিয়া তোগের ঐ মাইয়ারে।'

মেলায় ঠাকুর এলেন। লোকে লোকারণ্য। দীক্ষার আশায় আকুল বহু ভক্তের ভীড়ের মধ্যে সৌম্য প্রশান্ত মুখে ঠাকুর বসে আছেন। নদীয়া জেলার কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মেও এই মহাপুরুষ যে এভাবে গেরুয়া পরেছেন, তা নাকি শুধু বিস্ময়ের নয়, ভক্তির বিষয়।

কাজলিকে ধরে নিয়ে ঠাকুরের সামনে দাঁড় করালো তার মা—'দীক্ষা দাও ঠাকুর।'

অনেক গণ্যমান্য ধনী-অধনীর মাঝখানে এই অপরূপ মেয়েটিকে চোখ ভরে দেখলেন ব্রহ্মচারী।

জিজ্ঞেস করলেন—'গান জান?'

'জানি।'

'গাও তো একটা গান।'

কি জানি কি হয়েছিল সেদিন কাজলির। ভাবে ডুবে এলো তার কালো চোখ। গানে প্রাণের সমস্ত সুর ঢেলে দিয়ে গেয়ে উঠলো—

'গৌর রূপ দেইখ্যা হইয়াছি পাগল, ঔষধে আর মানে না, চল সজনী যাইলো নদীয়ায়।'

শুধু ঠাকুরের চোখে নয়, অনেক গণ্যমান্য ধনীর চোখেও সেদিন কাজলি কী এক মোহ বিস্তার করে দিয়েছিল। গান শেষ হলে ঠাকুর উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেছিলেন—

'এ যে দেবশিশুর কণ্ঠস্বর।'

কাজলি দীক্ষা পেয়েছিল। কেউ আপত্তি তুলতে পারেনি। কিন্তু ঠাকুর যখন খুব কম লোককেই দীক্ষা দিয়ে সেবার তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। কুৎসা রটে গেল কাজলির নামে। অনেকে এমনকি জেলেদের অনুরোধ করলো সনতদের একঘরে করবার জন্যে।

মন্দিরের দরজা তেমনি বন্ধ রইলো। কিন্তু জেদ চেপে গিয়েছিল জেলেদের মনে। ওরা বটগাছের গোড়ায় নিজেদের মন্দির গড়ে তুললো। সনত জেলে টাকা দিল অনেক। কাজলি হল সেবায়েৎ।

দীক্ষা নেবার আগে কাজলির চোখে-মুখে যে ভগবৎ ভাব ফুটে উঠতো, দীক্ষা পাবার পরে সে মুখে ক্রমশ একটা অন্যমনস্ক ভাব ফুটে উঠলো। নতুন মন্দিরে পুজো করতে গোড়ায় গোড়ায় ভালই লাগতো। কিন্তু কাজ ফেলে, মেঘনা ফেলে, ছোট্ট একটা পুতুলের মত এতটুকু গোপাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভালো লাগে না আর কাজলির।

প্রায়ই পূজোর ফাঁকে ফাঁকে মেঘনার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। আগের মত গলায় যখন তখন গানও আসতে চায় না। তবু লোকে চাইলে গাইতে হয় সন্ধ্যেবেলা। অন্যমনস্ক কাজলি গায় আর উসখুস করে—তার বাবা তৈরি হলেই ও ছুটবে মেঘনার মাছ ধরতে।

আজকাল বাবা একটু একটু আপত্তি তোলে। কিন্তু কাজলি শুনতে চায় না। লাফিয়ে পড়ে নৌকোয়।

আর মেঘ ডাকলে কাজলিরও ভেতরটা ডেকে ওঠে। গলা খুসখুস করে।

- গাছের গুঁড়িতে আর খানিকটা দূরে বসে ওসমান সেদিন ডাকলো—

'আর একখানা কেত্তন গা না কাজলি।'

'মরি আর কি?'

'ক্যান্ আমি কইলেই বুঝি মরণ অয়?'

'সর্ সর্—মোছলার পোনা মন্দির ছুঁইয়া বস্‌ছস্ ক্যান রে?'

'তুই কোন বায়ন আইলি রে—।'

'ওসমান ভাগ এইখান থিক্যা।'

কাজলি একটা শুকনো ফুলের মালা ছুঁড়ে মারলো ওসমানকে। মালাটা ওসমান তুলে নিতেই কাজলি চাপা গলায় বললো—'হায় গোপাল, একি করলাম আমি?'

ওসমান ফিসফিস করে বললো—'কাজলি তুই মরছস, এক্কারে মরছস। মোছলার পোলার গলায় গোপাল ঠাকুরের মালা দিলি?'

'দিই নাই অসইভ্য।'

'তোরে বিয়া করুম কাজল।'

'চুপ যা। চেচামু ওসমান।'

'কিন্তু বিয়া আমি তোরে করুমই।'

'মইর‍্যা গেলেও আমি করুম না!'

'দেখা যাউক।'

রাত ঘন হয়ে এলো। মেঘনা যেন কলকল করে কথা বলছে অনর্গল। ওসমান চুপ করে গিয়েছে। খানিকক্ষণ উসখুস করে কাজলি গেয়ে উঠলো, 'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।'

কালো কালো মূর্তিগুলো অন্ধকারে নড়ে চড়ে সরে এলো কাজলির আরও কাছে। মুহূর্ত, মিনিট, ঘণ্টা কাটলো। কাজলির গলা যেন মেঘনার সঙ্গে সঙ্গতে বসে গিয়েছে। সে গায়। ওরা বসে বসে শোনে। সাঁ সাঁ হাওয়ায় মেঘনা দোলে! কড়াৎ করে মেঘ ডেকে উঠে চারিদিক এক মুহূর্তের আলোয় কানা করে দিয়ে দপ্ করে নিভে যায়।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি বেড়ে ফোঁটায় পরিণত হলো। যখন গা মাথা সব ভিজে সপসপে হয়ে গেল তখন 'গুলো একে একে উঠে দাঁড়ায়। কে যেন বলে 'চল ঘর যাই হক্কলে।' ভুলে যায় যে আজ যাবার মত ঘর নেই কারু।

হঠাৎ গুমগুম করে ওঠে পৃথিবী। পায়ের তলা নড়ে ওঠে। কালো মূর্তিগুলো ছিটকে সরে দাঁড়ায়। ভাঙন শুরু হয়েছে। অন্ধকার। তবু স্পষ্ট দেখা যায় মেঘনা ভয়ঙ্কর গর্জন করে উন্মত্ত আবেগে চিহ্নিত এলাকার মাথা থাবড়ে, ধসিয়ে, ডুবিয়ে দিয়ে নেচে উঠলো।

থৈ থৈ জল। বট গাছ থেকে কয়েক হাত দূরে থৈ থৈ করে উঠলো মেঘনার জল। প্রত্যেক বছর এই দৃশ্য প্রতিবার তার নির্মম মূর্তি নিয়ে আসে। প্রতিবার মানুষ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে নেশা লেগে যায় ওসমানের। কানের কাছে মুখ এনে বলে—

'সাদি করুম কাজলি।'

কাজলি কিছু বলে না। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জলের দিকে। নেশা লেগেছে কাজলির। হাত নিসপিস করছে তার।

জেলেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। জলের হুংকারের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ওরা উঁচু গলায় কথা কয়—

'জাল ফালাইতে চল্ গা।'

'ইলশ্যা আইজ খুব সরেশ অইবো।'

'হ হ জাল ফালাইতে জান্ নিক্‌লাইয়া যাইব না।'

হাতে হাতে নৌকা এলো। লম্বা ছিপনৌকোর মত হাল্কা। সরু সূক্ষ্ম জালে এরা বর্ষার সরেশ ইলিশ ধরে আনবে পাগলি মেঘনার বুক থেকে। এইমাত্র মেঘনা হাতেনাতে তার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছে। রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছে সে। জান প্রাণ এক এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে পারে ঐ রাক্ষুসী। বড় ভয় লাগে। যখন মেঘনা ক্ষেপে যায়। জ্ঞান থাকে না, প্রাণগুলো ধুকপুক করে আতঙ্কে। মাঝি হাঁকে— 'আল্লা পার কর!' জেলে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মুহূর্ত মুহূর্ত কেটে যায়।

তারপর জাল ওঠে হাতে হাতে।

'হালির অহঙ্কার দ্যাখলে গা জ্বইল্যা যায়!'

সরু লম্বা নৌকোগুলোর গা ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা মেঘনার বুকে। মোচার খোলার মত ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ওরা পৌঁছে যায় মাঝ দরিয়ায়।

ওসমানের চাচা হালিমের পাশের নৌকাখানায় বসেছিল কাজলির বাপ—সনত জেলে। গাদা করা জালের উপর বসে ইলিশ মাছ ধরার কালো কালো আশঙ্কায় বুক ঢিপঢিপ করে—জালে উঠবে কি ওরা?

জাল টেনে তোলে পাড়ে। একরাশ ইলিশ মাছের মাঝখানে অচেতন কাজলিকে জলকন্যার মত দেখায়। সম্পূর্ণ নগ্ন কাজলিকে গামছা ঢাকা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা শুরু করে দেয়।

জালের গায় গায় ভেসে ওঠে ওসমান। মেঘনার জলে এই অন্ধকারেও তার কালো পেশী ঝকঝক করে ওঠে। তার চাচা হালিম দেখতে পেয়ে টেনে তোলে তাকে— 'ওসমান!'

নৌকায় উঠে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে বসে পড়ে। হালিম সস্নেহে কি রকম গলায় বলে, 'এ হগল পাগলামি বলে না।'

ওসমানের কোমরে কাজলির পরনের কাপড়খানা বাঁধা ছিল। জলের নিচে বার বার ডুব দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে কাপড়খানা পেয়ে ওসমান বুঝেছিল কাজলি বেশি দূরে নয়। ঠিক সেই সময় জাল টানা শুরু হয়। জালের সঙ্গে সঙ্গে ওসমান ভেসে ওঠে। যদি কাজলিকে জালে না পাওয়া যেত, অবার ঝাঁপ দিতে হতো ওকে।

ডাঙায় গাছতলায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে কাজলিকে। একটু পরেই ভোর হবে। জেলেদের আর সময় নেই। বৃষ্টি থেমে এসেছে। ধরাধরি করে কাজলিকে ডাঙা মন্দিরের দাওয়ায় শুইয়ে দিয়ে গেল ওরা। কাজলির সবে জ্ঞান ফেরা চোখে তখনও ঘোর লেগে। যাবার সময় সনৎ জেলে বলে গেল—'তুই শুইয়া থাক কাজল—আমি আইলাম বইল্যা।'

সামনের মাঠে টাঁই করা আছে কাজলির সঙ্গে ওঠা ইলিশগুলো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। ফরসা হয়ে আসছে চার ধার।

এক পা দু'পা করে উঠে এলো ওসমান। ফ্যাকাশে আলোয় সামান্য একটা পাৎলা গামছায় ঢাকা কাজলির দিকে চেয়ে রইল ওসমান। পাহারায় আর প্রতীক্ষায়।

'কাজলি!'

'কি?' সলজ্জ কাজলি ম্লান হাসলো।

'সাদি দিয়া দিল ম্যাঘনায়।'

'ইস!'

'এই তর শাড়ি। এবার লাফ দিলে আমারে ঐ কাপড়ের কোণায বাইন্দ্যা লইয়া যাওন চাই। ওইটা তো আমাগো গাইট ছড়া—না?'

'তুই মোছলা না? বায়নরা এ মন্দিরে আমারে উঠতে দেয় নাই। আর তুই বেশ বইস্যা আছস তো? বয় ডর নাই দেখি প্রাণে।'

'না আমার বয় ডর নাই। কিসের ডর দেখাস্ রে—ওস্মানরে।'

'হ' হ'।'

'মেঘনা তো বায়ণ মোছলমান মানে না। সাদি দিয়া দিছে ম্যাগনায়।'

'আমার গোপাল ঠাকুর?'

'শুনস্ না? মন্তর পড়ত্যাছে গোপাল ঠাকুর?'

কাজলি হাসে। গামছায় ঢাকা নিজের শরীরটার দিকে চেয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে—

'কাপড়টা দিবি?'

ওসমান এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। বলে—

—'বড় ভিজা যে।'

তবু চেয়ে নিয়ে শরীরে জড়িয়ে যেন শাড়িটা। ভিজে চপচপে শাড়িখানা গায়ে লেপটে লেপটে যায়।

'ওসমান!'

'কি রে বউ?'

'বড় ভাল লাগত্যাছে।'

ভোর হয়ে এলো। শীত শীত হাওয়া সকালের সঙ্কেত দিচ্ছে। গায় কাঁটা দিয়ে উঠলো কাজলির। গা শিরশির করছে ওসমানের।

'ওসমান!'

'আয়।'

'ওসমান!'

'কাজল!'

মেঘনার কালো বুকে আশ্চর্য এক শান্ত সকালের প্রথম আলো ফুটি ফুটি করে শেষে ফুটে উঠেছে। পূবের মেঘ না সরলেও স্নিগ্ধ সকালের মুখ দেখে ছলছলিয়ে উঠলো মেঘনা।

থৈ থৈ করছে মেঘনার বুক। কূল ছাপিয়ে উঠছে মেঘনার।

পাতাল প্রবেশ

আশাপূর্ণা দেবী

মেজ জ্যেঠির পিছনদিকে দালানের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঘলা দিনেও ঘামতে থাকে আরতি, 'মেজজ্যেঠি' শব্দটাকে কিছুতেই উচ্চারণ করে উঠতে পারে না।

অথচ মেজগিন্নী যেভাবে নিবিষ্টচিত্তে হেঁটমুণ্ডে শাকের কাঁড়ি নিয়ে বাছতে বসেছেন, সহসা যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনপানে তাকাবেন এ ভরসাও কম।

কী বিরক্তিকর কাজেই মা পাঠান আরতিকে।

কিছুতে নিজে আসবেন না! 'যা শত্রু পরে পরে'।

আরতি যে এই একই কারণে বারবার এখানে এসে দাঁড়াতে, 'মেজজ্যেঠি' বলে ডাকতে, মাথাটা কাটা যায় সে খেয়াল নেই।

ভারী নিষ্ঠুর মা আরতির।

মায়ের এই নিষ্ঠুরতায় ক্ষুব্ধ আরতির রাগটা আরো বেড়ে গিয়ে পড়ে বাপের ওপর। কী দরকার তাঁর মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে উদয় হবার? বারোমাস যেখানে থাকেন, জন্মের শোধ থাকুনগে না সেখানে। না এলে সাত জন্মেও বাপের জন্য মন কেমন করবে না আরতির। বাপ তো নয়, খাবার কুটুম।

আরতিদের যে কীভাবে দিন চলে কোনোকালেও তার খোঁজ নেবেন না, থেকে থেকে আসবেন খালি রাজভোগ খেতে। আর মাও তেমনি, জ্ঞাতিগুষ্টি পাড়াপড়শীর কাছে ভিক্ষে করে জোগাবেন সেই ভোগটি।

আরতির হাতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকলে দেখা যেতো—বিনা নোটিশে যখন-তখন 'দুম' করে নিরভিভাবক দুটো স্ত্রীলোকের সংসারে এসে পড়ে রাত্রে 'গরম লুচি' আর ভাতের পাতে 'সরের ঘি' খাবার বায়না করার ফলটা কি! কিন্তু তা তো হবে না। আরতির মা যে আদর্শ হিন্দু ললনা, পতিব্রতা, সতী।

মায়ের ওপর, বাপের ওপর, মেজ জ্যেঠির ওপর, বোধ করি সমস্ত জগৎ সংসারের ওপরেই তিক্ত বিরক্ত ধরে যায়— ষোলটি বসন্তে গড়া এই নবযৌবনা মেয়েটির।

কিন্তু তাই বা বলি কি করে? 'বসন্ত' আবার কোথায়? বসন্ত অতো সস্তা নয়।

যে মেয়ের সকাল থেকে দুপুরবেলায় ভাত খাওয়ার আগে পর্যন্ত শুধু 'খাবার জল' ছাড়া আর কোনো 'জলখাবার' জোটে না, ভাতের উপকরণ বলতে পড়শীর বাগানের কচু কুমড়োই যার একমাত্র ভরসা, আবার পরম পদার্থের মতো সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা সেই কুমড়ো কচুর একাংশ দিয়েই যাকে রাত্রের আহার সমাধা করতে হয় দু'খানা আটার রুটির সাহায্যে, তার কাছে আবার 'বসন্ত' উঁকি দেবে কোন লজ্জায়?

দুটো মাত্র শাড়ী-জামা দু'বেলা ব্যবহার করেও দু'বছর চালিয়ে দেবার রহস্যময় কৌশল যাকে আয়ত্ত করতে হয়, তার বয়েসটা কি ষোলোর মাধুর্য নিয়ে দেখা দিতে পায় কোনদিন? ছেঁচল্লিশ বছর

বয়েসটা কেন জীবনের সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে জেঁকে এসে বসে ষোলর ঘাড়ের ওপর। ঠোঁটের কোণায়, চোখের তারায় থাকে সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

ষোল বছর বয়েস যদি সত্যিই এসে থাকে আরতির, সেটা তার মায়ের ভাবনা বাড়াতে নয়, বিরক্তি বাড়াতে। 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে' এমন অসম্ভব কথা মনের কোণেও ঠাঁই পায় না আরতির মার। তিনি শুধু এই ভেবে বিরক্তি হন যে, যে মেয়ে কিছুদিন আগে অপ্রতিবাদে মায়ের হুকুম তামিল করেছে, সে যদি এখন আদেশের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতে চায়, 'পারবো না' বলে চুপ করে বসে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে তাঁর?

এই আজই তো পড়শীর বাড়ি ধার চাইতে যেতে নিতান্ত অনিচ্ছুক মেয়েকে হুকুমের বদলে মিনতিই করতে হলো। অবিশ্যি তাতেই জিত হয়ে গেছে তাঁর। আদেশের চাইতে মিনতি বড়ো। সে অলঙ্ঘ্য।

তাই না আরতি পূর্বেকার অপমান ভুলে আবার এসে দাঁড়িয়েছে জ্ঞাতি জ্যেঠির কাছে ধার চাইতে—যে ধার কোনোদিনই শোধ করতে পারবে না নিশ্চিত জানা। বহুবারই যে রকম ধার 'অশোধ্য' হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ ঘেমে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে আরতি একবার নকল কাশি কেশে জ্যেঠির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, ফল হয় না।

কে জানে মেজগিন্নীর এই অন্যমনস্কতাটা 'ভান' নাকি। বিরক্তির একটা বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছে দেখেও দেখতে না পাওয়া। নইলে রাঙা নোটেশাকের মধ্যে এমনকি দ্রষ্টব্য থাকতে পারে যে দৃষ্টিটা আর তার থেকে নড়তে চায় না মেজগিন্নীর?

—মেজ জ্যেঠিমা!

অস্ফুট এই উচ্চারণটুকুর কার্যকারিতাও বোঝা যায় না। কে জানে হতাশ হয়ে ফিরে যেতো কিনা আরতির? হঠাৎ একটা আকস্মিক ঘটনায় বাধ্য হয়ে মুখ ফেরাতে হলো মেজগিন্নীকে। আর দরজায় জায়গা দিতে দালানের মধ্যে ঢুকে পড়তে হলো আরতিকে।

দরজা খালি পেয়ে হুড়মুড় করে যে ব্যক্তিটি দালানে ঢুকে পড়লো তার এক হাতে একটা মাছধরা ছিপ, আর অপর হাতে সেই ছিপে ধরা দুটো মৃগেল মাছ। সের তিনেক করে হবে।

—পিসিমা, দেখো সক্কালবেলাই কি রকম শিকার! সাতদিনে তোমার পুকুরের সব মাছ শেষ করে দিয়ে যাবো। 'পিসিমা' একবার আড়চক্ষে নিজের দেবর কন্যাকে দেখে নিয়ে ভাইপোকে উদ্দেশ্য করে বলেন—তোর পিসেমশাইয়ের কি একটা মোটে পুকুর নাকি রে রণু? দুটো চারামাছ তুলে তো ভারী বাহাদুরি দেখাচ্ছিস!

—'চারা' থেকে মহীরুহ।....কি আরতি যে? কি খবর? ভালো আছো তো? খুব যে বড়ো হয়ে গেছো! বলাই বাহুল্য আরতি একটু জড়সড় হয় মাত্র, উত্তর দেয় না। মেজগিন্নী বিরক্তভাবে বলেন—তুই এখন বাড়ি যা আরতি, আমি ব্যস্ত আছি রণু এসেছে—

আরতি কিছু বলবার আগেই রণু হৈ হৈ করে ওঠে—আরে কি মুশকিল! আমার নামে বদনাম কেন বাপু! আমি আবার তোমাকে কি ব্যস্ত করছি?....না না, আরতি তুমিই বরং যতো ইচ্ছে ব্যস্ত করো তোমার জ্যেঠিমাকে, তোমার হলো গিয়ে পাকা চাকরি।....তারপর তোমার মা ভালো আছেন তো?

আরতি মনে মনে জ্যেঠির অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি অনুমান করে কোনোমতে একবার ঘাড় নাড়ে। রণু অথবা রণজিত হাতের মাছটাকে দোলাতে দোলাতে বলে—এদের কোথায় রাখবে পিসিমা?

ছোট বৌ আছে রান্নাঘরে, দিগে যা তার কাছে। যাচ্ছি আমি।

রণু চলে যেতেই মেজগিন্নী চোখের অগ্নিজ্বালা কণ্ঠে আমদানী করে আরতিকে প্রায় মরমে মেরে বলেন—কী! তোর বাপ এসেছে বুঝি?

আরতি অবশ্য নীরব।

টাকা হবে না! বল গে যা তোর মাকে।

তথাপি স্থানুর মতোই দাঁড়িয়ে থাকে আরতি। মা বলে দিয়েছে 'টাকা যদি না দেয়, একটু সরেব ঘি আর গোটাকতক নৈনিতাল আলু চেয়ে আনবি। ওতো আব কিনতে হয় না মেজদির।'

বদ্যিবাটিতে মেজগিন্নীর বাপের বাড়ি, বাপ আলুর ব্যবসাদার, প্রায়ই মেয়েকে পাঠান বস্তাবন্দী আলু।....কিন্তু সে আলু যে মেজগিন্নীর অখেদ্যে অবধ্যে জ্ঞাতি দ্যাওরের ভোগে লাগবে, এমন কথা তো ছিলো না। 'সরের ঘি'টা অবশ্য মেজগিন্নীর নিজের কৃতিত্ব।

—ফের দাঁড়িয়ে রইলি যে বললাম না, টাকা হবে না?

আরতি প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ওঠে—টাকা নয়, মা বললে—একটু সরের ঘি আর আলু—

'দূত— অবধ্য' এ নীতি গ্রাহ্য করেন না মেজগিন্নী।

বূঢ় দৃষ্টিতে একবার মেয়েটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে কটুকণ্ঠে বলেন—-তোর মাকে পতিভক্তিটা একটু কমাতে বলগে যা আরতি। পরের ঘাড় দিয়ে বারোমাস চলে না। আমার ঘরে সবাইয়ের পাতে সবের ঘি কুলোতে পারিনে, নিত্যি যাবো দাতব্য করতে। বল গে যা, নেই। খেতে ভাত জোটে না—ঘি খাবার বায়না।'

আরতি যে চলে যাবে সে অবস্থাও যেন থাকে না তার, লজ্জায় ঘৃণায় চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে, চারদিক ঝাপসা হয়ে আসে। কী অপমান। কী অপমান! কী অপমান!....যতদিন বয়েস কম ছিলো, লজ্জা হতো, দুঃখে চোখে জল আসতো, এমন দাহ হতো না। সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে উঠতো না একটা দুঃসহ জ্বালায়।

আর ঠিক এই সময় চটিজুতোর শব্দ করতে করতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন মেজকর্তা।

—কী? হচ্ছে কি এখানে? ওদিকে মাছফাচগুলো কোটা হয়ে যাচ্ছে। আমি চারটি টাকা মৌরলা আনলাম, শশী তো সকালেই এনে ফেলেছে সেরটাক 'পোনা', আবার রণু—

কর্তার কথায় বাধা দিয়ে গিন্নী বলেন—তা যাক না আমার সংসার ভেসে, তোমার জ্ঞাতিগুষ্টির মন রাখাটাই হচ্ছে প্রধান কাজ।

—হলো কি?

—না, হয়নি কিছু। ছোটকর্তা অনুগ্রহ করে বাড়ি এসেছেন, কাজেই ছোটগিন্নীর অর্ডার এসেছে আলু আর গব্য ঘৃতের। দুটো টাকা হলে আরো ভালো।

—টাকা হবে না! টাকা কোথায়! আলুফালু থাকে তো--দিয়ে দাওগে গোটাকতক। ভায়ার আমার রোজগারের মুরোদ নেই, কিন্তু মুখটি আছে নবাবী।. বারোমাস ছোঁড়া থাকে যে কোথায়—

শেষ কথাটা চটিজুতোর শব্দে বিলীন হয়ে যায়।

মেজগিন্নী বিরক্তিচিত্তে ভাঁড়ারের দিকে অগ্রসর হন। বোধকরি ভাবতে ভাবতে যান, ছোট পাথরবাটিগুলো তেমন ছোট আর কই! চামচে দুই ঘি দেওয়া যায় এমন বাটি থাকলে ভালো হতো। বড়ো বাটিতে যৎকিঞ্চিৎ জিনিস বড্ডো যেন বিশ্রী দেখতে লাগে। প্রার্থীর চাইতে দাতার নির্লজ্জতাটাই প্রকট হয়ে ওঠে তাতে।

অন্যদিন হলে হয়তো আরতি দাঁড়িয়েই থাকতো, চলে যাবার সাহস হতো না। কারণ জানে

মেজজ্যেঠি দেবেনই। না নিয়ে যাওয়ার দুঃসহ স্পর্ধা তাঁকে যা অপদস্থ করবে তার কাছে আরতির অপমান কিছুই না। আরতি কে? আরতি আবার একটা মানুষ নাকি?

আজ কিন্তু হঠাৎ ছুটে পালিয়ে যায় সে। 'গোটাকতক' আলুর আশায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না কিছুতেই। কে জানে, হয়তো রণুর উপস্থিতিটা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

এর আগে যখন এসেছিলো রণু, তখন আরতি বছর বারোর। নিতান্ত ছেলেমানুষ-বোধে প্রায় ত্রিশোত্তীর্ণ রণজিৎ তাকে পিঠ চাপড়াচ্ছে, মাছ ধরার খিদমদগারী করিয়েছে, প্রশংসা করেছে। মাত্র এই।

তবু সেই স্মৃতিটুকুই আরতির কাছে মূল্যবান।

ডেকে কথাই বা কে কয় তাকে?

হয়তো লোকে ভাবে কথা কইলেই পাছে কিছু চেয়ে বসে।

আরতির মা সকলের কাছে সব কিছু চেয়ে চেয়ে নিজেদের মানমর্যাদা বলে তো রাখেনি কিছু।

বাড়ি ঢুকেই ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ে আরতি, ছেঁড়া শতরঞ্চি পাতা চৌকিটার ওপর।

এ দৃশ্য মায়ের চোখে পড়তে দেরী হয় না, কারণ মেয়ের প্রত্যাশায় হাঁ করে ছিলেন তিনি। এসে বলেন—কি হলো? দিলেন না বুঝি?

আরতি উঠে বসে।

পাশের ঘরে বাপের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে—না না! রোজ রোজ কেন দেবে লোকে তোমাদের? লজ্জা করে না তোমাদের বারোমাস ভিক্ষে করতে? রোজগার করবার যার ক্ষমতা নেই, তার আবার ঘি আলু ভাতে খাবার শখ কিসের? বলে দাওগে বাবাকে যখন-তখন এসে আর আমাদের মাথা কিনতে হবে না তাঁকে—

—ওরে সর্বনাশী, চুপ কর—ব্যাকুল হয়ে ওঠেন মা—শুনতে পাবেন যে!

—পান না, ভালোই তো। অতো 'চুপ চুপ' কিসের? কি এমন ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করছেন আমাদের? মামাদের দেওয়া ওই ক'টা টাকার ভরসায় ফেলে রেখেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কোনদিন আমরা কি খাই পরি? কুটুমের মতন এসেই বাড়া ভাতটি পাবেন এতো আশা কেন? অমন লোকের গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত।

থর থর করে কেঁপে আবার শুয়ে পড়ে আরতি।

কাঁপেন আরতির মাও।

রুষ্টস্বরে বলেন—কী বললি লক্ষ্মীছাড়ি? মেয়ে হয়ে তুই বাপের মরণ বাক্যি মুখে আনলি? পয়সা আনতে পারে না বলে সে বাপ বাপই নয় কেমন? সময়ে-অসময়ে আপনার লোকের কাছে হাত কে না পাতে? তাতেই তোমার মাথা কাটা যায়?

—হ্যাঁ যায়!....আরতি ক্ষণপূর্বক অসতর্ক উক্তির লজ্জা ভুলে আবার চেঁচিয়ে ওঠে—আমি আর ওঁর জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে যেতে পারব না, পারবো না। হলো? তোমাকেও ধন্যবাদ মা, এখনো তুমি বাবার মুখ দেখো।

আরতির মা স্তম্ভিত বিস্ময়ে মিনিটখানেক নীরব হয়ে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—বেশ! ভাতের হাঁড়িটা নামিয়েছি, সেই ক'টা সামনে ঢেলে দিয়ে বলিগে, এস পিণ্ডি গেলো, গিলে নিয়ে দড়ি একগাছাও যদি না জোটে কোঁচার খুঁট গলায় জড়িয়ে আড়ায় বেঁধে ঝোলো গে! তোমার মেয়ের নিচু মাথাটা উঁচু

হোক।....কতো দুঃখেই যে বাড়িতে মুখ দেখায় না মানুষটা, সে আর কে বুঝবে! বেশ মরুক, মরুক। মরাই ভালো ওঁর।

কিন্তু কই, এহেন বাক্যবাণেও আজ আর আরতিকে অপ্রতিভ করা যায় নাই? মায়ের গমন পথের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকে সে। না, কাবুর ওপর কোনো মমত্বই আর নেই তার। সব স্বার্থপর। মা'তার কেউ নয়—

এর পরই পাশের ঘরের মায়ের গলা শুনতে পায়। তর্জন-গর্জন, খেদ, ধিক্কার, নানা সুরের খেলা। বোঝা যায় না উপলক্ষটা কে! মেয়ে, না তার বাপ!

এর পরই একটা ক্রুদ্ধ অথচ ব্যাকুল আবেদনের বাণী—'যেওনা বলছি—মুখের ভাত ফেলে! মাথা খাও আমার। তবু যাচ্ছো? বেশ যাও। একটা মানুষ ডোববার মতো জল এখনো দীঘিতে আছে। মুখের ভাত ফেলে চলে গেলে কি করি দেখো।

—'মরবে এই তো?' আরতির বাপের গলা ক্ষুব্ধরুষ্ট, শ্লেষাত্মক— 'মরেই তো আছো। যার স্বামী এমন হাভাতে হতচ্ছাড়া, মেয়ে অতো বড়ো বিদুষী, তার আবার মরতে বাকী কি? আমার এই শেষ। আর আসবো না। মনে কোরো তুমি বিধবা হয়েছো। কে ওখানে?'

'আজ্ঞে আমি, ছোটকাকাবাবু'।....মাথায় আধঘোমটা টেনে এগিয়ে আসে মেজগিন্নীর ঝি শশী। একটা চুপড়িতে গোটাকতক বড়ো বড়ো আলু, ছোট একটা পাথরবাটিতে একটু ঘি, আর পাতায় মোড়া খানচারেক কোটা মাছের টুকরো দাওয়ায় নামিয়ে দিয়ে মধুবর্ষী কণ্ঠে বলে —'মা পাঠিয়ে দিলেন।' দিদিমণি যখন গেছলেন—মায়ের হাতজোড়া ছিলো, একটুক্ষণ দেরী হয়েছিলো, তা দিদিমিণির তো দেরী সইলনি। চলে এলেন 'ঠর ঠর' করে! মা বলে দিলেন যদি সময় হয় দিদিমণিকে একবার একটা বাটি হাতে করে যেতে, মাছের তেলকাঁটা দিয়ে ছ্যাঁচড়া রান্না হচ্ছে দেবেন। রাঁধা জিনিস তো আমাকে দিয়ে পাঠানো চলবে নি?'

ছোটকর্তার বোধকরি নিজের কলকাতার বস্তিজীবন স্মরণে আসে।

কার হাতে যে খেতে হয়! সে তুলনায় শশী তো ভাটপাড়ার ভট্‌চায।

উদ্‌গত হাস্য গোপন করে বলেন—আচ্ছা আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি না হয়। মেয়েটার আবার রোদ থেকে এসে মাথা ধুরছে নাকি, শুয়ে পড়েছে।.. . ইয়ে—কইগো—একটা বাটি দাও না।

'মাছের তেলকাঁটা চচ্চড়ির' অপ্রত্যাশিত আনন্দে পূর্ব অঙ্কের শেষ দৃশ্যের কথা বোধকরি আর মনেও থাকে না তাঁর। কাজেই তার সঙ্গে বর্তমান দৃশ্যের সামঞ্জস্য রাখা প্রয়োজন অনুভব করেন না।

ছোটগিন্নীও ততক্ষণে মেজদির বদান্যতার পরিচয়ে দ্রবীভূত। বোঝেন তাঁর নিজেরই যাওয়া দরকার। কিছুটা তোয়াজ করে আসা প্রয়োজন। বোঝাই যাচ্ছে একটু এদিক-ওদিক কথায় মেয়ে তেজ দেখিয়ে চলে এসেছেন। আরে বাপু, ওদের কাছে আমাদের তেজ করলে চলে? তাছাড়া মেজদি মানুষটি তো মন্দ নয়, কথাগুলোই যা একটু চড়া। তা ভগবান যাদের মেরেছেন তাদের নরম হতে হবে বৈকি।

মেজদির বদলে তাঁর ঝিয়ের কাছেই মাখনের মতো নরম হয়ে পড়েন ছোটগিন্নী। তুমি যাও শশী, আমি যাচ্ছি বাটি নিয়ে।

শশী মুচকে হেসে চলে যায়।

জানে তো এদের ধাত। 'মেধো ভাত খাবি?' 'না, আঁচাবো কোথা?'

কর্তাগিন্নী পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলেন।

এক পক্ষের ভাব....কই, যাও এবার জন্মের মতো?

অপর পক্ষের ভাব....যাওয়া আর হলো কই?

উভয়েরই মুখের প্রসন্নতায় যেন নৈনিতাল আলুর নিটোল মসৃণতা, মাছের 'তেল চচ্চড়ি'র স্নেহস্নিগ্ধতা। আলো ফুটে ওঠাটুকু বোধহয় মেজগিন্নীর করুণায় জ্যোতির প্রকাশ।

ওদিকে অপর তৃতীয় পক্ষটি ঘৃণায়, লজ্জায় ধরনীকে দ্বিধা হতে বলার বদলে নিজের কপালটাই চৌকির গায় ঠুকে ঠুকে দ্বিধা করে ফেলতে চায়।

কী কুৎসিত লোলুপতা!

লোভের কী নিলজ্জ প্রকাশ! ঘৃণায় 'রি রি' করতে থাকে সমস্ত শরীর।

এই আরতির মা বাপ! এতো নির্লজ্জতা বোধহয় এর আগে কোনোদিন ধরা পড়েনি।....কি করবে আরতি? নিজেকে কি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে?....না, গলায় দড়ি যদি দিতে হয় সে আরতিরই দেওয়া উচিত।...হাঁ মরবে, সেই মরবে।

ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াক ওরা, লোকের কৃপাকণায় তুষ্ট হয়ে তাদের পদলেহন করুক। বাপের চাইতে মায়ের ওপরই ঘৃণা বেশি আসে। আজকে যেন সত্যই আশা করেছিল আরতি, একটা কিছু হেস্তনেস্ত হবে। জন্মের শোধ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবেই একটা।

এই তার পরিণাম!

ভাবতে ভাবতে, কাঁদতে কাঁদতে, ঘৃণা করতে করতে, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো আরতি।....ঘুম ভেঙে দেখলো রোদে ছেয়ে গেছে উঠোন, বাড়িটা কেমন যেন থমথমে।

প্রথমটা কিছু মনে পড়ছিলো না, তারপর পড়লো।

জেগেই মনে হলো স্নানের দরকার। বাড়িতে তোলা জলে নয়, দীঘিতে। ঝাঁ ঝাঁ করছে শরীর।

কিন্তু এরা কোথায় গেলো?

মা আর বাবা?

ছেঁড়া গামছাখানা হাতে নিয়ে উঠোনে নামতেই সন্ধান পাওয়া গোলো এদের। রান্নাঘরে। বেড়ার দেওয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে দু'জনকে।

বাবা খেতে বসেছেন, সামনে মা।

দাঁড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়েই থাকে আরতি।

হঠাৎ যেন চমকে গিয়েছে।

এতো রোগা ওর বাবা?

ময়লা একটা ফতুয়া পরে বেড়ান বটে সারাদিন, কিন্তু খালি গা কি আরতি আর দেখেনি কোনো সময়ে?....প্রত্যেকটি পাঁজরের হাড় যেন চামড়ার আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কাঁধের হাড়খানা পর্যন্ত খোঁচা হয়ে উঠেছে। আর শীর্ণমুখে কী ক্ষুধার্ত লোলুপতা! নিজের পাতের চাইতে স্ত্রীর হাতের কাঁসিখানার ওপরেই সব দৃষ্টিটুকু আটকে আছে যেন।....যদিও তাতে সামান্যমাত্র তরকারিই পড়ে আছে। মনে হচ্ছে নেহাত চক্ষুলজ্জায় চাইতে পারছে না, অথচ সমস্ত ইচ্ছেটা উগ্র হয়ে আছে ওই অবশিষ্টাংশটুকুর ওপর।

আর মা!

মায়ের মুখে....হ্যাঁ সেই শীর্ণ শ্রীহীন মুখে এ কী অপরিসীম তৃপ্তির ছবি আঁকা, এ ছবি আরতির কতো অপরিচিত!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে অদ্ভুত একটা সহানুভূতিতে আরতির মুখের কঠিন পেশীগুলো কেমন

যেন শিথিল হয়ে আসে।....কেন যে আরতির মা লজ্জা-ঘেন্না সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ভিক্ষুক-বৃত্তিকেও স্বীকার করে নিয়েছেন, সে প্রশ্নের উত্তর যেন লেখা রয়েছে তাঁর মুখের ওই পরিতৃপ্তির ছবিতে।

মায়ের ঠোঁটের কোণে এখনো এমন হাসি ফুটে উঠতে জানে? কৌতুক আর প্রশ্রয়ের? স্নেহ আর দরদের? হাসিজড়ানো সুরে বলেন—

—অতো আর চক্ষুলজ্জার দরকার কি বাবু, নাও এইটুকু। দেমাকী মেয়ে তো তোমার খাবে না এসব।

হাতের কাঁসির সবটুকু দিয়ে দেন স্বামীর পাতে।

—আর তুমি?

লোভে চকচকে দুইচোখ তুলে প্রশ্ন করে ছোটকর্তা।

—আমি?....আমার খাওয়া হয়ে গেছে!

—সে কি,....কখন?

মুখটিপে হাসেন ছোটগিন্নী—এই এখন! তোমার সঙ্গে সঙ্গে । তুমি খেলেই আমার খাওয়া—

—ও হো হো। তাই বলো।....কিন্তু না না, অতোটা চচ্চড়ি, ফার্স্ট ক্লাস হয়েছিলো- তোমাদের একটু—

—আহা আমরা তো বারোমাস ঘরের রান্না খাচ্ছি, তোমারই অখাদ্য হোটেলের রান্না খেয়ে প্রাণ যায়।

নিশ্চিন্ত প্রেমালাপ।

কেউ সাক্ষী রয়েছে—এটা ধারণা নেই।

হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে যায় আরতির।

বাড়ির রান্না!

সত্যি কি ভালো ভালো রান্নাই খায় তারা।

আলু আর রইলো নাকি? মাছ?

আকণ্ঠ খেয়েও আশা মেটেনি। রাত্রের ব্যবস্থার সন্ধান নেওয়া চলছে।

—আলু আছে দুটো বড়ো বড়ো। মাছ আর কই? ভাজা হলো দু'খানা, আর এই দু'খানা ঝাল। চারের তিন যে ভোজনকারীর উদরেই স্থান পেয়েছে, সেটা সহজেই বোঝা যায়।

—বেশ আলুগুলো। ওই সঙ্গে খানকতক রুইয়ের দাগা পড়তো, আর তোমার হাতের রান্না! আহা হা! কতোকাল যে কালিয়া খাইনি। মাছের যোগাড় হয় না দু'খানা?

—কোথায় কে ? সবাই কিপটে হয়ে গেছে আজকাল।

উত্তরটা ম্লান।

—যা বলেছো। একটা নেমন্তন্নও হয় না। সেবারে সেই মেজগিন্নীর নাতির মুখে ভাতে যা ভালো নেমন্তন্ন খাওয়া হলো। সেই শেষ না গো? ক'বছর হলো?

—বছর কয়েক।

—সেই শেষ খেয়েছিলাম ভালো কালিয়া। রান্নাটাও হয়েছিলো তেমনি! আহা! আর সেই ইলিশের টকটা? হ্যাঁগো মনে আছে?

গলার স্বরে মনে হয় ঘটনাটা বুঝি গতরাত্রের, এখনো আস্বাদ লেগে রয়েছে জিভে।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে আরতি! এদের ওপর রাগ করবে? হায় ভগবান।

তাহলে 'করুণা' বস্তুটাকে রাখবে কোথায়?

পিঁড়ির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ছোটকর্তা।

ঝট করে সরে গিয়ে হন হন করে দীঘির দিকে এগিয়ে চলে আরতি। বেলা দেড়টা-দুটোর কম নয়, পথে লোকের চিহ্ন নেই।

কী আশ্চর্য! এই রোদে রণজিৎ একা বসে ছিপ নিয়ে একাগ্র সাধনায়!

—আপনি আবার এখন শিকারে বসেছেন?

চমকে ওঠে রণজিৎ!

—তুমি এ সময়? স্নানে নাকি?

—হ্যাঁ। অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—ঘুমিয়ে? চমৎকার!

—চমৎকারই তো! অসময়ে চমৎকার একটি ঘুম দিতে যা মজা—

ছেচল্লিশের খোলস ফেলে যোলো বছর বয়েসটা আত্মপ্রকাশ করে বসলো নাকি?

—থাক, ও মজা মেয়েদেরই মানায়।

—আর আপনাদের মানায় শুধু আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শিকারের সাধনা, কেমন?

নির্জন দীঘির পাড়, মধ্যাহ্নে বিশ্রামে বাতাস পর্যত স্তব্ধ হয়ে আছে যেন। এই পরিবেশে নিতান্ত বলিকা বলে আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না আবতিকে।

রণজিৎ তবু গম্ভীরভাবে বলে—তেমন শিকার আর জুটছে কই? সেবারে এসে তবু পাড়ার একটি মেয়ের একটু সাহায্য-টাহায্য পাওয়া গিয়েছিলো—

পাড়াব মেয়েব দায . .চটুলহাসি খেযে যায একটি অস্নাত অদ্ভুত শ্রীহীন মুখে।. . হ্যাঁ বুঝতাম গবম মাছভাজা খাবার আশা আছে—

—খেলেই পাওযা যায, ওই তো এক ব্যাটাকে ধবে বেঁধে জলে চুবিয়ে বেখেছি। খাওগে ভেজে।

—দাঁড়ান স্নানটা সেরে নিই।....কিন্তু বিনা পরিশ্রমেই পারিশ্রমিক?

আরতির দৃষ্টিও কি লোভে চকচকে হয়ে উঠেছে তার বাপের মতো?

কিসের লোভ?

রণজিৎ বুঝতে পেরেছে সে লোভের সেঙ্গে যোলো বছর বয়সের কোনো সম্পর্ক নেই, ওটুকু ভানমাত্র! তাই অবহেলাভরে ধবে রাখা মাছের বাঁধনটা খুলে আরতির পায়ের কাছে প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে বলে—পারিশ্রমিক কিসের? দাতব্য? নিয়ে যাও খাওগে।

ওর কণ্ঠস্বরে যেন আশাভঙ্গের তিক্ততা।

কিন্তু আরতি কি কুড়িয়ে নেবে হেঁট হয়ে?

তেজী মেয়ে আরতি!

না কি চলে যাবে গট গট করে? বলবে 'দাতব্যের জিনিসে দরকার নেই তার'?

কি করে যাবে?

ছ্যাঁচা বেড়ার ফোকর থেকে যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে....পাতলা চামড়ায় ঢাকা একখানি পাঁজব .. ক্ষুধার্ত লোলুপ দু'টি চোখ.... দেখা যাচ্ছে....অসীম পরিতৃপ্তির ছাপ আঁকা একখানি শীর্ণ মুখ।....।

হেঁট না হয়ে উপায় কোথায়?....

হয়তো—

হয়তো আরো হেঁট হতেও পিছপা হতো না। রণজিৎ রক্ষা করেছে।

মনস্তত্ত্ব

আশালতা সিংহ

আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় তীব্র নিন্দা করিয়া প্রবন্ধ লিখি। বলিতে গেলে সেই জোরেই আমার কাগজখানা আজকালকার এই বাজারেও বেশ চলিতেছে। মাঝে মাঝে প্রবন্ধগুলি গৃহিণীকে পড়িয়া শোনাই। তিনি শুনিয়া খুশী হন এবং বেশ তারিফ করেন, কারণ তিনি দ্বিতীয় ভাগ অবধি পড়িয়াই লেখাপড়ায় ইতি করেন। বাড়িতে অনেকগুলি ভাই-বোন ছিল। বিবাহের পূর্বে পিতৃগৃহে তাহাদেব খেলা দিতে নাযওানো-খাওয়ানো সমাধা করিতে বিদ্যার দৌড় ওই দ্বিতীয় ভাগ অবধি আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। আর অগ্রসর হইবার অবকাশ পায় নাই। সেজন্য তিনি মনে করিতেন যাহারা দ্বিতীয় ভাগ অবধি পড়িয়া লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারাই সুগৃহিণী হইবার উপযুক্ত। আব যারা কেতাবে অধিকতর মনোযোগ দিয়াছে তাহারা দিন-রাত্রি ফ্যাশান সিনেমা থিয়েটার হুজুগ এবং স্বামীকে নিত্য নূতন ফন্দীতে জ্বালান ছাড়া আর কোনো বিষয়েই পটু নয়। যাই হোক দিন কাটিতেছিল একরকম শান্তিতেই। অফিস যাইবার সময় হাতের কাছে পান সাজা ভর্তি ডিবা পাই। খাইতে বসিয়া সুক্তা এবং মাছের ঝালের স্বাদ ভালোই হয়। গৃহিণী গর্ব করিয়া বলেন আজকালকার ইংরেজী জানা মেয়ে বিয়ে করলে এমন হতো? তখন একদিন উড়ে বামুন পালালে তোমাকে ভিজে চাল কিংবা দোকানের খাবার খেয়ে অফিসে দৌড়াতে হতো। টের পেতে মজাটি। আমিও সায় দিয়া বলি, তা বটে।

এমনই করিয়া বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের প্রথম মেয়েটি ন'বছরে পড়িয়াছে। বাড়ির আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবিয়া প্রতিবেশী হবিবাবুব বাড়িতে তাঁহাব ছেলেদের মাস্টারের কাছে পড়া বলিয়া লইয়া কখন যে সে ইংরাজী গ্রামার শিখিয়াছে এবং ভগ্নাংশের আঁক কষিতে শুরু করিয়াছে আমি তাহার কিছুই খবর রাখি না। সেদিন সকালবেলায বাইরের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভের জন্য একটা ঝাঁঝালো প্রবন্ধ লিখিতেছি। তাহাতে আজকালকার মেয়েদের স্যাণ্ডাল এবং চশমা পরা হইতে শুরু করিয়া তাহাদের হাঁচি কাশিটিকে অবধি কষিয়া গাল দিয়াছি। সবচেয়ে চোখা কথাগুলি শেষে দিয়া প্রবন্ধেব উপসংহার করিব ভাবিতেছি এমন সময মেয়েটি আসিয়া আব্দারের সুরে কহিল বাব৷ আমি স্কুলে ভর্তি হবো। বীনা, রমা, ইলা, বেবী সবাই তো স্কুলে পড়ে। অবনীবাবু বলিলেন আমি যদি স্কুলে ভর্তি হই খুব অল্প বয়সেই ম্যাট্রিক দেব। আমি যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলাম। বীনা, রমা, বেবী এসব যে একেবারে অতি আধুনিক নাম। অল্প বয়সে ম্যাট্রিক এ সব ভয়ঙ্কর কথা সুবোধিনী শিখিল কোথা হইতে? ন' বছরের মেয়ে এবার তাহার রান্নাঘরের কাজে এ্যাপ্রেন্টিস্‌গিরি করিবার সময় হইয়াছে। সুপবিত্র প্রাচীন হিন্দু বাড়ির কন্যা হইয়া এমন বিবেক বিরুদ্ধ কথা তাহার মুখে শুনিয়া আমি দস্তুর মতো আঘাত পাইলাম। কাগজে বড় বড় কথা লিখিয়া কথা বলিবার ভঙ্গিটাও আমার কেমন বক্তৃতার ছাদের হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ শুনিলে মনে হইত স্কুলের ছেলেদের ডিক্টেশন দিতেছি। আবার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে শুরু করিলাম, দেখ সুবোধিনী তুমি হিন্দু বাড়ির ন'বছরের মেয়ে। এখন আর তোমার বালিকা সুলভ চপলতা শোভা পায়

না। তোমার উপর ভবিষ্যৎ জাতি গঠন নির্ভর করছে। স্কুলে ভর্তি হয়ে কতকগুলো বিজাতীয় শিক্ষা গলাধঃকরণ করবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? নারী জাতির যা চরম কর্তব্য— গৃহস্থালীর কাজকর্ম শেখা, রন্ধন অবহেলা কর না...কথার মাঝখানে বাধা দিয়া মেয়ে হাসিয়া বলিল রান্না করলে বুঝি স্কুল যাওয়া যায় না। ওই যে নীনাদের স্কুলের মিস্ট্রেস ননীদি বারো মাস নিজে রান্না করেন, আর সাড়ে ন'টার মধ্যে তৈরী হয়ে স্কুলে যান, সে হয় কি করে আমি বুঝি সকালে কতদিন তার বাড়ি যেয়ে দেখিনি? ওই তো কাছেই তার বাড়ি। এখান থেকে দেখা যায়। উনি কি শুধু রান্না করেন, কত কাজ করেন, কী চমৎকার সব এমব্রয়ডারি। আর কত পড়েন। উনি বলেন সারাদিনে ঘণ্টা দুয়ের বেশি রান্নাতে দিতে হয় না। যদি বুদ্ধি করে ব্যবস্থা করা যায়। তা বলে উনি মায়ের মত শিল পেতে একরাশ লঙ্কা বাটেন না, কিংবা সকাল থেকে সুক্তো, শাক, ছেঁচকি, আবোল-তাবোল দশটা তরকারি করেন না।

যত শুনিতেছিলাম ততই বিস্ময়ে হতবাক হইতেছিলাম। মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করিতেছিল। উঠিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা ভেবে দেখব। তোমার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা স্থির করব। আজ আমার অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে সুবোধিনী। সুবোধিনী কহিল আচ্ছা। কিন্তু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ লাভ নেই। তিনি শুধু বড়ি, ডালা, কুলো, হাঁড়ি, সরা এইসব নিয়েই ব্যস্ত। আপনি নিজেই ভেবে মত দেবেন বাবা। আর আমাকে সুবোধিনী বলে ডাকবেন না। এবার তার জায়গায় সুচরিতা বলে ডাকবেন। ননীদি বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, নাম জিনিসটাও ফেলনা নয়। ওটাও বেশ সুন্দর হওয়া চাই। আমি অবশ্য ননীদির সব কথা বুঝতে পারি না। কিন্তু সুচরিতা নামটাই আমার বেশি ভালো লাগে। আপনার লাগে না বাবা?

গৃহিণীর কাছে কথাটা পাড়িতেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠিলেন। নিজের মেয়েকে আজকালকার মেয়েদের মত পটের বিবি করতে চাও করো। তারপরে মজা যখন টের পাবে তখন কিন্তু ভুগবার বেলায় আমি ভুগছিনে।

কথার সঙ্গে তাঁহার হাতের খুন্তি ঘন ঘন চলিতে লাগিল। কড়াইটা দুম করিয়া নামাইয়া কহিলেন, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। দাঁড়াও তো আমি দেখাচ্ছি মেয়েটার মজা। হরিবাবুর বাড়িতে আনাগোনা করে যত খ্রেস্টান মাগীগুলোর সঙ্গে মেলামেশার ফলে অধঃপাতে গেছে। দু'দিনে আমি শায়েস্তা করছি, কোথায় সে?

আমি তখনকার মতো তাঁহাকে নিরস্ত করিলাম। স্মরণ করাইয়া দিলাম, হরিবাবু আমাদের বাড়িওয়ালা, লোকটি অতিশয় ভদ্র এবং অমায়িক। এবং আমার গৃহিণীর যেরূপ শুদ্ধাচার বা শুচিবাই তাহাতে কলকাতা শহরে এত অল্প ভাড়ায় এমন সর্বদিক দিয়া সুবিধার ভাড়াবাড়ি আর না পাওয়া যাইতে পারে। তখন আমার চেয়ে অসুবিধাটা ঘটিবে তাঁহার ঢের বেশি। অতএব গলার স্বরটা একটু নামাইলে যেন ভালো হয়। আহার শেষ করিয়া পান এবং দোক্তার ডিবেটি সঙ্গে লইয়া অফিস রওয়ানা হইলাম, কথাটা তখনকর মত চাপা পড়িল।

পাঁচটার সময় অফিস হইতে ফিরিতেছি, দেখি আমাদের পাশে হরিবাবুর আর একটা যে ছোট বাড়ি আজ দিন তিনেক হইতে খালি ছিল তাহাতেই ভাড়াটে আসিয়াছে। ভাড়া গাড়ির মাথায় তোলা উনুন, রজনীগন্ধার টব, খালি হর্লিক্স এবং গ্লুকোজের টিন, আচার এবং মোরব্বার জার, ইকমিক কুকার রকমারি জিনিস। দেখিয়া মনে হয় নূতন ভাড়াটেরা একটু সৌখিন প্রকৃতির এবং আধুনিক। ভাড়া গাড়ির পিছনে কিছু দূরে একটা ট্যাক্সি আসিতেছিল, আসিয়া দোরগড়ায় থামিল। একজন সুশ্রী

বাঙ্গালী ভদ্রলোক নামিলেন, তাঁহার বছর পাঁচেকের একটি ছেলেই হবে বোধ করি বাপের কোলে চড়িয়া নামিল। তাহার পর স্যাণ্ডালশোভিত চরণযুগল এবং ফেরতা দিয়া পরা লম্বা স্কার্ট পাড়ের ঝলমলানি দেখিয়া বিতৃষ্ণায় তাড়াতাড়ি চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইলাম। আমার বাড়ির পাশে আধুনিক শিক্ষিতা স্যাণ্ডাল পরিহিতা এক ভদ্রমহিলা দিব্য সংসার জমাইয়া বসিবেন চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ক্রোধবিষ্ট হইয়া উঠিলাম এবং স্থির করিলাম আজই সুবোধিনীকে ডাকিয়া বকিয়া দিব। তাহার স্কুলে ভর্তি হইবার প্রস্তাবে কোন মতেই রাজী হইব না। ওর ঘন ঘন হরিবাবুর বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিব। অফিস হইতেই শরীরটা অত্যন্ত খারাপ লাগিতেছিল, শহরে ভারি ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে তাহারই বিষ শরীরে ঢুকিল নাকি বুঝিতে পারিতেছি না। এ সময়ে আদা দেওয়া গরম এক পেয়ালা চা পাইলে ভালো হয়। বাড়িতে পা দিয়াই হাঁকিয়া বলিলাম ওগো এক পেয়ালা চা আদা দিয়ে খুব গরম গরম এনে দাও। গৃহিণী উত্তপ্তস্বরে বলিলেন দাঁড়াও। আমার এখন মরবারও অবসর নেই। ঝি মাগী বাসনে এঁটোর দাগ রেখেছে। লঙ্কা মজিয়ে দিয়ে গেল, এই অবেলায় নেয়ে মরি, সুবোধিনী কোথা গেল? ডাকো না তাকে, ধিঙ্গি মেয়ে একটি কুটো ভেঙ্গে দু'গাছি করবে না। রাত-দিন নেকাপড়া হচ্ছে। ঝাঁটা মার অমন নেকাপড়ার মুখে।

সুবোধিনীর খোঁজে গিয়া দেখিলাম সে বেচারী লেখা করে নাই, ক্ষুধার্ত এবং ক্রন্দনরত ভাইগুলিকে প্রাণপণ চেষ্টায় ভুলাইয়া রাখিতেছে। আমার প্রস্তাব শুনিয়া ম্লান মুখে কহিল বাবা কেমন করে চা করবো? মা তো আমাকে ভাঁড়ার ছুঁতে দেবে না। সেই নিজে স্নান করে কাপড় ছেড়ে তবে তখন ভাঁড়ার থেকে জিনিস বার করে দেবে। এই দেখছ না এরা খিদেয় কাঁদছে তবুও..। যদিও প্রবন্ধে শুদ্ধান্তঃচারিণীদের একান্ত শুদ্ধাচারের পক্ষ লইয়া অনেক যুক্তিবাণ বর্ষণ করিয়াছি, তথাপি বড় বিরক্ত হইয়া বাজার হইতে জলখাবার আনাইয়া ছেলেগুলোকে ঠাণ্ডা করিলাম এবং চা চিনি কিনিয়া সুবোধিনীর হাতে দিলাম। ঐটুকু মেয়ে বেশ নিপুণতার সহিত তাহার ক্ষুদ্র গৃহিণীপনা সমাধা করিল।

শেষ অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জার মতই বোধ হইতেছে। পরদিন সকালে অসুস্থ শরীর লইয়া অলসভাবে শয়ন ঘরের ইজিচেয়ারটায় বসিয়া আছি। পাশের নূতন ভাড়াটেদের জীবনস্রোতের কলগুঞ্জন এখান অবধি ভাসিয়া আসিতেছে। গোলমাল না বলিয়া গুঞ্জন বলিতেই ইচ্ছা করে। একটি মিষ্ট নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল...ওমা তুমি এতক্ষণে উঠলে। আমার কতক্ষণ সব রজনীগন্ধা আর গোলাপ গাছের টবে জল দেওয়া হয়ে গেছে। দু'বার চায়ের জল গরম করলাম ঠাণ্ডা হয়ে গেল।...একটু দাঁড়াও আমি চট করে তোমার ডিমটা ভেজে আনি। ওকি খোকা কেকটা ফেলে উঠছিস কেন? আমি কাল রাত্রিতে তোর জন্য নিজে করেছি। ওই আঁকুর বেরোনো ছোলাগুলোর উপর খোকার বড্ড লোভ। শুধু খোকার নয়, তোমার ও দেখছি...সকাল নটা-দশটা পর্যন্ত এমনই গল্প হাসি কথাবার্তা প্রতিনিয়তই শোনা যাইতে লাগিল। মন্দ লাগিতেছিল না। একলা চুপ করিয়া শুইয়া আছি। অফিসে ছুটি লইয়াছি। কোন কাজ নাই। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বই খুলিয়া নাড়া-চাড়া করা এবং লেখা ছাড়া গল্পের বই কস্মিন কালেও পড়ি নাই। এ যেন একটি গল্পের নির্ঝর স্রোত পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। অন্য সময় কেমন লাগিত জানি না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ভাল লাগিত না। আজ কিন্তু মন্দ লাগিতেছে না। দুপুরবেলা মা বোধহয় ছেলেকে পড়াইতে বসিলেন। পড়াইবার আওয়াজ খোকার কথা ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। খোকার বাবা নিশ্চয় কাছারি কিংবা অফিস গিয়াছেন। অনুমান ভুল নয়, চারটার সাড়া পড়িতে পড়িতেই স্টোভের আওয়াজ পাওয়া গেল। পেয়ালা নাড়ার ঠুন ঠুন শব্দ, স্টোভে কচুরি

সিঙ্গাড়া ভাজিবার সুঘ্রাণ, তারপর একটা ভারি জুতার শব্দ এবং তারপর খাওয়া এবং খাওয়ানোর সহিত মিলিয়া রাজ্যের গল্প হাসিতে জায়গাটা যেন মুখর হইয়া উঠিল।

আজ যদি সত্যি সিনেমা যেতে চাও চটপট কাজ সেরে নাও। কাজ আমার অনেকক্ষণ সারা হয়ে গেছে মশায়। ওবেলায় মাংস আর ইকমিক কুকারে পোলাও করেছিলাম দুপুরে তুমি অফিস বেরিয়ে গেলে পরে। ফিরে এসে স্টোভ জ্বেলে একটু গরম করে দিলেই চলবে। আজ তোমার পড়বার ঘরে একটা জিনিস দিয়ে এসেছি। কি আন্দাজ করো না। পারলে না? রজনীগন্ধার একটি তোড়া। কি বলছ? যা পরি তাতেই মানায়। অত আর বাড়িয়ে বলো না বাপু। কেন আজ বুঝি মাছের কচুবিটা অন্য দিনের চেয়ে ভালো হয়েছে? খোকাকে বাপু আমি তাড়াতাড়ি স্কুলে দিতে চাইনে। আমার কাছে পড়ে তো ও চমৎকার প্রোগ্রেস করছে। স্কুলে সেই তো আর সবার সঙ্গে এক বছর এক ক্লাস।

ক্রমশ রাত্রি হইল। একাকী ঘরে বসিয়া অনেক কথা ভাবিতেছিলাম। পাশের বাড়ির জীবনধারার অনুসরণ করিয়া ফিরিতে নিজেকে তেমন একাকী লাগে নাই। কিন্তু বোধহয় তাহারা বেড়াইতে গিয়াছে কিংবা সিনেমায় গিয়াছে। সমস্তই নিঃশব্দ। সুবোধিনী এক বাটি গরম দুধ লইয়া আসিয়া কহিল বাবা একা কি ভাবছেন? একটু দুধ খান, ঘুমোন। অসুস্থ শরীরে বেশীক্ষণ বসে থাকা ভালো নয়। বেচারীর মুখখানি ম্লান। স্কুলের কোন প্রসঙ্গই তুলিল না। বোধহয় মায়ের কাছে কষিয়া বকুনি খাইয়াছে।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কতক্ষণ ঠাহর নাই। ঘুম ভাঙ্গিল একটা সুমিষ্ট করুণ সুস্বরে। পাশের বাড়িতে এস্রাজ বাজিতেছে।

হরিবাবু পয়সার সাশ্রয় করিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি খাটাইয়া যে ভাড়াবাড়ি করিয়াছেন, সেগুলি একই বাড়ির মত। শুধু মাঝখানে একখানা পার্টিশানের দেয়াল। ধূপেব সুঘ্রাণ এবং রজনীগন্ধাব সৌরভটুকু অবধি স্পষ্টই অনুভব করা যায়। সকালে উঠিয়া সুবোধিনীকে চুপি চুপি ডাকিযা কহিলাম আজ তুই স্কুলে ভর্তি হবি। আমার কাছে টাকা নিয়ে রাখিস। ফর্ম আনিস, আমি সব লিখে দেব। ভেবে দেখলাম আমার আপত্তি নেই। সুবোধিনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল ফর্ম কবে এনে রেখেছি। ননীদি সব ঠিক করে দেবেন বলেছেন কিন্তু মা—

কহিলাম তোর মাকে আমি ঠেকিয়ে রাখব ভাবনা করিসনে।

মেয়েটি পুরোপুরি উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে। এস্রাজ বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছে। আমি অবশ্য কাগজে পুরাদমে প্রবন্ধ লিখিতেছি এবং সে প্রবন্ধের সুর ঠিক তেমনি আছে, তেমনি ঝাঁঝালো এতটুকু বদলায় নাই। আমার এবম্বিধ আচরণ হয়তো মনস্তত্ত্বঘটিত কোন জটিলতম সমস্যাব মধ্যে পড়ে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব নামটাই শুনিয়াছি, ও বস্তু লইয়া কখনো চর্চা করি নাই।

পথের বোন

রানী চন্দ

কলকাতা থেকে বোলপুর আসছিলুম। বিকেলের ট্রেন, অসহ্য গরম, কপাল দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে ঘাম পড়ছে। ভিতরের জামাটা ঘামে ভিজে পিঠের সঙ্গে সেপটে গিয়ে দারুণ অসোয়াস্তিতে মন ভরিয়ে দিচ্ছে—কলকাতায় বোমা পড়ার আতঙ্কে ভীত ত্রস্ত যাত্রীদলের ভিড় এড়িয়ে কোন রকমে হাওড়ায় উপস্থিত হলুম। ছেলেদের কামরাগুলিতে ভিড়ের আতিশয্য দেখে সঙ্গীদের সঙ্গলাভের লোভ পরিত্যাগ করে মেয়েদের কামরাতে উঠে পড়লুম। মনে মনে বরং একটু আরামই পেলুম, চুপচাপ নিজের মনে ভাবতে ভাবতে বেশ সারা রাস্তা যেতে পারব এই কল্পনা করে।

কামরায় মাত্র দু'টি মহিলা, প্রৌঢ়া তাদের বলা চলে না—যুবতীও নয়। এ দু'য়ের মাঝামাঝি—প্ল্যাটফর্মের দিকের পাতলা গদি-মোড়া সরু বেঞ্চিতে মুখোমুখি পা মেলে বসে দু'জনের মাঝখানে রাখা ঘন নীল রঙের রুমালের উপর সদ্য-ক্রীত বরফের চাকাগুলি থেকে কড়মড় করে দু'জনে বরফ খাচ্ছিলেন আর থেকে থেকে হাতের তালুতে, কপালে, মুখে, মাথায় বরফ ঘষছিলেন। অনুমানে মনে হয় তাঁরা দু'টি জা'। দু'জনেই যৌবনের প্রায় শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছেন। শুধু তফাতের মধ্যে এই—বড়টি বিধবা, ছোটটি সধবা। বিধবাটির রং যাকে বলা চলে শ্যামবর্ণ, বেশ লম্বা চওড়া মোটাসোটা শীরের গড়ন, তাঁর শরীরের এই স্থূলত্বটুকু বাদ দিলে তিনি যে মুখশ্রীর অধিকারিণী—তাতে তাঁকে রীতিমত সুন্দরী বলা চলত। তাঁর ঠোঁটের কোণার হাসিটি মুগ্ধ করে দর্শকদের। সে হাসি শুধু নয়ন ভোলানো নয়, মনও ভোলায়। মনে পড়ে যখন গল্পের কোথায়ও হাস্যমুখরা কৌতুকপ্রিয়া বৌদির কথা পড়ি, লেখক বোধহয় এমনি হাসির কথাই বর্ণনা করেছেন। চোখে তাঁর সোনার চশমা, গলায় সোনার পাটি প্যাটার্ণের চওড়া হার, বাঁ হাতের আঙুলে সোনার একটি আংটি। সাদা সেমিজের উপর সাদা থান ধুতি পরা, পাশে লোহার শিকে গরদের চাদরটি আটকানো। যদিও তিনি মুখোমুখি বসে আছেন কিন্তু সঙ্গিনীটির সঙ্গে নিজে বিশেষ কিছু কথাবার্তা বলছেন না, থেকে থেকে কেবল সঙ্গিনীটির কথা শুনে হাসছেন আর বরফের টুকরোটা এ গাল থেকে ও গাল করছেন। সধবাটির পরণে সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি, দু'হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, চুড়ির সামনে আবার মোটা মোটা দুগাছি বালা, গলায় দু'তিনটে সরু মোটা চেন হার, মাথায় ঘোমটা, পায়ে আলতা। ভদ্র মহিলার মুখের মধ্যে নাকটি বেশ উঁচু, মুখ চোখের গড়নও মন্দ নয়, সামনের দাঁতগুলি ঈষৎ বেরিয়ে এসেছে। যখন গল্প করতে করতে থেকে থেকে হেসে উঠছিল, হাসিটি তাঁর বড় সুন্দর লাগছিল—আবার কিন্তু যেই মুহূর্তে মুখ বোজেন অমনি মুখের ভাব যেন বিরক্তিতে ভরে ওঠে। আশ্চর্য হয়ে তাঁর এই মুখের ভাব বদল দেখছিলুম। সত্যিই হয়ত তিনি বিরক্ত হচ্ছেন না, হাসতে হাসতে এক মুহূর্তের মধ্যে এমন কিছু বিরক্তিকর ভাবনা বা কাজের কথা তাঁর মনে হতে পারে না, হলেও মুহুর্মুহু হাসি গল্পের মাঝে তা এত প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কিছুতেই। অথচ কি বিড়ম্বনা বিধির, যে এত হাসতে পারে তার মুখে অমন বিরক্তির রেখা এঁকে দেন কোন হিসেবে?

ট্রেন ছাড়তে আর কত দেরি? যে গরম, এক মুহূর্তকে যেন এক প্রহর বলে মনে হচ্ছে। এ পাশের বেঞ্চিটাতে নিজে একটু নড়েচড়ে বসলুম। মনিপুরী খেসটা খুলে বেঞ্চিতে ছড়িয়ে না পেতে বালিশের সঙ্গে জড়িয়ে পিঠের কাছে রাখলুম—ঠেস দিয়ে আরাম হবে। এই গরমে ঘুমের আশায় শোবার জায়গা অধিকার করে রাখা বৃথা। অথচ এমনিই মন, গাড়িতে যত ভিড় থাকে ততই যেন ঘুমে চোখ বুজে আসে, পা মুড়ে বসতে পা টন্ টন্ করে। দু'পা ছড়িয়ে বসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করে পাশের লোককে সরিয়ে দেবার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে কতবার কত কষ্ট পেয়েছে মনে। আর আজ এত জায়গা থাকতে এক কোণায় পিঠের কাছে বালিশ দিয়ে জড়সড় হয়ে পা মুড়ে বসে রইলুম হাতপাখাখানি হাতে নিয়ে।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে একটি মেয়েকে দরজা দিয়ে ভিতরে ঠেলে দিলে, কুলি এনে তুলল বড় একটি টিনের ট্রাঙ্ক, ছেলেটি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলে তার হাতের বোঁচকাটি। মেয়েটিকে বললে—ট্রেন ছাড়বে এক্ষুনি, আমি পাশের কামরাতেই থাকব, তুই আর দেরি করিসনে, শুয়ে পড়। বলেই অন্য কামরার দিকে চলল। মেয়েটি ক্ষিপ্রহস্তে বোঁচকাটি খুলে একটি চাদর, একটি বালিশ ও তার উপরে ভাঁজ করা, বোধহয় নিজের হাতের কাজ-করা ঝালর দেওয়া একটি বালিশের ঢাকা খুলে বালিশটির উপর পেতে দু'হাতে বুলিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকলে—অ' মেজদা—এইটে নিয়ে যাও, নয়ত তোমার কষ্ট হবে, অ' মেজদা—

চমকে উঠলুম, কী গলার সুর, কী কাতর স্নেহমাখা অনুরোধ। অমন ডাকে মেজদা কেন—রাস্তার লোকও বুঝি সে অনুরোধ এড়াতে পারে না। মেজদা দৌড়তে দৌড়তে ছুটে এল—বালিশ চাদর হাতে করে আবার তেমনিভাবে ছুটে গাড়িতে উঠল। মেয়েটি দরজার জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখল।

ট্রেন ছাড়ল—মেয়েটি এসে মাঝের বেঞ্চিতে আমার দিকে মুখ করে বসে হেসে বললে—সেই কোন সকালে উঠেছি, এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হলুম।

এইবারে আমিও তাকে দেখলুম। তার ভাইকে ডাকাব সুরে যে রস ঢেলে দিয়েছিল তার মুখের ভাবেও সেই একই রস আমার ভিতরটা করুণায়, মায়ায়, ভালোবাসায় তার প্রতি ভরে দিলে।

বছর আঠারো-উনিশ বয়স হবে তার, ছিপছিপে গড়ন, পরণে কালো নরুন পাড় সাদা শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে একটি সাদা জামা, তার উপরে পাতলা সাদা সরু মুগা পাড়ের একটি ওড়না জড়ানো। দু'হাতে দু'গাছি সরু সোনার চুড়ি, গলায় সরু একটি সোনার চেন, বাম বাহুতে কালো সূতোয় বাঁধা একটি তামার ছোট্ট কবচ। সূতোটি যখন হাতে বাঁধা হয় তখন বোধহয় মাপ ঠিকই ছিল, এখন সেটি অনেকখানি ঢিলে হয়ে গিয়ে বারে বারে নেমে আসছে। বর্ণ তার উজ্জ্বল শ্যাম, মুখের গড়ন আগে বোধহয় গোলই ছিল এখন গাল দুটো ভেঙ্গে পড়াতে লম্বাই দেখায়। কপালের দু'পাশ থেকে চুলগুলি নেমে এসে আবার পিছনে সরে গিয়ে ছোট কপালের গড়নটি আরো সুন্দর করেছে। ভুরু দু'টি বেশি টানা না হলেও বাহার আছে তাতে। তার মুখের মধ্যে সব চেয়ে আগে নজরে পড়ে তার কালো কালো করুণ ডাগর চোখ দু'টি। সে চোখ তাকে যেন গোপন রাখেনি কোথাও। সব মনের কথা, বুকের ব্যথা চোখ দু'টিতে এনে ধরে সবার সামনে। দু'চোখের নীচে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালি পড়ে গেছে। নাকটি চলনসই তার, ঠোঁট দু'টি বেশি মোটাও নয়, সরুও নয়। কিন্তু তা'তে বিশেষত্ব এই যে যেটা আমার বড় ভালো লেগেছিল, যেজন্য তার মুখের দিকে সারাক্ষণ তাকিয়েছিলুম—তার উপরের ঠোঁটের এমন গড়ন যে সে গড়ন ঠোঁটের দু'পাশে বড় করুণ ব্যথভরা ভাব ফুটে রয়েছে। কোনরকমে

দেহে জড়ানো ধুতিখানার ভারও যেন টানতে পারছে না এমনি অবসাদ এসে গেছে তার মনে। চোখে, মুখে, দেহে চলনে, বলনে, ভাষায়, ভঙ্গীতে এই করুণ মূর্তি কি এক বেদনায় আমার মনপ্রাণ ব্যথিয়ে দিল। স্তব্ধ হয়ে বসে বসে তাকে দেখতে লাগলুম।

মেয়েটি ধীরে ধীরে উঠল, উঠে শিথিল হস্তে ওড়নাটি খুলে বেঞ্চির এক পাশে রাখল। বোঁচকা থেকে গামছায় জড়ানো ভিজে সাদা পেটিকোটটি বের করে, খুলে, ঝেড়ে, আমরা মাথার উপর বাঙ্কে মুখের সামনে মেলে টাঙিয়ে দিলে। মুখের সামনে এ রকমভাবে কোন কিছু ঝুলছে তা কোনদিন সয়েছি কিনা জানিনে। আর আজ ভিজে পেটিকোটটি হাওয়ায় পতপত করে উঠে এক একবার আমার নাকে-মুখে লাগছে কিন্তু কিছু বলতে পারলুম না। বরং ছোট শিশুর ছোট হাতের ছোট ছোট চাপড় মা নিজের গালে যেভাবে আদরের সঙ্গে অনুভব করে তেমনি আমি .যেন পরম আদরের সঙ্গে মেয়েটির এই সরল উৎপাত সইতে লাগলুম। মনের মধ্যে এক স্নেহস্নিগ্ধ ভাব মেয়েটির প্রতি অনুভব করতে লাগলুম।

মেয়েটি পিছন ফিরে মাঝের বেঞ্চিতে একটি আধ-ময়লা বিছানার চাদর পাট করে পাতলো, বালিশের উপর আর একটি নীল লাল সবুজ রঙের রেশমী সুতোয় পদ্মপাতা জল আঁকা পরিষ্কার বালিশ-ঢাকা টেনে টেনে সমান করে রাখলো। যেখানে শোবে বলে বালিশটি রাখলে, দেখি সে জায়গাটিতে আমারই পাশের জানালা দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি জানালার খড়খড়ি নামিয়ে দিলুম। হাওয়া বন্ধ হলে আমার গরম লাগতে পারে সে কথা মনে হলেও তাকে প্রশ্রয় দিতে পারলুম না। আজ যে এইটুকু গ্রামের মেয়ের একটুখানি সুখ-সুবিধের জন্য মুহূর্তের তরেও নিজেকে ভুলতে পারছি একথা মনে হতে প্রাণ ভরে উঠল গভীর তৃপ্তিতে। মনে হল যেন প্রানের ভিতরে কোনও সম্পদের সন্ধান পেলুম আজ, যা কেবল নিজেরই ভাবনা-চিন্তায় আড়াল করে রেখেছি এতকাল।

এতক্ষণে মেয়েটি শোবার জায়গাটি পরিপাটি করে পেতে বেঞ্চির একপাশে বসে মাথার কাপড় সরিয়ে দিয়ে এলো করে বাঁধা চুলের গোছা খুলে দিলে। কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ কালো চুল পিঠ ছাপিয়ে বেঞ্চির উপর লুটোলুটি খেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে নাকে এলো ভিজে চুলেব ভাপসা গন্ধ।

মেয়েটি দু'হাতে চুলগুলি নাড়া দিতে দিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কতদিন বাদে আজ চান করেছি, এতক্ষণে খুলবার ফুরসৎ পাইনি। বলে চুলগুলি দু'ভাগ করে চুলের ভিতর আঙুল দিয়ে নখ আঁচড়া দিতে লাগলো।

ওপাশের বেঞ্চিতে তখনও তেমনিভাবেই বরফ খাওয়া চলছে। শেষ বরফের চাকাটি নীল রুমালে জড়িয়ে সধবাটি কামরার কাঠের মেঝেতে দু'তিন আছাড় দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দু'জনে টুকরোগুলিকে ভাগাভাগি করে নিলেন। বড়টি গম্ভীরভাবে সেগুলোকে মুখে পুরলেন; ছোটটি গুঁড়ো বরফগুলি হাতে ঘষে দু'হাতে কপালে মুখে বুলিয়ে হাতমুখ ঠাণ্ডা করলেন। বড় টুকরোটি একবার মাথার তালুতে চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘষে, দু'বার দু'কানের পিঠে বুলিয়ে টুকরোটি মুখে পুরে রুমালটি কোমরে গুঁজলেন, শাড়িটা টানাটুনি দিয়ে ভাল করে পরে, মাথায় কাপড় দিয়ে সভ্যভব্য হলেন। বড়টিও উঠে গদরের চাদরটি ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। গাড়ি একটা স্টেশনে থামল। তাঁরা নামবার জন্য এপাশে দরজার কাছে এলেন। নামবার আগে বড়টি এই মেয়েটিকে একটু ঘুরিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললেন—এমনি করে ঘুরে বস খানিক, জানালা দিয়ে রোদ আসছে চুল শুকিয়ে যাবে শিগ্গিরই। বলে নেমে গেলেন।

এইবারে মেয়েটিও আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করতে লাগল। আমার ডান পায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—'দিদি পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো কেন? ফ্যান পড়ে গেছে বুঝি?'

মেয়েদের ফ্যান পড়া ছাড়া আর কিছুতে জখম হতে পারে না এ ধারণা বোধহয় সে করতেই পারে না কখনও। কোথায় ভাতের হাঁড়ি থেকে ফ্যান গালতে গিয়ে পা পুড়িয়ে ফেলা, আর কোথায় 'বাটা' কোম্পানির স্যাণ্ডেল পরতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা—ঐ দু'য়ের তফাৎ কত। কিন্তু তাতে ধাক্কা দিতে মন সরলো না। ঘাড় নেড়ে বললুম—হ্যাঁ ভাই তাই।

সে আমার আর একটু কাছে এসে বললে—তা দিদি, তোমার এমন সাদা-সিধে বেশ কেন? হাতে শুধু শাঁখা, পরণে মোটা শাড়ি, চুল রুক্ষু, সিঁদুর বাড়ন্ত, পায়ে আলতা নেই—

কত জায়গায় ঘুরেছি, কত ট্রেনে চড়েছি, কিন্তু নিজের বেশভূষা সম্বন্ধে এমন অপ্রস্তুতে কোনদিন পড়িনি, আজ যেমন পড়লুম এই এইটুকু বালিকার এই অবাক চাউনি ও একান্ত সবলসহজ প্রশ্নতে। কি বলব ভেবে পেলুম না, দু'হাতে কপালের দু'পাশের এলোমেলো চুলগুলি সরাতে লাগলুম।

মেয়েটি বাঙ্কের উপর তার বড় ট্রাঙ্কটির দিকে তাকাতে লাগল, বললে—'কি কবে ট্রাঙ্কটা খুলি। অত উঁচুতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুলতে গেলে যে মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

আমি বললুম—'ট্রাঙ্কটা খুলবার কি নিতান্তই দরকাব তোমার?'

সে মাথা হেলিয়ে জানালে, হ্যাঁ।

আমি উঠে ট্রাঙ্কটা ধরে টান দিলুম, অত্যন্ত ভারী, দু'হাতে ধরে সহজে নামাতে পারব বলে ভরসা হল না। চেয়ে দেখি মেয়েটি এগিয়ে আসছে আমাকে সাহায্য করতে। তাড়াতাড়ি সে ধরবার আগেই কোন রকমে অতি কষ্টে ট্রাঙ্কটি নামিয়ে দিলুম। হাতে খুব লাগল কিন্তু তাকে যে কষ্ট কবতে দিলুম না এই আত্মপ্রসাদ আমায় তা ভুলিয়ে দিলে।

মেয়েটি ট্রাঙ্ক খুলল। দেখলুম ভিতরে খানকয়েক কালো পাড় মিলের শাড়ি, দু'তিনটি জামা, দু'টি পেটিকোট, একটি মশারি, দু'টি ছোবড়া ছাড়ানো নারকেল, একটি মুখ বাঁধা মাটির হাঁড়ি। সে বললে—'মা'র জন্য কাসুন্দি নিয়ে যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ি থেকে। আমার বাপেব বাড়িতে কাসুন্দি কবতে নেই, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—মা কোনটি খেতে ভালোবাসেন সংগ্রহ করে আনি। নয়ত প্রাণ কাঁদে। নারকেল দু'টিও শ্বশুরবাড়ির গাছের। এবারে চন্দ্রপুলি গড়তে শিখে এসেছি, মাকে কবে খাওয়াব।'

ট্রাঙ্কে আরো কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসের নিচে ছিল একখানি চামড়ার ছোট সুটকেশ। সেখানি খুলে তার ভিতর থেকে বের করল একটি সুগন্ধি তেলের শিশি, একটি ছোট আয়না ও গোলাপী রঙের একটি চিরুনি। বের করে এইসব হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি অবাক হয়ে হাত দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রেখে বললুম—ওকি—কি হবে ওসব দিয়ে? সে ডাগর ডোগর চোখ মেলে করুণ ঠোঁটে হাসি টেনে বললে—'ভালো লাগছে না দিদি তোমাকে এভাবে দেখতে। একটু সাজিয়ে দিই আমার নিজের হাতে, মানা কোরো না।'

চমকে হাত সরিয়ে নিলুম। কাকে বাধা দিতে যাচ্ছিলুম! কি অধিকার আমার—কি স্পর্ধা রাখি এমন আদর মাখা আব্দার অগ্রাহ্য করবার! আজ এই সরল মেয়টির কাছে আমার বেশভূষা মান-সম্ভ্রম সবকিছু হার মেনেছে যে। নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে আভিজাত্য বজায় রাখব এরই কাছ থেকে? আর তাকেই বলি আমরা আভিজাত্য, শিক্ষা, সভ্যতা?—ছেড়ে দিলুম নিজেকে তার হাতে। একবার শুধু বললুম—'তোমার অসুস্থ শরীর'—

সে বললে—'তা হোক। আমার যে আনন্দ হচ্ছে তোমায় সাজিয়ে সে তো আর পাব না। রোগ

তো চিরকাল আছেই আমার।' বলে আমার সামনের চুলে চপ্‌চপে করে তেল মাখিয়ে চুল আঁচড়ে দিতে লাগলো।

বললুম—'কোত্থেকে আসছো? কোথায় যাবে?'

সে বললে—'খুলনা থেকে আসছি, সেখানেই আমার শ্বশুরবাড়ি। সেই কোন ভোরে না খেয়ে না নেয়ে মোটরে চড়েছি, বেলা একটায় হাওড়ায় এসে পৌঁছলুম। মেয়েদের বিশ্রামের ঘরেই চান সেরে নিলুম। শরীরে তো বল নেই মোটেই, এটুকুতেই কত কষ্ট হচ্ছে। নেহাৎ বাপের বাড়ির ছুতোস দিদি, তাই পরশুদিন অন্নপথ্যি করেছি আর আজই কি এতখানি পথ আসা সম্ভব হত? এ যদি বাপের বাড়ি না হয়ে শ্বশুরবাড়িতে যেতে হত তাহলে আজই বোধহয় আমার আবার জ্বর এসে যেত', বলে একমুখ হেসে উঠল।

চুল আঁচড়ানো শেষ করে তার গামছা হাতে জড়িয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিয়ে আমার থলে থেকে সিঁদুরের কৌটা বের করে চিরুনির মাথায় আঙ্গুলে করে সিঁদুর নিয়ে আমার সিঁথেয় লম্বা করে সিঁদুর পরিয়ে দিলে। মনে মনে ভাবলুম, যাক্‌গে বোলপুরে যখন নামবো মাথার কাপড়টা কপাল অবধি টেনে দিলেই আমার এই কেশবিন্যাস কারো চোখে পড়ার লজ্জা থেকে রেহাই পাব। ইতিমধ্যে দেখি মেয়েটি গোলাপ ফুল আঁকা পুরানো একটি নীল রঙের 'রোজ' পাউডারের টিন—বোধহয় তাব বিয়েতে বাপের বাড়ি থেকে বাক্স সাজিয়ে দেবার সময় নানা মনোহারী জিনিসের সঙ্গে এইটিও পেয়েছিল, তা থেকে খানিকটা পাউডার বাঁ হাতের তালুতে ঢেলে ডান হাতের আঙুলে করে আমার মুখে মাখাচ্ছে। তখন আমার কি অবস্থা মনের! তার কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই. পরম নিশ্চিন্ত মনে যতখানি পুরু করে পারলে আমার মুখে পাউডার মাখিয়ে চলল।

পাউডার মাখানো শেষ হলে আমার মুখখানা এপাশ-ওপাশ করে ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললে—'দেখ তো দেখি, কেমন দেখাচ্ছে এখন।' বলে খুব বিজ্ঞের মতো আমার মুখশ্রী দেখতে দেখতে নিজের কৃতিত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ও তার কাজের প্রমাণস্বরূপ আমাণ মুখেব সামনে আয়নাটি ধরল। আয়নাতে আমার সে সজ্জিত মুখ দেখে হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারলুম না। তবু মুখে হাসি টেনেই বললুম—'বাঃ বেশ সুন্দরই তো দেখাচ্ছে আমাকে।'

একথা শুনে খুশিতে সে যেন ফেটে পড়লো।

চিবুনিখানা হাতে নিয়ে বললুম—'এস, এবাব তোমার চুল আঁচড়ে দিই!'

সে তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে চিরুনিখানা ছিনিয়ে নিয়ে সামনের চুলটা দু'-চারবার আঁচড়ে টান করে চুলের গোছা হাতে জড়িযে হাত খোঁপা বেঁধে নিয়ে ট্রাঙ্কে চিরুনি আয়না পাউডারের কৌটে বন্ধ করে আমার কাছটি ঘেঁষে বললে—'সে হবে না দিদি, মিছে কেন সময় নষ্ট করবো আমার জন্যে, তার চেয়ে যতক্ষণ পারি তোমার সঙ্গে গল্প কবি বরং।'

কি ছিল যে মেয়েটির মধ্যে যা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে।

তাকে আরো কাছে টেনে বললুম—'আচ্ছা, তাই বলো, গল্পই শুনি আজ তোমার কাছে।'

ব্ল্যাক আউটের জন্য ট্রেনে বাতি নেই, বাইরে সন্ধ্যে হয়ে গেছে খানিক আগে। অন্ধকারে আবছা আলোতে জানালার পাশে অতি স্নেহ ভরে তাকে কোলের কাছে নিয়ে বসে আছি।

সে বললে—'তের বছর পেরিয়েছি এমনি সময়ে বিয়ে হল আমার। এমন অবস্থা হবার আগে কলকাতায়ই থাকতুম, মাসে এই রাস্তা দিয়ে দু'বার যাতায়াত করতুম, মা-বাবাকে দেখে আসতুম। তখন সেখানে থাকতে ভালোও লাগত। কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না। একদিন, দু'দিন—ব্যস্‌।

তিন দিনের দিনই কেমন লজ্জা লজ্জা করতে থাকে, এ মুখ আর কাউকে দেখাতে ইচ্ছে করে না। আবার শ্বশুরবাড়ি চলে আসি। সেখানেও কিছুদিন পর মন ছটপট করে। কি করি কোথায় যাই মন হয়। তার উপর শরীরও ভেঙে পড়েছে।'

বললুম—'কি অসুখ তোমার?'

সে বললে—'অসুখ কি আর দিদি একটা? ম্যালেরিয়া ধরেছে, মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বুক ব্যথা করে। ব্যাধি ব্যাধি, দিদি, চারদিকেই আমার ব্যাধি।'

গায়ে তার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। সত্যিই তো ব্যাধি, ব্যাধি যে ওর দেহে মনে সব জায়গাই। এইটুকু প্রাণ, এইটুকু দেহে এরই মধ্যে ব্যাধিতে ছেয়ে গেছে। এমনি হয়তো আজ আমাদের প্রতি ঘরে ঘরেই, কে কার খবর রাখে, কেই বা তাদের এ থেকে বাঁচিয়ে উদ্ধার করে।

থুতনি ধরে তার দিকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিলে—

ডাকলে—'দিদি'—

বললুম—'কি বোন বল?'

সে বললে—'কর্ম মহা জিনিস জীবনে—না দিদি? এই তো আমিই বুঝি আমার জীবনে। এই শরীর নিয়ে কাজ করতে পারিনে। অবিশ্যি শাশুড়ী আমার দেবী, আমার হয়ে সব কাজই করে দেন। গিন্নিবান্নী মানুষ—তাঁর নিজেরই কত কাজ থাকে, তার উপরে আমার যা করণীয় কাজগুলি তাও সব তিনিই করেন, পাছে অন্য কেউ কিছু বলে। পাঁচ জনের সংসার তো? পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবেই। তাই শাশুড়ী আমায় খুব রেখে ঢেকে চলেন। তবু যখন খেতে বসি, খাবার মুখে তুলি তখন ভিতর থেকে কেমন লজ্জা করতে থাকে। কাজ করলুম না কিছুই, ভাতের গ্রাস মুখে তুলি কি করে? তাই যাচ্ছি বাপের বাড়িতে, এবারে বেশ কিছুদিন থেকে শরীর সারিয়ে তবে ফিরব সেখানে। শাশুড়ীর অবশ্য কষ্ট হবে, তিনি আমাকে বড় ভালোবাসেন। আপন গর্ভধারিণীর চেয়েও বেশি, তিনি সত্যিই দেবী।' বলে দু'হাতে এক করে কপালে ঠেকালে। তারপর কি কথা মনে পড়তে ফিক করে হেসে বললে তবে কিনা জানো দিদি—তা দোষ করলে তো বলবেনই সেটা। বকুনিও একটু দেবেন বৈকি—নইলে আমার দোষ শুধরাবে কি করে? আমার ভালোর জন্যই তো বলেন। আমি আবার থেকে থেকে দোষও করে ফেলি কিনা? কি ধরণের দোষ দিদি জানো? এই ধর না সেদিন পুকুরে নাইলুম, পুকুরে নাইলেই আমার আবার জ্বর হয়। তা এমন যন্ত্রণা হয় এক এক সময়ে, রোগে ভুগি, দিনের পর দিন চান করতে পাইনে, দেহের জ্বালা মনের জ্বালা—জ্বলে যায় সব। দেখ না দেখ কেউ যখন কোথাও না থাকে চুপিচুপি পুকুরে গিয়ে পা ডুবিয়ে বসি। বেশ ঠাণ্ডা লাগে আর একটু নেমে যাই, লোভ হয়—আর একটু নামি জলে, আর একটু আর একটু, এই করে করে গলা জলে নেমে যাই। তারপর হয় কি—আর একটু নামলেই আবার ডুবে যাবো তো—তাই পা দুটো আলগা করে দিই, ভেসে উঠি। ভেসে উঠতেই এদিকে আবার নতুন সাঁতার কাটতে শিখেছি, লোভ সামলাতে পারিনে। আস্তে আস্তে একটু হাত-পা দুটো নাড়ি, খানিকটা এগিয়ে যাই—তাহলে সাঁতার কাটা হলো তো একটু? তা না হয় কাটলুম কিন্তু মুস্কিল হয় ঐখানেই, ঠিক সেইদিন রাত্রেই আমার জ্বর আসে। তাই শাশুড়ী আমাকে পুকুরে নামতে দেখলেই বকুনী দেন খুব।

'সেদিন হয়েছে কি আমার বড় ননদের ঘরের মেজ ভাগ্নেটি 'অশথ নারাণ' করে। মাথার উপর পাঁচটি অশথ পাতা রেখে প্রত্যেকটির নামে পাঁচটি করে ডুব দেয়। গোটা মাসটা রোজই তাকে 'অশথ নারাণ' করতে হয়। সে এখন করেছে কি চার-পাঁচদিন 'অশথ নারাণ' ফেলে রেখে গিয়েছে

সেদিন সে চার-পাঁচদিনের 'অশথ নারাণ' করেছে, অনেকবার তো ডুব দিতে হয়েছে তাকে— ঘাটের কাছের জলটা ঘোলা হয়ে গেছে।

'সেদিন সবাই যখন এদিক-ওদিক কাজে ব্যস্ত আমি ঘাটে গিয়ে পা ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি, আর অমনি ইচ্ছে হল আর একটু যাই, আর একটু যাই সামনের জলগুলি তো ঘোলা— সেখানে ডুব দিলে চুলে কাদা জলে আঁট ধরবে—একেই তো চুল নিয়ে আমার বিষম বোঝা মনে হয়— তাই জলে নেমে একটু সাঁতার আমাকে কাটতেই হচ্ছে এমন সময়ে কোথা থেকে শাশুড়ী দেখে ফেললেন আমাকে। তিনি খুব বকুনি দিতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি উঠে চুল মুছলুম, গা মুছলুম, আর এক মনে ভগবানকে ডাকছি যেন এই বারের মতো তিনি আমার মুখ রাখেন। কিন্তু এমনিই আমার কপাল ঠিক সেই রাত্রে হু হু করে আমার জ্বর এলো।'—বলে মেয়েটি হি হি করে হেসে উঠলো।

শাশুড়ী শেষে আমার কাছে বসে আমাকে কত বোঝাতে লাগলেন, বললেন—'দেখ তো, তোমার ভালোর জন্যই তো আমি তোমাকে সাবধান করি। তোমার নিজের ভালো নিজে না বুঝলে কে বুঝবে? আমি আর কয়দিন? আমি চোখ বুজলে যে তোমার কি হবে সেই ভাবনাই আমাকে অস্থির করে দেয়।'

'সত্যিই দিদি, আমিই হয়েছি তাঁর বন্ধন, আমার জন্যে কত যে ভাবনা তাঁর। নিশ্চিন্ত মনে মরতেও পারবেন না বুঝি। অহরহ আমার ভাবনাতেই তিনি আকুল। আমি না মরলে তাঁর শান্তি নেই। তিনি বলেন, 'তোর মুখ চেয়ে সংসারে আছি, নয়ত কবে কোনকালে কোন তীর্থে গিয়ে পড়ে থাকতুম।'

তিনি দেবী, আমার কাছে তিনি মহাদেবী। আমারই অদৃষ্ট দিদি। আমার কপালে আছে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করা, তা খণ্ডাবে কে? নয়ত আমার স্বামী বিয়ে করবেন না, শেষে জোর করে বত্রিশ বছর বয়সে তাঁরা ছেলের বিয়ে দিলেন। স্বামী দেশে দালান তুললেন, নীচের ঘরগুলিতে সার্সি কপাট লাগালেন, দোতলায়ও দু'তিনখানা ঘর তুললেন, পুকুর কাটালেন, শেষ করতে পারলেন না— বিয়ের দু'বছর না পুরোতেই চলে গেলেন। সবগুলির দিকে তাকাই, অর্ধেক কাটা পুকুর তেমনিই পড়ে আছে। চারদিক যেন হাহা হাহা করছে। বুকের ভিতরটা কেমন করে দিদি। এই কলকাতা দিয়ে যখন যাওয়া-আসা করি—ভিতরটা জ্বলে খাক হয়ে যায়, বাইরে দেখাতে পারি না। হাসিমুখে চলি, পাছে কেউ মনে ব্যথা পায়। বাবার কাছে হাসিমুখে থাকি, বাবা আরও হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন। মাকে বলি, মা দেখতো আমি হাসছি আর তুমি অমনি করে কাঁদো তবে আমি থাকি কেমন করে? মা আরও বুক চাপড়ে চীৎকার করে কেঁদে ওঠেন। বলেন—'কী পাপ করেছিলাম আমি যে তোর এই মুখও আমাকে আজ দেখতে হচ্ছে।' ভাইরা কাঁদে, আমার কাছে কাছে থাকে, নানা গল্প করে ভুলিয়ে রাখে। শাশুড়ী কাঁদেন, আমার ছোট দেওরের নাম ধরে বলেন—'আমার সে গেল না কেন অমুকের বদলে। সে গেলে সে নিজের হাতে-পায়ে যেত, এমনি করে সবাইকে ভাসিয়ে দিয়ে যেত না। কালসাপ রেখে যেত না।' শাশুড়ীর দুঃখ আমার সহ্য হয় না দিদি। কাঁদতে পারি না, কারো সামনে কাঁদতে পারি না। কখন কাঁদি জানো? যখন তারা গঙ্গাস্নানে যায় তখন দোরে খিল দিয়ে কাঁদি, চানের ঘরে গিয়ে চান করতে করতে কাঁদি।

কাঁদিনি দিদি—স্বামী মারা গেলেন তখনও কাঁদিনি। হাসপাতালে ছিলেন, পেটে ক্যান্সার হয়েছিল। নয়-দশ বছরের নাকি রোগ— পেট থেকে গলা অবধি উঠেছিল। বাড়িতে যখন শেষ হয়ে যাবার খবর এলো, শাশুড়ী জা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি পরে যখন বুঝতে

পারলুম—'ফিট' হয়ে গেল আমার। দু'তিনদিন পরে ভালো করে জ্ঞান হল। শাশুড়ীকে অমনি করে কাঁদতে দেখে চুপ করে গেলুম।

'মেয়ে একটা হল আমার—স্বামী যখন মারা যান পাঁচ মাসের পেটে ছিল। সেই মেয়ে তিন মাসের হয়ে সেও মারা গেল। কোল থেকে মরা মেয়ে নামিয়ে দিলুম, তবু কাঁদিনি আমি। দেখলুম ভাসুর পাগলের মতো মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন। নিজেকে চেপে রাখলুম। পাষাণী আমি দিদি, পাষাণ নিয়ে গড়া আমার প্রাণ'—বলতে বলতে হু হু করে সে কেঁদে উঠল। বুকে চেপে ধরলুম তাকে। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। কী তাকে সান্ত্বনা দেব, একি ভাষায় কুলোয়? যে মা নিজের মৃত সন্তান কোল থেকে নামিয়ে দেবার সময়ও প্রাণ খুলে একবার কাঁদতে পারেনি, তার দুঃখ কি সান্ত্বনায় নরম হয়। কাঁদুক, এই কাঁদতে কাঁদতেই হয়তো একটু হাল্কা হবে বুকের বোঝা, আর যে অন্য পথ নেই ওর।

খানিক কেঁদে নিজেকে সামলে নিলে—বললে, 'দিদি কিছুই তো করতে পারিনি খুকুর জন্য। এখন তারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি 'স্মৃতি' করছি—দেখবে?'

আদর করে দু'হাতে তার মুখখানি নিয়ে দেখতে দেখতে বললুম—'দেখাও তো বোন আমার।' সে উঠে ট্রাঙ্ক খুলে কাঠের গোল ফ্রেমে জড়ানো একটি কালো সার্টিনের কাপড়ের টুকরো বের করলে। তাতে তার খুকুর নামে একটি কবিতা লিখে আগাগোড়া সোনালী রেশম দিয়ে সেলাই করেছে। বললে—'আর একটু বাকী আছে, শেষ হয়ে গেলে পরে বাঁধিয়ে রাখব।' আস্তে আস্তে অতি যত্নে দু'হাতে সেখানি হাতে নিয়ে দেখে আবার তার হাতে তুলে দিলুম, বললুম—'বড় সুন্দর হয়েছে।'

তার মুখ মাতৃত্বের গর্বে ভরে উঠল।

তারপর বের করলে ধুতি-জড়ানো কাঁচ দিয়ে বাঁধানো একটি কাঠেব ফ্রেমে মৃত স্বামীর সিঁদুর লেপা পদচিহ্ন।

বললে—'দিদি, আর তো কিছুই নেই, এখন এই আমাব সম্বল'—বলে সেখানি কপালে ছুঁইয়ে আবার রেখে দিলো।

বিমুগ্ধ করলো মেয়েটি আমাকে আজ তার সরল বিশ্বাসে, সহজ আচরণে, প্রাণভরা আদরে। কি বলব ভাষা নেই আমার। তাকে কাছে টেনে নিলুম। আমার বুকে মাথা এলিয়ে দিয়ে বললে—'দিদি, সংসারে আমি আর কিছু চাইনে, কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই আমার। শুধু এইটুকু চাই—সকলের মিষ্টি মুখ, সবাইকে যেন মনে করতে দেয় তারা আপনার আপনজন।'

তার মাথাটি আমার বুকে চেপে ধরলুম, ধীরে ধীরে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম, খানিকবাদে সে ঐভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল। বোলপুরে ট্রেন থামল, অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে আমার কোল থেকে তার মাথাটি নামিয়ে বালিশের উপর রেখে নিঃশব্দে দরজা খুলে নেমে পড়লুম। দু'গাল বেয়ে তখন আমার দরদর করে জল পড়ছে।

মরু-তৃষা

হাসিরাশি দেবী

যন্ত্র-দানবের বিরাট দেহ প্রায় একযুগ ধরে বসে আছে শহরের অর্ধেকের অধিকারী হয়ে—আর বাকী অর্ধেক ভরিয়ে রেখেছে ওরই সেবাইতের দল। ঘড়ির কাঁটায় সকাল ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের কানে গিয়ে পৌঁছায় ওর আহ্বান। কর্ম-যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে ঐ গুরু-গম্ভীর তূর্যধ্বনি সকলকে জানায় নিজের অস্তিত্ব, শক্তির সাফল্যে যার প্রতিষ্ঠা, আর ঐ প্রতিষ্ঠার পাদমূলে মাথা নত করে ফেলে ওর সেবাইতেরা—বিরাট লৌহ ফটক খুলে যায়, আবার বন্ধ হয় সকলের প্রবেশ শেষে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিল রেখেই ওরা যেন কাজ করে যায়, কোনও ক্ষণেই ভুল হবার উপায় নাই—যেন অভ্রান্ত।

দূর গ্রামে—ভাঙ্গা কোঠার দালানে বসে তামাক টানতে টানতে কারখানার কালো চিমনীটার অবিশ্রান্ত ধূমোদগার দেখে—আজ জগু ভাবে ওকেও একদিন এই ঘরের মায়া কাটিয়ে—ঐ দূর শহরে—ঐ চিমনীর তলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে চাকরির চেষ্টায়, নইলে দিন আর চলে না। যদিও আত্মীয় আত্মীয়ার বালাই নেই, তবু নিজেকে নিয়েও তো ভাবতে হয়। গাঁয়ে থাকে, তাস পাশা খেলে, আড্ডা দিয়ে আর উপার্জনের অভাবে আধ-পেটা খেয়ে আর কতদিন কাটবে!

জগু ভাবে—আর ছিলিমের পর ছিলিম নিঃশেষ করে ঝাড়ে, আবার সাজে। কিন্তু কোনও কাজই এগোয় না, বড়জোর থাকোহরির সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে সমালোচনা করে, কারণ— সেও আসে শুধু দুঃখ জানাতেই। কেউ কিছু না জানতে চাইলেও সহানুভূতির শুধু 'আহা' টুকুই ও শুনতে ভালবাসে, তাই উৎসাহিত হয়ে বলতে শুরু করে—

"তুমি তো আমার পর নও হে, বরঞ্চ আপনার আপনি সম্বন্ধ, তাই তোমায় বলতে আমার এক ফোঁটাও লজ্জা নেই—ভাবি—কি হবে তোমায় লুকিয়ে, তুমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছ না। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ—"

টেনে টেনে হাসা ওর স্বভাব। সেই সঙ্গে সঙ্গে—'তুমি' শব্দ ক্রমে 'তুই' হয়ে দাঁড়ায়। কালো, শিরওঠা সরু হাত দু'খানা নেড়ে চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে বলে—

"তারপরে জানিস, এই সংসারের দায়ে আমি সব খুইয়েছি মাইরি! আর পরের উবগার করা—ও, সে জানে দশখানা গাঁয়ের লোক। এই থাকোহরির মতো আর একটি লোক কেউ এ পিরথিবীতে খুঁজে বের করতে পারে? ফেলুক বাজী! বুকের পাটা থাকে, চলে আসুক থাকোহরির সঙ্গে বাজী জিততে, তবে বুঝবো মরদ।—"

হাতের চেটোয় একটা ছোট রকম কিল মেরে, সকলের মুখের দিকে একবার তাকায়, তাবপরে গলার স্বরটা একটু কোমল করে, একটু হেসে বলে—

"হুঁ, মোড়লী করে সবাই—কিন্তু কাজে করুক দেখি? সেটি হবার উপায় নেই। এখনও বলবে ও-পাড়ার হাবু বোস আর হাটখোলার পেঁচো ময়রা। সেই যেবার হাবুর ছেলেটাকে সাপে কামড়ায়, সেবারে কেউ গেল না ওঝা ডাকতে—শেষে গেল থাকোহরি। আর পেঁচোর দোকানে যেদিন চোরে

সিঁদ কাটে, সেদিন কোথায় ছিল পেঁচো, আর কোথায় ছিল পেঁচোর ইয়ারের দল? হুঁঃ, সে এই থাকোহরি ভাগ্যিস আসছিল তারিণীর বাড়ি থেকে তাস খেলে, তাই—"

এই পর্যন্ত বলে—সকলের মুখের দিকে তাকায়, হয়তো দুই-একটা বাহবা শব্দের আশা করে, কিম্বা আর কিছুর।

কিন্তু এ গেল তার বীরত্বের পরিচয়। দুঃখের পরিচয়ে গোটা দুই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—

"সেই যেবারে—আশ্বিনে বড় ঝড় হয়, জানো! যেবারে রায়বাবুর বাড়ির পিরতিমে গেল চুরমার হয়ে, আর সেই পাপে বাবুরা সবংশে নিধন হলো! সেইবারেই আমার বড় ভাই মারা যায় চাপা পড়ে। বড় ভাই বলে বড় ভাই! আমার চেয়ে সাত বছরের বড়, আর উপার্জনকারী ভাই। সে থাকলে আজ আমার ভাবনা কিসের? পায়ের ওপর পা রেখে জুড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতাম, কিন্তু কপালে নেই। তাই তিনি স্বগ্যে গেলেন, আর সব ভার পড়লো আমার ঘাড়ে। কি আর করি বল, নিজেও যদি একমুঠো খেতে পাই তবে ওরাই বা পাবে না কেন, এই ভেবেই সবাইকে এক জায়গায় করে রেখেছি। কিন্তু রাখলেই কি নিস্তার আছে—একে এই দিন-কাল, তাতে আয় নেই, তাই ভুবনা শালার দোকানের দেনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জানিস তো সব, শেষ সম্বল বো'র কাঁখের বেট ছড়াও গেল মার অসুখে—ঐ আশু কবরেজের খপ্পরে, আর ছাড়াতে পারলাম না।

নৈরাশ্যের কাতরতায় ভরা একটা সঘন নিঃশ্বাস ওর বুকের পাঁজর কয়টা কাঁপিয়ে এসে বাইরের আবহাওয়াটা ভারী করে তোলে। উপস্থিত সকলেই সকলের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কেউই উত্তর দেয় না। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়, আবার যেন একবার হাঁপ দিয়ে থাকোহরি বলে--"এখন কোলের মেয়েটাকে দুধের বদলে ফ্যান খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে, দুধ কেনবার পয়সা কোথায়? বলে, নিজেদের পেটেই দুবেলায় ভাত জোটে না, তার দুধ! আব কিই বা আছে, যা বেচে দুধ খাওয়াব! বাকী শুধু ভিটেটুকু। এঃ হেঃ হেঃ হেঃ।..."

আবার সেই টেনে হাসি! ও হাসির শব্দ কান্নার মত করুণ, তবু ও হাসে।

জগু দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে ভাবছিল, ঘরের ছাদটা মেরামত কবাতে না পাবলে এবারের বর্ষায় হয়তো সব সমেত একদিন পাতাল প্রবেশ করতে হবে, কিন্তু উপায়ই বা কি, তাতে তেমন পয়সাই বা কোথায় যা এই বেকার অবস্থায় কিছু খাওয়া খরচের জন্যে রেখে বাকী সে ঘর মেরামতে লাগাবে! তাছাড়াও মার রেখে যাওয়া গয়নাগুলো, যা এই কয় বছব মহাজনেব কাছে থেকে সুদে আসলে সমান হতে চলেছে, তাও উদ্ধার করা খুব দরকাব—নইলে আব চলে না।

এতগুলো ভাবনা যখন অসংলগ্নভাবে জগুর মগজে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে তাল ঠোকাঠুকি করছিল, তখন ধীরে ধীরে বাখারির দরোজা ঠেলে এলো থাকোহরি। থাকোহরির দৃষ্টি লোলুপ। জগুর সযত্ন রোপিত পুঁই মাচা, লঙ্কা গাছ থেকে আরম্ভ করে হাত দেড়েক চারা শাকের ক্ষেত পর্যন্ত এক নজরে দেখে নিয়ে দাওয়ায় উঠে এলো। মৃদু তিরস্কারের সঙ্গে বললে—"লাল শাকের ক্ষেত শুকিয়ে উঠেছে কেন? রোজ জল না দিলে গাছ বাঁচে? তোর যেমন কাজ!—"

জগু মুখ থেকে হুঁকা সরিয়ে বললে—"বোস।"

থাকোহরি বসলো দুই হাঁটু জড়ো করে, উবু হয়ে। চারিদিকে আর একবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বুলিয়ে বললে—

"খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে দিয়েছিস বুঝি? তো বেশ! বেশ! একদিক দিয়ে, মাইরি বলছি জগু, তোর মতো কাজের লোক আর আমি একটি খুঁজে পাইনে। এমন তোর...."

জগু ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললে—

"এখনও চানই হয়নি তার খাওয়া!"

পরে থাকোহরির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—

"তোমার?"

থাকোহরি যেন এই প্রশ্নটার জন্য তৈরী হয়েছিল। কপালে একবার করাঘাত করে উত্তর দিলে—"আমার খাওয়ার কথাও আবার লোকে জিজ্ঞেস করে! বলে কোথায় চাল আর কোথায় হাঁড়ি!"

এ প্রসঙ্গটার ইতি করতেই বোধহয় জগু এই সময় হুঁকোটা থাকোহরির হাতে দিলে, থাকোহরি নির্বাকে সেটায় পর পর টান দিতে লাগলো। কলকের আগুন শেষ হতে মুখ তুলে দেখলে জগু উঠবার উপক্রম করছে।

হুঁকোটায় শেষ টান দিয়ে থাকোহরি মুখের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"গোটাকয়েক টাকা ধার দিতে পারিস জগু? টাকা আষ্টেক, নেহাৎ কম করে পাঁচটা টাকা দে। দেখ আমার বড় টানাটানি—মানে বড় অসময়ে পড়েছ মাইরি, দে ভাই! কেনা গোলাম হয়ে থাকবো তোর। নইলে পাওনা টাকার জন্যে ভুব্‌না শালা..."

জগুর বড় বড় চোখ দুটো বিস্ময়ে আরো বড় হয়ে উঠলো। বললে—"আমি দেব তোকে টাকা ধার? পাগল হয়েছিস! পাবো কোথায়?"

থাকোহরি যেন অনেকটা আশা নিয়েই এসেছিল, তাই হতাশায় নুয়ে পড়লো, উত্তর দেবার মতো ক্ষমতা ওর রইল না। কিছুক্ষণ পরে, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উচ্চারণ করলে—

"পারবি নে?"

জগু নির্বাকে মাথা নাড়লে, থাকোহরিও হাতের হুঁকোটায় টান দেওয়া ভুলে নতমুখে বসে রইল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কেটে যাবার পরে জগু মুখ তুলে ডাকলে—"থাকোহরি! ওরে থাকো!"

থাকোহরি মুখ তুলে তাকাতে প্রশ্ন করলে—

"খুব বেশি দরকার?"

থাকোহরি জানালে হ্যাঁ।

জগু কিছুক্ষণ কি ভেবে উঠে ঘরে গেল, যখন ফিরে এলো তখন তার হাতে সোনার একটা শিলে আংটি ঝক্ ঝক্ করছে।

বার কয়েক সেটার দিকে তাকিয়ে বললে—

"আমার অবস্থার কথাও তো জানিস্, দিন তিনেক একবেলা খাচ্ছি, কিন্তু তবু...."

একটু চুপ করে থেকে যেন স্বগত বললে—

"আজ শুধু এইটুকুই বাকী ছিল, বাপের দেওয়া সখের আংটি! আজ তোর হাতেই দিই, নিয়ে যা থাকোহরি। কিন্তু...."

থাকোহরির দিকে তাকাতেই কৃতজ্ঞতায় সে কেঁদে ফেলার উপক্রম করলো।

বাধা দিয়ে জগু বললে—

"কিন্তু এক কথা—এটা ভুব্‌নাকে দিয়ে বলবে এক কুড়ির এক টাকার কমে আমি বেচব না, সোজা কথা। আর যে টাকা পাবে তার অর্ধেক আমার। তবে আমার নাম করিস না। সোজা বলবি অমুক লোকের আংটি, কারণ ওর সঙ্গে আমার রাগারাগি কি না!—নইলে আমিই যেতুম...।"

থাকোহরি আংটি নিয়ে পেছন ফিরে নামতেই জগু ফিরতি ডাকলে—"শোন্—"

থাকোহরি ফিরলো।

রুক্ষ্ম স্বরে যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করে জগু বললে—"মনে রেখো আমি শুধু হাতেও তোমায় বিশ্বাস করে টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে শোধ করা চাই; নইলে..."

থাকোহরি জগুর সে রুক্ষ্মতা গায়েও মাখলে না, এক মুখ দাঁত বের করে বললে—"তুই আমায় তেমনি পেলি জগু! এতদিন দেখেও তুই আমায় চিনলি নে?"

জগু কি একটা জবাব দিতে গিয়ে চুপ করে গেল।

এক হাতের তালুতে অন্য হাত ঠুকে, মুখখানা অসম্ভব রকম ভারি করে থাকোহরি বললে—"এটা জেনে রাখিস জগু, মরদকা বাত, আর হাতিকা দাঁত। এর নড়চড় হবার জো-টি নেই। মানে পৃথিবী উল্টে গেলেও একথা মিথ্যে হবার উপায় নেই। তেমনি মরদ এই থাকোহরি! কাউকে সে পরোয়া করে না। তা সে হোক না কেন ভুব্‌না আর হোক না কেন লাট-বেলাট! ওসব আমার কাছে নেই! সোজা মানুষ আমি, ওসব বেঁকা-চোরার ধার ধারিনে। জানিস জগু, এই তোর কাছ থেকে আংটি বেচার টাকা যেমন হাত পেতে নিচ্ছি, তেমনি, তিনমাস কেন—আসছে মাসে যদি না হাত উপুড় করে ফেরৎ দিয়ে যাই তো—আমার নামে খেঁকি কুকুর পুষিস্‌।"

জগু নীরবে বসে রইল, উত্তর দিলে না।

থাকোহরি যেতে যেতে জগুর সযত্নরোপিত পুঁই শাকের গোটা কয়েক ডাঁটা মুচড়ে ভেঙ্গে নিয়ে—জগুর বাড়ির পুঁইডাঁটা চচ্চড়ি খেতে যে অন্য পুঁইডাঁটার চেয়ে সুস্বাদু এই কথাটাই সবিস্তারে প্রকাশ করতে করতে বার হয়ে গেল। জগু কলকের ওপরে হাত রেখে দেখলে তাতে আগুন আছে কিনা, তারপরে বোধহয় আগুন না থাকাতেই সেটাকে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে বসে রইল পথের দিকে তাকিয়ে, থাকোহরি এখনি টাকা নিয়ে ফিরবে বলে।

রাত্রে ঘুমিয়ে লোকে যা স্বপ্ন দেখে তা ভালোই স্বাভাবিক, আর মনে থেকেও কোন লাভ নেই, কারণ কাজের স্রোতে ছেঁড়া সুতোর মতো এক এক করে ভেসে যায়। কিন্তু, যার সৃষ্টি হয় জাগরণে, দিনের আলোয়, অফুরন্ত অবসরে যার পুষ্টি, তাকে ভোলা যদিও সহজ নয়, তবু অকথা বিপর্যয়ে মানুষই মানুষকে উপদেশ দেয় এই বলে যে—ও তোমার নয়, তোমার সাজে না। তেমনি অকথায় জগুও।

বাপ যদুনাথ যখন ওর জগন্নাথ নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করে তখন ওর বয়েস আঠারো, তারপরে আজ কয় বছর ধীরে ধীরে কেটে গেছে। বাপের অভাবে, যদুর যা কিছু জমা ছিল ভাঙ্গিয়ে, আর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েও বেশ সয়ে এসেছিল। কিন্তু মুস্কিল করলে অর্থের অভাব। বাপের আশা ছিল ছেলে হাকিম হয়ে হুকুম করতে না পারলেও ফাঁড়িদার হতে পারে এবং সেই আশায় গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরের প্রাইমারী স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করেও দিয়েছিল। কিন্তু ছেলের লক্ষ্য ছিল বোধহয় অন্য রকম, তাই পথেই শ্লেট বই রেখে সোজা চম্পট দিতে ইতস্তত করতো না। কিন্তু আজ সে দিনের সঙ্গে আর ওর অকথার সঙ্গে অনেক পার্থক্য বলেই বোধহয় জগুর মনে দুঃখ হয়। সময়ে অসময়ে তাই কুলুঙ্গীতে তোলা সেই পুরোনো বই শ্লেটগুলো নাড়াচাড়া করে, আবার গুছিয়ে রাখেও। বটতলার ছাপা, রংদার দুই একখানা নভেল হাতে এলেও ফিরাতে পারে না, ছেঁড়া ঠোঙ্গা করা খবরের কাগজও পড়তে সাধ হয়। বিস্মৃত সুখ-স্বপ্নের রেশের মত হঠাৎ যদুর আশার কথা মনে পড়ে, হয়তো নিজেরও কোন সুপ্ত বাসনা ওর সঙ্গে জড়ানো ছিল—তারা আজ জেগে ওঠে বেদনার রাজ্যে, নিরাশার শয্যায়।

দুঃখ হয়, মায়া হয় ওদের দেখে। কিন্তু দেখেই বা লাভ কি? আর লাভ লোকসান খতিয়ে দেখার ধৈর্যও তো ফুরিয়ে এসেছে, তবু বেশ আছে সে। মাঝে মাঝে বিরক্ত করে শুধু ঐ থাকোহরিটা এসে, হয়তো বা ওর তাসের আড্ডায় টেনেও নিয়ে যায়।

আংটি সে নিয়ে গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে জগু স্থির করলে থাকোহরি হয়তো এবেলায় টাকা পায়নি, ওবেলা এসে দিয়ে যাবে।

কিন্তু, পরপর কয়দিন কেটে যাবার পরও যখন থাকোহরির দেখা পাওয়া গেল না, তখন ও সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লো।

প্রতিদিন দূরের ঐ কারখানার বাঁশী ডাক দেয়—হারানো স্বপ্নের এতটুকু সুর যেন ওর কঠোর স্বরে মিশানো আছে!

গামের এই সংক্ষিপ্ত জীবন, এই একটানা সুর—এই একতালে পা ফেলে চলার ওপরে একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে। সব একঘেয়ে, কিন্তু এরই বাধা কাটিয়ে সে চায় বৈচিত্র্যের মাধুরী।

কিন্তু তার উপায় কি? সব গেছে, শেষ সম্বল আংটিটা!...

মনে মনেই সে গর্জে উঠলো—

দাঁড়া হতভাগা!

*　　　*　　　*　　　*

রাত্রি গভীর। ঘুম ভেঙ্গে জগু শুনলে দূরে, কিছুদূরে বাঁশী বাজছে।

ও সুর সাধা যে কার হাতের, ও বাঁশী যে কে বাজায় তা বুঝতে দেরী হলো না, কারণ ও বড় পরিচিত।

জগু উঠে বসলো। বালিশের তলা থকে দেশলাই বের করে আলো জ্বাললে, তামাক খেলে। তারপরে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বার হলো বংশীবাদকের উদ্দেশ্যে।

নেশাখোর, ধাপ্পাবাজ হলেও থাকোহরির বাঁশী বাজানোর হাত আছে, ছোকরা উচ্ছন্নে গেল শুধু সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে।

কিন্তু, তাতে জগুর কি? চুলোয় যাক ওর সঙ্গী, আর চুলোয় যাক ও, জগুর চাই নিজের জিনিস, হয় আংটি, নয় টাকা।

থাকোহরি পরম নিশ্চিন্তে নদীর বালুচড়ায় বসে বোধহয় চোখ বুজিয়েই বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছিল! পেছনে, জগুর পায়ের শব্দে খেয়াল হলো না। খপ করে ওর চুলের মুঠি ধরেই জগু গর্জে উঠলো—

"তবে রে শালা—"

থাকোহরি শীর্ণকায়, জগুর তুলনায় দুর্বল। তাই বোধহয় লাগবার ভয়ে মাথাটাতে ঝাঁকানি পর্যন্ত দিলে না। কাতর স্বরে বললে—

"ছাড় ভাই জগু, লাগছে মাইরি!"

জগু চুলের মুঠি ছাড়ল বটে, কিন্তু ওর একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে। পাশে বসে পড়ে কাঠোর স্বরে বললে—"আংটি দে, নইলে এক চাপড়ে আজ যদি তোর জান না নিই তো—"

জগুর মুঠোর মধ্যে থেকেই থাকোহরির হাতখানা একটু কেঁপে উঠলো বলে মনে হলো, কিন্তু সে ক্ষণিকের। চটে উঠে থাকোহরি জবাব দিলে—

"আংটি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি নাকি যে চাইবা মাত্তর ফেলে দেব! চল আমার সঙ্গে বাড়িতে, ফেলে দিচ্ছি তোর আংটি। আমি খেয়ে ফেলিনি তোর জিনিস।"—

জগু উত্তর দিলে না, কিন্তু হাতের মুঠোটায় যেন আরও একটু জোর দিলে-বলে মনে হলো।

উঠে দাঁড়িয়ে থাকোহরি বললে—

"অত ছোট মন নিয়ে থাকোহরি বাস করে না, মনে রাখিস্ জগু। চল্ আমার বাড়ি— তোর আংটি যদি এখনি না ফেলে দিই তো আমার নামই থাকোহরি নয়, চল—"

জগু ওর পাশাপাশি চললো। হাত অনেক আগেই ছেড়েছিল, তবু পাশে পাশে যাওয়াই ভালো। কারণ ওকে বিশ্বাস কি! ও নেশাখোর, ধাপ্পাবাজ!...

মাটির দেওয়াল ঘেরা ও গোলপাতার ছাউনি দেওয়া মুখোমুখি কয়খানা ঘর, হাত তিনেক চওড়া হাতনে, আর তার কোলের কাছের ছোট উঠোনখানি বেশ পরিষ্কার, চাঁদের আলোয় যেন ধুয়ে যাচ্ছে।

প্রভুর পায়ের শব্দে জেগে বোধহয় পোষা কুকুরটা বার দুই ডেকে উঠলো, তারপর লুটিয়ে পড়লো পায়ের কাছে।

অন্ধকার দাওয়ায় ওপাশ থেকে থাকোহরির মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—"থাকো, এলি বাবা?"

থাকোহরি সে কথার কোনও উত্তর দিল না। হাতনের একখানা ছেঁড়া চাটাই পেতে জগুর উদ্দেশ্যে বললে —"বোসো।"

জগু বসলো।

এক কলকে তামাক সেজে এনে থাকোহরি জগুর হাতে দিয়ে বললে—"ব্যাপার কি জানো।"

জগুর তখন ব্যাপার জানার মতো সদিচ্ছা না থাকলেও হুঁকোর মায়াটাও ত্যাগ করতে পারলো না—নির্বাকে তামাক টানতে লাগলো।

থাকোহরি বললে—

"হুঁঃ! তারপর, ভুব্‌নাকে বললাম তোমার কথা। আংটিটাও দেখালাম, শেষে ও শালা বলে কি জানো? বলে ও সোনা পাকা নয়, খাদ মিশেল—তাই কুড়ি সে কিছুতেই দেবে না, আমিও সহজে ছাড়বার পাত্তর নই। বললাম সে হবে না, জগু আমার বন্ধু লোক, আর বিশ্বাস করে আমার হাতে যেখানে সোনার জিনিস ছেড়ে দিয়েছে, সেখানে কেটে ফেললেও আমি তার নেমকহারামি করতে পারবো না। এত কথা বলতে তবে ভুব্‌না এলো সোজা পথে। তাও পনেরোর বেশি কিছুতেই উঠলো না।—"

বলে দুটো টাকা ট্যাঁক থেকে বের করে জগুর হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর বাকি তের টাকার হিসেব মুখোমুখি চট্‌পট্ দাখিল করে ফেললো। জগু কোনও কথা বলতে পারলে না, টাকা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো—সেই সঙ্গে ডান হাতখানাও মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠে এলো থাকোহরির কাঁধ লক্ষ্য করে। কিন্তু কাঁধের ওপরে পড়লো না, পেছন থেকে বাধা দিল থাকোহরির মার কণ্ঠস্বর।

জগু ফিরে দেখলে কম্পিত হাতে প্রদীপ নিয়ে থাকোহরির মা ধীরে ধীরে এইদিকে আসতে আসতে স্নেহকাতর স্বরে বলছে—

"ভাত খাবি নে থাকো? একে বৌমানুষ, তাতে কচিছেলের মা, আর কত রাত তোর ভাত আগলে রান্নাঘরে বসে থাকবে, বলতো বাবা?"

জগুর মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা অজ্ঞাতেই যথাস্থানে ফিরে এলো। থাকোহরির মা এগিয়ে এসেছিল,

হাতের প্রদীপটা তুলে ধরে দৃষ্টির ক্ষীণতা দূর করার চেষ্টায় দুই চোখ বিস্ফারিত করে কিছুক্ষণ নির্বাকে জগুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরে বললে—

"ও, তুমি জগন্নাথ! ও পাড়ার যোদের বেটা! আমি বলি বুঝি আর কেউ..."

জগু নির্বাকে বিদায় নিলে।

নির্জন পথ চলতে চলতে হাওয়ায় তালপাতা পড়ার মড়মড় শব্দে ও একবার শিউরে উঠলো, তারপরেই মনে হলো হাতের তলায় থেকেও টাকা দুটো যেন বুকের মধ্যে আগুনের সেঁক দিচ্ছে।

* * * *

যন্ত্রদানবেরও দয়া আছে, তাই বোধহয় তার লক্ষ লক্ষ সেবাইতের নামের খাতায় একদিন জগুর নামটাও লেখা হয়ে গেল—

"শ্রীজগন্নাথ কাহার।"

মনের আনন্দে পিতৃ-পুরুষের ভিটেয় পুরাতন মরিচা ধরা তালায় চাবি লাগিয়ে জগু শহরের পথ ধরলো। লাল ধুলোয় ভরা সোজা, বেঁকা, উঁচু-নীচু পথ। প্রায় ক্রোশ তিনেক গেলে শহর।

তা হোক, তবু ওকে আজ এবেলার মধ্যে পৌঁছাতেই হবে, কারণ কাল সকাল থেকে কাজ আরম্ভ, আজ তার জোগাড় করতেই হবে, নইলে উপায় নেই। আর কি দরকার উপায়ের? এতদিন নিরবিচ্ছিন্ন আবদারের মধ্যে থেকে থেকে অবসরের ওপরে ওর একটা গভীর অবসাদ এসে গেছে। তাকে দূর করতে হবে নূতন জীবনের প্রারম্ভে, নব কাজের প্রেরণায়। তাই চাই আজ ঐ একটানা ব্লকের একখানা ঘর। নিজের নামের ঘরখানাকে মনের মতো সাজাতে গোছাতে, যাতে সামনের কাজের সাতটা দিন কোনও রকমে পার হয়ে যায়। তারপর আবার দেড়দিন ছুটি, শনি রবিবার।

এ ছুটি অবসাদ ভরা নয়, জীবনের চাঞ্চল্যে ভরপুর —আনন্দে উজ্জ্বল।

সত্যিই জগু একসঙ্গে পেল অনেকগুলো জিনিস—ঘর, কাজ ও সঙ্গী। কাজ সে নিয়মমতই করে। ঘরখানাও যাহোক কিছু দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে, আর সঙ্গী অর্থাৎ সুধুয়ার গল্প, রাইচাঁদের দেশের কাহিনী আর ফকিরের ভাঙ্গা বেসুরো হারমোনিয়ামের সঙ্গে তেমনি বেখাড়া গলার গান শুনে শুনে মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে।

তবু হঠাৎ মনে পড়ে যায়, থাকোহরির শুকনো মুখ আর ভুবনার তাগাদা। ওগুলো জীবন থেকে নিশ্চিহ্নে মুছবার জন্যেই ও রোজ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে সিদ্ধি খায়—হারমোনিয়ামের পর্দায় পর্দায় সুর তুলে চীৎকার করে—

"যতদিন দেহে প্রাণ রহিবে..."

তাসের আড্ডা আজও জমে ওঠে, কিন্তু থাকোহরির দাওয়ায় নয়, ফকিরের ঘরে। সেখানে প্রদীপের বদলে কোনওদিন বা কেরোসিনের ডিবে জ্বলে জ্বলে অনবরত ধূমোদগার করে, আর ঐ আলোয় চেষ্টা করে দেখা যায়—ঘরের দেয়ালে আঁটা বিড়ির বিজ্ঞাপন, কালীঘাটের কালীর পট কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের লীলার দুই-একখানা ছবি। হয়তো রেশমী চুড়ির শিকল, আর ধূলি-মলিন কাপড়-জামা।

দড়ির খাটিয়ায় বসে ওরা তামাক, নয় বিড়ির বাণ্ডিল মিনিটে মিনিটে ধ্বংস করে। সেই সঙ্গে চলে গান, গল্প আর খেলা, রাত দশটা পর্যন্ত।

প্রায় বছরখানেক পরের কথা।

ছুটির দিন। দরোজার ফাঁক দিয়ে চোখে সকালের আলো এসে লাগলেও জগু বিছানা ছাড়েনি— ওঠেনি, দরজাও খোলেনি।

হঠাৎ বাইরে থেকে বন্ধ দরোজার ওপরে কে আঘাত করে ডাকলে "জগু"!

এ কণ্ঠস্বরে সুধুয়া, ফকরে কিম্বা রাইচাঁদের নয়—তাই উঠে দরোজা খুলেই চমকে উঠলো—দেখলে সামনেই থাকোহরি দাঁড়িয়ে—

থাকোহরিও যেন জগুকে দেখে চিনতে পারছে না, তাই যেন নিষ্পলকে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। ওর বুকের সব কয়খানা পাঁজরা গুণে নেওয়া যায়, চোখ প্রায় আধ ইঞ্চি বসে গেছে। মাথার চুল বড়, রুক্ষ্ম, হাওয়ায় উড়ছে।

এ যেন এক বছর আগের সে থাকোহরি নয়, তার কঙ্কাল।

জগুর জিহ্বা যেন অজ্ঞাতে উচ্চারণ করলে।

"থাকোহরি!"

থাকোহরি তাকিয়েই ছিল। শান্ত, অথচ কাঁচের মত উজ্জ্বল সে চোখ। ধীর স্বরে উত্তর দিলে—

"হ্যাঁ আমি। টাকা চাইতে এসেছি জগু, এই শেষবার, আর কখনো চাইবো না, মাত্তর দশটা টাকা ধার দে জগু—

জগু বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল।

থাকোহরি অন্য কোনও দিনের মত এগিয়ে এসে জগুর পা জড়িয়ে ধরলে না, কাঁদলেও না; যেমন শান্ত ধীর স্বরে আগে কথা বলেছিল ঠিক তেমনি স্বরেই বললে—

"ভুবনা টাকার জন্য আমার মাকে মেরেছে। বৌকে..."

ওর গলার আর স্বর বার হলো না। কিন্তু জগুর মন তখন পাথরের মত শক্ত, থাকোহরির পূর্ব অপরাধের অধ্যায় পর পর ওর মনে ভেসে উঠলো। মনে হলো ওকে বিশ্বাস করা উচিত নয়. কারণ ও মাতাল, বিশ্বাসঘাতক, ধাপ্পাবাজ!

অসহ্য রাগে কাঁপতে কাঁপতে জগু কয়েক পা এগিয়ে এলো, থাকোহরির জীর্ণ-শীর্ণ দেহে একটা ঠেলা দিয়ে চীৎকার করে উঠলো—

"কিছু শুনতে চাইনে, বেরো তুই এখান থেকে, বেরো বলছি, নইলে ঠেঙিয়ে পা ভাঙবো তোর..."

মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে থাকোহরি কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিলে তারপর একবার মাত্র জগুর আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল।

সারাদিন মনটা বড় খারাপ, কিছুই ভালো লাগছে না। সুধুয়ার রসিকতা, রাইচাঁদের দেশের কাহিনী আর ফক্‌রের গান, সবই যেন কেমন একঘেয়ে লাগছে।

ভালো নয়, দুনিয়ায় কিছু ভালো নেই, কেউ কারো ভালোও করে না। সব স্বার্থপর, ধাপ্পাবাজ, জুয়াচ্চোর। একা থাকোহরিই নয়।

থাকোহরি নীরবে চলে গেল, কিন্তু কেন?—বলবার মত কিম্বা জগুর কাজের প্রতিবাদ করার মত ক্ষমতাও কি তার ছিল না? কিম্বা বলতে এসেছিল—"ভুব্‌না, পাওনা টাকার জন্যে বাড়ি এসে ও বুড়ী মাকে মেরেছে, আর কাউকে..." কথাটা ভালো করে শোনাও হয়নি। কিন্তু এতক্ষণ পরে মনের একটা অজ্ঞাত স্থান যেন বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠলো, সেই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো থাকোহরির মায়ের মুখের সঙ্গে তারও মরা মা-বাপের ছবি, এমনি কাতর এমনি অসহায়তার সাদৃশ্য। আজও সেখানে সাত পুরুষের ভিটের গাঁথুনি মাটির মধ্যে মিশে যায়নি—তাই আজও সেই দূরের পানাপুকুর, উঁচু-নীচু গ্রাম্য পথ, বন-জঙ্গলের সঙ্গে দুর্বল, স্নেহকম্পিত হাত বাড়িয়ে ক্ষীণ স্বরে মনের এক পাশ থেকে ডাক দিচ্ছে। সেখানে আজও নদীর বালুচড়ায় থাকোহরির বাঁশী বাজে, বনবীথির মধ্যে থেকেও নিরাশ অবসরে পাখীর কূজন কানে আসে।

জগু চঞ্চল হয়ে উঠলো—

না, থাকোহরিকে অমন করে তাড়ানো ভালো হয়নি।

*   *   *   *

ঘরের দরোজায় তালা এঁটে, ফকরে, সুধুয়া, রাইচাঁদকে বলে পরদিনই সকালে জগু বার হ’ে পড়লো, সোজা গ্রামের পথ ধরে।

কতদিন...কতদিন গ্রামে যায়নি, এপথেও হাঁটেনি। গ্রামবাসীদের চেনা মুখগুলোও ভুল হয়ে এসেছে বোধহয়—কিন্তু...

ভাবতে ভাবতে সমস্ত পথটা এসে থাকোহরির বাড়ির কাছে ও থমকে দাঁড়ালো। থাকোহরির বাড়ি পুলিশে ভর্তি, পথের ধুলোয় পড়ে ওর মা কাঁদছে, বৌ বসে আছে নিস্তব্ধভাবে, কোলের মেয়েটা বোধহয় কেঁদে কেঁদে কোলের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

জগু এগিয়ে এলো।

রুদ্ধশ্বাসে ও যে খবরটার প্রতীক্ষা করছিল, তাই পেলে গ্রামবাসীর একজনের মুখ থেকে। কানের কাছে মুখ এনে সে ঘটনাটা ফিস্ ফিস্ করে শুনিয়ে দিলে—

“ভুব্‌নাকে খুন করে থাকোহরি কাল রাত্তিরেই পালিয়েছে।...”

নির্বাক দাঁড়িয়ে জগু অনুভব করলে পৃথিবী যেন পায়ের তলার থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে, কানে আসছে থাকোহরিব মায়ের করুণ ক্রন্দন।

এজাহারে জগু বললে—

“ও কাজ ও করেনি হুজুর, করেছি আমি।”

ওর কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা নাই, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

থাকোহরি যেন জগুর কথার ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গেল, কিন্তু পারলে না—বিবর্ণ ঠোঁট দুটো একবাব মাত্র কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

চাবিদিকের লোকজনের বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে—জগুর উদ্দেশ্যে আর দু’টি নারীর সজল চোখেব কাতব দৃষ্টি ভেসে এলো কৃতজ্ঞতা বহন করে।

জীবনের ক্ষেত্র আজ আরও বড়, আরও বিস্তৃত। সীমার ঐ ক্ষীণ রেখাটুকুও যে কোনও মুহূর্ত লুপ্ত হয়ে যাবে, তা জগু জানে কিন্তু সান্ত্বনা এইটুকু, যে আর কেউ কোনওদিন সাহায্য চাইতে আসবে না, থাকোহরিও নয়। কারণ, জগু আজ তার সব দেনা সুদ সমেত শোধ করে তাকে দিলে—সঙ্কীর্ণ জীবন, আর তার বদলে নিলে মৃত্যুর অপার মুক্তি। কারা কপাটের শিকল বাজিয়ে প্রহবী জানায় সে ঠিক আছে।

অন্য লোকে নিজেদেব মধ্যে বলা-কওয়া করে—লোকটা খুনী।

জগু ভাবে এ বরঞ্চ শেষ হল—

বড়বাবু এতদিন নিশ্চয় তার জায়গায় অন্য লোক ভর্তি করেছে। ফকরে, সুধুয়া, রাইচাঁদও এতদিন নিশ্চয় তার খবর পেয়েছে। এখন হয়তো জগুকে মনে পড়লে ওদের ভয় করে, কিম্বা ঘৃণা হয়। কিন্তু থাকোহরি! থাকোহরি তো তাকে জানে! হয়তো জানে বলেই আজও সময়ে সময়ে পাষাণ প্রাচীর ডিঙিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়—তারপর সেদিনের মত নির্বাক মুখে ধীরে ধীরে বার হয়ে যায়। তাহলেও বাইরে থেকে তার বাঁশী বাজে, আর সেই সুরের সঙ্গে ভেসে আসে ওর মা-বউযের রোদন ভরা কণ্ঠস্বর—ওরা যেন এক সঙ্গে জগুর আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করছে।

বিয়ে

প্রতিভা বসু

বৈশাখ মাসের আকাশ মুহূর্তে ভরে গেলো কালো মেঘে, প্রবল একটা হাওয়া দিয়েই ঝমঝমিয়ে নামলো বৃষ্টি। মেয়েরা যে যেখানে ছিলো ছুটে এসে জুটলো ঘরের মধ্যে, কেউ কেউ দৌড়লো জানালা বন্ধ করতে, কেউ আবার অকারণে চেঁচাতে লাগলো—যেন একটা উল্লাসের ধারাপাত হলো তাদের মধ্যে। তারপর সুস্থির হয়ে যখন সবাই বসলো একসঙ্গে, একজন বলে উঠলো, 'মালতী? মালতী? মালতী কই গেল?'

'মাঠেই তো ছিলো।'

'যখন মেঘ দেখলুম, তখন তো দাঁড়িয়ে ছিলো ভিজিটর্স-রুমের দরজায়।'

'আশ্চর্য মেয়ে, সত্যি! নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েছে। একদিন মিস মণ্ডলের খিঁচুনি শুনলেই ঠাণ্ডা হবে।'

'না, সখি—' এক গা জল দিয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে মালতীর প্রাবেশ। 'বৃষ্টি নামলো কেযা মজা। তাই ছুটলুম আনতে গজা।'

—'এই দ্যাখ—' বুকের কাপড়ের ভিতরে সযত্নে জল বাঁচিয়ে রাখা একটি মস্ত শালপাতার ঠোঙা বার করলো সে, তারপরে—মুটুর মুটুর করে খেতে আরম্ভ করে দিলো।

'এ্যাঁ!'

'তাই বল!'

'ওরে রাক্ষুসী!'

'আমাকে দে—'

'বারে! তুই তো সব খেলি—'

'চমৎকার!'

'বেঁচে থাক, মালতী!'

সমবেত কণ্ঠে নানা রকম ছোটো ছোটো ভাষা বুদ বুদ কবলো খানিকক্ষণ, তাব পরেই অত বড়ো ঠোঙাটি শূন্য।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ ভঙ্গীতে মালতী বললো,

'সখি—

ভালো হলো নাকি?'

'খুব ভালো হলো, একটি মেয়ে জড়িয়ে ধরলো তাকে। অবশিষ্টাংশটুকু চিবোতে চিবোতে আর একটি মেয়ে তারিফ করলো, 'তেওয়ারির বৌটা কী চমৎকার গজাই না ভাজে।' অন্য একজন শুয়ে পড়লো হাত-পা ছড়িয়ে। তারপর সকলেই বসে, দাঁড়িয়ে, হেলান দিয়ে—নানান ভঙ্গিতে গজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো, অনেকক্ষণ পরে মালতী বললো, 'ঘ্রাণেন অর্ধ ভোজনাং গজা গজা বলেও তো অনেকক্ষণ ধরে গজা খেলি, এবার দরকারি কথা শোন।'

'ওরে বাবা, তোর আবার দরকারি কথা হলো কবে থেকে?'

'আমি কাল পাটনা যচ্ছি।'

'পাটনা? কেন?'

একটি বাঙাল মেয়ে টেনে বললো, 'কোন কম্মে?'

'আমার পিতৃদেব শ্রীল শ্রীযুক্ত অবনীমোহন—'

'তোর বাবা লিখেছেন যেতে?'

'চিঠিতে তো তা-ই পড়লুম—'

'দেখি।'

'দেখবি আবার কি! লেখা আছে, আমার অতি যোগ্য, অতি বিদূষী একমাত্র কন্যা, পত্রপাঠ তুমি চলিয়া আইস'—আর মাতলা দিয়ে লিখেছেন "মা মালু, নয়নের কণ্টক আমার, জীবনের জঞ্জাল আমার, যদি না আইস তাহা হইলে—'

'ফাজিল!'

'ফাজিল? তোদের বিশ্বাস হলো না—'

'না, না, পাটনা যেতে হবে না এখন।'

'পিতার আজ্ঞা লঙঘন করা অতীব অন্যায়, সখি।'

'পিতারই বা এত জরুরি আজ্ঞা কেন—'

'নিশ্চয়ই আমার বিয়ে!'

'বিয়ে!'

'হুঁ, বিয়ে—। সে জন্যেই তো বলি :

দ্যাখো সখা ফস করে কিছু বোলো না—

ভালো যদি বাসো তবে কেন ছলনা!'

মালতী সুর করে গান আরম্ভ করে দিলো। হঠাৎ সমস্ত ঘরটি সচকিত করে মিস মণ্ডলের পদধ্বনি শোনা গেলো। বড়ো মাথায় ছোটো খোঁপা নিয়ে—ছোটো পায়ের পাতায় বৃহৎ শরীর ধারণ করে থপথপ করতে করতে এলেন তিনি।

'মালতী!'

'আজ্ঞে।'—মস্তক নত।

'তোমার বাবার জরুরি চিঠি এসেছে।'

'আজ্ঞে।'

'তিনি লিখেছেন—'

'আজ্ঞে।'

'তিনি লিখেছেন যে, আমি যেন অনুমতি দিতে দ্বিধা না করি—'

'আজ্ঞে।'

'দ্বিধা না করে কালই রওনা করে দিই।'

'আচ্ছা।'

'প্রস্তুত থেকো।'

'আচ্ছা।'

মিস মণ্ডল আবার থপথপ করে চলে গেলেন। মেয়েরা একটু অপেক্ষা করে হাসিতে ফেটে পড়লো এ-ওর গায়ে।

হাওড়া স্টেশন। হরেক রকম মানুষের হরেক রকম কণ্ঠস্বর। ইঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ, হুইসিল, বাঁশি, ভিড়।

সব কিছু অতিক্রম করে মালতী একখানা মেয়েদের সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে এসে কায়েমি হয়ে বসলো। কুলি সহাস্যে এবং সানন্দে এক টাকা বকশিশ পেয়ে বিছানা করে দিলো পরিপাটি করে। খাবার এনে দেবে কিনা জিজ্ঞেস করলো, তারপর এক তাড়ায় ছিটকে অনেক দূরে সরে পড়লো। জানলা দিয়ে এবার মুখ বার করলো মালতী। দুই চোখে শিশুর কৌতূহল নিয়ে চেয়ে রইলো বাইরে। তারপর ঘণ্টা পড়লো, নিশেন উড়লো, হুইসিল বাজিয়ে হেঁটে গেল গার্ড—গাড়ি চলতে লাগলো। তখনো প্ল্যাটফর্ম ছাড়েনি—একটি যুবক ছুটতে ছুটতে এসে লাফিয়ে উঠলো সেই পা-দানিতে—হাতে ঝোলানো ছোটো স্যুটকেসটি ছুঁড়ে দিলো ভিতরে, তারপর হাতল ঘুরিয়ে ঢুকলো নিজে। ঢুকেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো —'ও, এটা মেয়েদের গাড়ি!' অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গীতে স্যুটকেসটি আবার হাতে তুলে দরজার হাতল ঘোরালো।

মালতী হঠাৎ এ-রকম চলন্ত ট্রেনে যুবকটিকে উঠতে দেখে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিবোধ করেছিলো, কিন্তু তক্ষুণী আবার তাকে নামতে উদ্যত দেখে ঈষৎ চঞ্চলবোধ করলো। করছে কী লোকটা! পড়ে মরবে যে! 'এ কী! ট্রেন চলছে যে!' বলতে বলতে ভালো করে তাকালো সে যুবকটির দিকে, মুহূর্তে চোখ তার চিকচিক করে উঠলো। একটু বিস্ময়, একটু আনন্দ, একটু মজা, যেন বিগত দিনের কোনো কৌতুকের অস্পষ্ট স্মৃতি—সব কিছুর সমন্বয়ে মুখের ভাব তার কেমন হয়ে উঠলো। ঈষৎ লঘু কণ্ঠে বললো, 'আত্মহত্যা করবেন নাকি?'

'আজ্ঞে?' পুরু লেন্সের চশমাটিতে আলোর ঝলক লাগলো।

'ট্রেন তো চলেছে—'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নামছেন কেন?'

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে সেই হাতলের উপরেই হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেটি—একটু পরে বললো, 'আমি জানতুম না এটা মেয়েদের গাড়ি।'

'জানলেন বলেই বুঝি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন?'

'না, না—' অপ্রস্তুত গলায় যুবকটি বললো, 'মেয়েদের গাড়ি কিনা—'

মালতীর হাসি পেলো। কিন্তু মুখ গম্ভীর রাখলো সে।

'তা মেয়েরা তো আর বাঘ-ভল্লুক নয়—'

'না, না—'

'তাহলে ঝুলে না থেকে তো বসতেও পারেন।'

'আপনার অনুমতি পেলে—' বলতে বলতে সামনের বেঞ্চির উপর অতি সন্তর্পণে এসে বসলো সে। একটু স্বস্তির রেখাপাত হলো মুখে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বাইরের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললো, 'গার্ড এসে না ফ্যাসাদ করে।'

'না, গার্ডের অত শিভালরি নেই যে চলন্ত ট্রেনে উঠে এসে আপনাকে শাসন করবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ধন্যবাদ!' মালতী ভুরু কুঁচকোলো। 'ধন্যবাদ কেন? গাড়ি বানালো ইংরেজ, টিকিট কিনলেন আপনি, আর ধন্যবাদ পাবো আমি?'

'বাঃ, এটা যে মেয়েদের গাড়ি।'

'না, না—' মাথা নেড়ে মালতী আপত্তি জানালো, ও-সব মেয়েদের কামরা, মেয়েদের সীট, মেয়েদের পার্ক, মেয়েদের দোকান—এ-সবের মধ্যে আমি নেই। মেয়েদের আবার কী? মেয়েরা কি কোনো আলাদা জগতের আলাদা জীব?'

'না, তা বলিনি—' ছেলেটি একটু দিশাহারাবোধ করলো।

'তবে আর কী—' হঠাৎ মালতী কথাবার্তা চুকিয়ে দিয়ে মস্ত মোটা এক বই খুলে মুখের উপর আড়াল করলো।

যুবকটি একটুক্ষণ তাকিযে রইলো, তারপর গুছিয়ে বসে স্যুটকেস খুলে সেও বার করলো মোটা নীল রঙের বই।

সময কাটতে লাগলো নিঃশব্দে। ট্রেনের আওয়াজ দ্রুত হলো।

খানিক পরে—'আপনি কদ্দূর যাবেন?' বইয়ের আড়াল থেকেই প্রশ্ন করলো মালতী।

'উঁ— ' বই থেকে মুখ ঘোরালো ছেলেটি—তার চোখের ভাবে বোঝা গেলো সত্যিই সে মগ্ন হয়ে পড়েছিলো বইয়ের অক্ষরে—'কিছু বলছেন?'

'না, বলছিলাম যে এব পরের স্টেশনে নেমে যাবেন তো?'

'হ্যাঁ' বলিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু একটুখানি রসিকতার লোভ সংবরণ করতে পারলো না যুবকটি। বইটি বন্ধ করে পাশে রেখে বললো, 'নেমে যাবো কেন?'

'কেন মানে? এটা তো মেয়েদের গাড়ি।'

'তাতে কী। আপনি তো আর সে সব মানেন না।'

'না।'

'তবে?'

'তবে? তবে গার্ড আপনাকে নামিয়ে দিয়ে সেই বসে যাবে পাহারায়—অন্তত আপনি যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ তো নিশ্চয়ই।'

মুখের উপর থেকে বই সরালো মালতী—তার গৌরবর্ণ মুখ হাসির আভায় উজ্জ্বল বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে কপালের উপর—যুবকটি এতক্ষণে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলো মালতীকে। প্রায় অন্ধ দৃষ্টি অনেকক্ষণ স্থাপিত করে রাখলো সেই মুখের উপর, তারপর মুখে একটা হাসির আভা ফুটলো—পরিহাসের সুরে বললো, 'তাতে তো বড় ভাবনার কথা। শেষে কি গার্ডের গার্ডগিরি করবার জন্য আবার আমাকেই থাকতে হবে?'

'অতএব পরের স্টেশনে আপনি নামবেন না?'

'না।'

'তবে থাকুন।' অত্যন্ত উদাসভাবে মালতী আবার বইয়ের পাতায় চোখ ডোবালো।

একটু চুপচাপ।

'বই পড়ছেন?' ছেলেটি বললো।

'দেখতে তো পাচ্ছেন।'

'খুব বই ভালোবাসেন বুঝি?'

'খুব।'

'আমিও ভালোবাসি। কিন্তু সজীব সঙ্গী কাছে থাকলে বইয়ে আমার মন বসে না।'

এবার বইটা আঙুলে বুজিয়ে মুখ ফেরালো মালতী—'আপনার ও-বইটা বোধহয় ইউজিন ও-নীলের নাটক?'

'আজ্ঞে।'

'মার্কো পোলোকে কেমন লাগছে?'

'ওটা তো একটা হতচ্ছাড়া।'

'আপনিও তাই।' বইয়ে পুনঃ মনোসংযোগ।

'এ কিন্তু আপনার খুব অন্যায়।'

'অন্যায়টা কী?'

'আমি কেন মার্কো পোলো হতে যাবো?'

'হলে আমি কী করবো?'

'এদিকে তাকান—'

'বলুন না, শ্রবণ তো কানের ধর্ম—চোখ দিয়ে তো শুনি না।'

'বেশ! তাহলে কর্ণপাত করুন—আমি ও-রকম নই। বরং আমারই সেই চীনে বাজকন্যার দশা।'

'হুঁ।' চোখ তুলে বললো মালতী। 'বসতে দিলুম, মেয়েদের কামরায় থাকতে দিলুম, ধন্যবাদ নিলুম না, আর তারপর আপনি কী করলেন? না, বইয়ের মধ্যে আত্মনিবেদন। অন্তত একটা কৃতজ্ঞতাও থাকা উচিত ছিলো।'

'ছি ছি ছি! এও নাকি বিশ্বাসযোগ্য। আপনি বসে আছেন মুখোমুখি গদিতে, আর আমি বসে আছি ও-নীলের নাটক নিয়ে! না দেবী, আমি ওটার আড়ালে আপনাব করুণার জন্যই প্রার্থনা করছিলুম।' যুবকটি যুক্তকর হলো।

মালতী এবার সমস্ত গাম্ভীর্য ভুলে হেসে ফেলে হাতের পাতায় মুখ ঢাকলো।

'মালতী দেবী—' অত্যন্ত গম্ভীর গলায় এবার ডাকলো যুবকটি।

'তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'তা কী আপনি বোঝেননি?'

'না।'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে আমার ভাগ্য!'

'ও রাগ! কিন্তু আপনি তো জানেন আমার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। খুব ভালো করে না তাকালে আমি মুখ বুঝতে পারি না। বলাই বাহুল্য, আপনি ছাড়া এমন তাকাবার যোগ্য মুখও তো ভূ-ভারতে বেশি নেই যে অনর্থক সেদিকে দৃষ্টিপাতে সময় নষ্ট করবো, তাই—'

'এই পাঁচ বছর পরে—'

'হ্যাঁ, পাঁচ বছর কী কম দীর্ঘ—নগণ্য মানুষদের মনে রাখার পক্ষে তো প্রায় অনন্তকাল।'

'তবেই দেখুন তো—অনন্তকাল পর্যন্তই আমি যাকে মনে রেখেছি, সে আমার কাছে কেমন করে নগণ্য হয়!'

'থাক, থাক!' মালতী বই পড়তে উদ্যত হলো।

ছেলেটি একটু চুপ করে থেকে বললো, 'তাহলে বই-ই পড়বেন?'

'তাছাড়া আর কী করা যায়।'

'এক সময় তো আপনিই বলেছিলেন যে, সমস্ত জীবনই আমার সঙ্গে গল্প করে কাটানো যায়—' মালতীর মুখ এ-কথায় আরক্ত হলো। পাঁচ বছর আগেরদিনে ফিরে গেলো তার মন।

আলো-ঝলকিত ভিড়াক্রান্ত বিয়েবাড়ি। সানাইয়ের অবিশ্রান্ত মন ভুলানো সুর—খাওয়া-দাওয়া, হৈ হল্লা, খালের ঘাটে হাউস-বোট বাঁধা, সুবেশ সুন্দর তরুণ বরযাত্রীর সমাবেশ—অর্থাৎ দেশের বাড়িতে মহা সমারোহে তার এক জ্যাঠামশায়ের মেয়ের বিয়ে। ছুটিতে সেবার দেশে গেছেন তার বাবা—তার আগে মালতী দেশ দ্যাখেনি—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয়ে যাবার পর সেই এ প্রস্তাব তুলেছিলো। আর সেখানে গিয়ে তার এতো ভালো লেগেছিলো যে, এখনো মনে হয় সমস্ত জীবনের সকল আনন্দ একসঙ্গে করলেও বুঝি সে আনন্দের তুলনা হয় না। এই মানুষটির সঙ্গে তার সেই সময়ের পরিচয়। এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, মালতী মাত্র তিনদিনের পরিচয়েই একটু যেন দুর্বল হয়েছিলো এর প্রতি। আর এই যুবক? এর কথাও মালতী জানে বৈকি! সম্পর্কটা মধুর—দিদির দেওর। অতএব হাস্য পরিহাসে বাধা ছিলো না—কিন্তু মাত্র তিনদিনেই তারা যেন একটু বেশি কাছাকাছি হয়ে পড়েছিলো। তারপর সব চুকিয়ে ভগ্নীপতি যখন সদলবলে চলে গেলেন—তখন চিলেকোঠার ছাতে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে যে কত কেঁদেছিলো!

'কী ভাবছেন?'

মালতী সচকিত হলো। একটু ভারি গলায় বললো, 'বিয়েবাড়ির কথা ভাবছিলাম।'

হয়তো চিন্ময়ও ভবাছিলো সে কথা—মালতীর কথায় চোখে চোখে একটা প্রশ্ন বয়ে গেলো তাদের—তারপর দু'জনেই চুপ।

মালতী যখন পৌঁছলো প্রায় রাত। অবনীবাবু নিজে স্টেশনে আসতে পারেননি। এসেছে পুরোনো চাকর ভজহরি। মালতীর সঙ্গে সঙ্গে চিন্ময়ও নেমে দাঁড়ালো—কিন্তু তক্ষুণি আবার উঠতে হলো তাকে। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়ালো না।

'তাহলে মঙ্গলবারই ফিরছেন?' মালতী প্রশ্ন করলো।

'আপনিও আসুন না সে তারিখেই—'

'চেষ্টা করবো—'

বাধা দিয়ে চিন্ময় বললো, 'ইচ্ছেটা তো আপনার হাতে! দয়া করে সেইটাই প্রয়োগ করবেন—'

ভজহরি তাড়া দিলো 'দিদি চলো।'

'এই যে—আচ্ছা—'

'আচ্ছা—'

'আশাকরি মনে থাকবে।'

গাড়ির চাকার শব্দে মালতীর জবাব হয়তো ছেলেটি শুনতে পেলো না—যতদূর দেখা গেল কেবল হাত নাড়লো করুণ মুখে। এক সময় শূন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো মালতী।

মেয়েকে দেখে অবনীবাবু ভীষণ খুশি। একটু একটু জ্বর হয়েছে দু'দিন থেকে—তাই নিয়ে ওঠা-হাঁটা করতে লাগলেন—হাঁক-ডাকে অস্থির করলেন সক্কলকে। রাত্রিতে মার বুকের তলায় ঠিক ছোট্টো মেয়ের মতো করে ঘুমুলো মালতী। পরেরদিন আসল কথা পাড়লেন তাঁরা।

'তোমার বিয়ে স্থির করেছি।' কথাটা অবনীবাবুই বললেন।

'বিয়ে!' বুকের মধ্যে থেকে যেন লাফিয়ে এলো কথাটা।

'হ্যাঁ, মা। অত্যন্ত সুপাত্র—'

'না বাবা!' মালতী আঁতকে উঠে বাধা দিলো।

'কেন?'

কণ্ঠস্বরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বললো, 'আমি এখন বিয়ে করবো না।'

মালতীর মা মেয়ের কথায় আশ্চর্য হলেন।—'বলিস কি তুই? বিয়ে না করে করবি কী?'

'না, মা।'

'ছেলেমানুষি করবি না মালু। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, বিয়ে একদিন হবেই হবে—কিন্তু এমন চমৎকার পাত্র—'

'তা হোক—'

'মালতী—'

'না, মা।'

'এ তো দেখছি মহা মুশকিল!'

'আচ্ছা, তুমি চুপ করো!' অবনীবাবু স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে মিষ্টি কথায় মেয়েকে বোঝাবাব চেষ্টা করলেন, 'তুমি মা বুদ্ধিমতী—'

'বুদ্ধিমতী না হাতি—' পেছন থেকে ছোটো বোন প্রণতি বলে উঠলো, 'আমি হলে কখন রাজি হয়ে যেতুম।'

প্রণতির কথায় একটা হাসির ছেদ পড়লো—তখনকার মতো বেঁচে গেলো মালতী। কিন্তু রেহাই হলো না তাতে—অবনীবাবু হাল ছেড়ে দিলেও তার মা লেগে রইলেন পিছনে। শেষ পর্যন্ত একটা রাগারাগি কান্নাকাটির মধ্যে সপ্তাহটা শেষ করে ঠিক মঙ্গলবার দিন রওনা হয়ে গেলো মালতী।

অবনীবাবু আর প্রণতি স্টেশনে এলেন—অন্যান্য বার মাও আসেন, এবার তিনি মুখ ভার করে বাড়িতেই রইলেন।

যথাসময়ে ট্রেনটি এসে পৌঁছতেই মালতীর চোখ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো এবং কোনো এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে আরো একজোড়া ব্যগ্র চোখের সঙ্গে দৃষ্টি মিলতে তার দেরি হলো না। প্রথমটায় লক্ষ্য করেননি অবনীবাবু—চিন্ময়ই নিজে থেকে নেমে এসে কাছে দাঁড়ালো।

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

অবনীবাবুর দৃষ্টি ব্যাকুল হলো। একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'আমি তো—আমি তো ঠিক—'

'বিকাশদা আমার মামাতো ভাই—আপনার ভাইঝির সঙ্গে তার--'

'অ্যাঁ!' হঠাৎ অবনীবাবুর মুখটা যেন এতখানি হাঁ হয়ে গেলো—'তবে তুমিই চিন্ময়? নরেনবাবুর বড় ছেলে?'

'আজ্ঞে।'

'তবে তুমি—তবে তুমি—'

মালতীর ছোটো বোন তিড়িক করে দিদির কানের কাছে মুখ আনলো, 'দিদি!' ফিসফিসিয়ে উঠলো তার গলা—'এই তো, এই তো ছেলে। এর সঙ্গেই তো—'

গাড়ি ছাড়বার শেষ ঘণ্টা বাজলো, বাধা পড়লো কথায়। 'উঠুন, উঠুন', চিন্ময় মালতীকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে নিজেও উঠে পড়লো গাড়িতে—ঝিক ঝিক করে চাকা নড়ে উঠলো—হতভম্ব হয়ে অবনীবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন—চলন্ত গাড়ি থেকে মুখ বার করে চিন্ময় তার কন্যাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলো—মালতীর ছোটো বোন হাসিমুখে দিদির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের চেষ্টা করলো, আর মালতী স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো প্ল্যাটফর্মের দিকে।

স্টেশন ছাড়িয়ে গেলে চিন্ময় বললো, 'চাদরটা বিছিয়ে দি?'

'থাক।'

'কী হয়েছে? মন কেমন করছে?'

'হুঁ।'

'তবে ক'দিন থেকে এলেই পাবতেন—'

মুখের উপর চকিতে পলকপাত করেই দৃষ্টি নামালো মালতী।

'আমাব না হয় চাকরি -' খুব ভালো মানুষের মতো বললো চিন্ময়, 'মঙ্গলবার না ফিরলে নয়—আপনার তো আর সে প্রয়োজন নেই।'

মালতী চুপ।

'তা আর কী কববেন, যখন এসেই পড়েছেন। উঠুন—সুজনিটা বিছিয়ে দি—ভালো হয়ে বসুন।'

'থাক না।'

'সে কি হয়?' চিন্ময় নিজের বালিশে জড়ানো সুজনিটা বিছিয়ে দিলো। বালিশটা ঠিক করে দিয়ে বললো. 'একটু প্রসন্ন হোন। এ অভাজন যে নিতান্তই আপনার কৃপাপ্রার্থী।'

'ইস!' মালতী উঠে বসলো বিছানায়—'আপনি?'

'আমি? আমিও বসব বৈকি—' মুখোমুখি গদিতে গিয়ে বসল চিন্ময়।

'বা রে—রাজ্যপাট কি আমার জন্য ছেড়ে দিলেন? আপনার চাদব, আপনার বালিশ—'

'রাজ্যপাট? বলেন কী? জীবন দিলেও কি আশ মেটে?'

'তা বটে।'

'আচ্ছা, মালতী দেবী, এই পাঁচ বছর আমাদের তো আরো দেখা হতে পাবতো? কেন হয়নি বলুন তো?'

'সময় মতোই সব হয়! কিন্তু আপনার বিয়ে ঠিক করতে যাওয়াটা এবার ব্যর্থ হলো কেন?' কথাটা ফস করে বলে ফেললো মালতী। তার পরেই কানটা গরম লাগলো।

অবাক হয়ে চিন্ময় একটু তাকিয়ে রইলো তার দিকে, 'কী করে জানলেন?'

জবাব দিতে একটু ইতস্তত করলো মালতী, তারপর অত্যন্ত সহজভাবে বললো, 'আমি যে তাকে চিনি।'

'তাই নাকি? ইস, আমার সঙ্গে যদি আলাপ হতো!'

'বলেন তো পরিচয়ের ঘটকালিটা আমিই করি।'

'অশেষ ধন্যবাদ, মালতী দেবী। আপাতত তিনি একটু নিরাপদে থাকুন তো, তারপরে দেখা যাবে।'

'কেন, তার সঙ্গে বিয়েতে আপনার মত নেই?'

'না।'

'পছন্দ হয়নি বুঝি?'

'দেখিনি তো।'

'শুনেছেন তো?'

'শুনিওনি—'

'শোনেনওনি—তিনি কে তা আপনি জানেন না বলতে চান?'

'কী করে জানবো?'

'কী করে জানবেন, তা কি আমি বলে দেবো—কলকাতা থেকে এত মাইল তাহলে দৌড়ে এলেন কেন?'

'মার অসুখের খবর পেয়ে। শেষে শুনলাম—'

'কী শুনলেন?' কৌতূহলে যেন ফেটে পড়লো মালতী।

'বাজে কথা বলেই সময় কাটাবেন বুঝি?'

'বাজে! একজনের জীবন-মরণের কথা বাজে?'

'জীবন-মরণ! কেন, জীবন-মরণ কেন?'

'নয়? আপনি তো অনায়াসে অবহেলা করে চলে এলেন, আর মেয়েটি আমাকে বললো—সে আর প্রাণ রাখবে না।'

'দুষ্টুমি, না? কিন্তু আপনার অবগতির জন্য বলছি, তিনিই আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।'

'কী রকম?'

কী রকম? তাহলে শুনুন - বাড়ি যেতেই মা বললেন, 'আমার অসুখের খবরটা বাজে আসলে মেয়ে দেখতে ডেকেছি।' আমি বললুম, 'তার মানে?'

মা বললেন, 'মানে এই যে, রূপে-গুণে একটি মনোমতো পাত্রী—' এই পর্যন্ত বলতেই সবেগে বাধা দিলুম—বললুম, 'অসম্ভব! বিয়ে আমি এখন কিছুতেই করবো না।' তারপর চললো কথা কাটাকাটি, মান-অভিমান—শেষে যখন কেমন করে কথা দিয়ে বিয়ে ফেরাবেন ভাবছেন—তখন খবর পাওয়া গেলো মেয়েটিই বিয়ে করতে রাজি নন এখন। হলো? এবার এ প্রসঙ্গে যবনিকা পড়ুক।'

'উহুঁ।'

'তাহলে যা খুশি বলুন, আমি বই পড়ি।' চিন্ময় এটাচি-কেস খুলে একখানা বই বার করলো।

মালতী বাধা দিয়ে বললো, 'একটা কথা—'

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে মেয়েটি পাটনাবাসিনী—'

'না।'

'তাও জানেন না?'

'না।'

'আমি জানি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'সে কেমন, কী করে, কার মেয়ে—তাও কি আপনার জানতে ইচ্ছে করে না?'

'না।'

'কেন?'

'কেন শুনবেন?' চিন্ময়ের চোখে দুষ্টুমির হাসি চকচক করে উঠলো। একটু হেসে বললো, 'আমি একটি মেয়েকে চিনি—যিনি বিশ্বসংসারে একেবারে অদ্বিতীয়া—আর তিনিই থাকেন পাটনাতে। অতএব—'

মালতীর চোখেও ঝিলিক লাগলো, 'যদি বলি সেই অদ্বিতীয়াটি আর তিনি এক দেহ এক প্রাণ?' বলেই তার গৌরবর্ণ যেন অচিরেই রঞ্জিত হয়ে গেলো। মুখ নীচু করলো সে।

চিন্ময় হঠাৎ তার পুরু লেন্সের চশমা থেকে দৃষ্টিটি মালতীর উপব স্থির করলো। তারপর অনেকক্ষণ পবে বললো, 'সত্যি!'

মালতী নিতান্ত উদাস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

'সত্যি নাকি?'

মালতী চুপ!

চিন্ময় একটু থেমে বললো, 'হুঁ।'

তারপর একটানা অনেকক্ষণ দু'জনেই নিঃশব্দ। দু'জনের দৃষ্টিই বাইরের দৃশ্যে নিবদ্ধ। গাড়ির ঝিকঝিক শব্দ ক্রমশ কর্কশ, আরো কর্কশ হয়ে শেষে ঝিমিয়ে এলো—শেষে ঘটাং করে একটা স্টেশনে এসে থামলো। চিন্ময় সেই যে গম্ভীর মুখ করে বসেছিলো তেমনি গম্ভীব মুখে নেমে দাঁড়ালো—যতক্ষণ না আবাব গাড়ি উঠলো দাঁড়িয়েই রইলো ততক্ষণ।

এবার গাড়িতে উঠতেই মালতী বললো, 'আমার সঙ্গটা যেন আপনার অসহ্য ঠেকছে মনে হয়।'

'ছি, তা কি হতে পাবে?'

'তবে?'

'তবে কী?'

'আপনার ব্যবহার তো আপনার কথা সমর্থন করছে না।'

'না।'

'কেন?'

'কেন সে কথা আপনিই তো ভালো জানেন।'

মালতী অবাক হলো। মুখের ওপর চোখ রেখে নবম গলায় বললো, 'রাগ করেছেন নাকি?'

'রাগ!' এমন করে কথাটা উচ্চারণ করলো চিন্ময়, যেন এর চাইতে বিস্ময়ের সংসারে আর কিছুই থাকতে পারে না—'রাগ আমি করবো কবে? আমার মতো একটা নগণ্য মানুষ—এমন একটা হতভাগ্য, অযোগ্য মানুষ—বাংলাদেশের পুরুষ হয়ে জন্মেও যার বিয়ে হয় না—'

'ও—!' এতক্ষণে বুঝলো মালতী। বুকের মধ্যে একটা সুখের ছলছলানি বয়ে গেলো স্রোতের মতো। একটা মধুর লজ্জা তার সমস্ত দেহ-মন মথিত করলো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ছেলেমানুষের মতো বললো, 'আমি কি জানতুম নাকি?' তারপরেই দু'হাতে মুখ ঢেকে বালিশের মধ্যে গুঁজে দিলো।

অনেকক্ষণ পরে অনুভব করলো চিন্ময় হাত রেখেছে তার মাথার উপর, নীচু গলায় বলছে, 'শোনো—'

'বলুন।'

'এখন তো জানলে। এখন কি তোমার মতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে?'

'জানি না।'

'আমি কিন্তু জানি—'

বালিশে মুখে ঢেকেই মালতী চাপা গলায় জবাব দিলো, 'বেশ তো।'

'সে জানাটা কি তা শুনবে না?'

'না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'তাহলে আমার যা খুশি করবো তো?'

'আমি জানি না।'

'জানো, জানো, নিশ্চয় জানো। দুষ্টু মেয়ে কোথাকার।'

চিন্ময় জোর করে তার মুখ থেকে বালিশ কেড়ে নিল। তারপর আস্তে নিজের একখানা হাত মালতীর হাতের উপর রেখে চুপ করে বসে রইলো।

দু'দিন পরে অবনীবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর নামে একসঙ্গে একখানা চিঠি এলো—

'মা, বাবা,

আমি অবাধ্যতা করে যে অন্যায় করেছি তার অনুশোচনায় আমার মন উদ্‌ভ্রান্ত। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো—আমি সর্বান্তকরণে মত দিচ্ছি।

ইতি স্নেহের মালতী'

আর ওদিকে চিন্ময়ের মাও এক চিঠি পেলেন সেদিন—

'মা,

যদি ও পক্ষ থেকে কোনো অমত না হয়, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি ভেবে দেখলাম বিয়ে তো একদিন না একদিন করবোই, অথচ এখন না করে কেন তোমার মনোবেদনার কারণ হই। আমার মেয়ে দেখতে হবে না—তোমাদের পছন্দই আমার পছন্দ। যত তাড়াতাড়ি হয় ঠিক করে আমাকে জানিয়ো, সেই অনুসারে আমি ব্যবস্থা করবো।

চিন্ময়'

মাটির মানুষ

সাবিত্রী রায়

চৈত্র মাস—। রৌদ্রের কি তেজ! বলাই আর চলিতে পারে না। তাহার নরম পায়ের তলায় মাটিটা যেন আগুনে তাতিয়া গিয়াছে। এই প্রথম বলাই নীলপূজার সন্ন্যাসী হইয়াছে। বলাইয়ের মা প্রথমে রাজী হয়নি—এতটুকু ছেলে সংযম নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিবে না—অযথা ঘরে পাপের ছিদ্র তৈয়ার করা। নাছোড়বান্দা বলাইয়ের কান্নাকাটির চোটে তাহার বাপ হারাধন ভূমালী রাজী হয় অগত্যা। খুনী রং কিনিয়া কাপড় ছাপাইয়া দেয়। বড় বোন যমুনা বারে বারে তাকাইয়া দেখে ভাইকে—নীলপূজার সন্ন্যাসীর বেশে লাল কাপড় পরা বলাইকে কি সুন্দর মানায়। গৃহস্থ বৌ-ঝিরা প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখে ছোট্ট বলাইলালের নাচ। সন্ন্যাসীরা গান করে—'ওগো মা—ওগো মা— তোমার অনন্ত নীলে...

ঢাকের তালে তালে নাচের পা ফেলে বলাই উঠানস্থিত সিঁন্দুর মাখানো মহাদেবের ত্রিশূল প্রদক্ষিণ করিয়া।

বাড়ির গৃহিনীরা থালায় করিয়া ভিক্ষার চাউল ফুটী তরমুজ ঢালিয়া দেয় সন্ন্যাসীদের ভিক্ষার থলির ভিতর।

পথে বুড়ো শিবের দলের সঙ্গে দেখা—তাহারা আজ রাতে বলাইদের বাড়িতেই অতিথি হইবে। বুড়োশিবের দলের নিকুঞ্জকে এরই মধ্যে ভাল লাগিয়া যায় ছোট্ট বলাইয়ের। একটা লাল রুমাল দিয়া মাথার উস্কোখুস্কো চুলগুলি বাঁধিয়া রাখিয়াছে—কেমন সুন্দর লাগে। সন্ধ্যার পর বলাইদের বাড়ির গোবর দিয়া লেপা ঝকঝকে উঠোনের উপর সারি দিয়া খাইতে বসে সন্ন্যাসীরা। কোমরে শাড়ির আঁচল জড়াইয়া যমুনা পরিবেশন করে। পরিবেশনরত যমুনা ঠিক নিকুঞ্জর পাতে ডালের হাতাটা প্রসারিত করে। বুড়ি ঠাকুরমা অদূরে দাঁড়াইয়া রসিকতা করে, 'ওলো অন্নপূর্ণা, মহাদেব সন্ন্যাসীদের ভাল করে পরিবেশন করিস—শিবের মত সোয়ামী পাবি।'

যমুনার কানের পাশটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে—হাতের লাল কাঁচের চুড়িগুলি একটু কাঁপিতে থাকে—নিকুঞ্জও লক্ষ্য করে।

নিকুঞ্জ একটু তাকাইয়া দেখে যমুনাকে, তাহার ডাগর চোখ দুইটিকে।

খাওয়া হইয়া গেলে সন্ন্যাসীরা হরিতকি চিবায়, তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ—।

কালীখোলার মাঠে কাঁচনাচান শুরু হয়। অনাবৃত ছোট্ট মাঠটির চারদিক ঘিরিয়া সকল দর্শকের ভিড়। আড়ম্বরবিহীন সহজ গ্রাম্য জীবনের একান্ত অভীপ্সিত সন্ধ্যা!

নাচ শুরু হইয়া যায়—। ঢাকের তালে তালে আসে হনুমানের বেশে ভূমালী হারাধন। কাটা বস্তা ও কাগজের মুখস আঁটা হনুমানের ফল ভক্ষণ। হাসি হুল্লার ধূম পড়িয়া যায়—একটা বোকা ছেলে কাঁদিয়া ফেলে। তারপর শুরু হয় কালো বোষ্টম-বোষ্টমীর তীর্থযাত্রা—সরস ছড়া আর গানের পটভূমিকায় 'কামারে ধইরা নেরে হাত ধরে কানা বলে তো ডাকলো মোরে...'

কামার কুঞ্জর ডেরা বার করা চোখের তারাটা অবিকল কানার মত দেখায়।

যমুনা আর বলাই ঠাকুমাকে ঘেরিয়া মাঠের এক কোণে বসিয়া দেখে। পান্তা খাওয়া দিনগুলি একরাতের জন্য দূরে মিলাইয়া যায়। শিশুমনে অপূর্ব বিস্ময় কৌতুকভরা সরল মনগুলিতে দোল খাইয়া যায় এক অমায়িক পরিবেশ।

বুড়োশিবের দলও খুশিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া গানের ধুয়া ধরে। রৌদ্রে পোড়া ঘর্মাক্ত দিনের এক সহজ বিস্মৃতি। ডুরে-শাড়ি পরা শূদ্র ব্রজমোহনের মধ্যাহ্নের মাংসপেশীগুলি নাচে—বেদেনীর নাচের কি অপরূপ ঢং! নিকুঞ্জও দেখে প্রশংসমান দৃষ্টিতে বেদেনীর নাচ আর দেখে আড়চোখে যমুনার কৌতুকভরা ডাগর চোখ দু'টি। 'ভালই দেখতে মেয়েটা।' মনে মনে ভাবে নিকুঞ্জ, মুহূর্তের জন্য দু'জনের চোখে চোখ পড়িয়া যায়।

পুরা চৈত্র মাসটা নীলপূজার সন্ন্যাসীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে হরগৌরীর পূজা হয়। ঘরে ঘরে বিশেষ আয়োজন।

পুণ্যলোভাতুরা ত্রয়োস্ত্রীরা শিবের হাতে ফল দিবার আকাঙক্ষায় ভাল ভাল ফল সংগ্রহ করে।

দিনের প্রারম্ভেই ভূমালীর বাড়ির উঠানে হরপার্বতীর সাজের আয়োজন আরম্ভ হইয়া যায়। বুড়ির বর পার্বতী সাজে। হলুদ বাটিয়া মুখের রং হলদে করে, তাহার উপর সিঁদুর গুলিয়া ফুল আঁকে। জমিদারবাড়ি হইতে চাহিয়া আনা বেগুনী রংয়ের পুরান আসমানি শাড়িখানা মেয়েলী ঢঙে ঘুরাইয়া পরে পার্বতী। বুকের উপর দুইটা নারকেলের মালা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া হাতকাটা একটা জরির পাড় বসান ব্লাউজ পরিয়া লয়। দাড়ি গোঁফ কামান হলুদমাখা উন্নত বক্ষ পার্বতীকে দেখিয়া বৌ-ঝিরা হাসিয়া কুটিপাটি। ঠাকুরমা বুড়িও হাততালি দিয়া নাচের ভঙ্গীতে রঙ্গ করে নাতনীজামাই রামমোহনের সঙ্গে। পার্বতীকে পাইয়া মহাদেব যেন তাহার নাতনীটিকে ভুলিয়া না যায়।

ওদিকে বুড়োশিবের দলের হরগৌরীও আসিয়াছে জমিদার বাড়িতে। নিকুঞ্জ মহাদেব সাজিয়াছে এইবার। উহাদের মহাদেবকে কেমন সুন্দর মানাইয়াছে। যমুনা বারে বারে তাকাইয়া দেখে। নৃত্যরতা পার্বতীর ফাঁকে ফাঁকে জটাধারী মহাদেবের প্রশান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয় কিশোরী যমুনা।

চৈত্র মাস শেষ হইয়া যায়। আবার নূতন বছর আরম্ভ হয় নূতন সম্ভাবনা নিয়ে। কামার কুঞ্জর কাজের চাপ খুব। সারাদিনই হাপর চলে।

ভূমালী হারাধন আর একা পারিয়া উঠে না। বলাইকে সঙ্গে নিয়ে যায় কাজে। জমিদারবাড়ির সখের ফুলবাগানের কাজ।

পদ্মদিঘির গায়ে একান্ত পরিত্যক্ত জমিটায় নূতন পরিকল্পনা। বিদেশী ফুলের বীজের নিত্য নূতন আমদানি। ত্রিকোণ ফুলের বেদীতে সাদা পাথরের সীমানা। ছাপার বইতে কত কি বাহারে ছবি।

হারাধন শুধু কোপায় আর বলাই আগাছা বাছিয়া তোলে বেতের ঝুড়ির ভিতর।

শক্ত মাটি কালো মানুষের ঘামে ঘামে নরম হয়। তুলতুলে নরম মাটির সোহাগ লাগে বিদেশী ফুলের অঙ্কুরে। ওদিকে পঞ্চমুখি জবার লাল অভিনন্দন বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

বাড়িতে বলাইয়ের মা ধান সিদ্ধ করে। লাল মিঠা আউষের ধানের সোঁদা গন্ধ ভুর ভুর করে। জমিদারবাড়ির কামধেনু গাইয়ের বাড়তি খুদকুঁড়াগুলি উপরি লাভ। বলাইয়ের মা মনে মনে হিসাব করে— কয় সন্ধ্যায় ফ্যান ভাত হইবে গরুর চাউলের ক্ষুদ দিয়া। তুঁষগুলি জমানো থাক শীতের জন্য। তুঁষের পাতিল ছাড়া শীতের একরাতও চলে না শাশুড়ী ধরনীবুড়ির।

ঘরের পেছনে বসিয়া ধরনীবুড়ি তামাকের টিকা দেয় জমিদারবাড়ির সেরেস্তা ঘরের জন্য। মাটির গামলায় ফ্যান আর কাঠ কয়লার গুঁড়া দিয়া টিনের উপর টিকা দেয় আর মনে মনে গুণিতে থাকে কয় কুড়ি হইল।

মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত ধরিত্রী। গৈরিক মাটির বুকে কালো মানুষের রুদ্র প্রচেষ্টা।

হারাধন আর বলাই কোদাল হাতে ঘরে ফেরে ঘর্মাক্ত দেহে। দাওয়ায় বসিয়া এক ছিলিম তামাক খাইয়া লয়—বুড়িমা আসিয়াও একটু টান দেয় কল্কিতে। ভাগ্নীজামাই রামমোহন আলাপ করে হারাধনের সঙ্গে। নিকুঞ্জর বাপ খবর পাইয়াছে—আজ বৈকালে সে যমুনাকে দেখিতে আসিবে।

ধরনীবুড়ি দক্ষিণের ঘরের সুন্দর-বৌকে ডাকিয়া আনে নাতনীকে সাজাইতে। মাস্টারবাবুর বৌ-এর কাছ হইতে একটু ফুলতেল চাহিয়া আনে। সুন্দর-বৌ চকচকে করিয়া তেল মাখাইয়া যমুনার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়। তেলমাখা হাত দুইটা যমুনার সলজ্জ তুলতুলে গালে মাখিয়া দিয়া কাঁচ-পোকা কাটিয়া সবুজ টিপ একটি পরাইয়া দেয় কপালে। ফুলতেলের মিষ্টি গন্ধে যমুনার মন একটা ভয়মিশ্রিত আনন্দে খুশি হইয়া উঠে। নিকুঞ্জকে সে ভালোভাবেই দেখিয়াছে—শুধু শ্বশুরবাড়ির বিভীষিকা শিশুমনকে শঙ্কাতুর করিয়া তোলে। যমুনা লুকাইয়া আয়না দিয়া একবার মুখখানা দেখিয়া লয়। যমুনার মা বারে বাবে ইষ্টদেবকে ডাকে—অমন চমৎকাব ছেলে—যমুনার সঙ্গে মানাইবে ভালই।

ধরনীবুড়ি এরই মধ্যে হাসি-মসকরায় মত্ত হইয়া যায় ছেলের ভাবী বেয়াইয়েব সঙ্গে।

যথাসময়ে মেয়ে দেখান হয়—মেয়ে পছন্দ হয় ছেলের বাপের। কিন্তু টাকার অঙ্কে মেলে না। নিকুঞ্জর বাপ তিন কুড়ি এক টাকার উপরে এক পয়সাও দিতে রাজী নয়।

ওদিকে হারাধনের ঘরের চাল না বদলাইলে সামনের বর্ষা কাটান দায়। ঐ একটি মেয়ে, তাহাকে সোনাব নাকছাবি না দিলে মেয়ের মার মন উঠিবে না—পাঁচজনকেও তো অন্তত পান বাতাসাটা দিতে হইবে হলুদ কোটার দিনে। কাজেই সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। একটা দমকা কালো মেঘে বিকালের সোনালী আলোটুকু যেন ম্লান হইয়া যায় এক মুহূর্তে।

আবাব কিছুদিনের মধ্যে আরেকটা সম্বন্ধ আসে চাকলাদাব পাড়ার পঞ্চাশ বছবের শশী ভূমালীব সঙ্গে। শশীর বৌ মরিয়া গিয়াছে অনেকদিন আগে সোমত্ত ছেলে ও ছেলের বৌ রাখিয়া।

বুড়া নিজেই মেয়ে দেখিতে আসে। যমুনা লুকাইয়া বেড়াব ফাঁক দিয়া দেখে। শশীব চকচকে টাক মাথাটাই চোখে পড়ে শুধু। ভীত হইয়া উঠে যমুনা—মনে মনে ভাবে—এত কাশে কেন বুড়াটা...কি বিশ্রী কাশিব শব্দ।

নিকুঞ্জের চেহারাটা বারে বারে মনে পড়ে—আর মনে মনে ভগবানকে ডাকে।

এবাবও সুন্দরবৌ আসিয়া মেয়ে সাজায়—টিপ পোকা কাটিয়া আমেব আঠা দিয়া কপালে টিপ লাগাইয়া দেয়। যমুনা ঘরে গিয়াই নখ দিয়া খুটিয়া টিপ তুলিয়া ফেলে— হে ভগবান, যেন পছন্দ না হয তাকে। কিন্তু তবু মেয়ে পছন্দ হইয়া য়ায শশী ভূমালীব। টাকার অঙ্কেও মিলিযা যায।

কাজেই পাকা কথা হইয়া যায় সেইদিনই। ডাগর মেয়েকে আব বসাইযা বাখা যায় না—সমাজের ভয় আছে।

যমুনার মা আড়ালে চোখ মুছে।

পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখিয়া শশীর সঙ্গে যমুনার বিয়ে হইযা যায়। মেয়ে জামাই রওনা হইয়া গেলে বৌ-ঝিরা সব যে যার ঘরে ফেরে পান বাতাসা হাতে নিয়ে।

বলাই শুধু দূর পর্যন্ত দিদির পেছনে যায়। মস্তবড় ঘোমটার ভিতর যমুনার কচি মুখখানি চোখেব জলে ভিজিয়া একাকার। বলাই একটা উঁচু বাঁশের সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া দেখে—দূরে বধূবেশী দিদির অস্পষ্ট ছবি। ঐ বুড়ার সঙ্গে কেন যে দিদির বিয়ে হইল—বলাই কিছুতেই বুঝিতে পারে না। উহারা মারিবে না তো দিদিকে! বলাইয়ের চোখ দুটো জলে ভরিয়া উঠে— প্রীতিভরা সহজ আবেগের এক অবুঝ গুমরানি ভীরু মনে।

সদ্যো-বিবাহিত শশী ভূমালী বৌকে নিয়া পদ্মদিঘি পার হইয়া হরিখোলার মাঠের ধার দিয়া হাঁটিয়া চলে। দক্ষিণে অনেক দূরে চাকলাদার পাড়ার তালগাছের সারি। মাঝে বিস্তৃত চষা খেত। সরু মেঠো পথের উপর দিয়া অগ্রসর হয় শশী ভূমালী। হাতের শিথিল চামড়ায় বাঁধা দশ গ্রন্থীর হলুদ সূতা। যমুনার পরনে কোরা লাল পাড় শাড়ি, হাতে সিঁদুরের রাজ কৌটা।

ভীরু পদক্ষেপে ছোট ছোট পা ফেলে যমুনা, পেছনে ঘন ঘন কাশির শব্দ শূন্য মাঠে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। এক অজানা আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠে যমুনা। চোখের জল শুকাইয়া যায় অলক্ষ্যে।

শশী বারে বারে তাকাইয়া দেখে যমুনার দেহের গড়ন, খুশি হইয়া উঠে সে মনে মনে বলে— 'বাড়ন্তই আছে মেয়েটা'। কামাতুর মৃদু হাসি খেলিয়া যায় বৃদ্ধের গোঁফের আড়ালে। লাল চামড়ার ভিতর হইতে নিষ্প্রভ চোখ দুইটিতে একটা লোভী দৃষ্টি জ্বল জ্বল করিয়া উঠে।

দুই মাস হইয়া গিয়াছে যমুনা শ্বশুরবাড়িতে। এর মধ্যে একবারও হারাধন মেয়েকে দেখিতে যাইতে পারে নাই। বলাইয়ের মার তাগিদের চোটে হারাধন অস্থির। কিন্তু মেয়ে মানুষের বুদ্ধি দিয়া সে তো আর বুঝিবে না—কর্তাবাড়ির তরকারি বাগানে এখন একদিনও কামাই দেবার উপায় নাই। কামলারা সব জ্বরে পড়িয়া, শুধু সে আর রামমোহন এখন জোগান খাটিতেছে। তাছাড়া একেবারে খালি হাতে মেয়ের বাড়ি যাওয়া যায় না।

বলাইয়ের মার মনটা কয়দিন যাবৎ ভাল নয়। যমুনার জন্য মন কেমন করে। সেদিন বিকালে একটা ফেরিওয়ালা শাড়ি, ব্লাউজ, সিটের কাপড় নিয়ে তাদের পাড়ায় আসে।

বৌ-ঝিরা ভিড় করিয়া দাঁড়ায়—সবাই এটা সেটা নাড়িয়া দেখে—কেউ বা নাড়িয়া ফেবৎ দেয়— 'দাম বড় বেশি সেখের পো'।

বলাইয়ের মার একখানা ছাপার শাড়ি বড় পছন্দ হইয়া যায়। মনে মনে ভাবে—যমুনাকে মানাইবে ভালো। কিন্তু দাম বড় বেশি। নগদ টাকা, কোথায়ই বা পায়। হারাধনকে জানানোর উপায় নাই। সেবারে, বলাইয়ের অসুখের সেই ওষুধের দাম এখনও বাকি ডাক্তারবাবুর কাছে। ভয়ে ভয়ে বলাইযেব মা সুন্দরবৌর শরণাপন্ন হয়—'বেশিদিন রাখবো না বৌ, এই বাড়তি ধানের দাম দিয়াই শোধ কইরা দিমু।'

ছাপার কাপড়খানি কিনিয়া বলাইয়ের মা চুপিচুপি পুরানো পোর্টম্যান্টটিতে বন্ধ কবিযা বাখে। সুন্দর-বৌও তো তারিফ করিয়া বলিয়াছে— 'কাপড়খানি যমুনাকে মানাইবে ভালই।'

সন্ধ্যাবেলা দাওয়ায় বসিয়া হারাধন তামাক টানে। শরীবটা একটু গবম করিযা লয, সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া চুপসিয়া আছে। আষাঢ় মাস পড়িতে না পড়িতেই যা বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, শ্রাবণের ধারা তো পড়িয়াই আছে। সদ্য লাগানো ঘরের চালের দিকে তাকাইয়া মনে মনে ভাবে, দিনে তো ভিজিতেই হইবে, রাত্রিতেও যদি একটু ঘুমানো না যায় তবে মানুষ বাঁচে কি করিয়া। গেল বছর ছেলে মেয়ে মা বৌ মায় ছাগলগুলি শুদ্ধ ঐ ঘরের এক কোণায় কি কষ্টেই না কাটিয়াছে। তার ফলেই তো ছেলেটার সেই কি কাল ম্যালেরিয়া ধরলো। দুই দুইটা ইনজেকশান দিয়া তবে তাকে বাঁচানো যায়। তার দাম এখনও বাকি। ডাক্তারবাবুকেই বা কি যে বলিবে সে। তিনি নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন 'ছোট লোকের জাতই নিমকহারাম।'

ওদিকে মেয়েটাকেও আনিতে হয়—ছেলেমানুষ, তার মনটা কেমন হইয়া আছে কে জানে! বুকটা কি রকম একটু ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করিতে থাকে।

ঘরে বসিয়া বলাইয়ের মা গজ গজ করিতে থাকে— 'বলি প্রথম বছর যে শ্বশুরবাড়িতে শ্রাবণের

জল পারাইতে হয় না—সে কথাও ভুইলা গেল, এক বাহাত্তুরে বুড়ার সঙ্গে ঐ মাইয়াটার বিয়া দিয়া কি আমার হাড় জুড়াইয়াছে।'

হারাধন আর সহ্য করিতে পারে না—তাহারও বুকে ঐ একই জ্বালা। তবু যুক্তি দিয়া সে মনকে প্রবোধ দেয় যত গণ্ডগোল ঐ ছিঁচকাঁদুনে মেয়েলোক লইয়া।

সেও ঝাঁজিয়া ওঠে— বড় যে আজ মেয়ের উপর সোহাগ উপচে পড়ে। বলি কি রকম বর্ষা হইছে চোখে পড়ে। খুব তো আরামে চালের তলায় বইসা ধর্ম কথা শোনান হইতাছে। গেল বছরের কথা মনে পড়ে।

অদূরেই কোথায় যেন একটা বাজ পড়ে কড়মড় করিয়া, সবাই একসঙ্গে আচমকা কাঁপিয়া উঠে। বলাই ছুটিয়া আসিয়া বসে মার গা ঘেঁষিয়া। কোণের একটা বেড়ার বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে বাতাসে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভিজিয়া একাকার। হারাধন উঠিয়া পড়ে বাঁধনটা শক্ত করিয়া দিতে। বলাইয়ের মাও চুপ হইয়া যায়, ভাবে— এই ঝড় জলে যমুনা কেমন আছে কে জানে। সুখেই আছে নিশ্চয়। বুড়া হইলে কি হইবে অকথা তো ভালই। মনকে প্রবোধ দেয়।

সেই রাত্রেই জল বৃষ্টির মধ্যে যমুনা শ্বশুরবাড়ি হইতে পালাইয়া রওয়ানা হয় তাহার শৈশবের অতি পরিচিত গ্রামের উদ্দেশ্যে। বারে বারে ভয়ে ভয়ে পিছনে তাকায়—শশীর কঠিন হাত দুইটা যদি তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরে। কি বিশ্রী সোহাগ।

দিন গড়াইয়া যাওয়া যমুনার এক একটি দুঃসহ দিনের ছবি ভাসে চোখে। শশীর গায়ের ঝুলিয়া পড়া চামড়ার স্পর্শে যমুনার গা ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। মনে হইতেছে, এখনও যেন তাহার বুকটা ঢিব ঢিব করিতেছে শশীর সাদা লোমে ভরা বুকের ভিতরে।

বুড়োর ছেলের বৌয়ের ঘরে যাইত যমুনা যখন তখন—কি সুন্দর সুতায় ফুল তোলে সে পাখায়। যমনা পাড় হইতে সুতা খুলিয়া দিত আর বসিয়া বসিয়া দেখিত ছেলের বৌর ফলতোলা। দেখিয়া পিত্তি জ্বলিয়া উঠে শশীর—'ছেলের ঘরে ঘরে অত আনাগোনা কিসের?' রাত্রিতে ব্যর্থ কামনার বহ্নিতে জ্বলিয়া এক হিংস্র মত্ততায় শশী দুয়ারে খিল আঁটিয়া দেয় সশব্দে। ভয়ার্ত যমুনা ঘরের বেড়াটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া শুধু কাঁপিতে থাকে। তাহার ছোট মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ পাংশু হইয়া উঠে— গাঢ় অন্ধকারের ভিতর হইতেও শশীর সেই দৃষ্টি জ্বল জ্বল করিয়া উঠে—হিংস্র বাসনার শাণিত লালসা...।

যমুনা আরও তাড়াতাড়ি পা চালায়—আবার কোনদিন যদি ঐ বুড়ার পাশেই শুইতে হয়! যমুনা শিহরিয়া উঠে। তাহার কচি গালের উপর শশীর অতি সোহাগের চিহ্নস্বরূপ গরম কঙ্কের ছাপ কালো হইয়া আছে—হয়তো চিরদিনই থাকিবে! দ্রুত পায়ে হাঁটে যমুনা।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া পরনের শাড়ি চুপসিয়া একাকার। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—তবু চেনা পথের অঙ্গুলী নির্দেশে যমুনা ঠিক পথেই চলে।

মহার্ঘ পোষাক

বাণী রায়

এবার শীতে দংশন বেশি—মাধুর্য কম।

দোতলার ফ্ল্যাটের লিন্ডার তাই মনে হচ্ছে।

লিন্ডা বাঙ্গালী। তার পুরো নাম লাবণ্যলিন্ডা মিত্র। নেটিভ ক্রিশ্চান পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সে বিবাহিতা হয়েছে অন্য এক স্বধর্মীয় ঘরে। স্বামী মাঝারি অফিসার।

লিন্ডার চুল কালো, গোছাধরা রেশমী, চোখ দুইটি বৃহৎ ও প্রদীপ্ত। মেটে মেটে গায়ের রং। দোহারা গড়ন, বরঞ্চ মোটার দিকেই।

কয়েক পুরুষ ধরে লিন্ডার বাবারা ক্রিশ্চান। 'লাবণ্য' না ডেকে ডাকনাম 'লিন্ডা' বহাল কবাব মধ্যে লিন্ডার বাবা হরিমোহন লাহাড়ীর সাহেবী ভাব সম্যক 'পরিদর্শিত'। হ্যার লাহিড়ী অস্থিমজ্জায় সাহেব ছিলেন। খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বৃত্তি নিয়ে সামান্য কিছুদিন বিলেত দেশটা ঘুরে এসেছিলেন। ডি এল রায়ের মতো 'বিলেত দেশটা মাটির' তার প্রতীয়মান হয়নি। জ্যোতির্মালা দেবীর মতো তিনি ওই শিরোনামায় গল্প লেখেননি, বরঞ্চ 'সেটা সোনা-রূপার' যে এটাই ভেবে তদনুকরণে চলবার চেষ্টা করেছিলেন। স্ত্রী, নেহাৎ বঙ্গজা লীলারানী মার্গারেটের রাখা নাম 'লাবণ্য'। কিন্তু হ্যার লাহাড়ীর রাখা নাম 'লিন্ডা'। বলা বাহুল্য লীলারানীর সঙ্গে মেলানো। তদুপরি পদবী 'লাহাড়ীর' সঙ্গেও মেলানো।

লিন্ডাদের বাড়ির বসবার ঘরে কলেজের বন্ধুরা চায়ের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ টোস্ট খেতে খেতে মন্তব্য কেটেছিল, "লিন্ডা, তোমার নামে যে অ্যালিটারেশানের ছড়াছড়ি, লাবণ্যলিন্ডা লাহাড়ী! মরি মরি।"

কিন্তু এবংবিধ অনুপ্রাসের ঝঙ্কার বেশিদিন রাখা যায়নি। বি এ পাশের পরেই লিন্ডার লাবণ্য তাকে একটি স্বামী এনে দিল।

বড় চাকুরে কিন্তু কুদর্শন, তায় বিপত্নীক। তবে পুত্র-কন্যা নেই। লিন্ডার বিবাহ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। একে সমাজস্থ বহু অনূঢ়ার প্রাদুর্ভাব দেখে সে ভয় পেয়েছিল, তদুপরি হ্যার লাহাড়ীব আর্থিক অবনতি ঘটেছিল নিদারুণ। মধ্যে মধ্যে পাওনাদারের প্রকোপে অপদস্থ হয়ে পড়তেন লাহাড়ী।

একজন ডাক্তারের প্রায়রূপসী, শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহে পেয়েছিলেন তিনি। তখন সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত। তার গৌরবর্ণ বেঁটেখাটো মজবুত সুপুরুষ চেহারা। ট্রাউজারে ক্রিজ, জুতোয় চক্‌চকে পালিশ সর্বদা থাকত। মুখে বাংলা শোনা যেত না। ডক্টর সাহেব বড় আশা করে পঞ্চ কন্যার একটিকে হ্যারমোহন লাহাড়ীর করস্থ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রাউজারের ক্রিজটি রইল, জুতোর পালিশ ক্রমাগত চাকুরি খোঁজার ফলে রাখা গেল না।

তিন কন্যায় ধন্যা হলেন লীলারানী লাহাড়ী। বড় দুই বোন কোনক্রমে পাশ করে যথাসাধ্য চাকুবি যোগাড় করে নিল। ওরা বাড়িতে নিজেদের মধ্যে কখনও বাংলা বলত না। কাজেই ভালো ইংরেজি জানা পরিবার বলে নামডাক ছিল। প্রাইভেট টিউশ্যানেরও অভাব হবে না। হ্যার লাহাড়ীর মেয়েদের কাছে মেয়েকে পড়াবার জন্য অনেকেই ব্যগ্র হয়ে থাকতেন।

একভাবে থেমে থেমে সংসারতরণী চলত তাদের। চার মাসীর মধ্যে দুইজন খুবই অবস্থাপন্ন ঘরে পড়েছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে অজস্র ও অকাতর সাহায্য আসত।

মধ্যে মধ্যে হ্যার লাহাড়ীর কাজকর্মও জুটে যেত। বড় বড় কথা ও সু-চেহারার গুণে ধরাধরি করে কিছু কিছু কাজ তিনি পেতেন বটে কিন্তু টিকে থাকতে পারতেন কই? কাজে প্রবেশ মাত্র তাঁর প্রতীয়মান হত যে, ওপরওয়ালা তাঁর চেয়ে মূর্খ ও একেবারে অপদার্থ। ওইসকল ব্যক্তিকে অপসারণ করে হ্যারকে বসানো হোক না। কেন হচ্ছে না?

অতএব কিছুদিনের মধ্যেই মাসমাহিনা পকেটে নিয়ে হ্যাবকে বেরিয়ে আসতে হত। পরবর্তী দিনগুলিতে শোনা যেত আরও বড় বড় কথা।

কিন্তু যে ক'দিন টাকা বা চাকরি থাকত হ্যার লাহাড়ী 'মিলর্ড'। বাড়ির টেবলে প্রত্যহ চিকেন-মাটন। মেয়েদের জন্মদিনে ঘটা-পটা, যীশুখৃস্টের জন্মদিনে কেক-কমলালেবুর ছড়াছড়ি। ঘরের ভাসে গোলাপের গোছা। ক্রুশবিদ্ধ খৃস্টের একখানা ছবি আছে ড্রয়িংরুমে। সেখানে সোফাসেট না থাকলেও রোলটপ ডেস্ক এবং কয়েকখানি আরামদার কেদারা সাজানো। ত্রিপদ, নিক-ন্যাক, ছবি দিয়ে সুসজ্জিত কবে তোলা ঘর। পর্দা কয়েকটি নয়নাভিরাম।

সেখানে বসে রিনি আন্টি (লিন্ডার মেজ মাসী) একদা ছোট বোনকেও বললেন, "লুক হেয়োর লীনা, হোয়াই ডোন্ট ইউ ম্যারি ইয়োর ডটারস অফ? নাউ হ্যার ইস ইন সার্ভিস। আই হ্যাভ গট অ্যান আই-এ -এস গ্রুম ইন হ্যাণ্ড।"

অতঃপর উভয় বোনের বিদেশি ভাষায় কথার বঙ্গা ভাবার্থ দেওয়া হচ্ছে।

রিনি আন্টির স্বামী বিরাট চাকুরে। বাড়িতে পার্টি লেগেই আছে। সম্প্রতি এক নবীন আই এ এস এসেছেন ওঁর পাড়ায়। রিনি পাত্রনবীশ বোনের মেয়ের উদ্দেশ্যে তাকে মনোনীত করে ফেলেছেন।

তবে কোন্‌টি এহেন পাত্রে অর্পণ সম্ভব? বড় জ্যোৎস্নাব বয়স গেছে। মাস্টারী করতে করতে দেহ শীর্ণ ও নীরস। মেজ অফিসে কাজ করে। বেজায় মোটা হয়ে পড়েছে বসে বসে কাজ করতে করতে। তাবও বয়স আঠাশ।

অবশ্য তাতে কিছু আসত-যেত না। বয়স গোপন করে তো আজকাল বহু বিবাহ হচ্ছে। তেমনটি করা যেত। কিন্তু ওকে যে বয়সের চেড়ে বড় দেখায়। তার শ্রীযুক্ত মূর্তি নয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রিনি আন্টি বললেন, "চাকরি আর টিউশানী কবিয়ে করিয়ে মেয়েদের চেহারায় কিছু রাখনি। এক লিন্ডার ভালো বিয়ে হতে পারে। এখনই চেষ্টা কর, নইলে পরে পস্তাবে।"

জ্যোৎস্না ততক্ষণ একচিলতে খাবার ঘরে সাধারণ কাঠের টেবলটি সাজিয়েছে ডিনারের আয়োজনে। আজ হ্যার লাহাড়ীর ঘরে নববর্ষের উৎসব—পয়লা জানুয়ারী পাওয়া যায়নি। রিনি অ্যান্টিব পার্টি ছিল। অগত্যা ৪ঠা জানুয়ারী বোনেরা নৈশভোজে মিলিত হয়েছেন। নানাবিধ খাদ্যে টেবল সজ্জিত। হ্যার লাহাড়ী খেতেদেতে ভালোবাসেন। খাওয়ার কষ্ট টাকা থাকলে তাঁরা পান না।

ইলিশ মাছের ডিমের চাটনী খেতে খেতে ইলা আন্টি বললেন, "রান্নাটি চমৎকার হয়েছে। তোমার নিশ্চয়। তুমি ছাড়া এত ভালো রান্না কার? ফ্রায়েড রাইসও চমৎকার হয়েছে। হাল্কা অথচ সুস্বাদু। হজম হবে সহজে।"

লীনা বললেন, "ভাত আমি করেছি, কিন্তু ডিমের চাটনী রান্না করেছে লিন্ডা। আমার থেকেও ভাল হাত ওর। আর একটু চাটনী নাও।"

ভোজন-পরিতৃপ্তি রিনি আন্টি দিলদরিয়া হয়ে উঠলেন, "আমার ওখানে পাঠাও লিণ্ডাকে উইক এন্ড কাটাতে। আমি ওর একটা ব্যবস্থা করে তবে ছাড়ব।"

লিণ্ডার ভাগ্য খাবার টেবলে স্থির হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

অতপর এক শুভ শনিবারে লিন্ডা হাজির রিনি আন্টির পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। সস্তা বিবর্ণ

ফাইবারের বাক্সে বাড়ির পোষাকী কাপড় কয়েকটি। দুটো-একটা জামাও কিনে দিয়েছেন লীলারানী। এক বাক্স ফেস পাউডার, ম্যাচকরা লিপস্টিক তৎসহ।

মিস্টার পাত্রনবীশের বাড়ি পরদিন চা পার্টিতে নবীন আই এ এস নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন। লিন্ডার সঙ্গে আলাপ করলেন। সাগ্রহে পিতৃ ও কুলপরিচয় নিলেন। বারবার চেয়েও দেখলেন লিন্ডাকে। মাতৃদত্ত সজ্জা মনঃপূত হয়নি মাসীর। নিজের গাঢ় গোলাপী ফুলছাপা সিফন জর্জেট তিনি পরিয়েছেন। সস্তা পাউডার লিপস্টিক বাতিল করে ম্যাক্স-ফ্যাক্টরে মেকাপ দিয়েছেন।

কিন্তু দু'দিন পরের ডিনারে উদয় হোল না মনোনীত ভাবী পাত্রটি। নানা অজুহাত দেখিয়ে নিমন্ত্রণ কোনদিনই গ্রহণে সে সম্মত হল না।

মিস্টার পাত্রনবীশ পাইপ মুখে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাঁকে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন রিনি, "এখন করি কী আমি? বড় মুখ করে এনেছিলাম ওকে। কী করি?"

মিস্টার পাত্রনবীশ চটে উঠলেন, "ডি-ডি ইট (Damn'it) অযথা সময়, অর্থ নষ্ট।"

স্বামী মহিলা সমক্ষে সোয়ার করলেন দেখে রিনি আন্টির চোখ ছানাবড়া। ভয়ে ভয়ে বললেন, "চা-পার্টিতে খরচ বেশি হয়নি তো। কেক পেস্ট্রি মাত্র এনেছিলাম ম্যাগনোলিয়া থেকে। বাকী সমস্ত বানিয়েছে বাবুর্চি। লীলা সেদিন যা ডিনার খাওয়াল। এ আর কি?"

"সে ডিনার দিয়েছে, তুমি তাকে লাবণ্য ডাক না। মেয়েকে নিয়ে অযথা নাচানাচি করছ কেন?"

এবার রিনি আন্টির চোখে জল। কার্শিয়াং-এর কনভেন্টে পড়ে গালে গোলাপ, ঠোঁটে প্রবাল, চোখে স্যাফায়ার নিয়ে এসে পাত্রনবীশকে পাকড়েছিলেন। এখনও ভগ্নাবশেষ রূপের মধ্যে মধ্যে জেগে ওঠে বই কি!

কোমরের ফুলকাটা রুমাল তুলে অশ্রু মুছে বলেন তিনি, "লীলার কথা ভেবে দেখো হ্যার যদি মানুষ হোত, তাহলে ওর কি আমাদের দোরে বর চাইতে আসতে হত? লিন্ডা দেখতে কম সুন্দর নাকি? আমাদের মেয়ে নেই বলে মেয়ের জ্বালা তুমি জান না। বেচারী লীলার কথা ভেবে মনে দয়া হল না তোমার? জ্যোৎস্নার বিয়ের আশা নেই, মীরা নিজে যদি জোটাতে পারে হবে। শুনছি নাকি অফিসের কোন লোফারের সঙ্গে লাভ চলছে। হ্যার জানলে ক্ষেপে উঠত। বোনের জন্যে কিছুই করবে না?"

মিস্টার পাত্রনবীশ একটু অপ্রতিভ হলেন। শ্যালিকা লীলার অবসন্নপ্রায় দেহ, করুণ মুখ মনে ভেসে এল। বিবাহের সময়ে ছোট শ্যালিকাকে দেখে মোহিত হয়েছিলেন তিনি, সেকথাও মনে পড়ল। ওর সেই টাটকা ডালিয়া ফুলের রূপ এখন কোথায়? সবক'টি পরাগ ঝরে গেছে।

স্ত্রীর চোখের জল এখনও এক্সটেনশনভোগী চাকুরেকে বিচলিত করে দেয়। তাড়াতাড়ি তিনি বলেন, "না, না, সেকথা বলছি না। আত্মীয়স্বজন, পরস্পরকে না দেখলে চলবে না। বলছি, হ্যার লোক ভালো নয়। যদি বিয়ের নাম করে এনে বিয়ে না দিতে পার, তবে সে স্বর্গমর্ত তোলপাড় করে তুলবে।"

"তাই বলছি, তুমিও একটু সাহায্য কর, ডিয়ার। কি আশ্চর্য! সেদিন ছেলেটি কত আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু শেষাশেষি কেটে পড়লেন কেন বুঝতে পারছি না।"

"বোঝা শক্ত নাকি?" মিস্টার পাত্রনবীশ কেটে কেটে বলেন, "বাবার নাম হরিমোহন লাহাড়ী শুনেই মুখখানা কেমন হয়ে গেল দেখনি? তুমি তখন কাবাব পরিবেশন কচ্ছিলে। হয়তো হ্যার ওর বাবার কাছেই দেনদার। য়ুনিয়ন জ্যাককে যেমন গোপন করা যায় না, হ্যারকেও তেমনি জীবন থেকে

সরিয়ে রাখা যায় না। ওর মেয়ের ভালো বিয়ে হতে পারে? তায় হিন্দু ঘরের ছেলে, আমার মতো ক্রীশ্চান বিয়ে করতে রাজী হবে কি?”

রিনি আন্টি হতাশ, “তোমার অফিসের কাউকে ধরে দাও না।”

“আমার অফিসে? ইজ দ্যাট পসিবল?”

কিন্তু প্রাণে ভয় ঢুকল পাত্রনবীশ সাহেবের। মেয়ের বিয়ে ঠিক করে না দিতে পারলে হ্যারমোহন লাহাড়ীর ভবিষ্যৎ বাচনভঙ্গি মনে পড়ায় তিনি কিঞ্চিৎ দমিত বোধ করলেন। বাড়ি বয়ে এসে হ্যার কথা শোনাবে, “তু দি ডেভিল—” ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য আই এ এস পাত্রের বিরাগের প্রকৃত কারণ কেউ জানল না। হ্যার লাহাড়ী স্বয়ম্ভু। সর্বত্র স্বতঃ উদয় তাঁর। এক রাস্তার মোড়ে দেখা পেয়েছিল তাঁর ভাবী পাত্র। দু'হাত পেছনে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সমুখের একটি সাইনবোর্ডের প্রতি।

“ কাম হিয়ার, ইয়াং ম্যান, কাম এন্ড সী”—

হ্যার লাহাড়ী এবংবিধ সম্বোধনে হতভম্ভ ছেলেটি এগিয়ে এসেছিল। বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় হ্যার লাহাড়ী তাকে অতঃপর বোঝালেন “হে যুবক, তোমার সময় নষ্ট করলাম কেন বলছি। সময়ের অনেক দাম আমি জানি। আমার শিক্ষা হয়েছিল ইংল্যান্ডে। তোমাকে দেখে মোটামুটি ভদ্রঘরের মোটামুটি শিক্ষিত লোক বলে মনে হচ্ছে। তাই তোমাকেই ডাকলাম একটা কলোক্যাল মিসটেক দেখিয়ে দিতে। আমি ছাড়া এসব ধরবে কোন লোক? আমার শিক্ষা হয়েছিল ইংল্যান্ডে। আমার নাম জান? হ্যারমোহন লাহাড়ী। কলকাতার কোনও সাহেব আমার নাম জানে না, এমন পাবে না। সবাই বলে, ‘হ্যার লাহাড়ী, তুমি এক ও অদ্বিতীয়।’ আমার শ্বশুরকুলও বনেদী। শালীদের বেজায় বড় বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। আমার ডটারেরা বাংলা বলে না, আমাব স্ত্রী বাংলা জানেন না। এসমস্ত ভুল আমি ছাড়া আর কে বার করবে?”

ভুলটা কি তখনও পর্যন্ত বুঝতে না পেরে ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে বললেন হ্যার, “চেয়ে দেখ ওই সাইনবোর্ডটি। মালিকের নামের পেছনে লেখা আছে বি এ বি টি, হাঃ হাঃ। ও ডাবল ব্যারেলড গান। বি এ পাশ না করলে বি টি হওয়া যায় না, বি টি নামেব পেছনে লেখা মানেই বি এ পাশ। হাঃ হাঃ, হ্যার লাহাড়ী ভিন্ন এ সমস্ত ধরবে কে?”

অতএব হ্যার লাহাড়ীর কন্যা লিন্ডার হাঁসটি সেদ্ধ হয়ে গেল (The goose is cooked) সেদিন।

এখন করা কী যায়? কী করা যায়?

লিন্ডা বারবার সপ্তাহান্তে আসতে লাগল। কোন কোনবার সপ্তাহের মধ্যে থাকতেও লাগল। কলেজ করত রিনি আন্টির বাড়ি থেকে, শচীন আঙ্কল গাড়ি করে অফিস যাবার মুখে ছেড়ে যেতেন।

কিন্তু পাত্র পাওয়া দায়।

রিনি আন্টি হতাশা সুরে স্বামীকে বলেন, “ভিক্টরের ওখানে পাত্র আছে (ছোট ছেলে)। কিন্তু ওয়েলসে পাঠাতে না পারলে হবে না। প্যাসেজ মানিটা দেবে কে?

আশাভরা চোখে স্বামীর দিকে চান। শচীন পাত্রনবীশ তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্টের টেবল ছেড়ে ওঠেন, “যাই দেরী হয়ে গেল অফিসের।”

শ্যালিকা কন্যার বিলাত যাত্রার খরচ দেবার আতঙ্কে অবশেষে শচীন-আঙ্কল সত্য সত্যই নিজেরই অধস্তন এক অফিসার যোগাড় করে ফেললেন। তবে চন্দ্র রাহুমুক্ত নয়। পাত্র কুদর্শন, তায় দোজবরে। অবশ্য সন্তান-সন্ততিবিহীন।

কিন্তু বিবাহ না দিলে লিন্ডাকে ফেরত পাঠানো যায় না। ওপরওয়ালার শ্যালিকা-কন্যা, খানদানী

বংশ। দেখতে ভালো, বি এ পাশ, গ্র্যাজুয়েট। হ্যার লাহাড়ীর অপরাধ অতএব স্ববংশীয় নিত্যানন্দকে ক্ষমা করতেই হয়। শাশুড়ীর চোস্ত ইংরেজী শুনে মোহিত নিত্যানন্দ কানুনগো টোপ গিলল।

এই হচ্ছে লিন্ডার সঙ্গে নিত্যানন্দের 'মিলন-কথা'। এতটা ভূমিকা রচনা করলাম শুধু এটাই বলে দিতে।

লিন্ডার জীবনের পটভূমিকা রচনায় অপরিহার্য বংশ বাদ দিয়ে লাভ নেই। লিন্ডার চরিত্র এবং তৎপরের ক্রিয়া লিন্ডার জীবনযাত্রার প্রণালী গ্রথিত করে রেখেছে। বাইরে আধুনিকতা, অন্তর্নিহিত খৃস্টধর্মের নানা আনুষঙ্গিক অনুশাসন লিন্ডা অতিক্রম করতে পারেনি।

তাই অতি সাধারণ ঘরে, নানা লোভনীয় পুরুষ দেখা সত্ত্বেও কুদর্শন কানুনগো ঘরণী হয়ে সময়ে বিমর্ষ লিন্ডা অন্য চিন্তা করেনি। সংসারে শাশুড়ী মাত্র। সংসার দেখাশোনা করেন তিনি, লিন্ডা অন্য লঘু চর্চায় সময় পায়। একভাবে মনকে মানিয়েছিল সে। স্বামী আদর-যত্ন করেন। শাশুড়ী নাক কুঁচকে সরাসরি লিন্ডা নাম বাতিল করে 'লাবণ্য' বলে ডাকলেও অনাদর করতেন না। বরঞ্চ চিরকাল সংসার তাঁর হাত থেকে বৌ যে কেড়ে না নিয়ে অধীন জীবনযাপন করছে, এতে তিনি হৃষ্ট। সারাদিন কাজকর্ম না করলেই বা দিন চলে তাঁর কেমন করে? গরীব নেটিভ খৃস্টানের কন্যা তিনি, খেটেখুটে সংসার চালানো অভ্যাস হয়ে গেছে। একটিমাত্র ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন নবীনা কানুনগো। কষ্টে পাদ্রীদের সাহায্যে ছেলেটি মানুষ হোল, বড় কাজ পেল। সখ করে সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে ছেলে হতে বৌটি নবজাতক সহ যীশুর পদপ্রান্তে উপনীত হল। যাক, তবু একার সংসার তাঁর ভরে উঠেছে আবার। লাবণ্য মেয়েটি ভালো। কিন্তু একদিকের ভাগ্য যে মন্দ।

নিঃশ্বাস ফেলে নবীনা সায়া-ব্লাউজের ওপর সরু কালোপাড় ধুতির আঁচলে শীর্ণ গা ঢেকে নেন। জালিকাটা নরম বাদামী পা ঢাকা চটি টেনে নিজের ঘরে যান। মাথার কাঁচাপাকা চুলেও পাতাফাটা।

নিজের ঘরে খাটে একটু বসলেন নবীনা। 'কোয়ায়েট টাইম' পালনের রীতি আছে ওঁদের। ওঁরা রোমান ক্যাথলিক। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের বৌ নিত্যের এসব ধার ধারে না। পিতাটি বাহারী মানুষ, মুখে সর্বদা ইংরেজী ভাষায় কপচানী, রবিবারে গির্জায় যান না হরিমোহন যদিও বয়স হয়ে গেছে। এক পুরুষে ক্রিশ্চান হলেই ওই হয়। হরিমোহন নামটির মানে গোড়ায় বোঝেননি, তাই হিদেন দিদিমার দেওয়া হিদেন নামটি অল্প বয়সে বদলান। হ্যারমোহন লাহাড়ী বললেও আসলে তিনি হরিমোহন লাহাড়ী—বিশুধ হিন্দু ঘরের পুত্র। নবীনা তিন পুরুষে ক্রিশ্চান, অতএব খানদানী ঘর। হ্যার লাহাড়ী এমন একটি ভাব দেখান যেন তিনি নবীনাদের বহু উচ্চস্তরের ব্যক্তি। নেহাৎ দয়া করে এমন ঘরে তাঁর মেয়ে দিয়েছেন।

নিত্য অবশ্য দোজবর। কিন্তু চাকরি ভাল, সংসারে দায় নেই এক মা ছাড়া। অবশ্য তিনি সংসার না দেখলে এই বৌ কি গৃহস্থালী ঠিকমত করত?

আগের বৌ ছিল অভাবী ঘরের মেয়ে। বাপের বাড়ি এটা-ওটা গোপনে পাঠালেও বিনত হয়ে থাকত। কিন্তু ভাগ্যে নাতি দেখবার আগেই সে গেল।

নিত্য অফিসে চটপট উন্নতি করে ফেলায় ওপরওয়ালার শালীর মেয়েটি জুটল দ্বিতীয় বিবাহে। তিনি প্রথমা বধূর যাবতীয় স্মৃতিময় ফটোখানি পর্যন্ত সরিয়ে রেখে দ্বিতীয়া বধূর আবাহনে ঘরদোর সাজালেন। মধ্যে মধ্যে বিগতা মাধুরীর কথা একমাত্র তাঁর মনে পড়ে। ছেলে তো আধুনিক, সুন্দরী বৌ পেয়ে এখন মহা খুশি। বউও দিব্য সুখেই ছিল স্বামীর সোহাগে। কিন্তু মধ্যে ঘটনাটা যদি না ঘটত। নবীনা নিজের ঘরের কোণে একখানা খৃস্টের ছবি রেখেছেন। নীচে একটি টুল। একছড়া

কালো জপমালাও ছবির নীচে ঝোলানো। এখানে বসে দিনের মধ্যে অন্তত কুড়ি মিনিট তিনি 'কোয়ায়েট টাইম' পালন করে থাকতে চেষ্টা করেন সংসার থেকে ছুটি নিয়ে চুপচাপ।

সংসারটি তাঁর সুন্দর ছিল। লাবণ্যও বেশ ভালো মেয়ে। কী সুন্দরই না চলছিল।

বাইরে বসবার ঘরে লিন্ডা একই কথা ভাবছিল। চারদিকে মানিয়ে চমৎকার দিনগুলো কাটছিল। স্বামী প্রতি শনিবারে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতেন। বিবাহ-বার্ষিকীর ঘটা ছিল কত। দামী উপহার আনতেন নিত্যানন্দ। প্রায়ই ফুল কিনে আনতেন। অফিসের গাড়ি পাওয়া যেত, পার্টিতেও লিন্ডা যেত। নিত্যানন্দের প্রথমা এক বছর মাত্র ছিলেন, কোথাও স্মৃতির ভাব রেখে যাননি। স্বামীও দ্বিতীয়ার সম্মুখে ভ্রমেও সেই নিষিদ্ধ নামটি উচ্চারণ করতেন না। নবীনাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

কাজেই গোলাপে কাঁটার মতো দোজবরে আখ্যাটুকু থাকলেও সেই কাঁটার খোঁচা বিঁধত না।

অবশ্য বরের চেহারাটি ছিল না সুদর্শন। লিন্ডাকে রীতিমত রাজী করাতে হয়েছিল নানা চেষ্টার পরে। হ্যার লাহাড়ী সম্মত হলেন না। কিন্তু তখনি একটা ঘটনা ঘটে গেল।

মেজ মেয়ে মীরা একদিন অফিস থেকে রোগা হ্যাংলা এক ছোকরা সহ এল। দু'জনেই কেরাণীর কাজ করে থাকে একত্রে। মীরার পাশে মন্টি সর্বাধিকারী বেমানান, বয়সেও হয়তো ছোট।

মন্টি মীরাকে বিবাহের প্রস্তাব সোসাইটি সঙ্গত প্রণালীতে হ্যারের কাছে করতে এসেছে।

তারপর? বিসুভিয়াসের অগ্নিপাতে লিন্ডারের ফ্ল্যাট কেঁপে উঠল। লিন্ডার মা কাঁদতে লাগলেন নিরুপায়ভাবে। তেজ করে মীরা বাড়ি থেকে বার হয়ে গেল মন্টির সঙ্গে, প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে ফেরানো হ্যারের সাধ্য হয়নি।

তারপর বাড়ির ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াবার উদ্দেশ্যে নিজের ঘটকালির বিবাহে লিন্ডা রাজী হয়েছিল। মেয়েদের আর সহধর্মিনীর মতো তাবেদার করে রাখা চলবে না, এতদিনে আবছা বুঝলেন হ্যার। মুখে বললেন আপত্তিসূচক বাক্য, কিন্তু কাজে বাধা দিলেন না।

মীরার ভালো রোজগার ছিল। প্রকাশ্যে কন্যাকে সদর্পে বর্জন করলেও মায়ের হাতে মীরার গোপন অর্থ প্রেরণ তিনি দেখেও দেখলেন না।

ওই পরিবেশ, ওই নিত্য অভাব-অনটন, মিথ্যা, নীচতা, দীনতা—এ সমস্ত ছেড়ে যেন স্বর্গরাজ্যে এসেছিল লিন্ডা। সেই 'কিংডাম অফ হেভেন' সম্পূর্ণ সুখ এল একদিন। যাদের উদ্দেশ্যে যীশুখৃস্ট বলেছিলেন, ''Suffer the little to come into me, for theirs is the Kingdom of Heaven''– তদেরই একজন সুখ স্বর্গকে সার্থক করতে নেমে এল।

কিন্তু কতদিন? দেড় বছরের মাথায় ডিপথিরিয়ায় লিন্ডার স্বর্গসুখ দিনগুলোকে নরকের দহন জ্বালিয়ে অপগত। লিন্ডার গোলাপের মত সুন্দর খোকনমণি 'প্রিন্স' আজ সাত মাস ছয়দিন বিদায় নিয়েছে।

তারপর আর দিন কাটে না লিন্ডার। এমন সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, অনুগত স্বামী, শাশুড়ীর সোহাগ কিছুতেই মন মানে না লিন্ডার। পার্টিতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে। লোকজনকে বাড়িতে ডাকার উৎসাহ নেই। দিন-রাত্রি একা একা থাকতে, তারি কথা ভাবতে ভাল লাগে।

কয়েক বোনের মধ্যে অভাবের জীবন নিরন্তর যাপন করে, অসহনীয় পিতাকে বাধ্য হয়ে সহ্য করে, মাতার নিরুপায় বেদনা দেখে লিন্ডার জীবনে নিরাপত্তাবোধ কমে গিয়েছিল। সর্বদা সে আশ্রয় খুঁজত। বিবাহের পরে আনন্দ পেলেও আশ্রয় সে পেয়েছিল নিজের শিশুটির মধ্যে মাত্র। প্রিন্স লিন্ডার একান্ত নিজস্ব, লিন্ডারই সৃষ্টি। এমনকি স্বামীর অংশটুকুও যেন ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অংশ বলে লিন্ডা মনে করত।

বসবার ঘরখানি সাজানো। পিত্রালয়ের সস্তা চেয়ার টেবিল নয়। ভালো দরের সোফাসেটে সাজানো। এক দেওয়ালে যীশুখৃস্টের মূর্তি অবশ্য। নীচে একখানি ত্রিপদীর ওপর ফুলদানে মোমের বা সত্যি ফুল সাজানো থাকত।

এখন সেই ত্রিপদীর বুকে একটা সুদৃশ্য কাঠের বাক্স বসানো হয়েছে। বাক্সের ডালার ওপর এখন ফুলদানি থাকে। আজ সেখানে সাদা ফুলের শোভা।

নবীনা ঠিকে-ঝিকে কাজকর্ম দেখাতে আবার বাইরে চলে এলেন। রান্নাঘরে একজন লোক রান্না চা ইত্যাদি সামলায়। এই ঝিটি নূতন। পুরনো ঝি একে সাময়িকভাবে দিয়ে ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। পৌষপার্বণের পিঠে-পায়েস খেতে নিশ্চয়।

নূতন ঝি-এর একটি বছর খানেকের বাচ্চা আছে—রেখে আসার লোক নেই। ছেলেটিকে এনে বসিয়ে রাখে এককোণে। থেকে থেকে ছেলে কেঁদে ওঠে। নবীনা দয়াপরবশ হয়ে রুটির টুকরো দেন। পরশু বড়দিনে কেকও দিয়েছিলেন।

ঝিটিকে বকাবকি করে ছেলেকে বাড়ি রেখে আসতে বলে লাভ নেই। স্বামী তার জলের ভারী, এ সময়ে ঘরে ঘরে জল দেয়। বস্তির ঘরে দেখবার কেউ নেই। ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে না রাখলে কাজ করা হবে না তার।

নিত্যানন্দ মাকে বুঝিয়েছে, "লিন্ডার মনটা খারাপ আছে। ঝিকে ছাড়ালে এত শীতে আবার পাবে কোথায়? খৃস্টানবাড়ি চট করে কেউ কাজ করতে চায় না। জানুয়ারি মাসে এসে যাবে আমাদের পুরনো লোক।" কিন্তু, নবীনা বলেন, "দালানটা নোংরা করে ফেলে, কান্নাকাটি করে। গা ঘিন ঘিন করে নোংরামি দেখে। কান্নার আওয়াজ যেন কুকুরের বাচ্চা। দিন-রাত কাঁদে।"

নিত্য বলে, "ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদে, বুঝছ না? সারাদিনে পেটে পড়ে কতটুকু। তুমি না হয় ওকে একটু করে দুধ দিও। ওই ঘটনা ঘটল আমাদের ভাগ্যদোষে। আর শিশুকে বাড়ি থেকে তাড়ানো উচিত হবে কি?"

নবীনা ধর্মভীরু। অতএব প্রত্যহ তিনি এক কাপ দুধ দিতে লাগলেন। অবশ্য দুধে খানিকটা জল মিশাত, কারণ অভ্যাস নেই ছেলেটার খাঁটি দুধ খাবার। কলকাতার জলমেশা দুধে পুনর্বার জল মিশে কী হত বলা শক্ত। তবে ছেলেটার কান্না থামল না।

আজ বাচ্চাটা খালি কাঁদছে। দুধের কাপটা খালি, রুটির ছিলকেগুলো উঠে গেছে তার।

নবীনা বিরক্ত হয়ে ঝিটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ বেবী কাঁদে কেন?" ঝি ছেঁড়া কাপড়ে গা ঢেকে কোনমতে কাজ করছিল। এসব বাড়ির ঝি নয় সে জাতে কিন্তু ভালো ঝি, অস্থায়ী কাজে পাওয়া যায়নি বলে একে দিয়ে গেছে পুরনো লোকটি।

ঝি মিনমিন করে বলল, "আজ বড্ড জার। শীত লাগিছে।"

তাইতো, শতচ্ছিন্ন একটু জামা সুতীর গায়ে, ছেলেটি কাঁপছে। নবীনা অপ্রতিভ হয়ে নিজের গায়ের থানের আঁচলের নীচে পরিহিত খয়েরী কার্ডিগানের দিকে তাকালেন। তদুপরি গাঢ় বাদামী আলোয়ানের স্পর্শ অনুভব করলেন।

সম্প্রতি গির্জায় সারমন শুনে এসেছেন বড়দিন উপলক্ষে। আর এক শীতার্ত নবজাতকের কথা হঠাৎ কেন জানি না মনে পড়ে গেল। বেথেলহেমের আস্তাবলে খড়ের গাদায় এক নবজাতক, যিনি জন্মসূত্রে সমগ্র ভূমণ্ডলকে পবিত্র করেছিলেন। আর এক শিশু যীশু।

কী করা যায়। ছোট ছেলের জামা চাই। আর আছে কি? না, সমস্ত বিলিয়ে দিয়েছে? অনেকবার ইতস্তত করলেন নবীনা অবশেষে দ্বিধা জয় করে এগিয়ে গেলেন।

"লাবণ্য!"

যীশুখৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ ছবির সম্মুখ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাবণ্য লিন্ডা। শাশুড়ীর ডাকে ফিরে তাকাল।

গলাটা ঝেড়ে নিয়ে নবীনা বললেন, "মা, ঝি-এর ছেলেটা বড়ই কাঁদছে। শীতে কষ্ট পাচ্ছে কিনা।"

লিন্ডা নির্বাক হয়ে শাশুড়ীর মুখে চেয়ে রইল। নবীনা গলাটা আর একবার ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "যদি পুরনো পোষাক এক-আধটা দেওয়া যায়, ছেলেটা বাঁচে। দেখগে, কি পরে রয়েছে।"

লিন্ডা দেখেছে। রোজই দেখে সে আজও দেখেছে। কিন্তু তার পিছনে বা আগে ভেবে দেখেনি।

শক খাওয়ার পর লিন্ডা সটান হয়ে দাঁড়াল । পোষাক? কার পোষাক? সে পোষাক রেখে চলে গেছে? সমস্ত পোষাক সে বিলিয়ে দিয়েছে ফাদার রবিনসনের আশ্রমে, দেখতে পারত না, সহ্য করতে পারত না।

শুধু একটি পোষাক আছে প্রিন্সের শেষ পোষাক, রাজপুত্রের শেষ পোষাক। পার্টিতে যাবার দিনে ক্রিমসন ভেলভেট সলমাচুমকী বসানো বেবিসুট ছেড়ে রাত্রে স্লিপিং স্যুট পরে মায়ের কোলে শুয়েছিল শেষবারের মত। পরের দিন সকালেই হাসপাতাল যেতে হল।

সেই পোষাকটি কাঠের বাক্সে রাখা আছে খাটের সম্মুখে। সাদা ফুলে সে সাজিয়ে রাখে, দামে নয় শুধু, হৃদয়ের মূল্যে মহার্ঘ পোষাক।

কী হবে পোষাকে? সে তো নেই। সে চলে গেছে। একটা হাহাকার লিন্ডার গলা থেকে উঠতে চাইল। দু'হাত মুঠো করে সে যীশুর ছবির দিকে আবার ফিরে গেল।

ক্রুশবিদ্ধ যীশুর চোখে অপার সান্ত্বনা।

"আমি কি যন্ত্রণা পাইনি? কষ্ট না পেলে মানুষ আমার কাছে কি শিক্ষা নেবে? সে আমার কাছে আসবে কেন? এক শিশু সহস্র শিশু হয়ে নিত্য যে তোমার সম্মুখে আসছে। তবু চিনে নিতে পারছো না কেন? ভালবাসার বড় সাধনা নেই। সবাইকে প্রেম দাও, তবেই তুমি প্রেম পাবে।"

যীশুর নেত্র যেন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। ললাটের পেছন হলো আরও উজ্জ্বল । সেই জ্যোতি সারা ঘর প্লাবিত করে দিল। লিন্ডার মনকে প্লাবিত করে দিল। অমর জ্যোতি অবশেষে লিন্ডাকে স্পর্শ করল।

সাদা ফুলের পাত্র নামিয়ে লিন্ডা কালো বাক্সটি খুলল। এই মহার্ঘ পোষাক সে অন্য শিশুকে দেবে। মহার্ঘ পোষাকে নূতন যীশু আবার শিশু হয়ে আসবেন। আর এক শিশু নূতন যীশু হয়ে উঠবে—

"Ring is the Christ that is to be–
Ring out wild bell to the wild sky.
The year is dying let it die,
Ring out the old, ring in the new."

❑

জন্মান্তর

আশা দেবী

মনের মিল একটি অদ্ভুত বস্তু। সারা জীবনেও হয়তো একজনের সঙ্গে মনের মিল হলো না, আবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে একজনের সঙ্গে মনের আশ্চর্য মিলের সূত্র পাওয়া গেল। নইলে কুসুম সাত মাসের ছেলে ফেলে কালিকানন্দের সঙ্গে পালিয়ে আসবে কেন?....

কালিকানন্দ ভৈরব হলেও গৃহস্থের সাংসারিক বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না সে। শ্রীঘরের ভয়ে কুসুমকে ভৈরবী সাজিয়ে সোজা কুম্ভ-স্নানে পাপস্খালনের জন্য চলল। কালিকানন্দ এসব দিক থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ। কিছুদিন নাগাদের সঙ্গে—কিছুদিন হরিদ্বারে কঙ্কাবাসে ঘুরে কুসুমকে সন্ন্যাস ধর্মে খানিকটা রপ্ত করিয়ে এবং দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে একেবারে কাশীতে এনে ফেললেন। দশাশ্বমেধের ঘাটের শ্মশানের পশে সে নিজের আস্তানা গেড়ে বসল।

সকাল বেলাতেই সোয়া তিন টাকার গাঁজা কলকেতে পুরে ভৈরব প্রচণ্ড টান দিয়ে বুঁদ হয়ে বসল, আর নাকমুখের যাবতীয় রন্ধ্র দিয়ে কুণ্ডলীতে ধোঁয়ার কালো রেখা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগলো। কুসুম শ্মশানের একটু কাছেই বসেছিল। চোখে তার জল টল টল করছে। সামনেই বাঁধানো জায়গাটায় একটি শিশুকে বুকে পাথর বেঁধে গঙ্গার বুকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে—কুসুমের বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠলো এতদিন পরে—মনে হলো অনেক দিন আগে যে খোকাকে সে ফেলে এসেছে কোথায় যেন এর সঙ্গে তার মিল আছে।

'এই কুসুমী—ওঠ্।' ভৈরব প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো। বসে বসে কাব্য করা হচ্ছে! বাজার যা! যা হয় কিছু কেনা-কাটা করে আন।'—

'আমার ভালো লাগছে না। তুমি যাও।'—

'মাইরী আর কি— ? তুমি যাও—। আমার বিয়ে করা বৌ-রে বাজার করে খাওয়াব! যা—যা শিগগির।'—

কুসুম উঠলো—বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু বাজারে গেল না। সোজা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসল।

কার ছায়া যেন আজ তার চোখের ওপর এসে পড়ে সমস্ত মনটা বিকল করে দিয়েছে। বুকের কাছে যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দুটো মুঠো—। হঠাৎ চমকে ওঠে কুসুম—না রুদ্রাক্ষের মালা।....সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম থাকতে নেই।

ভৈরব তাকে সব সময় আজকাল পীড়ন করে। নেশায় কম পড়লে মারধোর করতেও ছাড়ে না। মন ভাল থাকলে আদর আব্দার করে বটে, তবে তার সংখ্যা আজকাল হাতে গোণা যায়। চরস খেয়ে পড়ে থাকে— পেলে চণ্ডুও খায়, গাঁজা তো নিত্যসাথী। মেজাজ যেমন রুক্ষ, কথাগুলোও তেমনি কঠিন। কথার ঘায়ে যেন ভৈরব তাকে আজকাল ফুঁড়ে ফুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে চায়।

ঘর ছেড়ে আসবার সময় কিন্তু এ জীবন সম্পর্কে তার কেমন যেন একটা মোহ ছিল। কেন ছিল, সে তার মনকে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে—কিন্তু কোনও উত্তর পায়নি।

একটা লোক বাজার করে যাচ্ছিল, তাকে ষাঁড়ে ধরেছে কপির পাতা খাবার জন্যে।—'হ্যাট-যা-যা।' চমকে তাকালো কুসুম। কত বেলা হয়ে গেল—এখনও সে বাজার করেনি। হয়তো এতক্ষণ ভৈরব কালভৈরব হয়ে বসে আছে। ও আবার ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না মোটেই। হঠাৎ পা চালিয়ে চললো কুসুম।

বাড়ির কাছে আসতেই এক নারী কণ্ঠের খল খল হাসির শব্দে চমকে উঠলো কুসুম। কার সঙ্গে কথা বলছে ভৈরব?

'আরে ছেড়ে দাও—কুসমীর কথা। ও না কাজের, না কামের—শুধু বসে বসে মুখ গোমরা করে থাকতে পারে। কীভাবে সারাদিন ও-ই জানে?'

'তোমার তো ওকেই পছন্দ—'

'কে বললে—? আছে সঙ্গে—আছে। তোর সঙ্গে যে হরদুয়ার থেকে ভাব। তখন বললাম চলে আয়। এলি না। জানি আসতেই হবে। ভৈরবের টান চুম্বকের টান। আসতে হলো কিনা, বল?'

'হলো—। কিন্তু তোর ভৈরবীর কি হবে?'

'চুপ থাক তুই—আমি.....'।

আর থাকতে পারলো না কুসুম। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো।—হাতের থলিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'কে?'

'নেকি, আমাকে চিনলে না?'—নিশি ভৈরবী হাসলো।

'চিনি বৈকি? তো এখানে কেন? খোঁড়া কোথায়?'

'তাকে ছেড়ে এসেছি। সারা জীবন ধরে কি খোঁড়ার সেবা করবো না কি? তার ওপর তার একশ বাহানা। প্রাণ যেন ঝালা-পালা করে দিলো! শীতের দিনে এই আগুন জ্বালো, হাত সেকো, পা সেকো, আবার গরম পড়লে খাটিয়া নিয়ে আয় বাইরে—। নইলে চৌপর রাত পাখা চালা। হাতের পাখা পড়লো কি এক পায়ের গুতো দেবে—এমনি। মরুক এবার পচে গলে, কে দেখে দেখবো।—ওর চেলা আবার মারে আমাকে। ভিক্ষেয় যা পাই কেড়ে নেয়। ইয়া তাগড়া গুণ্ডা—ও খোট্টার সঙ্গে পারবো কেন! রাতে শুয়ে ছিলো ত্রিশূল দিয়ে একটা চোখ কানা করে দিয়ে এসেছি। মরুক হেদিয়ে এক-চোখ বজ্জাত এবার।'

কুসুম চমকে উঠলো, 'কী মানুষ তুমি। শুনলেও গা শিউরে ওঠে।'

'আহা, মরে যাইরে দরদী। ভরা সংসার, অমন শিবের মত স্বামী—কোলের ছেলে—দুধের শিশু, তা রেখে কেমন করে এলে চাঁদ! কোন প্রাণে শুনি?—'

কুসুম কথা বলতে পারলো না। খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে গেল।

পেছন থেকে একটি পুরুষ এবং নারী কণ্ঠের সমবেত হাসির ধ্বনি যেন বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠলো। কুসুম এবার যেন ছুটে পালাতে চাইলো ওখান থেকে।

শ্মশানের কাছে একটু উঁচু জায়গায় বসে রইলো কুসুম গঙ্গার দিকে তাকিয়ে।

কত লোক আসছে—কত যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী হাত ধরে আঁচলে আঁচলে বেঁধে গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে।

তারও তো সংসার ছিল। সুরেশ্বর রায় উকিল। তাঁর প্রাকটিসও ভালো—প্রচুর পসার। কুসুমকে

দেখেই বিয়ে করেছিলেন। বাড়িতে চাকর দাসী লোকজন সবাই। কুসুমকে সুরেশ্বর ভালোবাসতেন খুবই, কিন্তু গুরুপুত্র কালিকানন্দই মধ্যে থেকে সব গোলমাল বাধালো।

অযাচিত সহানুভূতি, উপদেশ আর ভালবাসার প্রদর্শনী তাকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আনল। তখন মনে হলো সব সুখ বুঝি ওপারে। মুখের কাছে অযাচিত সুধাপাত্র ধরা আছে তাকে প্রত্যাখ্যান করাই বাতুলতা। তারপর অত্যন্ত সংযত এবং ভদ্র সুরেশ্বরের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একদিন ধীরে ধীরে গুরুপুত্র ছুঁচ হয়ে প্রবেশ করে ফাল হয়ে বেরোল।

ভারি ভাবতে ইচ্ছে করে তার স্বামী কি তাকে ক্ষমা করেছেন? লোকের মুখে শুনেছিল সুরেশ্বর একেবারে ভেঙে পড়েছেন। কুসুমের বিরুদ্ধে কখনও কোনো অভিযোগও করেনি। তবে—?

এখন কোর্ট থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ তার গায়ের কোর্ট খুলে নেয়—পায়ের জুতো খুলে দেয়। আবার এগিয়ে—

....হঠাৎ চমকে উঠলো কুসুম। একটা মর্মান্তিক দৃশ্য সকলের চোখের সামনে তীক্ষ্ণ হয়ে বেজে উঠলো। একটি ষোড়শী...কত আর বয়স...ষোল কি সতের। চোখের জলে যেন তার গাল দুটো ভেসে যায়....মাথার রুক্ষ্ম চুলগুলো এলোমেলো বাতাসে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত গালে মুখে কপালে সিঁদুর লেপা—মৃতের পায়ের ওপর পাগলের মত মাথা কুটে কুটে কাঁদছে।

স্ত্রী নিশ্চয়ই—বুড়ো স্বামী। তবু তা সত্ত্বেও তাকেই সে ভালোবেসেছিল। সমস্ত মনটা যেন কুসুমের মোচড় দিয়ে উঠলো বেদনায়। হয়তো নিজের ব্যর্থতার কথা ভেবেই তার এমন লাগছে।

আর বসে থাকা গেল না। উঠে.আসতে হলো। কিন্তু তার ঘরের আর এক দৃশ্য। পাক-শাক শেষ করে নিশি আর ভৈরব আহার সমাপন করেছে। আচমন করে বদন প্রক্ষালন করতে গেছে ভৈরব, নিশি তামাক সাজার ব্যবস্থা করছে।

মীমাংসাটা কত সহজে হয়ে গেল তাই ভাবছে। হয়তো বা এ জীবন এমনি সহজ। এদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের মধ্যে বাধ্যবাধকতা খুবই কম। ইচ্ছা হলে থাকাও যত সহজ, চলে যাওয়া তার চেয়েও বেশি.সোজা। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললেই অনর্থের সম্ভাবনা।

নিশি যেন কতদিনের পাতা সংসারে এসে বসেছে এমনি ভাব। যেমন স্ত্রী সংসার ফেলে বাপের বাড়ি যায়, আবার আসে। তামাক হাতে নিয়ে নিশির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে লাগলো ভৈরব। কুসুমকে একবার একটা কথা জিজ্ঞেসও করল না।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। ওপারের রামনগরে দুই-একটি করে আলো জ্বলে ওঠে। গঙ্গার মন্থর জলে জোয়ারের চেতনা লাগে। একটু একটু করে জল বাড়তে থাকে। কাদা-মাখা ঘোলা জল একেবারে এপারের স্নানের ঘাটের ফাঁটা সিঁড়িটা স্পর্শ করে। হিন্দুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথের মন্দির থেকে আরতির বাজনা শোনা যেতে থাকে।

তারই সঙ্গে মিলিত হরিধ্বনি যেন চারিদিকের সুর কেটে দেয়।

নিশি বললে, 'ওই এলো আর একটা।'

ভৈরব বললে, 'অন্নকূটের সময় বুঝি কলেরায় মরেছে—মড়ক লেগেছে শুনেছি।'

'দেখিস বাপু সাবধান। তোকে 'ঝোলায়' না ধরে।' নিশির মুখ দিয়ে মাতৃভাষা বেরিয়ে গেল। কলেরাকে সে ভারি ভয় করে। আর তার চেয়েও বেশি রোগীর সেবা। তার ভারি খারাপ লাগে এ

কাজ। নমঃশূদ্রের ঘরের মেয়ে নিশি। বরিশালের গ্রামে—বাড়ির পাশের বিশিষ্ট পরিবারের এক ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে দেশত্যাগী হয়। বাড়ির লোকের ভয়ে সে কিছুদিন পালিয়ে থাকে। তারপর একদিন কি জানি কি কারণে সামান্য ঝগড়ার সূত্র ধরে সে ছেলেটির মাথায় চেলা কাঠ দিয়ে আঘাত করে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। তারপর তীর্থে তীর্থে—কখনও এর সঙ্গে—কখনও ওর সঙ্গে।

সেবার ভারি শীত। প্রয়াগে অগস্ত্য-বাস করবার জন্য গিয়েছিলো এক উর্ধবাহু সাধুর সঙ্গে। রাতে হঠাৎ ঘরে আগুন লাগে। নিশি পালায় কিন্তু সাধুটি পুড়ে মরে। নিশির অবশ্য তাকে বাঁচাবার কোনো তাগিদ ছিল না। এখন মরে গিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করল। এখন সে নিজের ইচ্ছেয় চরে বেড়ায়।

বুড়োর চিতা এতক্ষণে নিভে গেছে। একটা দুর্গন্ধ আর বিশ্রী অনুভূতি ওদের মনের ওপর দিয়ে অন্ধকারের মতো বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে এতো আলো থাকলেও এ দিকটা ছায়াচ্ছন্ন। দুই-তিনটে চিতা থেকে পোড়া কাঠ কয়লা এখনো সরানো হয়নি। সামনে ধ্বংসাবশিষ্ট চিতাগুলো যেন কেমন খাপছাড়া দেখাচ্ছে। ওদিকে আরো একটা চিতা প্রায় পুড়ে পুড়ে নিবে আসছে। কাঠ কয়লার রাশি রাশি অঙ্গারের মধ্যে সাদা সাদা হাড় পাঁজরগুলো নিষ্ঠুরভাবে যেন তাকিয়ে আছে। একটা চিতার আধ পোড়া পা থেকে একটা তীব্র দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। পোড়া মাংসের গন্ধে যেন বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে।

কুসুম বসেই রইলো। কোথায় ফিরবে সে?—এত সহজেই ভৈরব তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারলো। নিশির বয়স অল্প—স্বাস্থ্য ভালো।—কিন্তু.....

হোক, কিন্তু—পুরুষের জান্তব চোখে এর চেয়ে আর কিছুই বেশি করে ধরা পড়েনি?

স্নেহ, দয়া, মায়া, সেবা কালিকানন্দের কোন প্রয়োজন নেই?

চিতার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে কখন যেন একটু ঝিমুনি এসেছিল চোখ খুলতেই শুনলো, 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে'—দণ্ডী বাবা স্নানে নামছেন।

উঠে পড়ল কুসুম। আর ভৈরবের কাছে ফিরে যাবে না সে। বেরিয়ে পড়বে যেদিকে দু'চোখ যায়।—

কত যাত্রীর ভীড়। কত লোক।—ছত্রের কাছে বসে বসে দেখতে ভালো লাগছে কুসুমের। একটি আধবুড়ো লোক তার বন্ধুর সঙ্গে এসেছেন অন্নকূটে। পুত্র পুত্রবধূ সঙ্গে।

'সুরেশ্বরবাবু—এ যে এই দিকে আসুন। একি আপনার বক্তিয়ারপুরের ঘাট পেলেন নাকি?'

চমকে উঠলো কুসুম।—মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার, তারপর উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ ঠিক সেই লোক—সেই নাম—সেই গ্রাম। এ তো তারই খোকা....ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলেকে। কিন্তু সাত মাসের ছেলে কি আজ তার মাকে চিনতে পারবে—?

'ও ভৈরবী, শিগগীর যাও। ও দিকে তোমার ভৈরবের উল্টা হয়েছে—দাস্ত হচ্ছে। কাছে কেউ নেই?'

'কেন সেই সখের ভৈর'...

মুখের কথা তার শেষ হলো না। লোকটা বললে, 'পালিয়েছে তার যথাসর্বস্ব নিয়ে। ভৈরব বোধ হয় বাঁচবে না—অজ্ঞান হয়ে আছে।'

ওরা তখন এগিয়ে যাচ্ছে, কুসুমের সমস্ত মন যেন পাগলের মতো ছুটে যেতে চাইলো ওদের পেছনে। যে জীবনকে সে বিশ্বাস করে না মিছিমিছি তার সঙ্গে নাটকীয় আত্মীয়তার অভিনয় আর কতদিন করবে সে?

'কি চাও গো, ভিক্ষে?'—সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলো। 'সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছো কেন?'—

'ধন্যি কাশীর ভিখারী, পকেটে হাত পুরে টাকা তুলে নেয়। দিও না বাবা। একটাকে দিলে হাজারটা এসে ধরবে।—তখন?'

....কিন্তু সুরেশ্বর যেন অনেকক্ষণ তাকিয়ে কি দেখলো—চিবুকের তলায় একটা মস্ত জরুল। ঠিক এখনও সেখানেই আছে।

'ওকে একটা টাকা দিয়ে দে খোকা; যাও আর ঝামেলা করো না।'

হাত পাততে গিয়েও পারলো না কুসুম, ছুটে চলে গেল—পাগলের মতো পালাতে চাইলো ওদের চোখের সামনে থেকে। একটু বিভ্রান্তি এসে গিয়েছিল—একটু দুর্বল হয়ে গিয়েছিল মন। ওরা এখন ওর কেউ নয়। ওদের চোখে ও ভিখিরী।—

ফিরে এলো যখন তখন দুপুরের কাঠ-ফাটা রোদে চারিদিক পুড়ে যাচ্ছে। আর একা পড়ে ভৈরব চিৎকার করছে—জল—একটু জল দে।

ঘর খালি। কলস শূন্য। কুসুম ছুটলো কলস নিয়ে গঙ্গার দিকে। জোয়ারের গঙ্গার কাদা মাখা জল তখন একেবারে স্নানের ঘাটের ফাটা সিঁড়িটা স্পর্শ করেছে।

মেয়েমানুষ

ছবি বসু

নমু আর আমি দু'জনেই ক্লাস এইটে এক স্কুলে পড়ি, নমু মানে নমিতা আমার প্রিয় বন্ধু। এ-পাড়ায় এসেছি বছর দু'য়েক। আর ওদের বড়িটা—একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের বাড়ির গায়ে।

কথাটা তাহলে খুলেই বলি। ওদের বড়িটা এ-পাড়ায় সব থেকে পুরনো। আগে বোধহয় আশপাশ ফাঁকা ছিল। সেসব ফাঁকা জমি কবে বিক্রি হয়ে নতুন বাড়ি উঠেছে।

বাড়ির নীচটায় নানান দোকান ভাড়া। ওপরতলায় ওরা সব থাকে। সব মানে ওর বড় জ্যাঠা তো সেদিন বাড়ি করে সল্টলেকে উঠে গেলেন, ওর বাবা আর দুই কাকার পরিবার এখন দোতলায়। আর আছেন নমুর ঠাম্মা।

নমুদের বাড়িটা বেশ মজার দেখতে। নমুর বাবা করলেন কি—ওঁর তরফের দুটো ঘরের বাইরেটা রঙ করলেন পান্‌সে হলদে রঙে। পাশের ঘরদুটো বড় কাকার। উনি বললেন—ওসব রঙ-টঙ করার ওঁব পয়সা নেই। তাই বাইরেটা রইল ছাতারে পাখির গায়ের রঙে। শুধু বাড়ির গায়ে গায়ে অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে বয়েছে। তার ঠিক পাশের ঘর দুটো ছোটকার, হঠাৎ ছোটকা সে দুটোর গায়ে লাগালেন ঘন নীল রঙ। আচ্ছা বলুন তো, হাসি পায় না। কী কিম্ভূত কিমাকার দেখতে বাড়িটা। আর সবার প্রথমে ঘোরানো লোহার সিঁড়ির গায়ে যে ঘরটা সেটার গায়ে কেউ রঙ দেবার কথাই ভাবে না। ওটা একদিন ছিল বাড়ির আঁতুড়ঘর, এখন ঠাম্মা থাকেন। আমাব পড়ার ঘরের ঠিক উল্টো দিকটাতেই ঠাম্মার ঘর। কবেকার পুরনো কাঠের জানলাটার একটা পাল্লা ভেঙে গেছে, বৃষ্টির দিন ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি ঘরে ঢোকে। ঠাম্মা এ-ধার থেকে ও-ধার সরে যায়। আমি ভাবি কী মজা ঠাম্মার। ওঁকে কেউ বকবে না ভিজলে। আমি হলে...। নমুর ঠাম্মাকে আমরা দু'জনেই ভালবাসি। আমাদের কত গল্প বলেন। একদম বকেন না।

নমু বলে—'জানিস, ঠাম্মা জেলে গেছল। টিয়ার গ্যাস, গুলি কিছুতেই ঠাম্মার ভয় ছিল না।' নমুর কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

—'ফুঃ! তোর ঠাম্মা তো ফড়িঙের মতো পাতলা, ও কি করে পুলিশের সঙ্গে ফাইট করবে।'

নমু বিজ্ঞের মতো চোখ পাকিয়ে বলত।

—'বয়স হলে সবাই একদিন ফড়িঙের মতো হয়ে যায়। তুইও হবি।' আমার অবিশ্বাস তবু যায় না।

—'তোর জ্যাঠা, বাবা, কাকা, পিসী সব একগুচ্ছের ছেলে-মেয়ে তো ঠাম্মার'—

'তো কী? ঠাম্মা যখন জেলে যায় তখন তো জ্যাঠা, বাবা খুব ছোট।'

একদিন বলে—'বড় হলে আমি ঠাম্মাকে একটা ভাল ঘর বানিয়ে দেব। আসলে ঠাম্মার ঘরটা ছিল এ-বাড়ির আঁতুড়ঘর। বাবারা, ভাই-বোনেরা সবাই ঐ ঘরে জন্মেছে।'

—'আর তুই?'

—'আমি, আমার ভাই, সবাই নার্সিংহোমে জন্মেছি। মা বলেছে—ওমা ছিঃ ছিঃ, ঐ পচা ঘরে'....

নমু ওর মার নকল করে মুখভঙ্গি করে।

আমি একদিন ঠাট্টা করে ঠাম্মাকে বলি।

—'তুমি এই আঁতুড়ঘরে থাক কেন?'

ঠাম্মা নাকের ডগায় চশমা এঁটে বাঙলা কাগজ পড়ছিলেন। প্রথমটা শুনতেই পাননি। তারপর চশমা খুলে কাঁচ মুছলেন। আমার দিকে যখন চাইলেন তখন দেখি তাঁর দু'চোখ উপচে হাসি। হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল। বললেন—'ঘরে কি কোনো ছাপ দেওয়া থাকে রে? আমাদের যখন যা সুবিধে সেভাবেই ব্যবহার করি। আসলে তখনকার রেওয়াজ ছিল ঐরকম। এখন ভেবে দেখ এই শহরে কত মানুষ। একটা আস্ত পাকা ঘর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ভোগ করছি। ক'জন পারে, ভাবা যায়।'

আসলে নমুর মা-কাকীরা ঠাম্মাকে সরিয়ে দিয়েছে। ওদিক থেকে ছিটকিনি তোলা। তিন ঘর থেকে পালা করে একজনের মতো চাল ডাল আলু তেল আসে। কার্তিকের মা ঐ ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, আমার মা বলে—'ঐ সিধে যাচ্ছে।'

আমি বললে মা ক্ষেপে যায়। বলে—'পাকামো করবে না।'

নমুর জ্যাঠার বাড়ি সল্টলেকে। যেদিন গৃহপ্রবেশ হল সেদিকে ওরা ঠাম্মাকে নিয়ে গিয়েছিল।

নমু বললে—'জানিস, ঠাম্মা ওখানে কিছু মুখে দিল না, অনেক করে বলায় শুধু শরবত খেল। আসলে জ্যাঠা চলে যাবে এটা ঠাম্মা মানতে পারেনি।'

—'কেন রে, ওখানে তো কত ফাঁকা। ঠাম্মা তো আকাশ দেখতে চায়, তারা দেখতে চায়। এখানে এই উঁচু উঁচু বাড়ির ফাঁকে টুকরো টুকরো আকাশ।'

—'ঠাম্মাটা ঐরকম। কাল ছোটকার সঙ্গে একচোট হল। ছোটকা কোন মন্ত্রীকে একটা চিঠি দিতে বলেছিল। কত করে বলল। ঠাম্মা রাজি নয়।'

—'ওমা, তাই নাকি। তাহলে ঠাম্মাকে বল না মন্ত্রীকে বলে আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষাটা পিছিয়ে দিতে, একটুও পড়া হয়নি।'

—'দূর, ঠাম্মা তাহলে দেবে একখানি। যা বলছিলাম, শোন, তুই বড় বাজে বকিস। ঠাম্মা বললে—আমি নিজেও নেব না, কাউকে দেব না—সে ছেলে হোক আর যে হোক'—

—'পারমিটটা পাই তুমি তা চাও না।'

—'সত্যি তাই।'

—'এই না হলে মা। ছেলের সঙ্গে কিভাবে শত্রুতা করা যায় তারই সুযোগ খোঁজো।'

ছোটকা রেগেমেগে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে এমন করে ছুট মারল, ভাবলাম এই বুঝি পড়ল।

ঠাম্মার সম্পত্তি হচ্ছে একটা লাল টিনের বাক্স। সেটার মধ্যে রাশি রাশি কাগজপত্র। কিসের কাগজ বুঝি না। তবে চিঠি দেখি তাড়া তাড়া। কাগজগুলো হলদে হয়ে গেছে। তবু কি যত্ন করে বেঁধে রেখেছেন। ঠাম্মা মাঝে মাঝে চিঠির ঝাঁপি খুলে বসেন। নমু বলে—'দেখ্ দেখ্ চিঠি পড়ছে আর ফিকফিক করে হাসছে। এতকি মজার কথা রয়েছে রে?'

একটা বাঁধানো খাতায় পুরনো লেখাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঠাম্মা পা ছড়িয়ে এক একদিন সেখানে লিখতে বসে।

ঠাম্মা নাকি নমুকে বলেছিল—'খাতাটা তোর জন্য রইল। একদিন পড়বি। আমাদের যুগকে জানবি।'

—'কবে আমায় দেবে ঠাম্মা?'

—'যেদিন আমি থাকব না, সেদিন।' নমু চুপি চুপি বলে, 'ঠাম্মা মারা যাবার পর খাতাটা আমার হয়ে যাবে।'

নমুর মুখটা গর্বে চকচক করে। বলে—'তোকেও দেব রে। তবে ঠাম্মা তো এখনো বেঁচে আছে।।'

মাঝে মাঝে নমু বেজায় রেগে যায়।

—'কি যে রয়েছে তোমার ঐসব চিঠি আর কাগজে, সব একদিন ছিঁড়ে ফেলব।'

—'বড় হলে এর মর্ম বুঝবি। গল্পের মতো কত ঘটনা রয়েছে।'

—'খবরের কাগজে সে তো সব বেরোয়। আবার দু'দিন বাদে সেসব লোকে ভুলে যায়।'

—'যায়ই তো, ঠিক বলেছিস। ভুলবিনে বলে তো চিঠি, কাগজপত্র সব জমিয়ে রেখেছি। এক একটা যুগকে বুকে ধরে রয়েছি। তোরা জানবিনে, শিখবিনে?'

সত্যি বলছি, একটা বড় মজা লাগত আমাদের। বাক্সটা খুললে ঠাম্মা যেন বেমালুম সব ভুলে রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে আমরা চেঁচামেচি করি, লাফালাফি করি। ঠাম্মার মোটেও হুঁশ নেই।

পুরুষদের মতো ঘাড় ছাঁটা চুল। তায় আবার সাদা মাথা। তামাটে রঙ। চশমা খুললে দেখা যাবে ঠাম্মার ভাসা ভাসা চোখ। ঠাম্মা যেন এ-বাড়ির কেউ নয়। জেগে জেগে কেউ আবার স্বপ্ন দেখে। এক এক সময় নমু ভয় পেয়ে যায়।

—'ঠাম্মা, ও ঠাম্মা। আমরা কতক্ষণ খেলছি, খিদে পায় না?'

—'তো, খেলেই হয়।'

—'কী খাব, কাঁচা চাল? রান্না করবে তো? তোমার সিধে তো কখন এসে গেছে।'

মেঝের এক কোণে একজনের মতো চাল, ডাল, আলু, কাঁচকলা....

—'নাও দিকি, স্টোভটা ধরাও। আমি চালডাল ধুয়ে নিচ্ছি। মাকে বলে আসি এখানে খাব।'

আমি বলি—'আমিও।'

ঠাম্মার হাতে ভাতে ভাত খেয়ে খুব ভাল লাগে। আমাদের খাইয়ে ঠাম্মা নিজের ভাত বাড়ে। আমার আর নমুর তো চোখ ছানাবড়া। আমরা কী রে! বেচারি ঠাম্মা হাঁড়ি চাঁচছে।

এক একদিন রাতে ভয়ে ভয়ে দেখি উল্টোদিকে ঠাম্মা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কি দেখছে কি, রাস্তা, মানুষ, আকাশ ,তারা?

মাকে বলি—'ঠাম্মার কাছে যাব।'

মা বিরক্ত হয়—'বুড়ো মানুষের সঙ্গে অত কী ভাব। তোমাব আর নমুর একটু বাড়াবাড়ি। কই নমুর মা-কাকীমা কখনো কি ও-ঘরে যায়?'

—'ওদের আমার ভালো লাগে না। আচ্ছা মা, তোমরাও তো একদিন বুড়ো হবে, তখন?'

নমু বলে—'ঠাম্মা কি বলে জানিস? মানুষের মনটা বড় তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যায়। বুড়ো তো শুধু দেহে নয়, মনেও। এ পোড়া দেশে মানুষ কত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়। মনটাকে ছড়িয়ে দিবি। প্রকৃতিতে কত রঙ, বৃষ্টির জলে কত রাগরাগিণী। রাস্তায় মানুষ চলছে। তাদের চলায় কত বিভিন্ন ছন্দ। প্রত্যেকটা দিন-রাত, সকাল-সন্ধে নতুন নতুন প্রাণের সাড়া নিয়ে আসে। চোখ-কান খোলা রাখলে আপনিই মনটা চিরকাল সবুজ হয়ে থাকবে।' কেউ বুড়ো বানাতে পারবে না। সৃষ্টিকর্তার সাধ্য কি?'

ঠাম্মা এসব হেঁয়ালির কথা শুধু আমাদের দু'জনকে বলে। আর কাউকে নয়। মনে হয় এসব কথা ঠাম্মার ঐসব চিঠিতে রয়েছে। সব কথা বুঝিনে, তবু আমাদের কেন যে ভালো লাগে।

আমার মাও ঠাম্মাকে মোটে পছন্দ করেন না। বলেন—'মেয়েমানুষের জীবন আলাদা। ধীর-স্থির, নম্র-শান্ত। তা নয় ঘর-সংসার দেখলেন কই। পার্টি করা, লাঠি গুলি, পুলিশ জেল। তার ওপর মাস্টারি। সে তখন যা করেছেন তা করেছেন। ওখন তো পূজো-আচ্চা, দীক্ষা-টিক্ষা নিলে পারেন। যে বয়সে যা শোভা পায়'....

বাবা ফুট কাটেন—'তুমি তো বিয়ের আগেই দীক্ষা নিয়েছ। যা ভক্তিমতী তুমি।'

মা রেগে ওঠেন—'নিজের নাতনিকে যা বলেন বলুন। দেখছ না, দীপুটাকে কেমন হিপনোটাইজ করেছেন।'

—'ম্যাজিক জানেন বুঝি?'

বাবা হাসতে থাকেন। আমিও।

সেদিন ছিল রবিবার। ঠাম্মার ঘরে ঢুকতে গিয়েও দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়ি। কে একজন বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠাম্মা খুব জমিয়ে গল্প করছেন। ঠাম্মার মতোই ওনারও মাথা সাদা তবে গলা বেশ চড়া। দু'জনেই খুব হাসছেন। দেখতে পেয়ে ঠাম্মা ডাকেন—'এদের কথাই তোমায় বলছিলাম সহদেব। দুই নাতনী আমার বন্ধু—নমিতা আর দীপিকা, নমু আর দীপু।'

ভদ্রলোক আমাদের কাছে টেনে নিলেন।

—'সহদেব নাম তো সেই পঞ্চপাণ্ডবদের একজনের। বড় সেকেলে নাম। তোরা বরং আমায় দেবদাদু বলিস।' মাথা নাড়াই।

—'এতদিন তবে কোথায় ছিলে? ঠাম্মার সঙ্গে কেমন করে ভাব হল? কই কখনো তো দেখিনি?'

—'দাঁড়া বাপু। এতগুলো প্রশ্নের একসঙ্গে জবাব দিই কি করে?—ছিলাম কোথায়? কারমাটারে। ওখানেই গাছ-গাছালি নিয়ে পড়াশুনা করি। ওষুধ বানাই। আর ঠাম্মার সঙ্গে ভাব হয়েছিল সেই অ্যাত্তোটুকু বেলা থেকে। তোদের ঠাম্মার তখন আট কি নয় বছর, আর আমার হবে হয়ত দশ কিংবা এগারো, ওরা সব বেড়াতে এসেছিল চেঞ্জে। আমাদের বয়সী ছেলেমেয়ে ছিল বিস্তর।'

—'তোবা তো সে বয়সের ঠাম্মাকে দেখিসনি। কী ডানপিটে মেয়ে, বাপরে। রোজ আমাদের নতুন নতুন খেলা হতো। একদিন ঠিক হল লিচুগাছটার মগডালে যে উঠতে পারবে সে দুটো কমলালেবু প্রাইজ পাবে। সবাই তো উঠছি আর উঠছি। হঠাৎ চেয়ে দেখি শেষ চূড়োটায় টিঙটিঙে ডাল ধরে তোর ঠাম্মা ঝুলে পড়েছে—এই পড়ল বলে, আমরাও ভয়ে শিউরে উঠি। পাতলা ডালটা মনে হয় মট্ করে ভেঙে যাবে। আমরা তো চেঁচাচ্ছি, নিচ থেকে বড়রাও চেঁচাচ্ছে। সবার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা—"মায়া লক্ষ্মীটি, সোনা মেয়ে, পাশের ডালটা ধরে আস্তে আস্তে নেমে আয়।" সবাইকে ভাবিয়ে, ঘামিয়ে, ঘোল খাইয়ে মেয়ে গুটি গুটি নেমে এল। ওর মা যা পিঠে দুমদুম কিল মারল।'....ঠাম্মার মুখে মৃদু হাসি। চোখ থেকে চশমা খুলে মুছলেন। ভদ্রলোক উঠতে বললেন—'কবে কারমাটার ফিরছো?'

—'কাল কিংবা পরশু। একেবারে একলা তো। গিন্নী বছর পাঁচেক হল স্বর্গে গেছেন। দুই ছেলে বিদেশে। কিন্তু কারমাটারে কী যে মধু। থেকে থেকে মন টানে। বাইরে থাকতে পারিনে।'

ঠাম্মা কি বলতে গিয়েও থামেন। বাব কয় কাশেন। আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলেন—

—'এই বুক চাপা ঘর থেকে খোলামেলা জায়গায় আকাশের নিচে ছুটে চলে যাবার সাধ হয়। কিন্তু শরীর বড় বেইমান, সহদেব!'

—'এসো না একবার, ভাল লাগবে। বার্ধক্য তো দ্বিতীয় শৈশব।'

আমাদের দিকে চেয়ে বললে—'এই নন্দীভৃঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে এসো। কিন্তু লিচুগাছটা আর নেই। বাজ পড়ে কবেই যে মরে গেছে।'

গরমের ছুটিতে দু'হপ্তার জন্য মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র নমু ছুটে এল—'দীপু, একটা খারাপ খবর রয়েছে, জানিস। ঠাম্মার ঘরে ঠাম্মা নেই।'

—'মারা গেছেন বল।'

—'ধেৎ, তা কেন। সবকিছু যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। লাল বাক্সটার ডালাটা খোলা। ঠাম্মা কোথাও নেই।'

—'সেই খাতাটা, যেটা তোকে দেবে বলেছিল?'

—'তুই কি রে? ঠাম্মা হারিয়ে গেছে সেটাই তো বড় কথা।'

নমু কেঁদে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

শুনি ওর বড় জ্যাঠা-জ্যেঠি এসেছে। সবাই মিলে কথাবার্তা বলছে।

'চল, আমিও তোর সঙ্গে যাই।'

পায়ে পায়ে আমরা নমুদের ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়াই। আমাদের কেউ দেখেও দেখে না।

বড় জ্যাঠার গলাটা কী ভীষণ খসখসে—

—'তখনই জানতাম, তোমরা কেউ মার সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবে না।'

—'তা কেন? অযত্নটা এমন কী হল।'

বড় জ্যাঠা কি রকম করে হাসলেন—

—'মানুষটা জেদে জেদেই গেল। বুঝলাম তোমার জীবনে ত্যাগ, আদর্শ সব ছিল। চিরটা কাল কি তার জের চলবে? তোমার সঙ্গীসাথী, তাদের ছেলেরা কে না গুছিয়ে নিয়েছে। আর তুমি? একটু পাবলিসিটি থাকলে নিদেনপক্ষে এম এল এ-ও হতে পারত।'

নমুর মা বলে—'মাকে তো জানই। শুধু বলবেন—ওপরের দিকে চেয়ে রয়েছিস, কি করে উঠবি। একবার নিচের দিকে চেয়েছিস। একেবারে নীতিহীন জীবন'....

বড় জ্যেঠি ফুঁসে ওঠে—'ওর মতো ছেলেদের ভাসিয়ে দিয়ে ধেই ধেই করে বেড়াব!'

ছোটকা হঠাৎ চেঁচায়—'বক্তৃতা করবেন না বৌদি। মাস্টারি করে মা আমাদের মানুষ করেছেন। বাবা তো সেই কবে মারা গেছেন। এই বাড়িটা ছাড়া আর কি ছিল?'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ, ঘরে টুঁ শব্দটি নেই। নমুটা এমন না, হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। আমিও। নমুর বাবা আমাদের ঘরের মধ্যে টেনে আনেন।

—'হাঁরে, তোরা তো মার নাড়ীনক্ষত্র জানিস। কোথায় যেতে পারে জানিস?'

—'জানিনে।'

নমু মাথা নাড়ে, আমিও।

হঠাৎ আমার নামটা মনে পড়ে।—'কারমাটার'....

'কোথায়?'

—'একদিন না কারমাটারের দেবদাদু এসেছিল।'

—'দেবদাদু!'

নমু আমাকে [illegible]য় সামনে চলে আসে।

—'সেই যে গো। কারমাটার। সহদেব না কী নাম।'

'ছেলেবেলায় ঠাম্মার সঙ্গে খুব খেলতেন।'

সারা ঘরে জ্যাঠা, জ্যেঠি, বাবা, মা, কাকা, কাকীদের জোড়া জোড়া চোখ বিস্ফারিত।

—'তারপর, তারপর? কী জানিস সব বল। লক্ষ্মী মেয়েরা, তোদের ক্যাডবেরি খাওয়াব। হোটেলে চীনে খাওয়াব।'

নমু আমার মুখের দিকে চায়।

—'আর কী বলছিল রে দেবদাদু?'

—'ঐ তো বৌ মারা গেছে। ছেলেরাও বিদেশে। তবু কারমাটারের মায়া ছাড়তে পারেন না।'

—'ঠাম্মা কী বলল?'

নমু ঢোক গেলে— 'ঠাম্মা বলল যে খোলা আকাশের নিচে ফাঁকা জায়গা খু-উ-ব ভাল লাগে।'

—'তাহলে একটা ক্লু পাওয়া গেল। খোকনকে শুধু শুধু হাসপাতালগুলো দেখতে বললাম।'

নমুর জ্যাঠা বলেন।

—'পুলিসকে কী বলবে?'

—'নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে কাগজে, টিভিতে ঘোষণা বন্ধ কবতে হবে তাহলে'—বড়কাকা বলেন।

হঠাৎ জেঠি বলে—'ছিঃ-ছিঃ পাড়ার লোকই বা বলবে কী সব, একেবারে ঢিঢি পড়ে যাবে। আমার বাপের বাড়ি, আত্মীয়স্বজন কার মুখ চাপা দেব?'

—'চাপা দেবাব কি রয়েছে?'

—'বিলক্ষণ রয়েছে। বুড়ো বুড়ো ছেলেদের গায়ে থুথু দেবে না?'

নমুর জ্যাঠা বাবা কাকারা কী রকম হতভম্ব হয়ে যান।

আমি ফিসফিস করে নমুকে বলি—'হ্যাঁরে, থুথু কেন দেবে? বড়রা কি থুথু দেয়?'

হঠাৎ কে যেন বলে—'কারমাটাবই যাবে কেন ধবে নিচ্ছ? মা কি এ বয়সে একা একা' ....

তাছাড়া পয়সাকড়ি হাতে কোথায়?

ছোটকাকী ফুট কাটে—'কিছু কী আর নেই? একেবারে হাতখালি ছিল না নিশ্চয়ই।'

ছোটকা বিকট তড়পায়—'বছবে তো কোনোদিন ও-ঘরে মাড়াতে না। সব জেনে রেখেছ দেখছি' ...

নমুর বাবা বলেন—'মাথা ঠাণ্ডা কর। উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই।' তারপর নমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—

'হ্যাঁরে, ঠাম্মা কী তোদের কোনো চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছিল?'

—'না তো।'

—'ঠাম্মার নামে কোনো চিঠি এসেছিল।'

—'না না।'

আমি তারপর বাড়ি চলে আসি।

সন্ধেবেলা নমু বলে—'দীপু চল, আমরাও কোথাও চলে যাই। বাড়িতে যা চেঁচামেচি। মোটে ভাল লাগছে না। ঠাম্মার ঘরটা জ্যাঠা তালা দিয়ে দিয়েছে।'

—'এইরে, ঠাম্মার সেই খাতাটা? কি হবে?'

নমু গুম মেরে ছিল। একটু বাদে বলে—

—'বড়রা কিছুই দেবে না। ও-খাতাটা যে ঠাম্মা আমায় দিয়েছিল সেকথা বিশ্বাসই করবে না।'

—জোর হাওয়া দিচ্ছে। ঠাম্মার ঘরের একপাল্লা জানলাটা দুমাদুম পড়ছে। ঘরে একটুও আলো নেই। সেই অন্ধকার সরিয়ে জানালায় যদি একবারও ঠাম্মাকে দেখতে পেতাম। কত সময় দেখেছি গায়ের কাপড় খসে পড়েছে। পাকা চুলভর্তি মাথাটা তুলে একদৃষ্টিতে আকাশ খুঁজছি। এখান থেকে ডেকেছি। ঠাম্মা সাড়া দেননি। আমরা দু'জন এখান থেকে ডেকেছি। ঠাম্মা সাড়া দেননি। একদৃষ্টিতে আকাশ খুঁজছেন। আমরা দু'জন একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে থাকি। বুক টিপটিপ করে।

মা এসে আমাদের দু'জনের মাঝে দাঁড়ায়।

—'হ্যাঁরে, তোরা দু'জনে কত কী সব বলেছিস।'

—'কী বলেছি।'

—'ঐ যে কারমাটার। দেবদাদু না কে?'

—'তো কি? আমরা কি বলেছি ঠাম্মা দেবদাদুর কাছে গেছে? তবে?'

—'যদি যায়?'

—'যায় তো কি?'

হঠাৎ নমু ডুকরে কেঁদে ওঠে।

—'ঠাম্মা ওদের সবার মা, তাই না?'

—'তো কি?'

— 'ঠাম্মা পুলিশের সঙ্গে ফাইট করেছে।'

—'তো কি?'

—'ঠাম্মা জেদী। কোনো মন্ত্রীর কাছে ছোটকাকার হয়ে চিঠি দেবে না।'

—'বলবি তো। তাই কি?'

—'তবু ঠাম্মা সবার মুখে চুনকালি দিয়েছে?'

মা নমুকে বুকে টেনে নেয়।

—'শোন, তোরা এখন বড় ছোট। সব কথা ঠিক বুঝবিনে। যদি ঠাম্মা কারমাটার যায় তাহলে সত্যি তোর বাবা-কাকাদের গায়ে লোকে থুথু দেবে।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে নমু ওর চেরা চেরা গলায় বলে—

—'কেন? কেন? বলবে তো কেন?'

—'একজন নিঃসঙ্গ পুরুষের কাছে তোর ঠাম্মার একা যাওয়া ঠিক নয়।'

—'কেন?'

—'সে তুই বুঝবিনে। বয়স হয়েছে ঠিকই, তবু তোর ঠাম্মা যে মেয়েমানুষ।'

আত্মজা

মহাশ্বেতা দেবী

রানিখেতের মল-এ এক কুয়াশা ঢাকা সকালে বিনু আবার বোনটিকে খুঁজে পেল। ভীষণ দরদস্তুর করে পেপে কিনছিল বোনটি, হাতে একটা বেতের ব্যাগ। কালো কোটের কলার একটু তোলা, পায়ে জুতো, মেয়েটিকে ভীষণ চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

'বাঙালি মেয়ে'। ওর বন্ধুরা একটু হাসল। বিনু বাঙালি দেখলে এখনো হেদিয়ে গিয়ে আলাপ করে, কলকাতায় কোথায় থাকে নাম ঠিকানা বাতলে দিয়ে আসে, বন্ধুরা সেজন্যে ওকে কাঠগুদাম ছাড়বার পর থেকেই ঠাট্টা করছে।

শুধু কট্টর নীতিবাদী রাম যোশী ভুরু কুঁচকে বললে, 'মেয়েই যদি দেখতে চাও তাহলে নৈনিতালে থাকলেই পারতে।'

বিনু বললে, 'এক মিনিট ভাই। মেয়েটি আমার চেনা', পাথরে পা দিয়ে ও নেমে এল। 'এই বোনটি' বিনু ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শুনতে বোকা। বোকা। কিন্তু ফুলপিসিমা ওর একটি ছেলে আর মেজ মেয়ের ডাকনাম ভাইটি আর বোনটি রেখেছিলেন, কিংবা উনি রাখেননি। ওরা দু'জনে দুজনকে যা বলে ডাকত সেটাই ডাকনাম দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ওর ভাল নাম নীলাঞ্জনা।

'আরে বিনু যে!'

ওরা দুজন প্রায় সমবয়সী। এক বাড়িতে পিসতুতো-মামাতো অনেকগুলি ভাইবোন গুঁতোগুঁতি করে মানুষ হলে যা হয়, এক সময় ওদের খুব ভাবও ছিল। বোনটি বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ফুলপিসিমা তো বিনুকেই সন্দেহ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোর সঙ্গে ঘুরত-ফিরত। তুই জানিস না কোথায় গেছে? ছি ছি বিনু, তুই যে এতখানি নীচ তা আমি ভাবিনি।'

ফুলপিসিমার দাদা, বিনুর বাবাও চেঁচামেচি করেছিলেন। ওঁদের কী করে ধারণা হল বিনুও জড়িত সে কথা বিনু আগে বোঝেনি। তারপর বুঝেছিল বিনুর সঙ্গে বোনটির ভাব আছে, বিনুকে ফুলপিসিমারা সবাই ভাল ছেলে বলে মনে করেন, বোনটি এর দুটোকেই নিজের কাজে লাগিয়েছিল।

ততদিনে বিনুরা আলাদা বাড়িতে উঠে এসেছে। বোনটি যখন-তখন বেরোবার জন্যে বিনুর নাম ব্যবহার করত।

'বিনুর সঙ্গে গিয়েছিলাম, বিনু মোড় অব্দি পৌঁছে দিল', বাড়িতে প্রত্যেক দিনই এসে বলত। কাজেই 'আমার খোঁজ কোরো না, লাভ হবে না', লেখা চিঠিটা আবিষ্কার হবার পর ফুলপিসিমা বিনুর কাছেই ছুটে এসেছিলেন।

মা, বাবা, পিসিমা সবাই ওদের মেলামেশাকে কী চোখে দেখেছে, বিনুকে কতখানি দুর্বলচিত্ত মনে করেছে টের পেয়ে বিনুর মাথা কাটা গিয়েছিল। তারপর বোনটির ওপর রাগ হয়েছিল। মিছিমিছি ওর নামকে নোংরা করবার জন্যে বেজায় চটে গিয়েছিল বিনু।

এখন সেকথা মনে পড়ল। ফুলপিসিমা সেদিন অব্দি বলতেন 'যদি কোথাও দেখতে পাস ওর মুখখানা মাটিতে ঘষে দিস বিনু'। কিন্তু ইদানীং আর কিছু বলতেন না। বোধহয় ওঁরা ধরেই নিয়েছেন ওঁদের মেয়ে আর নেই। পাঁচ বছর যখন খবর পাওয়া যায়নি তখন মরে গিয়েছে নিশ্চয়।

পিসেমশায় আবার বেশি বড্ড গোঁড়া। উনি তো ছোটমেয়ের বিয়ের আগে স্পষ্ট বলে দিলেন, 'আমার দুই মেয়ে, অঞ্জনা আর রঞ্জনা। অন্য কারো নাম আমি শুনতে চাই না।'

বিনুর চট করে মনে হল বোনটির সঙ্গে দেখা হবার চমকপ্রদ খবরটা সত্যেন রায় রোডে কাউকে দেওয়াও যাবে না। পিসেমশায় বাঘ। ফুলপিসিমা ছোটোমেয়ের কাছে বেড়াতে গেছেন। ওঁদের একমাত্র ছেলে, বোনের নাম পর্যন্ত শুনতে রাজি নয়।

'বাবার কথার ওপর আমার কথা নেই ভাই'— ওর সাফ কথা। মাকে পর্যন্ত বলে দিয়েছে, 'যদি আমাকে চাও, তা হলে এ বাড়িতে ওর নাম পর্যন্ত কোরো না মা। আমাদের কথা ও যদি তিল মাত্র ভাবত তা হলে বুঝতাম!'

বোনটির হাতে কাচের চুড়ি, গলায় মঙ্গলসূত্র দেখত দেখতে বিনুর মনে হল মেয়েটা একেবারে পালটে গিয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওর কথা কাউকে বলা যাবে না ভাবতে ওর খারাপ লাগল।

'তুমি কি বেড়াতে এসেছ?' বোনটি ওর লজ্জা কাটাতে চেষ্টা করছে। এই পাঁচ বছরেই চেহারা ভারী হয়ে গিয়েছে। কে বলবে এই মেয়ে এক সময়ে ভাল নাচত, থিয়েটার করত।

'অফিসের কাজে।'

'কী অফিস?'

বিনু নাম বললে।

'কদিন থাকবে?'

'সাতদিন।'

আসলে চারদিনের মেয়াদ, কিন্তু বিনু নিজেই জানে না কেন দুম করে মিছে কথা বলে বসল। এতক্ষণে সম্ভবত যাওয়া-আসার কথা উঠল বলে বন্ধুদের কথা মনে পড়ল।

'কোথায় থাক বোনটি?'

'এই তো পি ডব্লিউ ডি বাংলোর বাঁদিকে একটু এগিয়ে আমাদের বাড়ি। ডাক্তার ঠক্কর এখানেই চেম্বার করেছেন। যাবে?' বোনটি হঠাৎ সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল।

'ডাক্তার ঠক্কর কোথায়?'

'এখন শহরে। ওষুধের দোকানে একটু বসেন। লাঞ্চে আসবেন। তুমি কোথায় উঠেছ? ও, তোমাদের তো আপিস থেকেই বন্দোবস্ত করে।'

'চলো, বাড়িটা দেখেই আসি।' বিনু ওকে দাঁড়াতে বলে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। বন্ধুরা বেকারী থেকে বুটি কিনছে।

'লাকি চ্যাপ!' রাম যোশী বললে।

'কে বাবা?' মদন পেরো জিগ্যেস করলে। এক বিনু ছাড়া চারজনই অবাঙালি যদিও সবাই বাংলা বলে। বিনুর মনে হল মদন পেরেরার সঙ্গে বরঞ্চ ঠক্করের কোনো না কোনো রকম আত্মীয়তা থাকলেও থাকতে পারে, আর যা হোক একই রাজ্যের লোক তো! হয়তো বোনটি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে ও সহজ বোধ করবে। কিন্তু বিনুর সঙ্গে কথাবার্তায় ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা আড়াল এসে গিয়েছে।

'আমার পিসতুত বোন।' বিনু সংক্ষেপে জবাব দিল।

'এখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। তোমরা যাও।'

'আরে, আমরা চৌবাটিয়া যাব।'

'আমি না হয় কাল যাব।' বিনুকে দেখে বোঝা হচ্ছে ও বিব্রত, বোধহয় উদ্বিগ্নও খানিকটা। 'অলরাইট' বলে ওরা চলে গেল। অফিস ওদের হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত করেছে। মল-এর ওপরেই ওদের হোটেল।

বোনটির বাড়িতে বিনু বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিল। ছোটো বাড়ি, সামনে একটু বাগান। জানলা দিয়ে নিচের চীরবন দেখা যায়। খণ্ড খণ্ড কুয়াশা চীর গাছের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। অনেক নিচে বোধ হয় কেউ কাঠ কাটছে তার ঠকাঠক শব্দ ভেসে আসছিল। কোথায় রেডিওতে গানের শব্দ।

বোনটি রান্নাবান্না নিজেই করে। বিনুর জন্যে চা করতে গিয়ে ও উধাও হয়ে গেল। বোধহয় বিনুর সামনাসামনি আসতে এখনো লজ্জা পাচ্ছে।

এই ডাক্তার অমৃতলাল ঠক্করের বয়স বাষট্টির কম নয়। কলকাতায় থেকে থেকে উনি একেবারে বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। পিসেমশায়ের বাড়ির সবাই ওঁকে 'কাকা' বলত, বিনুরাও বলত। ছেলেবেলা থেকে ওঁর ওখানে ওরা চিকিৎসা করাচ্ছে। বিনুরা গেলে উনি ওদের লজেন্স দিতেন। ছবির বই, পেন্সিল। বিনু রোজ একটা ডাবওয়ালাকে হোটেল থেকে খাবার আনতে দেখত। বাড়িতে রান্নার কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। ভাসাভাসা শুনেছিল ওঁর বউ বোম্বের এক বড়লোকের মেয়ে, বাপের ওয়ারিসান। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে উনি বম্বেতেই থাকেন। স্বামীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। দুপক্ষই দু'পক্ষ সম্পর্কে একেবারে চুপচাপ। ডাক্তার ঠক্কর কখনো বম্বে যেতেন না।

পিসেমশায় বলতেন, 'মরে গেলে, লোকটা টাকাকড়ি সব চ্যারিটিতে দিয়ে যাবে জানলে?'

কলকাতার গুজরাটি সমাজে ওঁর খুব একটা যাতায়াত ছিল না। যদিও ডাক্তার হিসেবে সব সমাজেই ওঁর মোটামুটি পসার ছিল।

বয়স আঠারো হতে না হতেই বোনটির মুখে অসম্ভব ব্রণ বেরিয়েছিল। কী রকম চাপা আর গম্ভীর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল ওর, কারো সঙ্গে বেশি কথা বলত না। বিনুর এখন মনে পড়ল দুবার বোনটি ওকে নিদারুণ লজ্জায় ফেলেছিল। ওদের বয়স যখন বছর বারো, তখন ঘর অন্ধকার করে চোর-চোর খেলছিল ওরা। বাইরে ভীষণ বৃষ্টি। ছাঁট আসছে বলে গোটা বাড়িটাই দরজা-জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা একেবারে একটা বন্ধ কৌটোর মতো।

সেই সময়ে বোনটি ওকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরেছিল। বিনু প্রথমটা খেলা খেলা মনে করে, কিন্তু পরে 'এই ছেড়ে দাও, কী হচ্ছে?' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে মণ্টুটা ফট করে বাতিটা জ্বেলে দিয়েছিল। বিনু তো অপ্রস্তুত, কিন্তু বোনটি বললে 'বিনুটা খেলা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি আর খেলব না।'

আরেকবার তখন ওরা নতুন বাড়িতে চলে এসেছে, ওদের বাড়িতেই পোস্টম্যান পোস্টম্যান খেলা হচ্ছিল। বোনটি ওর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল। 'এই পোস্টম্যান, তোমাকে তো কেউ চিঠি দেয় না, আমি একটা চিঠি দিলাম। তুমি পড়ে দেখো।' চিঠিটায় লেখা ছিল 'বিনু স্বাতীকে বিয়ে করবে।'

স্বাতী পাশের বাড়ির মেয়ে। বিনু তাকে কোনোদিন ভাল করে চেয়েও দেখেনি। স্বাতীদের বাড়িতে একটা আইসক্রিম বানাবার কল ছিল, আর পাড়ায় একবার ছোটদের মেলা হল যখন, বিনুরা সেই কলে এন্তার আইসক্রিম বানিয়ে বিক্রি করেছিল। স্বাতীর দাদা ছিল মেলার পাণ্ডা।

সেদিনও বিনু কম অপ্রস্তুত হয়নি। বোনটিকে ওর একটু ভয়-ভয়ই করত অনেকদিন পর্যন্ত। কিন্তু

সবচেয়ে আশ্চর্য এই, সতেরো বছর বয়সে বোনটি পাড়ার একজন আসল পোস্টম্যানের হাতেই চিঠি গুঁজে দিয়েছিল একটা। লিখেছিল 'আপনার সঙ্গে আমার অনেক গোপন কথা আছে'।

পোস্টম্যান আবার সে চিঠি এনে পিসেমশায়ের হাতে দেয়। উনি যতই চেঁচান কুরুচি, কুশিক্ষা এইসব বলে, বোনটি একেবারে নির্বিকার। কেন লিখেছিস, ওকে কেন লিখেছিস, একটি প্রশ্নেরও জবাব দেয়নি। বিনুর পরে মনে হয়েছে মেয়ের ওপর ওঁদের খুব একটা বিশ্বাস ছিল না বলেই বিনুকে ওঁরা অবিশ্বাস করতে পেরেছিলেন। সে অবিশ্বাসের স্মৃতি এখনো বিনুকে লজ্জা দেয়। শরীর ঘেমে ওঠে ওর, মনে হয় একথা জানাজানি হয়ে গেলে সবাই ওকে দুশ্চরিত্রা বলে মনে করবে। বিনুর মা যদিও ফুলপিসিমাকে ঝরঝরিয়ে অনেকগুলো খরখরে কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ঘর সামলে পরকে বলতে এস। তোমার ও মেয়ে হাড়ে বজ্জাত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা ঝুলোঝুলি করত!'

বিনুও বিশ্বাস করে মেয়েটি বজ্জাত। নইলে ডাক্তার ঠক্করের কাছে গেলি ব্রণর চিকিৎসা করতে, ডাকতিস 'কাকা' বলে। কেমন করে কোন রুচিতে লোকটাকে বিয়ে করে চলে গেলি। ও বাড়িতে কোন্ মেয়েটার বিয়ে উনিশ বছরের মধ্যে হয়নি? তোরও হতো। বিনুর মা ঠিকই বলেন। কিছু কিছু মেয়ে আছে তারা বিশ্বসংসারকেই জ্বালাতে আসে।

ডাক্তার ঠক্করের চেহারা চোখে পড়ার মতো। কাটা কাটা মুখ-চোখ, কালো রং, মুখের হাসি মিষ্টি। মাথার চুল অনেকদিন ধরেই ধপধপে সাদা। ওখানে ওর পসার এমন কিছু ফলাও ছিল না। ধর্মতলায় ছোট্ট একটা ঘরে দিনে আলো জ্বেলে পাখা ঘুরিয়ে টেবিলের পেছনে বিরাট একটা গণেশের ছবি ঝুলিয়ে উনি ডাক্তারি করতেন।

এখানে পাকাটা ঘুরছে না বটে, কিন্তু সেই সবুজ রেক্সিনের টেবিল, দেওয়ালে গণেশ, টেবিলে, কাচের নিচে 'গড ইজ গুড', 'অল্'জ ওয়েল দ্যাট এণ্ড্‌জ ওয়েল' লেখা কাগজেব টুকরো চাপা দেওয়া। তা ছাড়া কাগজের ফুল। বিবর্ণ, পাংশুটে কতকগুলো কারনেশান। এই তো ঘরের বাইরে উৎসুক শিশুদর মতো উজ্জ্বল সোনালি ক্যানা, পোর্টিকোতে নীলমণি লতার ফুল, টবে এখনো ডালিয়া। যার বাগানে এত ফুল সে কাগজের ফুলে ঘর সাজায় কেন?

এখন বিনু দেখতে পেল পাশের দেওয়ালে একটি মেয়ের ছবি, ছবি ঘিরে কাগজের ফুলের মালা।

'চা খাও।' বোনটি ঘরে ঢুকেছে।

'ওটা কার ছবি?'

'ওর মেয়ের।'

'মেয়ের?'

'হ্যাঁ বিনু। এ বাড়ির কোনো ঘরে জানো আমার একটাও ছবি নেই। প্রতিটি ঘরে ওর মেয়ের ছবি দেখতে পাবে। এমন কি জানো? ওর পকেটে পর্যন্ত মেয়ের ছবি থাকে।'

বোনটি হঠাৎ হাসতে লাগল। ওর হাসি দেখতে দেখতে বিনু বুঝতে পারল হাসিটা হিস্টিরিয়ার। চীনে ধাঁধার একটা টালি যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন বসিয়ে দিতেই ছবিটা পরিষ্কার। আর বুঝতে ভুল হবার কথা নয়। হিস্টিরিয়ার হাসি বিনু আগেও দেখেছে। নিশ্চয় দেখেছে কোথাও, নইলে চট করে বুঝে ফেলল কী করে?

হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে বোনটি মুখে আঁচল চাপা দিল। বলল, 'বিকেলে এসো বিনু। বাড়ি তো দেখে গেলে।'

ডাক্তার ঠক্কর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিনু ওঁকে আলগোছে একটা নমস্কার সেরে বেরিয়ে

এল। বোনটির হাসির শব্দ। একটা প্রচণ্ড চড় মারল কে। হাসি নেই। চীরবনের গভীর থেকে কাঠ কাটবার ঠকাঠক শব্দ। বিনু রাস্তায় পা দিল।

'বাড়ি ফিরে চলো বোনটি।' সন্ধ্যার আকাশের নিচে বসে বিনু বলছিল। এখন বাড়িতে কেউ নেই। ঘরে বাতি। বাতির চারপাশে পোকা উড়ছে। বোনটি চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে।

'বাড়ি ফিরে চলো। ভুল করেছ বলেই ভুলের জের টেনে চলতে হবে তার কোনো মানে নেই।'

'বাবার বাড়িতে?'

'ফুলপিসিমা আছেন।'

'না।' বোনটি মৃদু বিষণ্ণতায় মাথা নাড়ল, 'তুমি তো জানো বাবা কতটা শক্ত হতে পারেন। দাদাও বাবারই মতো। বাবা কতবার মা-কে বলতেন এ বাড়িতে তোমার শুধু খোরপোষের অধিকার, মনে নেই? দাদা বউদি একবার রানিখেতে এসেছিল। ওর সঙ্গে দেখা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল জান?'

'তুমি কেন এমন কাজ করলে বোনটি?'

'কী জন্যে করেছি বলে মনে হয়?'

'জানি না। বুঝতে পারি না।'

'আমি কিন্তু অনুতাপ করি না বিনু। শুধু ও যদি আগে নিজের মন একটু স্পষ্ট করে বুঝত।'

'ও কি তোমায় কষ্ট দেয়?'

'কষ্ট কাকে বলে বিনু?' বোনটির স্বর যেন ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে, কুয়াশার মতো থিতিয়ে যাচ্ছে কোনো অন্ধকারের বুকে। দূরে চীরগাছের মাথার ওপর দিয়ে কোনো উপত্যাকার আলো। ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে একটা গাড়োয়ালি বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছে। 'হোম, সুইট হোম' গানের সুর চীরবনের মাথায় ছড়িয়ে গেল।

'মনের কষ্ট'।

'বুঝি না।' বোনটি কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ওর মেয়েকে ও দু বছর বয়সের পর দেখেনি জানো?'

'কী করে জানব বলে?'

'মেয়ের মা দেয়নি। কোনো সম্পর্ক ছিল না ওদের মধ্যে। এমনকি ওর মেয়ের বিয়ের খবরও ডাক্তার পায়নি। কাগজে দেখে একটা চেক পাঠিয়েছিল, চেক ফেরত আসে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে জানো? কার ছেলের সঙ্গে?'

একটি বিখ্যাত হোটেল মালিক পরিবারের কর্তার নাম করল বোনটি। ভারতের প্রতি হিল স্টেশনে ওদের বড় বড় হোটেল আছে। সবশুদ্ধ চল্লিশটি।

'আমাকে বিয়ে করবার জন্যে ও যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল বিনু। আমি তো ওকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু ও আমায় ভাল না বেসেই বিয়ে করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছিল কেন বল তো?'

বোনটি কথা বলতে বলতে অস্থির একটা আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিনুর মনে হল অনেকদিন ও কথা বলতে পায়নি।

বিয়ের পর বোনটি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল যখন ডাক্তার ঠক্কর ওকে কিছুতেই স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাননি। 'আমাদের বিয়ে অনেকদিন অব্দি শুধু কাগজ-কলমের বিয়ে ছিল বিনু!' বোনটি বারকয়েক বলল। ও বোধহয় ভাবছিল বিবাহিতা মেয়েরা যেমন করে বোঝে, বিনুর মতো আনাড়ি ছেলেরা তেমন করে এসব কথার গুরুত্ব বোঝে না। কিন্তু বিনু বললে, 'আমি বুঝেছি।'

ডাক্তার ঠক্কর ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়েছিলেন। বোনটি পরিবারের কারো সহযোগিতা পেল না সেজন্যে উনি অপ্রতিভ হয়েছিলেন। অনেক ফুলটুল এনে ঘর সাজিয়েছিলেন। বিনুদের আর বোনটিদের বাড়ি বাদ দিয়ে অন্য রোগীদের ডেকেছিলেন রিসেপশনে। চীনে, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, গুজরাটি, সিন্ধ্রি, বাঙালি, মারাঠি সবাই এসেছিল।

ফুলশয্যার রাতে বোনটি যখন বসে বসে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে সেই সময়ে ঘরে এলেন ডাক্তার ঠক্কর। ওঁর হাতে ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন। বললেন 'আমি অন্যায় করেছি নীলা।'

অন্যায় কেন হবে? লোকের চোখে না হয় অস্বাভাবিক কিন্তু ওরা দুজনে তো দুজনকে ভালবেসেছে। ভালবাসার মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে কেমন করে?

ডাক্তার ঠক্কর হঠাৎ বলেছিলেন 'আমার একটি মেয়ে আছে নীলা! ও কি আমায় ক্ষমা করবে?'

বোনটি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ঠক্কর তো ওকে সব কথাই বলেছিলেন। ওঁর স্ত্রী-কে একদিন উনিই ত্যাগ করে চলে আসেন। স্ত্রীর অপরাধ—ওঁর বাবা স্যার দয়ারাম, ওঁরা ভীষণ বড়লোক। স্ত্রী ভেবেছিলেন হয়তো মেয়ের সঙ্গেও বাপের কিছুটা সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু ডাক্তার ঠক্কর চলে আসবার পর বছর বারো কেটে যেতে হঠাৎ ওঁর মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছে হয়। তখন মেয়ের মা ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করে চিঠি লেখেন। মেয়ে জানে না ওর বাবা একজন সামান্য ডাক্তার মাত্র। মেয়ের কাছে একটি কাল্পনিক পিতার কাল্পনিক চেহারা গড়ে তোলা হয়েছে। এখন আর যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত নয়, সম্ভবও নয়।

ভদ্রমহিলা পরের দিকে খুব ধার্মিক হয়ে গিয়েছিলেন, ধর্ম-ধর্ম বাই, ধর্মশালা করে দেওয়া, এইসব নিয়ে থাকতেন। ডাক্তার ঠক্করকে সান্ত্বনা দিয়ে উনি জানালেন, 'মেয়ে তো দাদুর আদরে নিজের ইচ্ছেমতো জীবন কাটায়। আমি থাকি আমার ঠাকুর-দেবতা নিয়ে। ধর্ম একটা ফুলটাইম চাকরি বললেও হয়। তুমিও ঠাকুর-দেবতাকে ডাকো, শান্তি পাবে।'

কিন্তু শান্তি তো ডাক্তার ঠক্কর চাননি, চেয়েছিলেন মেয়েকে। যতদিন ইচ্ছে করলেই যেতে পারতেন, মেয়েকে দেখতে পারতেন, ততদিন মেয়ে সম্পর্কে বোধহয় কোনো কথাই ভাবেননি। কিন্তু এখন চেকপোস্ট বসে যাবার পর হঠাৎ ওকে ভালবাসতে শুরু করলেন। মেয়ে যদি এক কাল্পনিক বাবার কাল্পনিক ছবিকে স্বীকার করে নিতে পারে, উনিই বা কেন কাল্পনিক এক আত্মজাকে ভালবাসতে পারবেন না? রক্তমাংসের মেয়ে তো তাঁরই সৃষ্টি, কল্পনার মেয়েকে তিনি আবার সৃষ্টি করলেন। শান্ত, সুন্দর, শ্রীময়ী একটি মেয়ে। বাবার জন্যে যে অস্থির, উদ্বিগ্ন। মেয়ে যে বাবাকে ক্ষমা না-ও করতে পারে তা ডাক্তার ঠক্কর ভাবেননি। স্ত্রী লিখেছিলেন ও এক কাল্পনিক পিতাকে জানে। উনি ভেবেছিলেন স্ত্রী নিশ্চয় ওঁর প্রতি খুব নির্দয় হবেন না। মেয়েকে জানতে দেবেন ওর বাবা খারাপ লোক নয়। ডাক্তার ঠক্কর ভেবেছিলেন বউ অত্যন্ত ধনী এবং জাঁহাবাজ বলে তাকে ছেড়ে এসেছেন। সেটা আর এমন কি অপরাধ? সেজন্যে কি প্রভাবতী দয়ারাম এতদিন রাগ পুষে রাখতে পারেন? আর, ডাক্তার ঠক্কর ছেড়ে এসেছেন বলেই না ভদ্রমহিলা ঠাকুর-দেবতা, ধর্ম-কর্ম করতে পারছেন?

ডাক্তার ঠক্কর প্রভাবতী দয়ারামের রাগের ও আক্রোশের পরিমাণ বোঝেননি। ছেড়ে যাবার জন্যে স্বামীকে উনি ক্ষমা করেননি, কোনোদিন না। উনি ছেড়ে এলে সেটা অলরাইট হতো, কিন্তু তাঁকে, দয়ারামের মেয়েকে ছেড়ে চলে যায়, লোকটার এতবড় আস্পর্ধা? মেয়েকে বলেছিলেন, 'বাবার কথা তোমার ভাববার দরকার নেই। বেঁচে আছে এইটুকু জেনে রাখো শুধু। তোমার বাপ একটা অপদার্থ।'

মেয়ের কাছে মা যতটা সত্যি ছিল বাপ ততটা নয়। ডাক্তার ঠক্কর কল্পনার মেয়ে দ্বিতীয় আত্মজা,

বাবার স্নেহমমতা পাবে বলে কোথায় যেন অপেক্ষা করত। তাঁর রক্তমাংসের মেয়ে দাদুর আদর আর টাকার বন্যায়, পার্টি থেকে পার্টিতে খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াত। বিয়ের পর ওর উচ্ছৃঙ্খলতা আরো বেড়ে যায়। টাকার সঙ্গে টাকার বিয়ে, ফলে এই অতৃপ্তি, অসুখ আর অশান্তির জন্ম।

বোনটি তো সব কথাই জানত। বলত, 'কেন তোমার এ অপরাধবোধ? আর যে মেয়ে-মেয়ে করে তুমি অস্থির হচ্ছ সে কি তোমার কথা ভাবে?'

ডাক্তার ঠক্কর নাকি বলতেন, 'নীলা তুমি আমার মেয়েকে মেরে ফেলতে চাও? ওয়ান্ট টু ডেস্ট্রয় হার ইমেজ?'

বোনটির মনে হয়েছিল, তোমার কল্পনায় ও শিশু, নিষ্পাপ বালিকা। তাকেই ভালবেসে যদি সুখ পাও তো তাই পেলে না কেন? আমাকে কেন মাঝখান থেকে আমার সমাজ-সংস্কার থেকে ছিঁড়ে আনলে?

ডাক্তার ঠক্কর বলেছিলেন, আগে উনিও নীলাকে ভালবেসেছেন। এখনো বাসেন। তবু কেন যেন দোষী-দোষী মনে হয় নিজেকে। মনে হয় মেয়েকে মেয়ের প্রাপ্য স্নেহমমতা দিইনি সেটা অপরাধ।

শুনে বোনটি খেপে যায়। সেই থেকেই যে মেয়েকে দেখেনি, যাকে জানে না, তার ওপর ওর ভয়ানক হিংসে হয়।

বোনটি বলতে লাগল, 'মেয়ে মেয়ে আর মেয়ে! আমি একদিন বলেছিলাম, তুমি একটা শয়তান, তোমাকে জেলে পোরা উচিত। ও বললে হ্যাঁ নীলা, কেস করলেই তুমি মুক্তি পাও। আমি ওকে মুক্তি দিতে চাইনি। ভালবাসাই একমাত্র বেঁধে রাখবার ক্ষমতা রাখে না বিনু। ঘৃণাও মর্মান্তিক টানে টানতে পারে। তুমি কি ভাব আমি ওকে ছেড়ে গেলেই সমস্যার মুক্তি হবে। কখনো না দুজন দুজনের মধ্যে এত বেশি জড়িয়ে গেছি বিনু, ওর সাধ্য কী আমার থেকে মুক্তি পায়? দুটো সাপের মতো পরস্পরকে গিলতে গিলতে আমরা এখানে এসেছি।'

'শুনতে জঘন্য, কিন্তু ওকে আমি নিদারুণ আঘাত করেছি। মেয়ে আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নাও এ কথাও বলেছি। ও বলেছে ছি ছি নীলা, তুমি কী বলছ? মেয়ের সম্পর্কে আমার তো একটু স্নেহ শুধু....আমি বলছি তা হলে আমাকে ভালবাসতে পারছ না কেন।'

'ও হতাশ হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকেছে। বলেছে আমি তোমায় ভালবাসি নীলা। বুড়ো হয়ে গেছি তো। কেমন করে বোঝাব বল? আমি তো ওর বুকে আছড়ে পড়েছি বিনু, জড়িয়ে ধরে বলেছি বয়সের কথা বোলো না। আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি ওদের কথা ভুলে যাও। ওরা তোমার জন্যে কেয়ারও করে না। হ্যাঁ বিনু, আমি তোমায় খুব ফ্রাঙ্কলি বললাম সব। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। আমরা এক ঘরে, এক বিছানাতেই ঘুমোই। কিন্তু কাছাকাছি আসা অত কঠিন বিনু! যা-হোক, একদিন কাগজে দেখলাম ওর মেয়ে আর জামাই রানিখেতে আসছে। ওদের নতুন কেনা হোটেলে।'

ডাক্তার ঠক্কর বললেন, 'আমি যাব।'

বোনটি বলল, 'তুমি যেও না।' ও বুঝতে পেরেছিল এতদিনে একটি মেয়ের মৃত্যু আসন্ন। ডাক্তার ঠক্করের কল্পনার সেই শান্ত, সুন্দর, শ্রীময়ী আত্মজা এবার মরে যাবে। বহুদিন বেঁচে আছে মেয়েটি, ডাক্তার ঠক্করের ক্ষুধিত কল্পনায় একটু একটু করে বড় হয়েছে। এখনও শুধু এক অফুরন্ত ভালবাসা, অসীম করুণা, অপার ক্ষমা। অথচ এমন সুন্দর মেয়েটাকে সরস্বতী গ্রেওয়াল এক মিনিটে মেরে ফেলবে। বোনটি সেই সময়ে ডাক্তার ঠক্করের কল্পনার সরস্বতীকে ভালবেসে ফেলেছিল।

কোন গল্প যদি জানা থাকে, সে গল্পের সিনেমা দেখতে দেখতে যখন মনে হয় এমন সুন্দর ছেলেটা বা মেয়েটা এখনি মরে যাবে, তখন যেমন কষ্ট হয়, বোনটিরও তাই হয়েছিল।

কিন্তু ডাক্তার ঠক্করও ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বোনটির মতো নিউরোসিস না থাক, ওঁর মেয়ের ওপর ভালবাসা, নিউরোসিসের মতোই তীব্র। বোনটি বলেছিল, 'যেতে চাও যাও, কিন্তু জেনে রেখ, লাথি খাওয়া কুত্তার মতো তুমি আমার কাছেই ফিরে আসবে। আমি বলছি তুমি যেও না।'

সরস্বতী গ্রেওয়াল ডাক্তার অমৃতলাল ঠক্করকে দেড় মিনিটের ইন্টারভিউ দিয়েছিল। লাউঞ্জে বসেছিল ও, পরনে লাল স্ন্যাকস, হাতে ড্রিঙ্ক। একটু পরেই ওকে আদর্শ গৃহকর্ত্রী হতে হবে। একজন মন্ত্রী চম্বা থেকে ফিরছেন, রানিখেতে হল্ট করবেন। ওদের হোটেলেও কয়েকজন ভি-আই-পি আসবেন। শাড়ি পরতে হবে মনে করেই সরস্বতীর কান্না পাচ্ছিল।

ডাক্তার ঠক্করকে দেখে ওর মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

'আমি তোমার বাবা....'

'প্লিজ গো অ্যাওয়ে।'

'আমি তোমার বাবা একটু কথা বলেই চলে যাব।'

'রিয়ালি।' সরস্বতী কোনো সদ্য বরখাস্ত অবুঝ চাকরকে বোঝাবার ভঙ্গিতে আঙুল তুলে বলেছিল 'আমি তোমায় চিনি না, চিনতেও চাই না। আমার স্বামী তোমার অস্তিত্বই জানেন না। তুমি চলে যাও।'

মেয়েটির স্বামীও ঘরে ঢুকেছিল। অত্যন্ত বড়লোকের (এক পুরুষের বড়লোক বলাই ভাল) অভ্যস্ত দুর্বিনয়ে বলেছিল 'লোকটা কে ডার্লিং? কী চায়?'

'আমাকে দেখতে চায়।'

'দেখেছে তো। এখন যেতে বলো।'

'ইয়েস। গো অ্যাওয়ে।'

সরস্বতী শেষের কথাটা চেঁচিয়ে বলেছিল। ডাক্তার ঠক্করের চোখে জল এসেছিল। রক্তমাংসের সরস্বতী ওঁর কল্পনার সরস্বতীকে মেরে ফেলল। এর চেয়ে যদি না আসতেন এখানে....নীলা ঠিকই বলেছিল।

লাথিখাওয়া কুকুরের মতো বোনটির কাছে ছুটে এসেছিলেন ডাক্তার ঠক্কর। বলতে চেয়েছিলেন, 'ও আমায় চিনতে লজ্জা পেল নীলা....তুমি আমায় ক্ষমা করো। এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

বোনটি বললে, আমি তো জানতাম ও আসবে বিনু। আমি তো জানতাম ওর মেয়ে প্রথমে বাবাকে, তারপর নিম্নবিত্তদের ঘেন্না করতে শিখেছিল। ওর মেয়ের কাছে হয়তো এদেশের সবাই নিম্নবিত্ত। তা, ওদের আন্দাজে ময়লা জামাকাপড়পরা লোক দেখলেই ওর হিস্টিরিয়া হতো। আমি জানতাম ডাক্তার আমার কাছেই আসবে, আর ওর চোখে জল দেখলেই আমি সব ভুলে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে আমি চৌবাটিয়া চলে গিয়েছিলাম বিনু, ট্যাক্সি নিয়ে।

'আমি যে জানতাম ওকে দেখলেই সব ভুলে যাব। আমি যে ভুলতে চাই নি। কেন একটা মিথ্যে কল্পনাকে ভালবাসতে গিয়ে ও আমার উপর অবিচার করেছিল? কেন নিজের মন বোঝেনি। এতদিন ও আমায় শাস্তি দিয়েছে, এবার আমি ওকে শাস্তি দিলাম। সেদিন ওর মুখটা কেমন হয়েছিল জানো? দুবার লাথি-খাওয়া কুকুরের মতো।'

বিনু অস্বস্তিবোধ করছিল। ক্রমেই বোনটি অচেনা মনে হচ্ছিল তার, যেন অপরিচিত।

'তারপর ওর মেয়ে মারা গেল।'

'সে কি?'

'আমেরিকায়। যখন মেয়ে মারা গেল সেদিন ও দরজা বন্ধ করে বসেছিল বিনু, আর আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। এতদিনের দুঃখ আর অভিমান, সব। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে দোর খুলতে অনুনয় করছিলাম বিনু। বুঝতে পারছিলাম কী ভুল করেছি এতদিন ধরে। মিছেমিছি কী নিচে নেমে গিয়েছি আমি। কিন্তু ও বেরিয়ে এসে কি বললে জানো?'

'কে মারা গিয়েছে, কী হয়েছে আমি কিছুই জানি না তো!' আমি বললাম—'সরস্বতী।' ও বললে 'সে কে?'

বোনটি আবাব হাসতে লাগল। হাসি আর ডুকরে কান্নার মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগল ওর গলা দিয়ে। ও বলল 'ওইটেই ওর শাস্তি দেওয়া। সরস্বতীর নাম পর্যন্ত করে না বিনু, কখনো ওর কথা বলে না। আমরা যে যেখানে ছিলাম, সেখানেই রয়ে গেলাম। কাছে যাই, সে সাধ্যও নেই, ছেড়ে যেতেও পারি না। কিছুই যেন করে উঠতে পারি না আমরা। আমাকে ও এখনো যত্ন করে, আদরে মুড়ে রাখে। হিস্টিরিয়া বাড়লে চড়চাপড়টা মারে হয়তো, সকালে হয়তো টেরও পেয়েছ।'

'বোনটি, এভাবে সম্পর্ক টেনে রেখে কী লাভ?'

'জানি না। তোমার তো রবীন্দ্রনাথের সে গল্পটা মনে পড়ে বিনু, আমারও মনে হয়, আমাদের দুজনের মাঝখানে সেই মরা মেয়েটা শুয়ে আছে। ওকে আমরা ডিঙোতে পারি না। মাঝে মাঝে হয়তো দুজনে একটু কাছে আসি, মনে মনে শান্তি পাই, কিন্তু তখনই মেয়েটা এসে আড়াল করে দেয় সব। আমার তো লজ্জা, আমিও তো ওকে ঘেন্না করেছি।'

'এরকমভাবে কতদিন চলবে বল?'

'জানি না, জানি না বিনু। ওকে ভাল বেসে বেসে, ওর মেয়েকে হিংসে করে করে আমি যেন ফুরিয়ে গিয়েছি, আর কিছু করবার জোর নেই আমার, আর কিছু ভাববার শক্তি নেই।'

অন্ধকার। রানিখেতের ওপর কুয়াশার ঘেরাটোপ নামছে। নামতে নামতে চীরবনের ওপর সাদা চাদর টেনে দিয়ে কুয়াশা নিচের উপত্যকায় নেমে গেল। ওখানে, অন্ধকার খাদের সবটুকু ওরা ঢেকে রেখে দেবে। খাদের ভেতরটা বড়ো কুশ্রী।

হঠাৎ ভীষণ শীত করল বিনুর। 'চলো ঘরে যাই', বোনটি আস্তে বলল। গেটের শেকল খোলার শব্দ। ডাক্তার ঠক্কর ফিরে এলেন।

অভিজ্ঞান

সুলেখা সান্যাল

'দু'টি বোন, কত পর হয়ে গেছি আজ। ছেলেমেয়েরা চেনে না তাদের মাসীকে'—পূজোর ছুটিতে চিঠি লিখলো আভা, 'তুই আয় না বিভা—এখানে। এবার না হয় নাই গেলি কার্শিয়াং আর কালিম্পং। ওতো তোদের বিলাস—থাকবেও চিরকাল। এবার আমাদের দেখে যা।' চোখের জলও পড়েছে বোধ হয় দু'এক ফোঁটা। চিঠিখানা হাতে করে বিভার চোখ দু'টোও সজল হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। থাকগে এবার কার্শিয়াং—কলকাতাতেই যাবে সে।

একটু অনুতাপ হল—বড় স্বার্থপর সে, ছোটবেলার একই সঙ্গে মানুষ হয়েছে দু'টি বোন, অথচ আজ কোথায় দুজনে। মা-বাবা না থাকলে এমনিই হয় বুঝি। দূরে থাকলেই বুঝি খোঁজ রাখতে নেই আর। চোখের ওপর ভেসে উঠল দিদির গোলগাল মোটাসোটা চেহারা—বড় বড় চোখ, বোকা বোকা চাহনি। সে কতদিনের কথা!

এখন ছেলেমেয়ে হয়েছে—সে খবরও আভাই জানিয়েছে। বিভা বুঝি শুধু একবার কয়েকটা টাকা পাঠিয়েছিল একটা চিঠির উত্তরে।

বিয়ের ইতিহাসে কিন্তু বৈচিত্র্য আছে দিদির—সেকথাও মনে পড়ল। বিভা তখন কলেজে পড়ে, রাজনীতি করত তখন বিজয়, পাশের বাড়ি যাতায়াত ছিল এ-বাড়ি ও-বাড়ির, আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বিভাকে পড়াশোনা দেখিয়ে দিতে আসতো বিজয়। সুন্দর স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান আর ভদ্র ছেলে, সবাই জানতো ওদের দু'জনের কথা—বাবা, মা নিশ্চিন্ত ছিলেন বিভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

কিন্তু কি করে কী হয়ে গেল। সেবার এক বছর পরে জেল থেকে বেরিয়েই সব যেন পাল্টে গেল বিজয়ের। জেল থেকে বাড়িতে ফিরেই বিজয় প্রথমেই ছুটলো বিভাদের বাড়ী। বিভা দাঁড়িয়ে ছিল দরজায় মালা হাতে করে। ঢুকতেই সলজ্জ হেসে মালাটা বিজয়ের গলায় পরিয়ে দিল। বিজয় হাতখানা ধরে একবার নেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল—চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করছে আভা। দু'হাতে ওকে উঠিয়ে দিয়ে বিজয় হঠাৎ চমকে উঠলো—দু'চোখের কোণে ওর টলমল করছে জল, ঠোঁটে এক অপূর্ব সুখের হাসি। সে এক মুহূর্ত। তাবপরেই ঝড়ের মত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাবা অপেক্ষা করছিলেন অনেকদিন থেকে। বিকেলে বিজয়কে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এবার বড় হয়েছ—তোমার আর বিভার—'

হঠাৎ বাধা দিয়ে বিজয় বলে উঠলো—'বিভা নয়, আভা। আভাকে আমি বিয়ে করব মেশোমশাই।'

পাংশু হয়ে উঠলো বিভা এক মুহূর্তে। বিমূঢ় অমূল্যবাবু তাকালেন বিজয়ের স্থির মুখের দিকে। বিভা ঘর ছেড়ে সোজা বেরিয়ে এল আভার কাছে। তীক্ষ্ণ, কর্কশ হয়ে উঠেছে গলার স্বর, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—'দিদি, তুই বিজয়কে ভালবাসিস?'

আভা হঠাৎ চমকে উঠলো—বিপন্ন মুখে খানিকক্ষণ বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

বিভারও বুঝি চোখে জল এল—সহানুভূতিতে দ্রব হয়ে এল মন এই অল্প লেখাপড়া-জানা দিদির ওপর—হঠাৎ গভীর মমতায় দিদির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হেসে ফেললো, 'কাঁদছিস কেন, বিজয়দার সঙ্গেই তো বিয়ে হবে তোর—বাবাকে বলেছেন বিজয়দা।'

আভা চোখের জল মুছে সোজা হয়ে বসল। তারপর হঠাৎ বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মত প্রশ্ন করল 'কিন্তু তুই।'

'আমি'?—বিভা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো 'আমি বিজয়কে ভালই বাসি নি কোনদিন। উনি যে তোকেই ভালবাসেন সে আমি অনেক দিনই জানি।'

সে সব কথা আজ কতদূরের স্মৃতি—মনেও পড়ে না। আজও বিভা একাই—কিন্তু সে অনুরাগে কিংবা অভিমানে নয়—সময় আর সুযোগের অভাবে।

এ জীবনে মর্যাদা আছে—প্রাচুর্য আছে। কিন্তু নিঃসঙ্গতাও মাঝে মাঝে পীড়া দেয় বৈকি। এখন নতুন পরিবেশ, পুরোনো কথা ছায়া হয়ে গেছে। মা-বাবা মারা যাবার পর বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেই গেছে একরকম।

নম্বর খুঁজে বাড়িটা বার করতে গিয়ে রিক্সাওয়ালা হিমসিম খেয়ে গেল। অনেক কষ্টে খুঁজে বার করা গেল বাড়ি—ছোট্ট, অপরিসব, নোংরা আব পচা গন্ধে ভরা বাই-লেন একটা। বিভা নাকে রুমাল চেপে ধরল। একতলা ছাল ওঠা কতদিনের পুরোনো বাড়ি পৈত্রিক আমলের। দরজার সামনে ভীড় করেছে আভা আর তার ছেলেমেয়েরা—বিজয়ও উঠে এসেছে লাঠি ভর দিয়ে। জিনিসগুলো দেখে নিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বকশিস্ দিয়ে বিভা নেমে এল।

আভা এগিয়ে এল ওর দিকে, 'কত দিলিরে ওকে?'

'দুটো টাকা বকশিস দিলাম দিদি, যা ঘুরতে হয়েছে তোমার বাসা খুঁজতে।'

'দুটো টাকা!' একমুহূর্তে আভার চোখের ওপর যেন বিস্মৃত দিনের স্বপ্ন নেমে এসেছে—'আছে বলে কি ওমনি করেই নষ্ট করতে হয়।'

কিরকম লোভীর মত চক্চকে ভাব ফুটে উঠেছে আভার চোখে মুখে—সেদিকে তাকিয়ে বিভা হঠাৎ চমকে উঠলো, একমুহূর্তে বুঝে ফেললো অনেক কিছু। ঘরে ঢুকে বিভার গায়ের মধ্যে ঘিন্ ঘিন্ করে—অপরিসর দু'খানা ঘর, ওপাশে দু'খানা—দু'জন ভাড়াটে থাকে।

ছেলেমেয়েরা এসে ছেঁকে ধরে বিভাকে—'মাসি কি এনেছ দাও।'

বিভার বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে বিজয় একটার মাথায় চড় বসিয়ে দেয়—বলে, 'পাজীর বেহদ্দ সব। এস বিভা আমার ঘরে।'

ছোট ছেলেটা প্রাণপণে চেঁচায় মার খেয়ে—'বারে! মা-ই তো শিখিয়ে দিল বলতে।'

বিভা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

ঘরে ঢুকে বলে 'অবস্থা আপনাদের জামাইবাবু, চেনাই যায় না যে। সংসারের চেহারাও তো এই।'

বিজয় একটু হাসলো—ম্লান, বিকৃত হাসি, 'স্বাধীন দেশের সুখী মানুষ যে আমরা। তোমরা আর জানবে কোত্থেকে এসব—সাহেব পাড়ায় থাকো, তাও আবার বাংলাদেশে নয়। যেতে দাও না আরও ক'টা দিন—একেবারেই চিনতে পারবে না যে।'

আভা চা করে নিয়ে এল কলাই করা একটা গ্লাসে, আর একটা প্লেটে চিড়ে ভাজা। খাবার ইচ্ছে বিভার ছিল না—ছোট মেয়েটার হাতে চিড়ে ভাজার প্লেটটা তুলে দিতেই আর কজন হুড়মুড় করে

উপুড় হয়ে পড়ল প্লেটের ওপর, কান্নাকাটির আর কামড়াকামড়ি করে একমুহূর্তে বিষাক্ত করে তুললো আবহাওয়াকে। সব ক'টাকে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে পিঠে কয়েক গা বসিয়ে দিয়ে আভা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো—'মর সব হতভাগারা, এসেছিলি কেন আমার কাছে মরতে'। আভার মনেব ওপর মেঘ জমেছে খানিকক্ষণ থেকে—ঝরে পড়ল তা এতক্ষণে। বিভা বাক্স খুলে জিনিসগুলো বার করে আনলো—খেলনা আর খাবার। এবার আর ওরা এগিয়ে এল না, ভয় পেয়েছে, চকচকে চোখে তাকিয়ে দেখলো শুধু। আভাই এগিয়ে এল—খাবারগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল, 'এখন দিস্‌নে ওদের হাতে, যা রাক্ষস সব। এই খাবে এখন ক'দিন ধরে।'

আভার শাড়ীখানা হাতে তুলে দিতেই খুশিতে ঝলমল করে উঠলো চোখ, খানিকক্ষণের মধ্যে যেন আবার সহজ হয়ে উঠলো আভা, ভীষণ দামী কোন জিনিসের মত শাড়ীখানাকে সন্তর্পণে বাক্সে তুলে রাখলো।

বিভা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আভাকে—সামনের দিকের চুলগুলো সব উঠে গেছে, জটাধরা রুক্ষ্ম চুলে মাথা ভর্তি, বড় বড় চোখ দু'টি কোটরে ঢুকে গেছে, ফর্সা রং আরও ফ্যাকাশে হয়েছে, শীর্ণ হাত দু'খানা। দুটো শাঁখা পরে আছিস কেন?'

'গয়না'—আভা হঠাৎ হেসে উঠলো, 'আমার আস্ত ক'টা শাড়ী আছে তাই জিজ্ঞেস কর না। তুই আসবি বলে শাড়ীটা সোডা সেদ্ধ করে পরেছি।' কী লজ্জাকর উলঙ্গ স্বীকৃতি! বিভা যেন সাপ দেখার মত চমকে উঠলো—পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে। তবু আবহাওয়াকে সহজ করে নিতে চেষ্টা করে, 'ছোটবেলার কথা তোর মনে আছে দিদি? কতদিন হয়ে গেল। পড়া না পারলে মার কাছে পালা করে কানমলা খাওয়া, আমি আগে পড়া পারলে তুই কেঁদে ফেলতিস, কথা বন্ধ করে দিতিস। ইস্কুলের পরীক্ষায় একবার তুই ফেল করে আমাকে হঠাৎ কি রকম করে মেরেছিলি—আমি তো অবাক।' বিভা হো হো করে হাসে। আভা হাসার চেষ্টা করে, কেমন একটা ম্লান হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটে—জোর করে টেনে আনা। আভা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে বিভার কথা—চোখ দু'টো চক্‌চক্ করে শুনতে শুনতে বলে, 'কি করিসরে তুই অত টাকা দিয়ে? আমাকে দে না মাসে কিছু কিছু করে, বাঁচবো তাহলে।'

এই আভা! ছোটবেলায় বিভা কোন জিনিস দিতে গেলে কেঁদে ফেলতো—অদ্ভুত ছিল ওব আত্মসম্মান, 'কেন নেব তোর জিনিস আমি—কখখনো না।' ওর লোভী চোখের দিকে তাকিয়ে বিভা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, অপরাধী মনে হয় নিজেকে। এমনকি আভার পাশে বসা পাঁচ বছরের মেয়েটার চোখের দিকে তাকাতেও বিভার যেন ভয় করে। সমস্ত আবহাওয়াটা বিষাক্ত হয়ে ওঠে আবার।

পাশের ঘরের ভাড়াটেরা বোধহয় ঝগড়া করছে—অশ্লীল, কুৎসিত গালাগালি, নগ্ন অভিযোগ, বোধহয় স্ত্রী। অভিযোগ অসংখ্য, খেতে না দেওয়ার অভিযোগ—অভিযোগ কাপড়ের।

হঠাৎ এক করুণ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বাড়ীটায়—বিভা একলাফে উঠে দাঁড়াল, 'মারছে বুঝি বউটাকে, আচ্ছা চামার স্বামীটা তো।'

আভা বিকৃতমুখে হাসলো, 'তুই যাচ্ছিস কোথায়? ওদের থামাতে! ওতো লেগেই আছে। ওই তো ওদের সান্ত্বনা—পেট ভরে খেতে পায় না, পরতে কাপড় পায় না—মুখ ফুটে তা বলতেও পারবে না—দেখে আয়গে যা বউটাকে—অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা, কি হয়ে গেছে না খেতে পেয়ে। গালাগালি দেওয়াটা কি ওর অপরাধ—আর স্বামীরই বা অপরাধ কি, বউকে মেরেই ওরা সান্ত্বনা খোঁজে।'

হাসতে হাসতে বিজয় ঘরে ঢোকে, 'এর পর বউটির সান্ত্বনা আছে—মৃত্যু। দেবে একদিন গলায় দড়ি, ল্যাঠা চুকিয়ে দেবে।'

বিজয় চৌকির ওপর চেপে বসল পা ঝুলিয়ে—আভা উঠে গেল, রান্না করতে হবে।

বিভার বিভ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিজয় যেন কৌতুক অনুভব করে, 'খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ তুমি? এরকম দেখবে আশা করনি না?'

মনে আছে বিভা—জেলগেটে আমার জন্যে কত লোক দাঁড়িয়ে থাকতো। স্বপ্ন দেখতাম স্বাধীনতার সুখের। ১৫ই আগস্টের ভোরবেলা জান বিভা—আনন্দে ছোট ছেলের মতো লাফালাফি করেছি। তার দিনকয়েক পরে শরীরটা খুব খারাপ বলে মাত্র তিনদিনের ছুটি চাইলাম—শুনলাম একেবারেই ছুটি হয়ে গেছে। এই এক বছর কোথাও কিছু পেলাম না গোটা কয়েক টিউশনি ছাড়া, শরীরটাও ক্রমাগত খারাপ হতে হতে অকর্মণ্য হতে চলল। এদের বাঁচাই কী করে বল তো বিভা? চাকরী যে আর কোথাও পাব সে আশা নেই—ক্রমাগত ছাঁটাই চলছে। কোথাও যেন আশা নেই—কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল।'

উত্তাপহীন অসহায় ক্ষোভ—বিজয় যেন হতাশার মুখে বিভার কাছে উত্তর চায়। না পাওয়ার দুঃখে যেন তিল তিল করে ভেঙে পড়ছে বিজয়ের মন।

একটু চুপ করে থেকে বিজয় যেন স্বগতোক্তি করে, 'মনে আছে বিভা, আমি তোমার দিদিকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। স্নিগ্ধ, নম্র আভার কাছে কলেজে পড়া স্মার্ট মেয়ে তোমাকেও আমার ছোট মনে হোত। ওকে নিয়ে কত স্বপ্ন, কত আশা করতাম।'

'কিন্তু আজ'— গোপন কথা বলার মত বিজয় যেন ফিস ফিস করে বলে, 'কি হয়েছে দেখেছ? পাশের ঘরের বউটার মত ও আমাকে গালাগালি দেয়—অকর্মণ্যতার অভিযোগ করে। ইচ্ছে করে ওকে মারি, কিন্তু আমার কালচার আমাকে বাধা দেয়। আমরা কী বিভা—এদিকও না, ওদিকও না! আমাদের সান্ত্বনা কোথায়?'

ঘরের মধ্যে মিটমিট করে লণ্ঠন জ্বলে—আলোর চেয়ে ধোঁওয়া হয় বেশি, কেমন একটা আবছা ছায়া নামে। পাশের ঘরে বউটা তখনও অক্লান্তভাবে কেঁদে চলেছে ইনিয়ে বিনিয়ে।

বিভা বলে, 'দিন না জামাইবাবু আরতিটাকে— মানুষ করে দেব। ছেলেটাকে তো প্রাণের তাগিদে মানুষ করে তুলবেন যে করেই হোক— কিন্তু মেয়েটা আর মানুষ হবে না।'

বিজয় হাসে, 'ছেলেটাকেই বা কি মানুষ করছি! মাস দুই হোল ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিয়েছে। ওরাই বা কি করবে। যে কটা টাকা পাই চাল কিনতেই যায় ফুরিয়ে—ইস্কুলের মাইনে দেবার মতো বিলাসিতা পোষায় না। যাও না নিয়ে একটাকে, ভার কমুক। কিন্তু আভা ছাড়বে নাকি ভেবেছ— খেতে না পেয়ে মরবে তবু কাছছাড়া করবে না।'

আভা বলে, 'কীই বা হবে লেখাপড়া শিখে—মেয়েমানুষের আবার মানুষ হওয়া। শেষ পর্যন্ত আমার মতোই ভাগ্য। তার চেয়ে ক'টা টাকা পাঠাস—খেয়ে বাঁচবে সব ক'টা।'

বিমূঢ় বিভা চুপ করে থাকে।

নোংরা অপরিসর বিছানায় বিভার একখানা ফর্সা চাদর পেতে সংস্কৃত করা হয়েছে—তার একধারে আরতি আর পাঁচ বছরের মেয়ে'টা ঘুমোচ্ছে। বিভার গায়ের মধ্যে ঘিন্‌ঘিন্‌ করে—সন্তর্পণে শোয়

একধারে। আরতি ঘুমোয়নি—কাছে সরে এসে বিভার গায়ের ওপর হাত রেখে ডাকে, 'মাসি ও মাসি।' বিভা ধড়মড় করে উঠে বসে, 'কি রে?'

—'আমাকে নিয়ে যাবে তো তুমি?'

—কান্না জড়ান গলায় বিভার বুকের ভেতর মাথা গোঁজে। বিভা মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, 'তোর মা যে ছাড়বে না তোকে। এখানে টাকা পাঠাব আমি, ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে যাব।'

আরতি সজোরে মাথা নাড়ে, 'না টাকা পাঠিও না তুমি—মা আবার ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে, সেই টাকা দিয়ে চাল কিনবে। জান—দাদাকে ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিয়েছে।'

তারপর বিভার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, 'আমাকে নিয়ে যেও তুমি—আমি লেখাপড়া শিখবো, তোমার মতো হব। মা একটুও ভাল না—খিদে লাগলে, খেতে চাইলে কেবল বকে—।' বড় বড় অসহায় চোখ পূর্ণদৃষ্টিতে বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আট বছরের রোগা মেয়েটা।

'আমাকে নিয়ে যাবে তো? বল না—' ক্রমাগত এক প্রশ্ন করে চলেছে। অবশেষে বিভার আশ্বাস পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে শান্ত হয়ে।

বিভা ঠায় বসে থাকে— চোখ দু'টো জ্বালা করে। ঘুম চলে গেছে চোখ ছেড়ে।

মেয়ে দু'টো টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেয়— রোগা রোগা হাড়-পাঁজরাগুলো ওঠানামা করে। ক্ষুদ্র অপরিসর ঘরে ওদের নিঃশ্বাসগুলো বেরুবার পথ পায় না।

মরে গেছে আভা—আগের দেখা সেই সুন্দর, সরল বোকা মেয়েটা। বিভার চোখের উপর ভাসে প্রাইভেট কার, ডাইনিং রুম, মেদবহুল দেহগুলো আর ফুটফুটে সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়ে। ওদের দেখতেই তো অভ্যস্ত ছিল বিভা এতদিন। এরা আবার কারা—এমন ছিল, থাকতে পারে—তাই বা কে ভেবেছিল? এরা নিজেরাই বাঁচতে পারে না তার আবার সংসার করবার ইচ্ছে—মা হবার সখ, পিতৃত্বের গর্ব—কেন?

বিজয়কে মনে পড়ে—ইংরেজ আমলের নির্যাতিত সৈনিক—বিশ্বাস করেছে—আশা করেছে স্বাধীনতা আসবে—স্বাচ্ছন্দ আসবে, সম্মান পাবে তার বিদ্যার, তার পরিশ্রমের, নতুন স্বাধীন ভারতে। তাই ওকে ওরা সম্মান দেখিয়েছে—একেবারেই অবসর দিয়েছে ওকে পরিশ্রম থেকে, পারিশ্রমিক দিয়েছে ব্যাধি আর দারিদ্র।

আরতি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে—স্বপ্ন দেখে বোধ হয়। এবার বিভার কেমন মায়া হয়, আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় আরতির।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যায় বিভা—রাস্তায়, ট্রামে, বাসে খুশিতে ওরা ঝলমল করে। খাবারের দোকানে খাবার খেতে গিয়ে ওরা আনন্দে এ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, খাবার গলায় আটকে গিয়ে বিষম খায়। দু'-একটা জিনিসপত্র পেয়ে আনন্দে ওদের চোখে জল আসে, ওরা যেন বিশ্বাস করতে পারে না পৃথিবীতে এত আনন্দ আছে—এত সুখ আছে। বিভা অবাক হয়—কত অল্পে খুশি ওরা, কত সহজে হাসি ফোটানো যায় ওদের মুখে। আর এই সামান্য আনন্দটুকু দিতে আভা আর বিজয় কেন পারবে না—সে কথা ভেবে পায় না বিভা। কেমন আশ্চর্য লাগে।

বাড়ীর মধ্যে পা দিয়ে হঠাৎ আভার তীক্ষ্ণ, কর্কশ চীৎকারে ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে—তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে চলেছে আভা।

'আমার সব কিছুই তোমার কাছে খারাপ লাগবে সে তো জানিই—আমি তো আর বিভা নই।

চাকরিও করি না — ছেলেমেয়েদের বেড়াতেও নিয়ে যেতে পারি না, আমার আজ রূপও নেই, গুণও নেই।'

নিস্তব্ধ বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আভা যেন ক্ষেপে যায়, 'এই ক'বছরে ছেলেমেয়ে মানুষ করে, দিনের পর দিন অভাব সহ্য করে আজ আমার এই দশা, তাই আমাকে আর পছন্দ হবে কেন? কিন্তু একদিন আমাকেই তো ইচ্ছে করে বিয়ে করেছিলে—বলতে আমার মন নাকি ফুলের মত শুভ্র। এখন খারাপ লাগছে—নীচ হয়ে গেছি আমি। না? আমার দোষ, সব আমার দোষ।' পাগলের মত আভা মেঝের ওপর মাথা কোটে।

বিভাকে প্রতিজ্ঞা থেকে টলানো কঠিন। যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক করে ফেলেছে। ওর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় আভার। ছেলেমেয়েরা মাসীর চারপাশে বিষণ্ণ মুখে ঘুরে বেড়ায়, বিজয় অনুরোধ করে না—কি যেন ও বুঝে ফেলেছে। বিভাঙ্ক কেমন যেন মায়া হয় এদের ছেড়ে যেতে, কিন্তু আভার সেই ইঙ্গিতগুলো যেন কানের মধ্যে রিন্‌রিন্ করে বাজছে এখনও। একটা সুখী জীবন ছারখার হয়ে যেতে বিভা দেবে না।

সকালবেলা উঠে বিজয় বেরিয়ে গেল জামা গায়ে দিয়ে—ওদের অফিসে নতুন করে লোক নেবে কোথায় যেন খবর পয়েছে। বলে গেল, 'তোমার যাবার আগে আমি ফিরে আসব।'

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল বিজয়। নিজে আসেনি, কয়েকজন বয়ে এনেছে অচৈতন্য দেহটাকে, মাথার ব্যাণ্ডেজটা রক্তে ভিজে কালো হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। অস্ফুট আর্তনাদ করে বিভা দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

বিমূঢ় হয়ে গেছে সারা বাড়িটা—কেমন একটা শোকের ছায়া থমথম করছে বিজয়কে ঘিরে। পাশের ঘরে বিশীর্ণা বউটি আর তার স্বামী এসেছে, ছল ছল চোখে তাকিয়ে আছে—মাঝে মাঝে অস্ফুট মন্তব্য করছে ক্ষীণ স্বরে—'চোর না, গুণ্ডা না, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান, ভদ্রলোক। তাদের মাথায় লাঠি চালান, তাদের গায়ের ওপর ঘোড়া উঠিয়ে দেওয়া—ওরা কী মানুষ! অপরাধ কী—না মাইনে বাড়াও আমরা খেতে পাচ্ছি না, স্বরাজ দিলেন ওরা—' মেয়েটা বলে আর ঠোঁট ওল্টায়, মাঝে মাঝে আঁচলে চোখ মোছে, আভার আর একটু কাছে সরে বসে। যারা নিয়ে এসেছিল তারাও বসে আছে চুপ করে—সমস্ত ঘটনা নিজের চোখে দেখবার পরে ওরাই আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ—শুধু চার জোড়া চোখ জ্বলছে মাঝে মাঝে— প্রতিহিংসার একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে সারা মুখের ওপর, চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে উঠছে।

অচৈতন্য বিজয় মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে চীৎকার করে—সব কথা স্পষ্ট শোনা যায় না, দু'টো একটা বোঝা যায়—'ঢুকতে দিও না....কিছুতেই না....বেইমান....দালালী করাচ্ছ....পনেরো বছর জেল খেটেছি....'

সবাই ঝুঁকে পড়ে বিজয়ের মুখের ওপর, দেখে ওর ফ্যাকাসে শুকনো ঠোঁটের নড়াচড়া। শুধু আভা এ সব কিছু দেখে না, বিজয়ের দুই পায়ের মধ্যে মাথা রেখে ও পড়ে আছে, মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠছে থর থর করে।

বিজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিভার মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। বিজয়ের টুকরো টুকরো প্রলাপ, শীর্ণ বউটির ক্ষীণস্বরে মন্তব্য, মাথার কাছে বসে চারজন মজুরের মতো লোক—সবকিছু কেমন যেন অপরিচিত রহস্যময়। কালকের দেখা আভা মিলিয়ে গেছে ছায়া

হয়ে—বিজয়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকা আভাকে অদ্ভুত ভাল লাগছে আভার—পাশের ঘরের ঝগড়াটে বউটি যেন পরম বন্ধুর মত আভার গা ঘেঁষে বসেছে। গুণ্ডার মত চারটে লোককে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে যতখানি ভয় পেয়েছিল বিভা—এখন সে ভয়টা কি কেটে গেল তাহলে? নইলে ওদের কাছ থেকে সব খবর জানবার এত আগ্রহ হল বিভার? কেন মনে হচ্ছে ওরা বিজয়ের সত্যিকারের বন্ধু? সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে ওদের কাছে সব খবর শুনে, নতুন খবর শোনাল ওরা। মনে হোল না কোথাও এতটুকু অন্যায় কিংবা বাড়াবাড়ি আছে ওদের বর্ণনায়। আবেদনের ভঙ্গিতে শোনায় না। শক্ত, শান্ত গলায় ওরা বলে যায়—পুলিশ এল, ঘোড়সওয়ার এল, লাঠি চলল, বিভা যে বারে বারে শিউরে উঠছে সেদিকে একবারও লক্ষ্য করে না—কিংবা লক্ষ্য করেও হয়তো। কিন্তু বলে যায়—ঋজু অনুদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

ছোট মেয়েটা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এবার কাঁদতে শুরু করেছে—আভার মাথাটা বারে বারে ওঠাবার চেষ্টা করে—'ক্ষিদে পেয়েছে মা—ওমা।'

লোকগুলোর মধ্যে একজন মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসলো—' ভুখের কথা বোলে না খোকি—তাহলে ওরা লাঠি মারবে মাথায়, দেখছো না তোমার বাবাকে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে শুরু করে লোকটা এত দুঃখেও।

এতক্ষণে মনে পড়ল ট্রেনের কথা—ট্যাক্সিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ হয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে এল বিভা—নেই সে। এই তো একটুও আগেও ছিল দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল, ভাড়া না নিয়েই চলে গেছে লোকটা।

বাইরে এসে অজস্র আলো আর গান আর হাসির শব্দে বিভা যেন নিঃশ্বাস ফেলে স্বাভাবিকভাবে। সামনের তেতলা বাড়িটায় রেডিও বাজছে মৃদু করুণ সুরে—ছাদের মাথায় অনেক বড় একটা সিল্কের স্টেট ফ্ল্যাগ উড়ছে বাতাসে—পত পত শব্দটা এখান থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। হঠাৎ দৃষ্টি গেল গলির মাথায়—একদল গুর্খা পুলিশ, বসে আছে রকের ওপর, ছুঁচলো সঙিনগুলো পাশে রয়েছে, গল্প করছে, হাসছে। ওদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিভার গায়ের মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো—এ বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রথম দিন যেমন হয়েছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল বিভা।

পূর্বপুরুষের ছবি
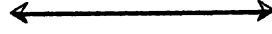
নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

বিষ্টুকাকার সাদার্ন এভিনিউ-এর তেরোতলার ফ্ল্যাটে চা তৈরি করছিলুম। দর্জিপাড়ার তিনমহলা গোলকধাঁধার মত বাড়িতে —অন্ধকার প্রকাণ্ড রান্নাঘর থেকে সিমেন্ট খোবলানো উঠোন পেরিয়ে তিনতলায় যে চা আসতো—তাতে গুচ্ছের মিষ্টি দেওয়া আর আধ-ঠাণ্ডা। বিষ্টুকাকা নিজের ফ্ল্যাটে এসে চায়ের সাজসরঞ্জাম পাল্টে দিয়েছেন।

চা ঢালতে না ঢালতে বিথোফোনের এলিসের জন্য রচিত কম্পোজিশনের প্রথম কলিটি কলিং বেল-এ ধ্বনিত হল। রাধানাথ দরজা খুলে দিলো। ঢুকলো হ্যারি অ্যান্ড ড্যাশ কোম্পানীর হরিদাস। ঠাকুরদার আমলের খাজাঞ্চি কালিদাস মাইতির ছেলে হরিদাস। দর্জিপাড়ার সিঁড়ির ঘর আর মামার বাড়িতে মিলিয়ে বড়ো হয়েছে। প্রি-উ পড়তে পড়তেই ব্যবসায় নেমে পড়েছে। হরিদাস বাঙালী কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাতিয়েছে।

মাঝে অনেকদিন হরিদাস আসেনি। লোহালক্কড় ভাঙা গাড়িটাড়ি নিয়ে হরিদাসের ব্যবসা শুরু হয়েছিল—তারপর ঠিকেদারি। মাঝে মাঝে দর্জিপাড়ায় আসে জেঠিমার পায়ের ধুলো নিতে।

বিষ্টুকাকা বলেন—হরি, তোর ব্যবসা চলছে কেমন?

—আজ্ঞে ঐ একরকম আপনাদের আশীর্বাদে। কোন রকমে চেষ্টা-চরিত্তির কবে একখানা সেকেন্-হ্যান্ড ফিয়েট কিনিচি।

বিষ্টুকাকা তখন কোম্পানীর গাড়ি চড়তেন। তাঁর খাজাঞ্চির ছেলে এই পঁচিশ বছর বয়সেই নিজের গাড়ি কবে ফেললো। হ্যাঁ, প্রশংসার কথাই বটে!

গলায় নিঃশ্বাস আটকে বললেন—কথায় বলে পুরুষস্য ভাগ্যং!

বিনয়ে মাখামাখি চকচকে মুখ হরিদাসের হাসিতে উদ্ভাসিত। বিষ্টুকাকার মতো পুরুষের ভাগ্যে মার্কেনটাইল ফার্মের চাকরিব জন্য ও লজ্জিত।

বিষ্টুকাকা এখন দক্ষিণ কলকাতায় ফ্ল্যাট সাজিয়েছেন। দর্জিপাড়ার চারতলার গুদোম ঘর থেকে অ্যান্টিকে পেটমোটা চীনে-ভাস্, কাজ কার রুপোর ফর্সী আর টি -সার্ভিস বার করে এনে হারানো শৈশবের গন্ধ শুঁকছেন।

হ্যারি অ্যান্ড ড্যাশ কোম্পানীর হরিদাস ফুরফুরে পাঞ্জাবিতে উডস্ অব উইনসরের গন্ধ ছড়িয়ে এসেছে।

বিষ্টুকাকা বললেন —বসো হরিদাস। অনেকদিন পরে এলে, সেই এয়েছিলে বছর আষ্টেক আগে, ঝাড়লণ্ঠনের খোঁজে। পেয়েছিলে কিনা জানাওনি। আমাদের গুনো তো জানই—পাঁচভূতে লুটে খেয়েচে, আমরা কেরাণীগিরি করে মরচি!

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম— সেই ঝাড়লণ্ঠনের, কাটগ্লাসের ছেঁড়া ঝুরিগুলো নিয়ে কত খেলা করেছি—মনে আছে বিষ্টুকাকা? জীবনে টাঙাতে আর পারলুম না।

হরিদাস আগে বিষ্টুকাকার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতো। যখন সেকেন্ড-হ্যান্ড ফিয়েট কিনে এসেছিল—তখনও দাঁড়াত। আজ হৃষ্টচিত্তে বড়লোকের কায়দায় সোফায় হেলান দিয়ে বসলো।

বলল— পেইচি। রাসেল স্ট্রিট থেকে কিনিচি।

—তা টাঙালে কোথায়?

— সেও কিনিচি। গ্রে স্ট্রিটের রাজা মণীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িখানা প্রোমোটাররা নিয়েচে—পেছোনের আধখানা। বাকিটা আমি নিয়ে নিলুম। পঙ্কের কাজ করা থাম, ভাঙা লাল-নীল কাঁচবসানো দালান—মস্ত উটুন, পেল্লায় সিঁড়ি, খড়খড়িওলা সার্সিওলা জাঁন্নাদর্জা—অমনি রেকে দিইচি। ঘরের মাতার আর্চগুনো সবুজে আর লাল কাঁচ দিয়ে সারিয়ে নিইচি। সেকেলে ল্যাজারাসের ফার্নিচার জোগাড় করে সাজিইচি সব। একদিন নিয়ে যাবো আপনাদের। যাবে তো তুমি?

আমি অবাক হয়ে ঘাড় নাড়লুম।

বিষ্টুকাকা বললেন—কাঁচ বসানো দালানই হলো আসল মোজেক করা—বুয়েচো? তাছাড়া বাঘের মুখ, মার্বেলের টেবিল, বেলোয়ারী আয়না, ঢাল-তরোয়াল, বন্দুকটন্দুক এসব করেচো তো?

—সে সব আপনাদের কৃপায় করে ফেলচি।

—প্লাস্টিকের বাঘ-মুখ নয় তো?

—রাম রাম! প্লাস্টিকে কি বনিদিয়ানা আচে?

বিষ্টুকাকা আমার দিকে চেয়ে বললেন—অনেকটা তোর মতো। তুই যেমন তোর মলিদিদির কাছ থেকে সোসাইটিতে ওঠার তামিল নিস, তেমনি আর কি?

এবারে তাহলে একটা রোলস্‌-টোলস্‌ কিনে ফেলো হরিদাস!—বলেই সামনের ক্যাবিনেটে চোখ দিলেন—যেখানে পূর্বপুরুষের রোলস্‌-এর বনেট থেকে পড়ে থাকা পরীটা সাজিয়েছেন।—আমার বুকেব ভেতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। হরিদাস কোথায় উঠে গেল!

—রোলস না। তবে এখন একখানা কনটেসা-ক্লাসিক রেকিচি—নিজে ব্যবহার করি। আর একখানা ভিনটেজ বেনটলে কিনিচি বালিগঞ্জের কানোরিয়াদের কাচ থেকে। সেখানা রংচং করে গাড়িবারান্দার নিচে রেখেচি। কেউ ধরতে পারবে না রোলস্‌ কিনা।

বলে হরিদাস আত্মপ্রসাদের খোলা হাসি হাসলো।—ধরতে পারবেই। দুটো লাল রঙের 'আর' লেখা থাকে পুরোনো রোলস রয়েসে।

বিষ্টুকাকা মাথা নাড়লেন।—তা বেশ! ভালোই করেচো। তাহলে বাকি কি রইল?

—বাকি? একটা পূর্বপুরুষের ছবি! হ্যাঁ ছোড়দা ঐ একটা জিনিস হোলেই হয়। ওটাই আপনার কাচে চাইতে এলুম। দর্জিপাড়ার চারতলার ঘরে যদি কিচু পড়েটড়ে থাকে! তা বড় বৌদি বললেন—কি আচেটাচে দ্যাকো—তারপর বিষ্টুকে বলো। ওসবে হাত দিলে বিষ্টু বড় রাগ করে আজকাল।

আমি গুদোমঘরে গিয়ে দেকি একখানা 'শান্তনু ও গঙ্গা'—কাঁচভাঙা হয়ে রয়েচে। আর একখানা ছবির মাতার পাগড়ি ঝেপ্‌সে গ্যাচে, কোমরের তলোয়ারখানা উইয়ে খেয়েচে। খালি ছ'ইঞ্চি ফ্রেমের কাজগুলো ইদিক-ওদিক থেকে ঝরে গ্যাচে। কার ছবি বুজলুম না।

—অর্থাৎ কতখানি ভূতপূর্ব তা বোঝা যাচ্ছে না!

—নাঃ ছোড়দা, আমার বড় শখ বনিদি হবার। সব হলেও পূর্বপুরুষ পাওয়া যাচ্ছে না।

—হুঁ। তা তোমার বাবা মা ঠাকুর্দার ছবিতে পাগড়ি এঁটে একখানা আঁকিয়ে নাও না কাউকে দিয়ে?

—আজ্ঞে সেকি আর বাদি রেকিচি? তা আর্টিস্ট বললে একটা স্যাম্পেল দিতে, ঝাপসা হলেও হবে। আসল বনিদি পূর্বপুরুষের ছবি সে দ্যাকেনি বলেই দেখতে চাইচে। একখানা ছবি এ্যাঁকেছিলো যাস্সেতাই হয়েচে! গয়নাগুলোর হীরেপান্নার রংই আনতে পারেনি। ঠিক যাত্রাদলের রাজার মতো। সাতচল্লিশের পর কোলকাতায় এয়েচে কিনা। তিনশো বছরের বনিদি কোলকাতায় পূর্বপুরুষেরা কেমন ছিল বুঝতে পারচে না। তা আমি ভাবচি কি—ওখানা যদি বেচে দ্যান তো কিনি!

আমি চমকিত হয়ে বলি—আর্টিস্টদের বরং আইডিয়াটা বিক্রি করে দাও। ছবিখানা একবার দেখিয়ে দাও। তারপর এই ছকে ক্রমাগত পূর্বপুরুষের ছবি আঁকতে আঁকতে তারাও বিখ্যাত হবার সুযোগ পাবে। যারাই অ্যারিস্টোক্র্যাট হতে চাইবে—তারা কিনবে।

হরিদাস শান্ত ঠাণ্ডা হাসি দিয়ে বলল—না—তা হবে না, এ ছবি অরিজিন্যালই থাকবে। সবাই বনিদি হলে জনগণ কারা হবে বল তো? আর্টিস্টকে এ আইডিয়া আমি দেবোই না!

বিষ্টুকাকা সামনেব দেয়ালের কনটেম্পোরী ছবিখানার দিকে তাকিযে উদাসীনভাবে প্রশ্ন করলেন—বাগানবাড়ি-টাড়ি করেচ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের পানিহাটির খানা তো আমিই নিইচি বেনামীতে। গৃহপ্রবেশের দিনে ক্লাসিকাল গানেব জলসা দিইচি। ' ‍ঁদা আর বড়বৌদিকেও বলেছিলুম। ওঁয়ারা কেউ যেতে পারেনি।

বুকের ভেতবেব হাড়গুলো পর্যন্ত ক্ষোভে টনটনিয়ে উঠল। লোকটার টাকা হয়েছে বলে কি স্পর্ধা!

বিষ্টুকাকাবও যেন গলা শুকিয়ে গেছে। বললেন—তাই নাকি? তাহলে রক্তটক্তও পাল্টাতে হয!

—না না, রক্ত ভেতরে থাকে—কেউ দেখতে পাবে না।

নিজের গোলাপী হাতখানা চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন বিষ্টুকাকা, চিবুকে হাত বুলিয়ে বললেন—তা ঠিক। আজকাল নীল রক্ত কোনো গ্রুপে ফেলা যায় না। সব ভেজালে ভরে গ্যাচে।

আমার মন ভারী করে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। বিষ্টুকাকা নৈঃশব্দ ভেঙে বললেন—পূর্বপুরুষের ছবিটা হলেই তোমার বনিদি ছাপটা সম্পূর্ণ হবে? অ্যারিস্টোক্রেসিটা তাহলে কিনেই ফেলবে স্থির করেচো?—বিষ্টুকাকার কণ্ঠস্বরে যেন একটা আর্তনাদ। একটা হতাশা।

—আজ্ঞে তা যা বলেন! কেনা ছাড়া আর উপায় কি?

ছোটবেলায় একতলার দালানে হরিদাসকে কাঁচের গেলাসে চা খেতে দেখতুম। আজ বোন্-চায়নার কাপে সোনালী দার্জিলিং চা ঢেলে দিলুম কাজ করা রুপোর টি-সার্ভিস থেকে।

—ক' চামচ?

—চামচ? ওঃ না, ব্লাড-সুগার এখন সপ্তমে!

আঁৎকে উঠল হরিদাস।

—যাঃ, হরিদাস, ওটাও কিনে ফেলেচো?

—আজ্ঞে, এসব কিনতে তো পয়সা লাগে না। কিন্তু পূব্বোপুরুষের ছবিখানা কিনতে যা লাগবে—তাই দেবো।

—ভালো দাম পেলে দিয়ে দাও না বিষ্টুকাকা! কার ছবি—ক'পুরুষ আগেকার তা তুমি নিজেও জানো না। এই ভাঙাচোরা জিনিসগুলো রেখেই বা কি করবে? গুদাম খালি করার দায়টা জ্যাঠামশাই তোমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন তো। বড় বড় অয়েলপেন্টিংগুলোর একখানাও নেই, সব উইয়ে খেয়েছে। মা কিছু কিছু শিশি-বোতলওলাকে বিক্রী করেছেন! ছবির ফ্রেমের কারুকার্য খসে যাচ্ছে। যাকে তুমি চেনো না—নিজের ফ্ল্যাটেও খাতির করে সাজাওনি! ভূতের বোঝা বয়ে কি হবে?—যুক্তিপূর্ণ কথা বলে আমি বিষ্টুকাকার অনুমোদন পাবার চেষ্টা করি।

—তবেই বলুন। উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল হরিদাস। বলেন তো টাকাটা আমি ক্যাশই দোবো।

—ক্যাশ! টাকা? মানে কালো টাকা?—বিষ্টুকাকার কথায় ব্যঙ্গ।

হরিদাসের মোলায়েম হাসি—আজ্ঞে ছোড়দা, ফর্সা টাকায় কি হবে? ফর্সা টাকায় বনিদিয়ানাই ফর্সা হয়ে যায়!

পূর্বপুরুষের ছবির ঘুণ এতোক্ষণে বিষ্টুকাকার হৃদয়ে সংক্রামিত হয়েছে। রূপোর ফর্সীর নল হাতে তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন আলতো করে। সোফায় কাত হয়ে পরাজিত রাজ্যচ্যুত রাজার মতো ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—না, কিছুতেই না! ঐ পূর্বপুরুষের ভূতটা যদি একেবারেই চলে যায়—তাহলে আর কিস্‌সু থাকে না রে! ঐ ভূতটাই যে আমার সম্বল।

করমণ্ডলে হিরা
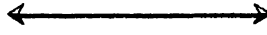
মীরা বালসুব্রমনিয়ন

হঠাৎ খবর এল যে মেজকা ও পুল্লা রেড্ডিকে ওঁদের অফিসের কাজে মাদ্রাজ যেতে হবে। মেজকা বললেন, "রেড্ডি, ওই সঙ্গে দু'-চারদিন ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে নিই না কেন? কাজ সেরে একটু ঘোরা যাবে। মাদ্রাজের আশপাশটা মোটে দেখাই হয়নি আমার।"

রেড্ডি বললেন, "উত্তম প্রস্তাব। রণ্টুও চলুক আমাদের সঙ্গে।"

"রণ্টু!" মেজকা বললেন, "রণ্টু কি করে যাবে, ওর কলেজ আছে না? আর আমরা যখন মাদ্রাজে ব্যস্ত থাকব, তখন ও কী করবে?"

আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, "কেন মাদ্রাজ শহরে কি দেখার কিছু নেই নাকি? আর দু-চারদিন কলেজ কামাই হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

তিনজনের মধ্যে আমি আর পুল্লা রেড্ডি একদিকে। অর্থাৎ মেজরিটি। অতএব মেজরিটির ভোটে ঠিক হল, মেজকাদের সঙ্গে আমিও যাব। মেজকা করমণ্ডল এক্সপ্রেসের টিকিট কিনে নিয়ে এলেন। এ সি স্লিপারের।

যাবার দিনে স্টেশনে এসে রিজার্ভেশান চার্টখানা পড়ে আবিষ্কার করা গেল যে, আমাদের খোপটার চতুর্থ যাত্রী হচ্ছেন জনৈক এ চৌধুরী। "ইনি আবার কোন মূর্তিমান হবেন কে জানে", বললেন মেজকা, "লম্বা জার্নিতে নাক-উঁচু সহযাত্রী হলেই চিত্তির।"

"ভাবছ কেন", আমি বললাম, "আমরাই তো রয়েছি গল্প করার জন্য।"

গাড়ি ছাড়ার তিন-চার মিনিট আগে ছুটতে ছুটতে উঠে এলেন মিঃ চৌধুরী। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা। সঙ্গে একজন কনস্টেবল ওঁর অ্যাটাচি আর ব্রিফকেস নিয়ে এল।

পুল্লা রেড্ডি এতক্ষণ কাগজ পড়ছিলেন। এবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আরে মিঃ চৌধুরী, আপনি?"

মিঃ চৌধুরী ওঁর বার্থে অ্যাটাচি ব্রিফকেস এসব গুছিয়ে রাখছিলেন। রেড্ডির কথা শুনে ওঁর দিকে ঘুরে বললেন, "মিঃ রেড্ডি! হোয়াট এ সারপ্রাইজ! মাদ্রাজ যাচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ, আপনি?"

"আমিও তাই। অন্তত আশা করছি।"

রেড্ডি মেজকাকে বললেন, "বোস তোমার প্রবলেম সল্‌ভড্। ইনি আর্য চৌধুরী, পুলিশ অফিসার, আবার ফাইন জেন্টলম্যান। আমার সঙ্গে আলাপ বেশ কিছুদিনের। ভালভাবেই অড্ডা দিয়ে যাওয়া যাবে। মিঃ চৌধুরী, বোস আমার কলিগ। আর এ হচ্ছে রণ্টু, বোসের ভাইপো।"

চৌধুরী বললেন, "অর্থাৎ আপনাদের ট্রিনিটি, তাই না?"

মেজকা বললেন, "আমাদের কথা পুলিশ ডিপার্টমেন্টেও ছড়িয়েছে তাহলে! মিঃ চৌধুরী, যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি...."

"বেশ তো।"

"একটু আগে রেড্ডির প্রশ্নের উত্তরে জানালেন যে, আপনিও মাদ্রাজ যাবেন, অন্তত আশা করছেন। কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। যদি মাদ্রাজ যাবেন বলে টিকিট কেটে থাকেন এবং মাদ্রাজ যায় এমন ট্রেনে চড়েন, তবে নেহাৎ অ্যাক্সিডেন্ট না হলে মাদ্রাজ পৌঁছবেন, সেরকমই তো কথা। এর মধ্যে আশা করার কথা আসে কেন?"

রেড্ডি চমৎকৃত হয়ে বললেন, "বা বোস, তুমি তো জেরার কায়দাকানুন বেশ রপ্ত করে ফেলেছ!"

মিঃ চৌধুরী বললেন, "তবে পয়েন্টটা উনি ভালই তুলেছেন। আসলে আই অ্যাম অন ডিউটি। যদি দরকার হয়, মাঝপথেও নেমে যেতে হতে পারে।"

"আমিও সেরকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম", বললেন রেড্ডি। "আপনার অ্যাসাইমেন্ট কি একান্তই গোপনীয়?"

"আপনাদের বলতে অসুবিধা নেই", বলে গলাটা নামিয়ে আনলেন আর্য চৌধুরী, "আমাদের পাশের খোপটা দেখেছেন তো? ওটাতে চারটে বার্থেই লেডিজ। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মিসেস ললিতা লাখোটিয়া। নামকরা শিল্পপতি ধনীরাম লাখোটিয়ার স্ত্রী। উনি মাদ্রাজ যাচ্ছেন কোনও নিকট আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে। সঙ্গে অন্যান্য গয়নাগাঁটি ছাড়াও রয়েছে একখানা বহুমূল্য হিরের নেকলেস। আজ সকালে মিঃ লাখোটিয়া ফোন করে জানালেন যে এই নেকলেসখানা নাকি এর আগেও কয়েকবার চুরির চেষ্টা হয়েছে। ওঁর সন্দেহ, একটা কুখ্যাত গ্যাং এই চুরির পেছনে আছে। মিঃ লাখোটিয়ার ধারণা, ট্রেন জার্নিতে ওটা চুরির চেষ্টা হতে পারে। ওটা পাহারা দেবার জন্যই আমার আসা।"

"মিসেস লাখোটিয়া প্লেনে গেলেন না কেন? তা হলে তো এসব ঝামেলা হতো না?" প্রশ্ন কবেলেন রেড্ডি।

"গত বছর দিল্লি থেকে যে প্লেনখানাকে লাহোরে হাইজ্যাক করেছিল টেররিস্টরা, উনি সেই প্লেনে ছিলেন। সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পর ঠিক করেছেন, জীবনে আর প্লেনে চড়বেন না।"

"কিছু মনে করবেন না", মেজকা প্রশ্ন করলেন, "আপনি যে ইউনিফর্ম পরে যাচ্ছেন, তাতে তো সবাই জেনে যাবে যে, আপনি পুলিশ অফিসার।"

"যাক না। বরঞ্চ জেনে গিয়ে যদি চোরেরা নেকলেসের দিকে হাত না বাড়ায়, তা হলেই তো আমার কাজ হাসিল। এই উদ্দেশ্যই তো ওঁদের পাশের খোপে সিট নিয়েছি। এছাড়াও বলে রেখেছি মিসেস লাখোটিয়াকে কিছুক্ষণ পর পর আমায় এসে জানিয়ে যেতে যে, নেকলেস যথাস্থানে আছে।"

এরপর হিরের নেকলেসের প্রসঙ্গ বন্ধ করে আমরা অন্য গল্পগুজব শুরু করলাম। আর্য চৌধুরী কিছুদিন সি আই ডি-তে ছিলেন, কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কেসের বিবরণ শোনালেন উনি। এরই মধ্যে একবার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলেন গোলগাল চেহারার মিসেস লাখোটিয়া। জানিয়ে গেলেন, সব ঠিক আছে। অর্থাৎ নেকলেস যথাস্থানে। বলার সময়ে নিজের হ্যান্ডব্যাগ যেভাবে তুলে ধরলেন উনি, তাতে আমার মনে হল নেকলেসখানা ওটাতেই আছে।

সন্ধেটা ভালভাবেই কাটল। রাত্তিরের খাওয়া একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিলাম আমরা। শুয়ে পড়লাম তারপর।

মিঃ চৌধুরী নিজের বার্থ উঠে বললেন, "শুলাম বটে, কিন্তু ঘুমোনো চলবে না।"

মেজকা বললেন, "ট্রেনের দুলুনিতে আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুম আসে।"

রেড্ডি বললেন, "একটা কথা খেয়াল হয়নি মিঃ চৌধুরী। এই ট্রেনগুলোতে তো করিডর দিয়ে অনায়াসে এক কামরা থেকে অন্য কামরায় চলে যাওয়া যায়। ভগবান না করুন, কোনও চুরি-ছিনতাই হলে চোর ধরা মুশকিল হবে আপনার।"

"কথাটা আমিও ভেবেছি। তাই কন্ডাক্টর গার্ডকে বলে তার ব্যবস্থা করেছি যে, রাত সাড়ে দশটার পর এই কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার দরজাগুলো বন্ধ থাকবে।"

"ভালই করেছেন।"

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতিও বেড়ে চলেছে। তবে গাড়ির দুলুনিটা বেশ আরামপ্রদ। তারপর গা জুড়ানো ঠাণ্ডা। আরামে চোখ আপনা থেকেই বুজে যাবে। ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে মনে হল, মিঃ চৌধুরী যাই বলুন, জেগে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না।

মিঃ চৌধুরী ঘুমিয়ে ছিলেন কি না জানি না, তবে আমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তা ঠিক। ঘুম ভাঙল হঠাৎ বিরাট একটা চেঁচামেচিতে। চোখ কচলে চেয়ে দেখি, চারদিকে আলো জ্বলছে। পুল্লা রেড্ডি ও মেজকা দাঁড়িয়ে। পাশের খোপে আর্য চৌধুরীর গলা শোনা যাচ্ছে, আর শোনা যাচ্ছে নারীকণ্ঠ উত্তেজিত কথাবার্তা। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি, আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে।

মেজকাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মেজকা, অত চেঁচামেচি কিসের?"

"মিসেস লাখোটিয়ার হিরের নেকলেস চুরি গেছে।"

"চুরি গেছে? কখন?"

রেড্ডি বললেন, "পাশের খোপ থেকে চৌধুরী না ফেরা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

মেজকা বললেন, "চলো না, রেড্ডি, গিয়ে দেখি, ব্যাপারখানা কী।"

"মন্দ বলোনি কথাটা। চৌধুরী বন্ধুস্থানীয়, ওঁকে মদত দেওয়া দরকার।"

মিসেস লাখোটিয়ার খোপের সামনে বেশ বড় জটলা। ভিড় সরিয়ে আমরা ঢুকলাম। পর্দা সরাতেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। রেড্ডির দিকে চেয়ে দেখি, উনিও নাকটা কুঁচকে রেখেছেন। আমি ওঁর কানে ফিসফিস করে বললাম, "রেড্ডিকাকু, একটা গন্ধ পাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। ঘুমের ওষুধ ছড়িয়েছে কেউ। তবে অল্প। দেখি মিঃ চৌধুরী কী বলেন?"

মিঃ চৌধুরীর অবস্থা দেখলাম কাহিল। মিসেস লাখোটিয়া ও তাঁর তিন সহযাত্রিণী চেপে ধরলেন ওঁকে। চারজনই একসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। মিঃ চৌধুরীর গলা সেই গোলমালে শোনা যাচ্ছে না। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আসা কনস্টেবলটি একেবারে বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

মিঃ রেড্ডি এগিয়ে এসে বললেন, "মিঃ চৌধুরী, চুরিটা কীভাবে, কখন হল?"

জবাবে চার ভদ্রমহিলা একসঙ্গে কলকলিয়ে উঠলেন। কিন্তু তা মিনিট খানেকের জন্য। রেড্ডি হাতজোড় করে ওঁদের বললেন, "আপনারা দয়া করে একটু থামবেন কি? প্রশ্নটা আমি মিঃ চৌধুরীকে করেছি।"

হাতজোড় করলেও মিঃ রেড্ডির হাবভাবে একটা নো-ননসেন্স ভাব ছিল নিশ্চয়ই, যাতে চার ভদ্রমহিলাই একসঙ্গে চুপ করে গেলেন। ফাঁক পেয়ে চৌধুরী বলে উঠলেন, "থ্যাংকস্ মিঃ রেড্ডি। এসে অবধি এদের চেঁচামেচিতে ব্যাপারখানা বুঝতেই পারছি না।"

"মিসেস লাখোটিয়াকে বলতে দিন না। নেকলেসখানা তো ওঁরই।"

"গুড আইডিয়া। তবে এঁদের জেরা করার কাজটা আপনিই করুন না কেন?"

রেড্ডি কিছু বলার আগেই মিসেস লাখোটিয়া উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "মিঃ চৌধুরী, আপনি আপনার ডিউটি করছেন না। নেকলেসটাকে তো বাঁচাতে পারলেনই না, এখন তদন্ত করাব ব্যাপারেও গড়িমিসি করছেন।"

মিঃ চৌধুরী কটমট করে মিসেস লাখোটিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা চারজনে যদি কোরাস গাইতে শুরু না করতেন, তাহলে এতক্ষণে তদন্ত অনেক দূর এগিয়ে যেত। আর মিঃ রেড্ডির রেপুটেশন আপনি জানেন না, তা না হলে বুঝতেন যে, তিনি এবং ওঁর বন্ধুরা যে এখানে উপস্থিত আছেন সেটা আপনার সৌভাগ্য।"

মিসেস লাখোটিয়া মিইয়ে গেলেন কতাটা শুনে। একটা ঢোঁক গিলে বললেন, "উ....উনি কি ডিটেকটিভ?"

রেড্ডি বলে উঠেলেন, "না, না, সেসব কিছু না। এই দু'-চারটে প্রশ্ন করব আর কি। তদন্তটা আসলে মিঃ চৌধুরীই করবেন। কিন্তু প্রশ্ন করার আগে আপনার সহযাত্রিণীদের পরিচয়টা জানতে পারলে ভাল হত।"

জানা গেল, দু'জন হচ্ছেন মিসেস পারুল চক্রবর্তী ও তাঁর মেয়ে পলি। পারুল চক্রবর্তী কলকাতার এক নামকরা কলেজের প্রোফেসরের স্ত্রী। পলিকে ভারত নাট্যম শেখার জন্য কলাক্ষেত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করাতে মাদ্রাজ নিয়ে যাচ্ছেন। চতুর্থ জন হলেন মিস্ লীনা লাকড়াওলা। উনি একটা বড় মার্কেন্টাইল ফার্মের পাবলিক রিলেশন অফিসার, ছুটিতে মাদ্রাজ যাচ্ছেন।

রেড্ডির প্রশ্নে জানা গেল যে অন্য গয়না একটা অ্যাটাচিতে থাকলেও হিরের হারখানা নিজেব হ্যান্ডব্যাগেই রেখেছিলেন মিসেস লাখোটিযা। ভুবনেশ্বরে যখন গাড়ি থেমেছিল, তখনও উঠে হ্যান্ডব্যাগ দেখেছেন, নেকলেস যথাস্থানেই ছিল। ভোবে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যথারীতি হ্যান্ডব্যাগ খুলে দেখেন, নেকলেস উধাও। রেড্ডি বললেন, "ভুবনেশ্বরের পর এখনও পর্যন্ত গাড়ি থামেনি এবং দুই বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার রাস্তা যখন বন্ধ, তখন নেকলেসখানা এখানেই আছে।"

"কিন্তু কোথায়?"

"সেটা বার করতে হবে। এই বগির সবাইকে সার্চ করতে হবে। মালপত্রও। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না। কিন্তু মিঃ চৌধুরী মেয়েদের সার্চ করার ব্যাপারটা—"

দেখা গেল, এ-ব্যাপারটাও আগেই ভেবে রেখেছেন মিঃ চৌধুরী। বললেন, "একজন মেয়ে পুলিশ সাদা পোশাকে থ্রি-টিয়ার কামরায় আছে। আর পুরুষদের জন্য আমার এই কনস্টেবলই যথেষ্ট।"

রেড্ডি খোপ থেকে বার হয়ে অপেক্ষমান যাত্রীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, "আশা করি সার্চের ব্যাপারে আপনারাও কোনও আপত্তি করবেন না।"

সবাই তখন নেকলেস চুরির মত রোমাঞ্চকর ঘটনার পরিণতি দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। আপত্তি-টাপত্তি কেউ করলেন না।

চৌধুরী গিয়ে সেই মেয়ে-পুলিশটিকে ডেকে নিয়ে এলেন। অবশ্য যাবার আগে সবাইকে বলে

গেলেন, যার যার জায়গায় বসে থাকতে।

সার্চ শুরু হল। প্রত্যেকের মালপত্র গা সব আঁতি-পাঁতি করে খোঁজা বল। কিন্তু নেকলেস পাওয়া গেল না।

চৌধুরী এসে চিন্তিত মুখে বললেন, "কী করি বলুন তো। কোথায় যে উবে গেল নেকলেসটা।"

"এই বগি ছেড়ে চোর পালিয়ে যায়নি তো?"

"ইমপসিব্‌ল্। রাত সাড়ে দশটাব পর দু'দিকের দরজা লক করিয়ে চাবি নিজের কাছে রেখেছি। এই যে...."

"তা হলে তো নেকলেসখানা এই বগিতেই থাকার কথা। অচ্ছা, মিসেস লাখোটিয়ার সহযাত্রিণীদের আপনার কেমন মনে হয়?"

"মিসেস ও মিস চক্রবর্তীর মালপত্র ঘেঁটে দেখেছি, কলাক্ষেত্র ইউনিভার্সিটির চিঠিও ওঁদের সঙ্গে আছে। ওঁরা জেনুইন। তাছাড়া শিক্ষাজগতে প্রোফেসর চক্রবর্তীর যথেষ্ট সুনাম আছে। ওরকম একটা ফ্যামিলির কেউ নেকলেস চুরি করবে এটা বিশ্বাস হয় না।"

"আর মিস লাকড়াওলা?"

"উনি অবশ্য একটা বড় ফার্মের নাম করেছেন, কিন্তু উনি যে ওখানকার অফিসার তার কোনও প্রমাণ বা কাগজপত্র ওঁর সঙ্গে নেই।"

মেজকা বলে উঠলেন, "ছুটিতে গেলে কেউ কি অফিসের কাগজপত্র নিয়ে বেরোয়?"

"তা অবশ্য ঠিক। তার ওপর ওঁর মালপত্রেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।"

রেড্ডি বললেন, "মিঃ চৌধুবী আমায় একটু ভাবতে দিন।"

চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগলেন রেড্ডি। কয়েক মিনিট পর বললেন, "চলুন, মিসেস লাখোটিয়ার সঙ্গে আর একটু কথা বলে নিই।"

ওঁদের খোপে গিয়ে দেখি মিসেস লাখোটিয়া ওঁর বার্থের একধারে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। সেই বার্থের অন্য ধারে বসে মিসেস ও মিস চক্রবর্তী নিচু গলায় কী সব আলোচনা করছিলেন।

মিস লাকড়াওলা নিজের সুটকেস গোছাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, " দেখুন আপনাদের সার্চ-পার্টি জামাকাপড়ের কী হাল করেছে। মাদ্রাজে পৌঁছেই ইস্ত্রি করাতে হবে সব কিছু।"

চৌধুরী বললেন, "সরি।"

মিস লাকড়াওলা সুটকেস বন্ধ করে নিচে নামিয়ে রাখলেন।

দেখলাম রেড্ডি একদৃষ্টে মিস লীনা লাকড়াওলার সুটকেসের দিকে চেয়ে আছেন। ব্যাপার কী রে বাবা, উনি কি সন্দেহ করছেন যে মিস লীনার সুটকেস ভাল করে খোঁজা হয়নি?

না, দেখলাম যে একটু পরেই রেড্ডি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। লক্ষ্য করলাম এবার উনি চেয়ে আছেন মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেসের দিকে। রেড্ডি সঙ্গে সঙ্গে আমিও মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেসের দিকে ভাল করে তাকালাম। আর তখনই ব্যাপারটা নজরে এল।

মিসেস লাখোটিয়া ও মিস লাকড়াওলার সুটকেস দুটো দেখতে হুবহু এক। একই কোম্পানির তৈরি, একই রঙ, এমনকী সুটকেসের নিজের নিজের নামের আদ্যক্ষর (এল.এল.) দুটিও এক।

কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে রেড্ডি বললেন, "মিঃ চৌধুরী, এই সুটকেস সার্চ করা হয়েছে?"

"ওটা কেন সার্চ করতে যাব? ওটা তো মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস।"

"তা হোক, ওটাও সার্চ করতে হবে। খোলান ওটা।"

মেজকা বলে উঠলেন, "রেড্ডি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যাঁর গয়না চুরি গেল, তাঁর সুটকেসই সার্চ করতে বলছ?"

মিঃ চৌধুরী কিন্তু রেড্ডির কথামতো খুলে ফেললেন সুটকেসটা।

সুটকেস খোলা হতেই তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন রেড্ডি। দু'চারখানা শাড়ি সরাতেই ঝলমলিয়ে উঠল হিরের নেকলেসটা। সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম, "আরে, নেকলেস তা হলে চুরি যায়নি!"

মিসেস লাখোটিয়া দেখলাম বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন নেকলেসটার দিকে।

চৌধুরী রাগে প্রায় ফেটে পড়েন আর কি। মিসেস লাখোটিয়াকে বললেন, " নেকলেস নিজের সুটকেসে রেখে সবাইকে বাঁদরনাচ নাচাচ্ছেন? ভেবেছেন কী? পয়সা আছে বলে যা খুশি তাই করবেন?"

মিসেস লাখোটিয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন,"কিন্তু আমি তো নেকলেস সুটকেসে রাখিনি।"

" তবে কি ওটা হ্যান্ডব্যাগ থেকে উড়ে এসে সুটকেসে ঢুকে গেছে?"

"উত্তেজিত হবেন না মিঃ চৌধুরী। ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকমই।" বললেন রেড্ডি। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন মিস লাকড়াওলা?"

দেখলাম মিস লাকড়াওলার মুখের রং ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে। আমতা আমতা করে বললেন,"এই একটু বাথরুমে যাচ্ছিলাম আর কি।"

"বেশ তো, যান মেয়ে কনেস্টবলটি সঙ্গে যাবে'খন। কিন্তু হাতের ব্যাগখানা দিয়ে যান।" বলে ছোঁ মেরে মিস লাকড়াওলার হাত থেকে কেড়ে নিলেন ব্যাগটা।

"ও কী করছেন আপনি?" জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস লাকড়াওলা। কিন্তু ততক্ষণে রেড্ডি সিটের ওপর ব্যাগটা উপুড় করে ফেলেছেন।

ব্যাগ থেকে বার হল একগোছা দশ টাকার ও খানকয়েক পাঁচ টাকার নোট। এ ছাড়া ট্রেনের টিকেট, পাউডার-কমপ্যাক্ট, লিপস্টিক, ছোট চিরুনি। এ সবের সঙ্গে বার হল দুটো চাবির রিং। তার মধ্যে একটাতে শুধু দুটো চাবি। দেখেই বোঝা যায় ওগুলো চাবিওলা দিয়ে তৈরি করা চাবি। রেড্ডি সেই চাবি দুটো চৌধুরীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, " দেখুন তো, এই চাবি দিয়ে মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস খোলে কি না।"

ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল যে, আমরা কেউ 'কী, কেন' এসব প্রশ্ন তুলছিলাম না। মিঃ চৌধুরীও তাই বিনা বাক্যব্যয়ে মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস লক করলেন ও তারপর রেড্ডির দেওয়া চাবি দিয়ে চট করে খুলে ফেললেন সুটকেসটা।

তা দেখে রেড্ডি হেসে বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আপনি যে গ্যাং-এর কথা বলছিলেন, তাদের একজন প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন। মিস লীনা লাকড়াওলা। যদিও মনে হচ্ছে ওটা ওঁর আসল নাম নয়।"

মিস লাকড়াওলা একবার চেঁচিয়ে উঠলেন, " কী যা তা বলছেন আপনি। আপনার নামে মানহানির কেস আনব।"

"স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কোর্টে বলবেন নিশ্চয়ই যে, মিসেস লাখোটিয়ার সুটকেস খোলে এমন চাবি আপনার হ্যান্ডব্যাগে কী করে এল? আর ওই রিংটার অন্য চাবিটায় যে মিসেস লাখোটিয়ার গয়নার অ্যাটাচিটা খুলবে না, এটাও কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?

মিস লাকড়াওলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন।

মিসেস ও মিস চক্রবর্তী এতক্ষণে চিত্রার্পিতের মত সব কিছু দেখে যাচ্ছিলেন। এবার এগিয়ে এসে বললেন, "মিঃ রেড্ডি, ব্যাপারটা কী হল বুঝতেই পারলাম না।"

"বলছি। মিঃ চৌধুরীর কথাই ঠিক। একটা গ্যাং এর পেছনে আছে। ওরাই হয়তো মিসেস লাখোটিয়ার কাজের লোকেদের কাউকে টাকা দিয়ে বশ করে ফেলেছিল, এবং ওঁর সুটকেসের চাবির ডুপ্লিকেট তৈরি করিয়েছিল। তারপর ওঁর সুটকেসের মত হুবহু আরেকটা সুটকেস জোগাড় করেছিল।"

মিসেস লাখোটিয়া বললেন, "বুঝেছি। আমার নতুন আয়া। মাত্র তিন মাস হল রেখেছি।"

"ওদের প্ল্যানটি ছিল চমৎকার। নেকলেসটা কোনওক্রমে সরিয়ে মিসেস লাখোটিয়ারই সুটকেসে রেখে দেওয়া, যা সার্চ করার কথা কেউ ভাববে না। পরে মাদ্রাজে নামার সময় কোনওভাবে সুটকেস পালটে নেওয়া।"

চৌধুরী বললেন,"প্ল্যান চমৎকার ছিল ঠিকই, কিন্তু ভেস্তে গেল। ওরা তো জানত না যে, এই ট্রেনেই মিঃ পুল্লা রেড্ডি অ্যান্ড কোং যাচ্ছেন।"

মিসেস লাখোটিয়া এগিয়ে এসে বললেন, "সত্যি মিঃ রেড্ডি, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব..."

মেজকা বললেন, "ধন্যবাদের বদলে, আমি বলি কি ম্যাডাম, এই বগির সবার জন্য চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত করুন। এত বেলা হল, সবার গলাই শুকিয়ে কাঠ।"

মিসেস লাখোটিয়া বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ডাকুন না, ডাইনিং কারের বেয়ারাকে।"

খিদে

কবিতা সিংহ

রঞ্জাবতী দিদিমণিকে দেখলে গলির মোড়ের শীতলাদেবীর মন্দিরটার কথাই মনে পড়ে যায় সুমতির। মনে পড়ে গেলে যেমনি ভালো লাগে, তেমনি কেমন যেন ভয় ভয় করে ওঠে।

নতুন এসেছিল স্বামী-স্ত্রীতে। গলির মোড়ের লাল বাড়িটার একতলায়। ঠিকে কাজের ঝি সুমতি।

—'দিদিমণি, ঠিকে লোক লাগবে তোমাদের?'

ফিরে তাকালো রঞ্জাবতী। দিব্যি রোগা রোগা ছিমছাম চেহারাটা। বয়স কত আর হবে, বড় জোর বাইশ-তেইশ। লালপাড় শাড়িটা একেলে ধরনে পরা। কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, আর হাতে এয়োতির শাঁখা। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে রঞ্জাবতীর চোখ। দুই বিন্দু দীপ্তি। সুমতির মনে হলো, এ তো তার নিচুচালা বস্তির কালি ওঠা ডিবরির আলো নয়, এ যেন বিদ্যুতের ঝিলিক্। রঞ্জাবতী দিদিমণি যেন ইস্পাতের ধার দেওয়া তলোয়ার, ধরলেই দুফাল হয়ে ছিঁড়ে যাবে সুমতি।

ততক্ষণে সুমতির দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক দেখে নিল রঞ্জাবতী। তারপর এলোমেলো রাগে বাক্স-বেডিং-এর উপর বসে থাকা ছিপছিপে দাদাবাবুকে ইংরেজী করে কি সব বললে। ইংরেজীটা বোঝে না সুমতি, তা বলে রঞ্জাবতীর মুখের প্রতিকূল অভিব্যক্তিটা বুঝতে কষ্ট হলো না সুমতির। কিন্তু দাদাবাবুই উত্তর দিলে শেষ পর্যন্ত—

—'আপাতত ওকেই রেখে দাও, তারপর না হয় খুঁজে-পেতে—'

অতএব রঞ্জাবতীর বাড়ি আট টাকা মাইনের ঠিকে কাজটা পেয়ে গেল সুমতি।

সুমতিকে রাখতে ভালো লাগেনি রঞ্জাবতীর, এ কথা রঞ্জাবতীর চোখ দেখেই বুঝতে পারতো সুমতি। সত্যিই তো, সকালবেলায় সাদা থান পরে চন্দর লেনের গলি দিয়ে বেরিয়ে এলেই কি আর জোড়াবট বস্তির গন্ধটুকু মুছে ফেলা যায় শরীর থেকে? যতই ধোও না কেন, তোলা যায় চোখের কোণের কাজল রেখা আর হাজাধরা পায়ের আলতার দাগ।

তবু সরু ঘিঞ্জি বস্তিপাড়ার গলি ডিঙিয়ে রঞ্জাবতীদের হরিয়ায় রোডের উপর আসতেই ভালো লাগতো সুমতির, তার চেয়েও ভালো লাগতো রঞ্জাবতীর গুছন্ত সংসারটিতে ঢুকতে।

তারপর যখনই সন্ধ্যা হয়ে আসতো সব কাজ শেষ করে রঞ্জাবতীর ঘরের সামনের ছোট্ট দাওয়াটায় আয়না পেতে বসতো সুমতি। ভাঙা চিরুনি নিয়ে পরম যত্নে একটি একটি করে সাজাতো স্বল্প চুলের গুছিটা। পাতা কেটে বানানো খোঁপাটা বাঁধতে বাঁধতে বেলা গড়াতো।

তাঁতের শাড়ি পরে উঁচু করে খোঁপা বেঁধে কলতলা থেকে গা ধুয়ে বেরোতো রঞ্জাবতী, সুমতির দিকে তাকিয়ে হেসে বলত—'তোর বয়স কত হলো রে সুমতি—'

সুমতির শরীরের লজ্জাবোধটা প্রায় অসাড় হয়ে খসেই গিয়েছিল পঞ্চাশের বন্যার পর—তার ছয় ছেলের বাপের দেওয়া শেষ শাড়িটার সঙ্গে। তবু রঞ্জাবতীর চোখের রঞ্জন আলোয় তারই একটা ক্ষীণ শিকড়কে অনুভব করত সুমতি। আর শুকনো বুকের উপর থানের আবরণ টেনে দিয়ে আড়াল করে দিত রঞ্জাবতীর দেওয়া পুরানো সাটিনের ব্লাউজটাকে।

স্বামীর জলখাবারটি গুছোতে গুছোতে নাকের দু'পাশে ঘৃণার বৃত্ত আঁকতো রঞ্জাবতী। 'কেন না তোর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স হয়ে গেল, তুই এসব ছেড়ে দে সুমতি, কারো বাড়ির খাওয়া-পরার কাজ নে।'

মাথা নিচু করে গলির মধ্যে ঢুকতো সুমতি। নিচুচালা বস্তির ছোট ছোট ঘরের সামনে তখন উঁচু হয়ে বসেছে দিনের ঠিকে ঝি'রা রাতের মোহিনী হয়ে। ঘরে এসে হাওড়া হাটের সাতরঙা ডুরে শাড়িটা পরতে পরতে ছয় ছেলেমেয়ের বাপকে ভাবলো সুমতি। খেতের কাজ সেরে ফিরলে তাকেও জলখাবার সাজিয়ে দিত একদিন। তবে টুকটুকে বউ রঞ্জাবতীর মতো তখন অমন লক্ষ্মী-লক্ষ্মী হাতে নয়। তারপর সব কথা স্মৃতি হয়ে মিশে যেত চেতনার অনেক তলায়। দরজা খুলে বাইরে এসে বসলে শুধু কেরোসিন ডিবরির শিখাটাই সত্যি হয়ে থাকত সুমতির চোখের সামনে।

শেষ পর্যন্ত আত্ম-পরিচয়ের শেষ, পর্দাটাও খসে পড়লো সেদিন রাত্রে জোড়াবট বস্তির সামনে। রঞ্জাবতী দিদিমণি আর দাদাবাবু বুঝি রাতশোতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিল বস্তির রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে বলে। সবই জানতো রঞ্জাবতী, তবু সেদিন অমন সোজাসুজি সবকিছু দেখে ফেলে ঘৃণাটা কণ্ঠপূর্ণ হয়ে উপচে পড়লো ঠোঁটের কিনারা দিয়ে।

পরদিন বিকেলে এঁটো বাসন মাজতে এসে শুনল সুমতি,

—'তোর লজ্জা নেই রে সুমতি,পাপের ভয় নেই?'—

—'কী করবো দিদিমণি, পেট যে শোনে না,'—

—'খিদে? বুজলি সুমতি, আত্মহত্যা করে মরে যেতাম,·কিন্তু না, কখনও পারতাম না এমন হতে'—

সুমতির বুকের মধ্যে একটা নিরুপায় বেদনা কেঁপে কেঁপে উঠলো। ভাবলো রঞ্জাবতী দিদিমণির ফরসা পা দুটো জড়িয়ে বলে ওঠে— ওগো দিদিমণি, থামো, থামো, পেটের জ্বালা কী তা তুমি জানো না।

কিন্তু না, সে কথা বলা যায় না। রঞ্জাবতী দিদিমণির খিদে পায় না, পেলেও তা সুমতির মতো নির্লজ্জ সর্বগ্রাসী নয়। ভোরবেলা উঠে লোকের বাড়ির বাতিল-করা বাসি ভাত-রুটি নিয়ে উবু হয়ে বসার কল্পনাটাও বোধহয় রঞ্জাবতী দিদিমণির স্মৃতিতে নেই।

মাথা নিচু করে কলতলায় নেমে গেল সুমতি। আর নজরে পড়লো একটিও এঁটো বাসন নেই কলতলায়। আরো নজরে পড়লো ছিমছাম ঘরটির সবুজ মেঝেতে স্বামীর ভাত ঢাকা দিয়ে রঞ্জাবতী দিদিমণি বসে আছে। লালপাড় শাড়ি আঁচল ছাপিয়ে এলো চুলের ঢাল। রঞ্জাবতীর সংসার এখনো অভুক্ত রয়েছে।

—'দাদাবাবু এখনো ফেরেনি দিদিমণি—তুমিও কিছু মুখে দাওনি বেলা যে পাঁচটা বাজে'—

মুখ তুলে তাকিয়ে মেঘলা হাসলো রঞ্জাবতী।

রঞ্জাবতী ঘরের দরজায় বসে অবাক ভাবতে বসলো সুমতির পেটের মধ্যে যে গভীর জারক রসের সৃষ্টি হয়, তারপর তা চুইয়ে চুইয়ে নামতে থাকে পাকস্থলীর দিকে, তারা যখন আহার্য না পায় কী দুর্দম হয়েই নাড়া দেয় বত্রিশ নাড়িতে, অন্ত্রে, অন্নাশয়ে। মাথা ঘুরে ওঠে, শুকিয়ে যায় তালু, বমি বমি ভাব ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে। সেই আশ্চর্যবোধকে চেনে না রঞ্জাবতী দিদিমণি। কী মন্ত্রে চেনে না? রঞ্জাবতী মুখ তুলে কথা বলল—'এ আর অবাকের কি, স্বামীর ভাত নিয়ে সব বৌ-ই বসে থাকে সুমতি, আমার মা কী করেছিলেন জানিস, সাবিত্রী ব্রত। চোদ্দ বছর স্বামীর এঁটো খেতে হবে। বাবা

যখন কলকাতার বাইরে যেতেন, হাঁড়ি করে বাবার এঁটো তোলা থাকতো, সেই পোকা ধরা ভাত একদানা খেয়ে তবে মা ভাত খেতে বসতেন'—

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সুমতি। মায়ের ঐতিহ্যের চালচিত্র পিছনে নিয়ে রঞ্জাবতী দিদিমণি যেন সুমতিদের গ্রামের দশভূজা মূর্তির মতো অনন্যা হয়ে গেছেন।

ঠিক এমনি সময়েই ঢুকলো দাদাবাবু। বাঁশপাতার মতো নেতিয়ে গেছে মানুষটা। উঠে এলো রঞ্জাবতী—'কী গো এত দেরী কেন তোমার— ছেড়ে দাও বাপু ঐ সেল্‌সম্যানের চাকরি।'

ঝুপ করে খাটের উপর বসে পড়লো সুনীল—'ছেড়ে দিতে হবে না, চাকরিই আমাকে ছেড়ে গিয়েছে রঞ্জা'—

ছায়ার মতো মিশিয়ে গেল সুমতি। ছুটে গিয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলল গ্রোভ লেনের গলিতে গিয়ে। আবছা ভাবলো একবার, তবে কি এবার উপোস করবে রঞ্জাবতী দিদিমণি, আর উপোসের শেষ সীমায় এসে গলির মোড়ে মর্মরিকা হয়ে দাঁড়াবে কোনদিন? মনে মনে জিভ কাটলো সুমতি। সতীসাবিত্রী দিদিমণির নামে এ কী কথা ভাবছে সুমতি!

তারপরে আর একটা মাস রঞ্জাবতী দিদিমণির কোনো খবরই রাখতে পারেনি সুমতি। রঞ্জাবতী দিদিমণির কাছ থেকে মাইনের টাকাটাও আনা হয়ে ওঠেনি। পাশের খুপরির গোলাপ বুঝি এটা-ওটা দিয়ে কোনো রকমে আবার খাড়া করে তুলল সুমতিকে। তারপর অসুস্থ শরীরেই আবার কদিন ডিবরি জ্বেলে বসলো সুমতি। কদিন পরেই টের পেলে পেটে একটা প্রাণের কাঁটা খচ খচ করে জেগে উঠেছে। রঞ্জাবতী দিদিমণির কাছে আর না গেলেই নয়। আটটা টাকা পাওনা রয়েছে। টাকা হাতে নিয়েই ছুটতে হবে জোড়াবট বস্তির বগলা বাড়িওয়ালীর কাছে।

যা হোক একটা ওষুধ-বিষুধ পেতেই হবে। নইলে কেইবা কাজ দেবে ভরা মাসে, কেইবা দিয়ে আদিমকালের আনন্দ খুঁজতে আসবে সন্ধেবেলা।

অনেকদিন পরে রঞ্জাবতীর ঘরে গিয়ে বসলো সুমতি। একটা মাস যেন বন্যার মতো চলে গেছে রঞ্জাবতীর গুছন্ত সংসারের উপর দিয়ে। সব যেন ছন্নছাড়া লণ্ডভণ্ড। এই বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে সেই ছিমছাম সংসারটিকে আর চিনে নেওয়া যায় না। রান্নাশালের একধারে হাঁটু মুড়ে খেতে বসেছে রঞ্জাবতী অবেলার ভাত। দেখে মনে হলো খুব খিদে পেয়েছে রঞ্জাবতীর। লোলুপ হাতে বড় বড় গ্রাস মুখে পুরছে। অবাক লাগলো সুমতির রঞ্জাবতীর এই আসন না পেতে জল না গড়িয়ে যেমন তেমন করে ভাত খাওয়া দেখে।

চারিদিকে তাকিয়ে আরো অনেক পরিষ্কার হয়ে এলো সুমতির কাছে। রঞ্জাবতীর হাতের চুড়ির ভার হালকা হয়ে এসেছে, শোয়ার ঘরে বিয়ের খাটখানা নেই, একপাশে একটা মলিন বিছানা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

তবু সুমতি টাকাটা চেয়ে ফেলল। মাত্র আটটা টাকা। রঞ্জাবতীর মুখখানি তাতেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সব বুঝতে পারলো সুমতি। কিন্তু সুমতিরও কোনো উপায় নেই। খুলেই বলল তার নিগূঢ় প্রয়োজনের কথা।

রঞ্জাবতী অবাক হয়ে তাকালো সুমতির দিকে। অঝোরের ঘৃণা ঝরে পড়লো তার টানা টানা দুটি চোখ দিয়ে—। তখুনি আলমারি খুলে, ড্রয়ার বাক্স হাতড়ে, নোটে খুচরোয় কোনোমতে আটটি টাকা ছুঁড়ে দিল সুমতির দিকে—'সুমতি তুই মানুষ খুন করিস, তুই খুনী!'

রঞ্জাবতীর তীব্র ভর্ৎসনায়, সুমতির বুকের ভেতরটা টান টান করে উঠলো। জল এলো তার

অনেক দিনের শুকনো চোখের কাজল-ঘেরা বিস্তারে। রঞ্জাবতীর দিকে তাকিয়ে যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে উঠলো সুমতি,—'দিদিমণি মানুষ কি আমি সাধ করে মারি,—পাঁচটি পোনাপুনি মানুষ করেছি একদিন, একদিন এই বুকেরই ধারা দিয়ে'—

—'কোথায় গেলোরে তারা'—

—'বানে ভেসে গেল গো দিদিমণি'—একটু হাসল সুমতি। স্মৃতির মধ্যে থেকে কী যেন হাতড়ালো—'যে কটা বাকি ছিল সে কটাও অকালে মরে গেল'—

—'পেটে যেটা এসেছে, সেটাকে না হয় বাঁচিয়ে তোল,'—

—'পারবো না দিদিমণি।' পারিওনি। এর আগে একটা একটা ছেলে এমনি করেই গেছে। মনে পড়লো সুমতির— কেমন কোলজুড়ানো সোনার চাঁদটি নিয়ে সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিল কবছর আগে। আর কেমন করে শুকিয়ে শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে সেই ছেলেই মারা গেল। কলকাতার ফুটপাতে।

বাঁধ ভেঙে গেছে সুমতির। বন্যার মতো ছুটে আসছে বেদনার নিরুদ্ধ আবেগ। আহা, সে কি এ জন্মের কথা, না সাত জন্ম আগের দেখা স্বপ্ন! আজ যদি বিজন তাঁতীর বউ সেই সুমতিবালা সুমতির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় হয়তো সুমতি নিজেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। সুমতির গাঁয়ে ছেলেমেয়ে হলেই ষষ্ঠীর আঁটন পড়ত ঘরের দেওয়ালের গায়ে, মেয়ে হলে নিটোল নিখুঁত কড়ি দিয়ে গাছ বানাত দেওয়ালের গায়ে, মেয়ে হলে ঘর। সুমতিরও ছিল ছয়-ছয় ছেলে—মেয়ের ছটি গাছ-ঘর। সুমতির সোয়ামী। তাতে সাজানো থাকত ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার বাসন, আর রাস চড়কের মেলা থেকে কিনে আনা ছেলেদের খেলনা,—বেনেবউ, মাটির রাধাকেষ্ট, কলসী কাঁখে বউ, লালপাগড়ি পুলিশ। তারই তলায় সমুদ্রের কড়ি দিয়ে নিজের হাতে গেঁথেছিল সুমতি ছটি শিল্পকাজ। কি তাদের ডালের বাহার! ছিউলী পোয়াতী বলে ঘরে ঘরে নামও ছিল সুমতির। নতুন শিশু এলে ডাক পড়তো তার সবার আগে। সময় লগ্ন দেখে নিপুণ চিকন হাতে কড়ির গাছ বুনে দিত সুমতি। চারিদিকে শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠতো, ধূপের গন্ধ উঠতো চারিদিক থেকে।

বলেই চলেছে সুমতি,—আমার বন খোকনটা ছোটখুকিকে রাগাত,—দেখেছিস আমার কেমন গাছ,—

মেয়ে কেঁদে উঠতো,—মাগো, আমার ঘরের চালে গাছ বানিয়ে দে—

যখন গ্রামের কোনো ঘরে কান্নার রোল উঠতো, ঠাণ্ডা হয়ে যেত কারো রক্তের ডিম, তখন ছয় ছেলেমেয়েকে বুকে চেপে ধরে ঘরে কপাট এঁটে ঝাঁপ টেনে বসে থাকতো সুমতি। আর যতই ভাবত ভাববে না, ততই যেন চোখে দেখতে পেত হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে মৃত শিশুর শোকে করুণ মা ঢেকে দিচ্ছে তার নাম করে গাঁথা কড়ি গাছটিকে।—শেষকালে আমার কড়ির গাছও ঢেকে গেল দিদিমণি,—বলে চলল সুমতি। তার শীর্ণ গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে এক হঠাৎ উপচে ওঠা বালিভাঙা ফল্গু। বন্যায় ফেলে দিল তার দক্ষিণ দেওয়াল। একাকার হয়ে গেল ছেলেমেয়ে কড়ি পাতিল। সংসারের পর সংসার ভেসে চলল সাগরমুখী হয়ে। সুমতিরও সর্বস্ব ভেসে গেল বন্যার জলে—

অনেকক্ষণ চুপ করে রান্নাশালের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল সুমতি। তার নিচুচাল বস্তির খুপরির সামনে যথা সময়ে জ্বললো না কেরোসিন ডিবরির আলো। আর নতুন চোখে তার দিকে

চাইল সেদিন রঞ্জাবতী দিদিমণি। সেই একটি সহানুভূতির কিরণরেখাতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুমতির কালো মনের অন্ধকার কোণ। নতুন সান্ত্বনা নিল সতী মেয়ের কথার আলোয়।

—'আর যাই করিস সুমতি, ওই হাতুড়ে ওষুধগুলো খাসনি—মরে যাবি'—

রঞ্জাবতীর দরজা পেরিয়ে এসে অন্ধকারের দিকে কান্নাভেজা হাসি ছুঁড়লো সুমতি—দিদিমণি বড় ছেলেমানুষ—আবোলা—

আবার পরদিন মুক্তোর মার মেয়ে মুক্তোকে দিয়ে ডেকে পাঠালো রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর ঘরে ঢুকে মনটা খুশির হাওয়ায় উচ্ছল হয়ে উঠলো সুমতির। মেঝেতে একরাশ কড়ি ছড়িয়ে বসে আছে রঞ্জাবতী—

—'তোর কড়ির গাছ আমার মনের মধ্যে ঘুরছে রে সুমতি, দে না আমায় একটা গাছ বুনে'—

আনন্দে চোখ দুটো ঝলসে উঠলো সুমতির। দিদিমণির খোকা হবে। ঐ টুকটুকে ছিমছাম হাল্কা দিদিমণিব।

লজ্জায় মাথা নামিয়ে ততক্ষণে একটা ছিন্নভিন্ন শাড়ি সেলাই করতে বসে গেছে রঞ্জাবতী। আর তার চারিদিকে জ্যোতিষ্মান ধুলোর বিন্দু উড়ছে সূর্যের আলোয় সুন্দর হয়ে।

ঠিক সেই সময়েই দিশেহারা চোখ আর এলোমেলো চেহারা নিয়ে ঘুরে ঢুকলো দাদাবাবু। ধূলিধূসর চুলেব মধ্যে দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বলল—

—'ভাত দাও রঞ্জা।'

—'ভাত,—মাথা নিচু করলো রঞ্জাবতী,—সুমতি যাক, দিই ভাত।'

—'থাক না সুমতি, হয়েছে কি তাতে, তুমি ভাত দাও,'—

বুঝতে পারলো সুমতি। রান্নাশাল শ্মশানের মতো উদাস হয়ে আছে, কোথাও এক দানাও ভাত নেই।

—আমি যাই দিদিমণি, তুমি দাদাবাবুকে ভাত দাও। উঠে পড়লো সুমতি। অমূল্য রত্নগুলো গুছিয়ে নিল কোঁচড়ে—সন্ধ্যাবেলায় এসে তোমার কড়ির গাছ তৈরী করে দেব—

রঞ্জাবতীর সংসারের এই ছন্নছাড়া চেহারাব মাঝখান থেকে উঠে যেতে যেতে নতুন সান্ত্বনার মোলায়েম মালিশ বুলালো সুমতি নিজের শুকনো হৃদয়ে—সে আসছে। সে এলে হয়তো আবার সব ফিরে আসবে। স্তনবৃন্তের চারপাশে কচি ঠোঁটের স্পর্শে শিহরণ অনুভব করল সুমতি। ভাগ্যবতী মেয়ে রঞ্জা দিদিমণি। সতী সাবিত্রী। তার পরে দোলনা ঝুলবে ক'মাস পরে। লজ্জা লজ্জা মুখ করে দাদাবাবু কিনে আনবে রাঙা মশারি। কচি গলার আওয়াজ ভাসবে ঘরের হাওয়ায়। দুদিন পরে কচিকচি টুকটুকে খোকা-খুকুরা ঝগড়া করবে কড়ির গাছ নিয়ে। সুমতির জারজ ভ্রূণ তখন কোনো ম্যানহোলের তলায় কাদা বালির ভারে চাপা পড়ে গুমরে গুমরে মরবে।

কিন্তু এজন্যে পিঁপড়ে কামড়ানোর চেয়েও কম যন্ত্রণা অনুভব করে সুমতি। এ মৃত্যুকে সুমতি মেনে নিয়েছে। যেমন মেনে নিয়েছিল তার জীবনের প্রথম পরপুরুষের অন্বেষণকে।

যাবার সময় জানলা দিয়ে শেষ ছবি দেখে গেল সুমতি, সাবিত্রীসমান রঞ্জাবতী দিদিমণি। জানলার গরাদ ধরে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। শুনে গেল সুমতি দাদাবাবুর এক চিলতে কথা—সন্ধ্যেবেলায় আমাদের আপিসের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে আনব রঞ্জা। তিনি আশা দিয়েছেন পাবলিসিটি বা প্রোপাগ্যান্ডায় তোমাকে রাখতে পারবেন হয়তো—তবে তোমার এই অ্যাডভান্সড্ স্টেজটার কথা বলিবলি করেও বলতে পারিনি—

সন্ধ্যাবেলায় রঞ্জাবতীর রান্নাশালের দেওয়ালে কড়ি গাছ তৈরী করে দিল সুমতি। বুকের সবখানি দরদ ঢেলে সাজালো সেই গাছ। চারপাশে তার কত অলক্ষিত শঙ্খঘন্টা বাজল, কত মাছ পদ্ম শঙ্খ-লতার দৈব জানালায় উঁকি দিয়ে গেলো তার সবচেয়ে ছোট কচি খোকাটার টুলটুলে মুখটা।

কে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরের বাইরে এলো সুনীল আর রঞ্জাবতী।—'দিদিমণি, তোমার গাছ হয়ে গেছে দেখে যাও'—

সেদিকে আর দৃকপাত নেই রঞ্জাবতীর। কি মোলায়েম খোসামোদের দৃষ্টি রঞ্জাবতীর সুর্মা আঁকা চোখে। সিল্কের কাপড়ে রঞ্জাবতীকে যেন নতুন বস্তির বড় ঘরানার রেশমী বিবিরি মতো দেখাচ্ছে। অমনি চুলে ফুল, গায়ে গন্ধ, পরনে ঝলমলে পোশাক। নতুন মানুষটি ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বলে গেলেন,—'আমি খুব বড় দুঃখিত মিসেস রায়, আপনাকে যে কাজটা দিতে পারতাম সেটা বড় ঘোরাঘুরির কাজ, আপনার এই অ্যাডভান্সড্ স্টেজে তা গ্রহণ করা আপনার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

—সুমতি—গাড়িও ছেড়েছে রঞ্জাবতী দিদিমণিও এসে দাঁড়িয়েছেন সুমতির সামনে। কোনোদিকে দৃষ্টি নেই তাঁর, বুক থেকে খসে গেছে সিল্কের আঁচল, দ্রুত নিঃশ্বাসে থর থর করে কাঁপছে অনাগত নবীন গরুড়ের অমৃতকুম্ভ। চোখের কাজল ধুয়ে ধুয়ে পড়েছে গালের উপর—'তোদের বাড়িউলীর কাছে থেকে আমাকেও ওষুধ এনে দিতে হবে সুমতি,'—সুমতির হাত দুটো চেপে ধরে রঞ্জাবতী—

খানিকক্ষণ পাথর হয়ে রইল সুমতি। কি আশ্চর্য! সেদিন সুমতিকে বারণ করেছিল, অথচ আজ কিসের মন্ত্রে নিজেই আর ভয় পায় না হাতুড়ে ওষুধ খেতে— ।

অনেকক্ষণ রান্নাঘরের দেয়ালে মাথা রেখে বসে রইল সুমতি। তার মনের মধ্যেকার ধারণার ছবিগুলো যেন চৈত্র-ঘূর্ণির শুকনো পাতার মতো ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে। পা দুটো আর যেন ওঠে না। তবু কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল সুমতি। থাবা থাবা মাটি দিয়ে ঢেকে দিল, শখ করে গড়া কড়ি গাছটাকে।

না, মাটির নিচে ম্যানহোলের গাঢ় পঙ্কিলতায় কোনো কড়ি বৃক্ষ নেই। সুমতির খোকনের পাশে রঞ্জাবতীর খোকনও সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে, কচি হাত-পা নেড়ে খেলা করবে না।

নিজের নিচুচালা বস্তির খুপরির দাওয়ায় ঠিক রোজকার মতোই কেরোসিনের ডিবরি জ্বালাল সুমতি। রোজকার মতো কালি-কলঙ্ক লণ্ঠনের শিখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিপর্যস্ত চিন্তাটা থিতিয়ে থিতিয়ে পরিষ্কার হয়ে এলো। প্রাণ সঞ্চারণের সেই পার্থিব কেন্দ্রকে শরীরের প্রতি স্নায়ু উদরের প্রতিটি লসিকা দিয়ে অনুভব করল, তারপর আরো খানিকটা সহানুভূতির ছিটে ফেলল ওর চিন্তায়,—

—আহা কি করবে দিদিমণি, ওরও তো খিদে পায়!

ভুবনডাঙার জাতখেলুড়ে

গৌরী ধর্মপাল

এক ছিল পুতুল গড়া বুড়ো। তার বাবা মরার সময় বলে গিয়েছিল, বাবা,

জাত-ব্যবসা করতে চাও করো
পুতুল-টুতুল গড়তে চাও গড়ো

কিন্তু জেনে রেখো—

রূপোর কাটি সোনার কাটি
ভুবনডাঙার পাবন মাটি—
এ তিন না হলে সবই মাটি।

বুড়ো বাবার ঐ কথাগুলি ভাবতে ভাবতে দিনরাত খালি পুতুল গড়ে আর পুতুল গড়ে। দিনমানে বুড়ো গড়ে কায়াপুতুল—সাপ খেলানো সাপুড়ে, সাপের জিভ দুটি করে নিজের মাথার সাদা চুল কালো রঙে ছুপিয়ে; খোল-খঞ্জনী হাতে বোষ্টম, সোনা রং খঞ্জনীটি ঝকঝক করে যেন এইমাত্র মাজা হয়েছে; মাছ-বেছুনী মেছুনী, নথটি দিতে ভোলে না আর দুহাতে দুগোছা কাঁচের চুড়ি; মাথায় জটা ত্রিশূল হাতে সন্নিসি, দেখলে যেন ভয় করে; কলসী-কাঁখে বৌ, সিঁদুর টিপটি ডগডগ করে যেন ভোরের আকাশে লাল সূয্যিঠাকুর; মাথায়-ঝুঁটি গুটিগুটি পড়ুয়া ছেলে, পাততাড়ি বগলেতে পাঠশালে যায়, যেতে যেতে মার পানে ফিরে ফিরে চায়; ঝগড়ুটে শালিক-শালিকনী, মাছ-হ্যাংলা দুধ-ক্যাংলা আপোষা বেড়াল, আরশোলা টিকটিকিফড়িং প্রজাপতি এলাচ সুপুরি লবঙ্গ ফলের ঝুড়ি—এইসব। দূর দূরান্ত থেকে লোকজনেরা এসে নামমাত্র দামে কিনে নিয়ে যায় এইসব পুতুল দেশ-বিদেশের হাটে চড়া দামে বিক্রি করবে বলে। দেশ-বিদেশে তার পুতুলের কেমন কদর কত কদর সে সব অবান্তর খবর বুড়োকে কে আর বলতে যাচ্ছে? বলতে গেলেই যদি বুড়ো বেশি দাম চেয়ে বসে! অথচ এদিকে

গণপতি প্রজাপতি ক্রোরপতি খান
বুড়োর পুতুল ছাড়া বসার ঘরে অতিথি বসাতে লজ্জা পান!

তা সে যাগ্‌গে।

সন্দে হলেই বুড়ো কিন্তু ঐসব হাট-বাজারী পুতুলের পাট তুলে রেখে, গড়তে বসে ছায়াপুতুল আর মায়াপুতুল। যেদিন যেমন আসে যখন যেমন ভাসে—জুজুমানা, হাসতে-মানা, রামগরুড়ে, একানোড়ে, কট্‌কটেটা, হট্টিমাটিম, মানুষমুখো মস্ত কাছিম, সিংগির মামা ভোম্বল দাস, টাগের জামাই জঙ্গলবাস, গোলাপ সুন্দরী, কিবা মেয়ের ছ্যারি, ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি, ভাবতে পারো যার-যা-খুশি, গালফুলো গোবিন্দর মা, সাত কাকে দাঁড় বাইছে না, খোকা বলে পাখিটি, শেয়াল পণ্ডিতের টিকিটি, যমুনাবতী সরস্বতী, দিগ্‌নগরের মেয়ে, নয়না-ঘাটের নেয়ে, কানকাটার মা বুড়ি, টিটিংটিঙের খুড়ি, বুই-বিলি-বঙ্কা, কঙ্কাবতী, ময়নাবতী, ভবের হাটে হেতিহোতি, গেছো ব্যাঙের দাদাশ্বশুর,

তালগাছেতে হুসুরমুসুর, ড্যামরাচোখো, ঢ্যামনামুখো, ঝাঁকড়াচুলো রাক্কুসি আয় না লাগাই এক ঘুঁষি—এইসব। সেসব পুতুল দেখে হেসে গড়াগড়ি যায়, ভয়ে ভিরমি খায়, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পাড়ার যত সামলে রেখো ডাকাবুকো, কোলতো-না-দুর বীর-বাহাদুর কচি-কাঁচা-কুচোর দল আর তাদের গল্পছড়ার যোগনদাররা।

প্রত্যেক বছর পুজোর সময় বুড়োর এইসব পুতুল দিয়ে মেলায় চমৎকার করে একখানা ঘর সাজায় পাড়ার বড়োরা। সঙ্গে থাকে ছড়াই-দিদির ধান সবুসবু ছড়া আর রূপসী মাসির চিঁড়ে-চিলতে গপ্‌পো। দেখেশুনে ঝুঁকে পড়ে লোকের আর আশ মেটে না, বারে বারে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে আসে। মেলার শেষে সব পুতুল বুড়ো ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেয় ওমনি-ওমনি, দাম কেই বা দিচ্ছে আর কেই বা নিচ্ছে। খিলখিল করে হাসি আর ঝিলমিল খুশির মধ্যে ওসব দাম-টামের কথা তখন মনেও থাকে না ছাই।

তা সে না হয় হল। রাত হলেই কিন্তু বুড়োর মন চলে যায় অন্য রাজ্যে। তখন আর তার আলো-আঁধার শব্দ-স্তব্ধ ভর্তি-ফাঁকা গড়া-আঁকা কিচ্ছু খেয়াল থাকে না। কোথায় আছে সেই রূপের কাটি সোনার কাটি ভুবনডাঙার পাবন মাটি সেই কথা ভ'বতে ভাবতে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ে গভীর ঘুমে। স্বপ্ন দেখে কি দেখে না, উঠলে আর মনে থাকে না। কি স্তু উঠলেই মনে হয়, ঐ য্ যা ভেঙে গেল। মনটা ভারি হয়ে যায়, কাজের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কাঁটার মতো কি যেন খচখচ করে। প্রথম পুতুলটা একবার গড়ে একবার ভেঙে আবার করে গড়তে অনেকখানি সময় লাগে।

এই রকম রোজ রোজ।

এইভাবে দিন যায়।

একদিন পুতুল গড়তে বসে বুড়ো ভাবলে, ধুত্তোরি ছাই, রোজই তো সেই—

আলতাপাটি হাতপা-তলা দাঁড়া বসা দেব্‌দেবতা
কিম্বা মানুষ লম্বা বেঁটে নাকচোখালো খ্যাঁদা ভোঁতা
জামতলাতে ছপণ কড়ি গুণতে-থাকা বুড়ি
ছয়বেহারা পালকি ডুলি, ছিঁচকাঁদুনে খুড়ি
সাপের ঝাঁপি সাপ সাপুড়ে ফুলনবাঁশি
কুড়ুল দড়ি কাঠ কাঠুরে ভুলন-হাসি
মস্ত পেখম বেশ-তো-ঝুঁটি ময়ূর
দুহাত তুলে নাচছে নিতাই-গৌর
রাখালছেলে কানাইবলাই
বেণু বাজাই ধেনু চরাই
ঢাউস ময়ূরপঙ্খী না'
দাঁড়ি মাঝির আদুড় গা
চালতা বনের বাদুড়
লেজের লাগাও লেজুড়
আতাগাছে তোতা
মুখখানা ভোঁতা

আয় চাঁদ টি
কিষাণের ঝি
ভরাভুঁড়ি
বুড়োবুড়ি
বাঘটা
কাগটা
মাছ
গাছ
মা
ছাঁ
হাঁ—

এই সব গড়ি। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। আজ গড়ব নতুন কিছু, অন্য কিছু। না পারলে গড়বই না।

গড়ব না তো গড়ব না, বেলা যায় গড়িয়ে, বুড়োর হাতের মাটি হাতে শুকোয়, রঙের বাটি চচ্চড় করে, বুড়োর আর পুতুল গড়া হয় না। রামায়ণের পুতুলমেলা দেখিয়ে পয়সা করবে বলে এক ব্যবসাদার মাস খানেক আগে বায়না দিয়ে গিয়েছিল, কাজ কেমন এগোচ্ছে দেখতে এসে সে তো হাঁ। ছেলেদের এক ব্যায়ামেব আখড়া থেকে যৌগিক আসনের পুতুল গড়ে দেওয়ার ফরমাস এসেছিল, কাজটা বুড়োর বেশ পছন্দও হয়েছিল, কিন্তু এখন কোথায় কি! হাত যেন সরে না, মন যেন নড়ে না, হাঁটুতে থুতনি গুঁজে বুড়ো খালি দাওয়ার ধারে চুপটি করে বসেই থাকে আর বসেই থাকে।

মাসখানেক এইভাবে যাওয়ার পর একদিন বুড়োর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই রে, সেই যে একরত্তি টিকলুমণি ঠোঁট ফুলিয়ে বলে গিয়েছিল,

রাজা নয়, রাজকন্যে নয়
হাতি নয় ঘোড়া নয়
চাইলুম একটা দেড়-আঙুলে
তাও দিলে না? আচ্ছা না-ই বা দিলে

আমি বাবার সঙ্গে পিসির বাড়ি যাচ্ছি, সেখান থেকে কিনে আনব, তখন দেখো—তার তো কিছু করা হলো না। বুড়ো তাড়াতাড়ি ঝেড়েফুড়ে উঠে একচামচা মাটি নিয়ে গড়তে বসে গেল টিকলুমণির দেড়-আঙুলে খোকা। একটু করে গড়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে আর বলে, উঁহু হয়নি। আবার ভাঙে আবার গড়ে। এমনি করে ভাঙতে গড়তে ভাঙতে গড়তে সাত দিনে তৈরি হল দেড়-আঙুলে পুতুল-খোকা। গড়া শেষ করে রং-টং দিয়ে তুলি বুলিয়ে চোখ দুটি এঁকে বুড়ো ভাবছে, কি যেন বাদ পড়ল, ভাবতে ভাবতেই উঠোনের কোণে কাপাস গাছের বীচি ফট করে ফেটে তুলো এসে পড়েছে দেড় আঙুলের মাথায়, আর কাজল-কুচকুচে ফলের গাছে একটি পাকা-টুসটুসে ফল থেকে টপ টপ করে কালো রস এসে পড়েছে সেই তুলোর উপর। দেখতে দেখতে দেড়-আঙুলে খোকার মাথায় ফরফর করে উড়তে লেগেছে তিন হাত লম্বা চুল। বুড়ো তাড়াতাড়ি সেই চুলে বিনুনি পাকিয়ে ভারি খুশিখুশি হয়ে শুতে গেছে। আর শুয়েই নিঝুম নিথর অথৈ নিতল ঘুম।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে বুড়ো দেখলে শরীর যেন পালকের মতো ফুরফুর করছে, মন যেন নাচে, আকাশ যেন অনেক অনেক অ-নে-কখানি কাছে। সেই দূরাকাশ নীলাকাশ, মহাকাশ যেন হয়ে গেছে পুজোবাড়ির উঠোনটুকু। কে যেন সেই উঠোন ঝাড়ফুড় দিয়ে পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করে এককোণে একটু আগুন জ্বাললে। দেখতে দেখতে আগুনটা গনগন করে উঠল, তার আঁচ গায়ের মায়ের ওমের মতো বুড়োর চোখেমুখে এসে লাগছে। পুবের পাড়ার জংলা ভিটের হাবুলের মা নিচুগলায় ডাক দিলে, 'ওরে অ হেবো, লাল সূয্যি দাদা হতে চলল, পাখিরা বাসা ছেড়ে কখন উড়ে গেছে, তোর কি ঘুম আজ ভাঙবে না রে?' সেকথা বুড়ো এখানে বসে দূর থেকে ভেসে আসা গানের আওয়াজের মতো স্পষ্ট শুনতে পেলে। বুড়ো বসে বসে দেখতে লাগল, ঘাসখুকুরা শিশিরের মালা পরে চিকমিক ঝিকমিক ফিকফিক করে হাসছে, এ ওর গলা ধরে, গাছের আর পাহাড়ের বুড়ী ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাখিরা হাওয়ারা মেঘের। লুকোচুরি খেলছে অন্তরিক্ষের ফাঁকা মাঠে। মাটিমায়ের সাধগুলি ইচ্ছাগুলি কল্পনাগুলি সব সূর্যের রঙে রেঙে বীজ গাছ ফুল ফল পোকা পাখি থল জল ঘর দোর মানুষ বাড়ি খেত খামার রাস্তা গাড়ি হয়ে ফুটে ফুটে উঠছে থাকছে মিলিয়ে যাচ্ছে। বুড়োর মনে হল, সবাই যেন তার চেনা, আপন, গলার ধুকধুকি, বুকের ধুকপুকি, রক্তের ছলছলানি, নিঃশ্বাসের ফিসফিসানি। এখন সে জলে ডুব দিলে ডুববে না, জল তাকে দোল দেবে। শূন্যে লাফ দিলে পড়বে না, শূন্য তাকে লুফে নেবে। আগুনে ঝাঁপ দিলে পুড়বে না, আগুন তাকে ঝেঁপে নেবে। বাঁশবাগানের শুকনো পাতায় পিঁপড়েদের চলার শব্দ সে শুনতে পাবে ঘরে বসে বসে। ধানীরং শাড়ি পার খেত্নী মেয়ের রূপ দেখবে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে। তার চোখ যেন এখন সব-দেখা চোখ, কান যেন সব-শোনা কান, হাত যেন সব-গড়া হাত...

পিসির বাড়ি থেকে ফিরে টিকলুমণি পুতুল দেখাতে এসে অবাক। একটু হেসে তার হাতে দেড়-আঙুলকে তুলে দিয়ে বুড়ো বললে, 'কী? পছন্দ?'

পরদিন থেকে বুড়ো আবার কাজে লেগে গেল। এখন বুড়োর হাতের মধ্যে মাটির তাল আপনা-আপনি নড়ে চড়ে পুতুল গড়ে। আঙুলগুলো তাদের ধরে আদর করে রাঙায় সাজায় অপরূপের বাজনা বাজায়। বুড়ো তাদের কাণ্ডকারখানা বিভোর হয়ে দেখে আর আশপাশের বাতাসের কানে ছড়া শোনায়—

চক্ষু দুটি কর্ণ দুটি
কার জাদুতে রাত পোয়ালেই রূপোর কাটি সোনার কাটি।
সূয্যিছোঁয়ায় আলতা-রাঙা
এই পৃথিবী ভুবনডাঙা।
তার বুকে পা দিয়ে হাঁটি
সেই তো আমার সবার চেয়ে আপনতম পাবন মাটি।
বিশ্বজোড়া খেলাঘরে
কোন সে বুড়োর বুড়োর বুড়ো আকাশ ভরে পুতুল গড়ে।
তারার পুতুল চাঁদের পুতুল
উল্কা পুতুল সূর্য পুতুল।
পৃথ্বী মেয়ে মাটির ঘরে
সে-সব নিয়ে খেলা করে।

মধ্যে-মধ্যে খেলা ছেড়ে
খুঁজে বেড়ায় কোথায় আছে মনের মতো
সাথ্‌-খেলুড়ে
জাত-খেলুড়ে।
না পেলে তার ভাল্‌ লাগে না।
খেলনাতে আর মন লাগে না।
তখন কত কলম-কালি
রঙের তুলি গল্প-ঝুলি
মনখারাপী রং মাখিয়ে
দেয় সে ফেলে হাত পাকিয়ে।
পৃথ্বিরাণীর মুখটি ভার
জগৎজোড়া অন্ধকার।
জগৎজোড়া অন্ধকারে
চাবি ঘোরায় কড়া নাড়ে ডাক দে, বেড়ায় দোরে দোরে
ও খেলুড়ে
অ খেলুড়ে—

ডাকতে ডাকতে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ একটি-দুটি দরজা খুলে যায়, ওমনি পাখি ডেকে ওঠে, গান গেয়ে ওঠে, আঁধারের বুকে ঝাঁপিয়ে নেমে আসে অফুরান আলোর ঝরঝর নির্ঝর। রাত ছাপিয়ে দিন ছাপিয়ে ঝরতে থাকে ঝরতে থাকে। সেই এক-একটি ঘরে ত্রিভুবন জড়ো হয়, খেলা শুরু হয়, খেলা চলতে থাকে চলতে থাকে।

বেজোড়
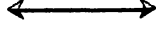
গৌরী আইয়ুব

আসানসোলের চিঠিখানা বালিশের তলায় রেখে চশমা খুললেন সতী। চশমাটি খাপে বন্ধ করে রেখে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন হাই তুলে। সারাটা জীবন বোঝা বয়ে বয়েই কাটলো, কখনো নিজের কখনো পরের কিন্তু আর কত পারা যায়—এখন বয়স তো হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের না আছে কাণ্ডজ্ঞান, না বিবেচনা। অপ্রসন্ন মুখে তাকিয়ে থাকেন গরাদের ডোরাকাটা চারকোণা ফ্যাকাশে আকাশটুকুর দিকে, রোজকার মতো ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে না আর আজ।

এই ছ-সাত মাস ছেলেদের আপিসের আর কলেজের ভাত নিয়ে যত কষ্টই হোক বুড়ো হাড়ে তাকে কষ্ট বলে মনে করেননি, নীলিমাকেও দোষ দেননি। মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি শুনে গেছে সেই মাঘের শেষে আর এখন ভাদ্র। মা মারা যাওয়ার পরও এই পাঁচ মাস ধরে নিজের ঘর-সংসার ফেলে বাপের দেখাশোনার নাম করে পড়ে আছে ওখানে। তার জন্যও অভিযোগ করেননি! বাপের সচ্ছল সংসারের সুখ মেয়েকে আটকে রেখেছে তা কি আর উনি বোঝেন না? কোনো কোনো শনিবার ছেলে চলে যায় আসানসোল, ফেরে সোমবার সকালে। বার-কয় সুভাষকে বলেছেন বটে সতী—

'তোর বৌদির আক্কেলটা একবার দেখ—মা আর কার চিরকাল বেঁচে থাকে? তাই বলে নিজের ঘর ফেলে রেখে বাপের সংসার আগলানো এমন তো কখনও শুনিনি।'

'দাদার যদি আপত্তি না হয় তো তোমার কিসের মাথা ব্যথা? আর বেশ তো আছ নির্ঝঞ্ঝাট—বৌদি ফিরলেই তো অষ্টপ্রহর আবার খিটিমিটি শুরু হবে।'

'ও—আমি বুঝি অষ্টপ্রহর খিটিমিটি শুরু করি!'

'তুমি কর কি বৌদি করে তার আমি কী জানি?—আমি তো দেখি দুজনে মিলেই কর আর বার বার নালিশ শুনতে পাই, 'দেখো তো ঠাকুরপো—দেখ্ তো সুভাষ, এই আর কি?'

অবশ্য নীলিমার এবার বাপের বাড়ি থাকাটা আর একদিক থেকেও ভালোই হয়েছে। বাপেরও দেখাশোনা করল মেয়ে, মেয়েরও এই বিশেষ সময়ে ভালো রকম আরাম যত্ন লাভ হল। প্রথম বারের মতো ঝক্কি সব তো একাই পুইয়েছেন সতী—বেয়ান চিররুগ্না, সেখানে কী ভরসায় পাঠাবেন? এবারও আসল ধকলটা ওর ওপর দিয়েই যাবে অবশ্য। সেটাই গতর দিয়ে খরচ দিয়ে সামলাতে তাঁর আর সময়ের শ্বাস উঠবে। তার ওপর কোন্ আক্কেলে এই সময়ে বাপকে নিয়ে আসছে নীলিমা? যাক গে, সতী রাগ করে কি বলবেন, রাগ করবেনই বা কোন্ অধিকারে? তিনি নীলিমার আশ্রিতা বৈ তো নয়। নিশ্চয়ই সময়ের সঙ্গে আগেই তলায় তলায় সব পরামর্শ হয়ে গেছে, এখন শেষমেষ চিঠি লিখে শাশুড়ী বুড়িকে ছুঁয়ে রাখা আর কী! মন সতীর অপ্রসন্ন হবে না কেন?

বাপ নাকি এবার এখন থেকেই আয়া রেখে দিয়েছেন, খুকির জন্যও কোনো ভাবনা থাকবে না তার, যে ক'দিন নীলিমা হাসপাতালে থাকবে আয়াই নাকি দেখাশোনা করতে পারবে মেয়ের। তারপরও দু'জনকেই আয়া সামলাতে পারবে—এক্সপার্ট আয়া! পারবে আবার না? ঐ যে বুড়ো হার্টের রুগী

এনে তুলছে সতীর মাথায় তাঁকেও বোধ হয় আয়াই দেখবে! আর এই তিনটে মাত্র ঘরে কোথায় থাকবে ওরা নিজেরা, কোথায় ওর বাপ, কোথায় দেওর আর শাশুড়ি! তার ওপর আবার থাকবে চব্বিশ ঘণ্টার আয়া! সতী আর ঘুমুতে পারেন না দুর্ভাবনায়। সুভাষের টেবিলে টাইমপিসে সাড়ে তিনটা। অবশ্য ঘড়িটা কোনদিন আধঘণ্টা, কোনদিন বা চল্লিশ মিনিট ফার্স্ট থাকে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে, পাখাটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে আর একবার শুলেন সতী। কী পচা গরম বাবা—আজ নিশ্চয় ঢল নামবে সন্ধে থেকে—ছেলে দুটো তার আগে ফিরলে হয়। দুটোরই সমান বারমুখো স্বভাব। নীলিমা কতদিন তাঁর সামনেই খোঁটা দিয়েছে তবু সময়ের অভাব যায়নি। ওখন তো মায়ের রাজত্বে দুজনেরই পোয়া বারো—অর্ধেক দিন বিকেলে চায়ের পাট নেই সতীর, সোজাসুজি রাত্তিরের রান্না চাপিয়ে দেন।

আজ শুক্কুর, ওরা আসবে বুধবারে। সব ঠিকঠাক আগে থেকেই—এখন শুধু দোষ কাটাতে শাশুড়ির মত চাওয়া! 'আপনার যদি বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ হয় মা, তাহলে অবশ্যই জানাবেন—বাবাকে নিয়ে আসব না। বাবা নিজে মোটেই যেতে চাইছেন না, আমি সাধাসাধি করে নিয়ে যাচ্ছি—বাবা এখানে একা থাকলে আমার ভাবনার শেষ থাকবে না এখন। তাই নিয়ে যেতে চাই। মা, আপনি অবশ্যই আপনার মতামত জানাবেন।'

আমার মতামত! বেশ তো তোমাদের মনোমত কথা দুছত্তর লিখে দেব। তোমাদের সংসার...আমিই হলাম গিয়ে বোঝা। আমার আবার মত নেওয়া?—অমন বাইরের ঠাট বজায় রাখবার জন্য ব্যস্ত নন সতী। সাতাশ বছর বয়সে তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হবার পর থেকে কম তো দেখেননি এই আরও সাতাশ-আটাশ বছরে। পাঁচজনের বেগার খাটার কপাল নিয়েই আসে না একেকটা মানুষ? সতীও তেমনি! ছেলে, মেয়ে, বৌ, ভাসুর, জা, ভাসুরপো, ভাসুরঝি—কত জনের না ঝামেলা পুইয়েছেন, এখন বাকি ছিল বেহাইয়ের পরিচর্যা করা। তাই বা বাকি থাকে কেন? বড়লোক বেহাই। সতীর মনটা বিরস হয়ে রইল ক'টা দিন।

'এলাম বেয়ান আপনাকে জ্বালাতে—'

'আমার আর কী জ্বালাবেন, নিজের রাজপ্রাসাদ ফেলে এসে কুঁড়ে ঘরে উঠেছেন।'

'রাজপ্রাসাদ যে শ্মশান হয়ে গেছে বেয়ান। বুড়িমাকে তাই এ্যাদ্দিন আটকে রেখেছিলাম। যখনই ফিরবার কথা তুলত তখনই যেন আমার হৃৎকম্প হতো। আমায় একা একা ওখানে ফেলে আসবে ভাবতে—'

'ফেলে আসবে কেন আপনাকে? ছেলেমেয়ে তো এই বুড়ো বয়সের জন্যই।...মানিক ফিরবে কবে?'

'মানিক তো ফিরতেই চায়, ওর মেমসাহেবের যে মন ওঠে না এদেশে—'

'ঐ তো জ্বালা।'

'সে তো জানতামই যে চাইবে না। কিন্তু তবু তো 'না' বলতে পারিনি ছেলের মুখ চেয়ে। ওদের সুখেই আমাদের সুখ কি বলেন বেয়ান? আমরা আর ক'দিন? আর এখানকার মেয়ে বিয়ে করলেই যে আমার বোঝা বইত তারই বা ঠিক কি? তখনও হিল্লী-দিল্লী কোন্ মুল্লুকে ছেলের চাকরি হোতো কে জানে?'

'তা বৈ কি? আপনার জল গরম হয়ে গেছে—যান, চান করে নিন গে। আমি যাই আপনার ঝোলটা নামিয়ে ফেলি—'

' গোড়া থেকেই বেশি আদর দেবেন না কিন্তু— শেষে হয়তো নড়তে চাইব না এখান থেকে।'

'কে আপনাকে নড়তে দিচ্ছে এখান থেকে, একি আপনার নিজের ঘর নয়?'—

ঝোলটা নামাতে নামাতে সতীর মনে নিজের মুখের কথাটাই ঘুরে ফিরে এল। যার জোরে জোর মানুষের সে জোর তো বেহাইয়ের অনেক বেশি। সেদিক থেকে যে এই সংসারেও তার অধিকার সতীর চেয়ে বেশি বৈ কম নয় সে কথা কি বেহাই বোঝেন না?

বাইরের বসবার ঘরেই খাট পেতে বিছানাপত্র, বৈ ওষুধ সব গুছিয়ে বস্লেন রমেশ নন্দী। প্রৌঢ়া নেপালী আয়া রাতে শোয় সতীর ঘরের মেঝেতেই। সুভাষ বেশি রাত পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে রাখলে আবার সে উঃ আঃ করে বিরক্তি জানায়। সুভাষ চটে মাকে বলে, 'মহারাণীকে বলো না বারান্দায় ওর শয্যা পাততে—'

সারাদিন বিনে মাইনের চাকরি করে এইটুকু লাভ সতীর যে বিছানায় গা ঠেকাতেই দু'চোখ বুজে আসে। এবং চোখ মেলেই উঠে 'দুগগা দুগগা' করে বালিশের তলায় দেশলাই হাতড়ান। ঐ সাতসকালে উঠে উনুনে আঁচ দিয়েও আপিসের ভাত, ডায়বেটিস আর হার্টের রুগীর পথ্য, তাছাড়া পোয়াতীর পছন্দসই এটা-সেটা সেরে নিজের নিরিমিষ হেঁসেলে হাত দিতে বেলা দুটো বেজে যায়।

এমনকি সমরও বিরক্তি প্রকাশ করে আজকাল, 'কী দরকার তোমার অত বাড়াবাড়ি করার মা? সকালে তাড়াহুড়োর সময়টা না হয় তুমি করলে, বাকিটা তো নীলিমাই করতে পারে।'

নীলিমা কিন্তু এগোয় না। সমর আপিস যাওয়ার আগে পর্যন্ত যা-ও রান্নাঘরে একটু ঘুরঘুর করে—কি আপিসের ভাতটা বেড়ে দেয়। ও বেরুতেই জলখাবার সামনে নিয়ে বাপের ঘরে বসে দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোশ গল্প চলে।

পথ্য হলেও যখন পঞ্চব্যঞ্জন সামনে সাজিয়ে দেন সতী রমেশ ভদ্রতা করে বলেন, 'আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন বুড়ির । একা হাতে এতসব করেছেন আপনি, আর ওকে কুটোগাছটিও নাড়তে বলেন না।'

মুখ ঘুরিয়ে যথাসম্ভব বিরক্তি চেপে সতী জবাব দেন, 'আমি খাব বলে কি ওর মাথার খুব কিছু বাকি রেখে পাঠিয়েছিলেন আপনারা?'

'তা বটে! মা ছিল কিনা ওর চিররুগ্না, হাতে ধরে কিছুই শেখানো হয়নি। ঝি-চাকরে চিরকাল সব করেছে—ওর দরকারও পড়েনি। কিন্তু আপনি কেন ওকে বসিয়ে রেখে একা একা হিমসিম খাচ্ছেন সকাল থেকে?'

সতী জবাব দেন না। কী জবাব দেবেন? বাপ যা দেখতে পাচ্ছেন মেয়ে কি তা দেখতে পায় না? কিংবা বাপ যা বলছেন মেয়ে কি তা শুনতে পাচ্ছেন না? না কি বাপের কথায় ও আরও প্রশ্রয় পাচ্ছে? 'ঝি-চাকরে চিরকাল সব করেছে।' এখন স্বামী যদি তিনটে ঝি-চাকর রাখতে না পারে তো শাশুড়ি বেটিই সই! দেড় মাসেই হাঁপ ধরে গেল সতীর। নেপালী আয়াটারও আবার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে কত যে বায়নাক্কা। একদিন সবাইকেই শুনিয়ে বললেন সতী, 'নীলিমা হাসপাতাল থেকে ফিরতেই এবার আমি বড়দির কাছে নবদ্বীপ যাব ছ'মাসের জন্য।'

কেউ-ই জবাব দিল না কিছু। নীলিমার কানে সে কথা গেল বলেই মনে হল না।

ভোর রাতে উঠে ট্যাক্সি করে ছেলে আর বৌ-এর সঙ্গে শিশুমঙ্গলে গেলেন সতী। সদ্য কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই দেখে আবার আপিসের ভাত নামাতে ছুটলেন বাড়ি। এগারোটায় নিজে ছটফট করে গেলেন খোঁজ করতে—ছেলে তো আপিসে। তখনও কিছু হয়নি। ফিরে এসে চান করে নিজের রান্না চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এমন সময় একটা মোড়া নিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন রমেশ। সকাল থেকে ছটফট করছেন।

'গতবার তো দূরে ছিলুম, বুঝতে পারিনি। সব ঝামেলা চুকিয়ে সুখবর পাঠিয়েছেন আপনারা।'

'ভাবনার কিছু নেই বেহাই। কোন রকম অস্বাভাবিক কিছু নেই ওর। তবু যতক্ষণ না চুকে যায় ততক্ষণ ভাবনা থাকে বটে।'

'আপনি যা করছেন ওর জন্য তা ওর মা-ও কোনোদিন করেনি—'

'আমি কি ওর মা নয়?'

রমেশ চুপ করে গেলেন। সতীর মনে হল লোকটিকে যতখানি দেমাকী আর আত্মমুখী মনে করেছেন এতদিন তা বোধ হয় নয়।

'আপনার ঘর-সংসার করা দেখে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে যাই বেয়ান। এইটুকু মানুষটি আপনি...সারাদিন দেখছি কিছু না কিছু করছেন। আমার গিন্নীকে কিনা দেখেছি চিরকাল শুয়ে আছেন; শরৎ চাটুজ্যে, রমেশ দত্ত নিয়ে। রোগে জর্জর হলে হবে কি। দেহ দেখে তো বোঝা যেত না, দুটি সমথ ঝি লাগত তুলতে...আপনার হাতে যে যত্ন পেলুম এ দুমাস, নিজের সংসারে তা কোনদিন পাইনি, জানেন?'

সতী উনুন থেকে চোখ দুটি তুলে সহানুভূতি ঢেলে দিলেন প্রায় সমবয়সী অথচ অকালবৃদ্ধ লোকটির মুখে। মনে মনে কেমন কুঁচকে গেলেন, তাঁর এতদিনের সেবায় হৃদয় দেননি বলে।

'আজ আপনি কি খেলেন না খেলেন দেখতে পাইনি—আয়াটা বা ঠিকমত গুছিয়ে দিল কিনা সব আপনাকে—হালপাতালে বসে মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিল।'—এখন সতীর মনে হল খচ্‌খচ্‌ করাই উচিত ছিল, আসলে কিন্তু ট্রামে যেতে যেতে ভেবেছিলেন, 'বেশ বুঝুন একবার রোজ কতখানি করতে হয় আমাকে এমন করে জামাইয়ের বাড়ি জামাই আদরে রাখতে।' সেই বিরক্তিটা কোথায় উবে গেল এখন মুহূর্তে!

'আমার জীবনে এত আদর-যত্ন সত্যি আমি কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

সতীর মনটা লজ্জায় নুয়ে গেল—আদর-যত্নে কোথায় ফাঁকি ছিল সত্যি কি তা রমেশের চোখে পড়েনি? চুপ করে বসে থেকে থেকে আবার ভাবলেন, কই মেয়ের সামনে তো এসে কোনদিন বলেননি এমন করে? কিন্তু এই নিভৃত স্বীকৃতিটুকুও বড় মধুর মনে বল সতীর। তবু অস্বস্তি কাটিয়ে উঠবার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন—

'কী-ই বা করতে পারলাম আপনার জন্য...কতটুকুই বা সামর্থ!...সে যাক্ আপনি একটু গড়িয়ে নিন গে। আমি এ-দিকটা গুছিয়ে নিই, ওবেলা আবার মেয়েকে দেকতে যাবেন তো?'

'যাব? নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'যাব বৈ কি? ট্যাক্সি আনিয়ে নেব ওদের গৌরাঙ্গকে দিয়ে। আয়া খুশিকে নিয়ে বসে বাড়ি আগলাবে।' মোড়া থেকে উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়লেন রমেশ।

'নাঃ একটু বসি; দেখি, আপনি কি খান। রোজ দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে ভাবি, আপনি আমাদের এটা-সেটা কতকিছু নিজের হাতে তুলে দিয়ে যত্ন করে খাওয়ান—অথচ আপনি কী খান না খান কেউ

দেখে না। বুড়িটাকে বলেছি কতদিন। ও বলে, মার কেমন অস্বস্তি হয় খাওয়ার সময় সামনে ঘুরঘুর করলে, তাই যাই না। সে কি একটা কথা হল? আমরা কিছুই শেখাতে পারিনি ওকে বেয়ান।'

সতী হেসে বললেন, 'ভাবছেন বুঝি ভালো ভালো যা কিছু সবই সরিয়ে রেখেছি নিজের জন্য—আর সব আজ ধরে ফেলবেন আপনি?'

'তা যদি ধরতে পারি তবে আর ভাবনা কিসের? তবে ভয় হচ্ছে ধরতে পারব না।'

সতী সসঙ্কোচে তাঁর সামান্য আয়োজন নিয়ে রমেশের সামনেই বসতে বাধ্য হলেন। অথচ সত্যি খারাপ লাগল না তাঁর। নানা কথায় সমস্তটা অস্বস্তি কাটিয়ে দিলেন রমেশ। কিন্তু কিছুই তার চোখ এড়ায়নি, 'কী যে খেলেন বেয়ান, শেষপাতে একটু দুধ পর্যন্ত নিলেন না কিছুই।'

'ওসব যে আমার আবার তেমন সয় না।'

'সয় না একটা কথা হল? সয় না বললেই শুনব? সওয়ালেই সয়। কী খাটুনিটাই খাটেন আপনি সারাদিন, ওটুকু নইলে চলে? সমরকে আজ বলতে হবে দেখছি।'

'আপনার মতলব ভালো নয় বেহাই। দুধ-দই খাইয়ে বেশিদিন খাটিয়ে নিতে চান এই তো? একটু যে দু'দিন বিছানায় পড়ে আরাম করব তা করতে দেবেন না।'

'আপনার কপালে এ জন্মে যে খুব আরাম লেখা আছে তো মনে হয় না আমার।'

সতী হেসে উঠে পড়লেন।

ষাট হয়নি, তবু কেমন নড়বড়ে হয়ে গেছেন রমেশ। ট্যাক্সি থেকে হাত ধরে নামাতে হল সতীকেই। কেমন যেন মায়া বেড়ে গেল অক্ষম মানুষটার ওপর। ভিজিটরদের ভিড় ঠেলে ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে হাঁপাতে লাগলেন রমেশ। 'নাঃ ভুল হয়ে গেল, না ভেবে-চিন্তে একে নিয়ে আসা' সতী আফসোস করতে লাগলেন মনে মনে। ক্যাবিনে এসে দেখেন নীলিমা নেই। খানিক বাদে স্টাফ নার্সের মুখে খবর পাওয়া গেল আধ ঘণ্টা আগে খোকা হয়েছে একটি—ভিজিটিং আওয়ারের ভিড় সরে গেলে তবে ওদের ক্যাবিনে নিয়ে আসবে। দুজনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সতীর মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

'যেমনটি চেয়েছিলাম, বিশ্বনাথ তেমনটিই দিয়েছেন।'

'আজ আমাদের একসঙ্গে স্ফূর্তি করার দিন বেয়ান।'

'আমার একটু বেশি—' চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিল সতীর।

'তা হোক আমারই বা কম কিসে?—'

'আপনার ছেলের ঘরের সাহেব নাতি থাকতে মেয়ের ঘরের কালো কালো নাতি কি মনে ধরবে?'

'সাহেব নাতিকে এ জন্মে চোখে দেখব বলে তো ভরসা হচ্ছে না। তার চেয়ে হাতের কাছে যা আছে তাই ভালো।'

সতীর মনটা কেমন ছলকে গেল। লোকটার সব থাকতেও যেন কিছুই নেই।

সুভাষ এল সাড়ে পাঁচটায়। ঘরে প্রত্যাশিত কিছু দেখতে না পেয়ে মায়ের মুখের দিখে তাকাতেই একগাল হেসে সতী বললেন, 'ভাইপো হয়েছে যে, যা বৌদির জন্যে গোলাপ ফুল নিয়ে আয় আর সন্দেশ। হয়তো আজ রাতে ওকে একটু খেতে দেবে। একটু বাদেই ওদের নীচে নিয়ে আসবে।'

সুভাষ ফুল আনতে চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই সমর এল। সতী বললেন, 'এবার কিন্তু আমি বিশ্বনাথ নাম রাখব, আপত্তি করবি না। অবশ্য শঙ্কর নামটা আরও ভালো।'

'ভোম্বলটা তার চেয়েও ভালো।' সমর উদাসীন ভঙ্গীতে মন্তব্য করল।

নব জাতককে অভ্যর্থনা জনিয়ে একই ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরল সবাই। সারাদিনের ছুটোছুটির পরও সতীর কেমন প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিল রান্নায়। সেকি শুধু নাতি হওয়ার আনন্দে? মাংস আনতে পাঠালেন সুভাষকে। সমর খবরের কাগজ নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল নিজের খাটে। খুশিকে কোলে করে বেয়াইয়ের ঘরে সসঙ্কোচে গেলেন সতী।

'একটু শুয়ে থাকুন আপনি, রান্না হয়ে গেলে ডাকব'খন আপনাকে— খুব ধকল গেছে আপনার ওপর দিয়ে আজ।'

'সেই ভোর রাত থেকে ছুটোছুটি করছেন আপনি, আর ধকলটা গেল বুঝি আমার ওপর দিয়ে? এখন আর শোব না এই ভর সন্ধ্যায়। তার চেয়ে বসুন না ঐ চেয়ারটায়, একটু গল্প করি।'

'আমার যে আবার রান্না রয়েছে—'

সে-সব আজ একটা দিন চালিয়ে দিক না আয়া।'

'দিচ্ছে অবশ্য। ডাল ভাত নামিয়েছে ও-ই। মাংসটা চাপিয়ে এসেছি। ওটা সময় নেবে একটু। বসি না হয় ততক্ষণ—'

মেজেতেই গুছিয়ে বসলেন সতী, খুশিকে ঘুম পাড়াবার জন্য। মা বাড়ি নেই বলে খুনখুন করছে। ঘামে ভেজা কপালে চুল এসে পড়েছে। কোঁকড়া নরম চুলগুলি কপাল থেকে সরিয়ে দিতে মনে পড়ল সবাই বলে খুশি চুল পেয়েছে ঠিক তার ঠাকুরমার মতো। মুখ-মাথা আঁচলে মুছে দিতে গিয়ে খুশির থুত্নির মাঝখানে চাপা টোল পড়া মতো অংশটুকু চোখে পড়ল; অমনি রমেশের দিকে চোখ তুললেন—হুবহু একরকম! রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন সতী।

'দেখুন বেহাই খুশির থুত্নির টোলটুকু একেবারে যেন উল্টো আপনার।'

বাকিটুকু কিন্তু ওর ঠাকুমার— নইলে কি অমন সুন্দরী হত?

সতীর হাসিমুখ নত হল। এমন কথা কতদিন কেউ বলেনি!

পাঁচজনের সংসারে তাঁর রূপ, তাঁর যৌবন সব কবে একটু একটু করে নিঃশেষ হয় এল সে কি তাঁর নিজেরই খেয়াল ছিল? খুশির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপন মনে ভাবলেন কী আশ্চর্য লীলা ভগবানের! সবাই বলে খুশির মুখে যেন ঠিক ওঁর মুখখানিই বসানো। সেই মুখে আবার বেয়াই-এর থুত্নির টোলটুকু ঠিক এসেছে! কেমন করে হয় এমনটা? হঠাৎ কেমন পুলকিত হয়ে উঠল ওঁর শরীরটা? কেমন করে ওঁরা দুজনে মিলে গেছেন ছোট্ট মুখখানায়?

সতী চুপ করে বসে রইলেন। রমেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললেন, 'এবার সংসার থেকে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে চলুন-না আসানসোল—আপনারও একটু হাওয়া বদল হবে, আমার তো সবটাই লাভ।'

আসানসোলের উল্লেখে মুহূর্তে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা সতী। আবার বুড়ো মেয়েকে নিয়ে ফিরে যেতে চায়, সোজাসুজি তা বলতে পারছে না—এ তারই ভণিতা। আসলে সতীর প্রয়োজন, কলকাতার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে— শুধু ভদ্রতা করে সতীর কথাটাও তোলা। মনটা তার বিরস হয়ে গেল। হয়ত সেই রসহীনতা তাঁর গলাতেও ফুটে উঠল।

'আমি আর কেন? আর আমার পায়ের বেড়ি তো আর অমন চট করে খুলে ফেলে চলে যাওয়া যায় না?'

'আপনার আবার বেড়ি কোথায় পায়ে? ইচ্ছে করলেই যেতে পারেন, ইচ্ছে নেই তাই বলুন... ওসব আপনার অজুহাত বেয়ান।'

রমেশের গলায় অভিমান শুনলেন যেন সতী? একটু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে

দেখতে চেষ্টা করলেন। টেবল ল্যাম্পের মস্ত বড় শেডখানা রমেশের মুখটি অস্পষ্ট করে রেখেছে। এবার মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলেন।

'আমিও গেলে ছেলেদের দেখবে কে? চাকর-বাকরের হাতে তো খেয়ে অভ্যেস নেই ওদের।'

'কেন নীলিমা?— পারবে না ওদের দেখাশোনা করতে?'

'নীলিমা?'—এবার অর্থটা স্পষ্ট হল সতীর কাছে। 'নীলিমা থাকবে এখানে হেঁসেলে সামলাতে আর উনি যাবেন বেয়াই বাড়ি বেড়াতে—এই কি রমেশ বোঝাতে চান?'

'সে কি হয়?'

'কেন হয় না? সুভাষের এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গেলে তো এখন লম্বা ছুটি তার। ওকে নিয়ে চলুন, দু-মাস ওখানে জিরিয়ে আসবেন। অবশ্য ওখানে গিয়েও পুরো ছুটি পাবেন না, মাঝে মাঝে আপনার হাতের সুক্তো আর ধোঁকার ডালনা আমার চাই-ই। আর ঐ যে পাঁচরকম সব্ব সবজি দিয়ে মুগের ডাল করেন ওটি আমার রাঁধুনিকে শিখিয়ে দিয়ে আসবেন। আমার গিন্নী আবার ওসব মোটেই জানতেন না... খোট্টার দেশে মানুষ হয়েছিলেন কি না ছেলেবেলায়।'

'আর কি দরকার পড়েছিল তাঁর জেনে? ভাগ্যবতী সিঁদুর মাথায় নিয়ে স্বর্গে গেছেন...ওঁর কী দায় ঠেকেছিল নিরিমিষ রান্না শিখতে শুনি?'

'সে যাই হোক্ আপনি চলুন... দেখবেন আপনার ফুল, বেলপাতা, তুলসী পাতার অভাব হবে না, নিজের হাতে বাগানের ফল পেড়ে দিতে পারবেন আপনার ঠাকুরকে—সন্ধেবেলায় বাগানে বসেই আপনার গল্প শুনব।—'

সতী আনন্দিত চিত্তে চুপ করে রইলেন। কলকাতার এই খাঁচা থেকে অমন সুখের মুক্তি কি সত্যি তাঁর হবে?— দু'মাসের জন্যও!—ভাবতেই খুশি হয়ে ওঠে মন।

'আমি তখন থেকেই ভাবছি বলব বলব—কেমন ভয় করছে, আরজি পেশ করতে না করতেই বুঝি আপনি না মঞ্জুর করে দেন।'

'কী যে বলেন বেয়াই—যাই, মাংসটা নামাই গিয়ে...কথায় কথায় এত রাত হয়ে গেল...আপনার আজ ওবেলাও ভালো করে খাওয়া হয়নি'—সতী দ্রুত পায়ে যেন উড়ে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে শুনলেন।

'সমরকে আমিই বলব বুঝিয়ে...তখন কিন্তু আবার না করতে পারবেন না আপনি।'

রমেশ আবছা অন্ধকার হতে গাঢ় অন্ধকারে তাঁর মিলিয়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, 'কী স্নিগ্ধ এই মানুষটি। সংসারটায় এখন অসমবয়সীর ভিড়, তাদের সঙ্গে না যায় দুটো কথা বলা, না যায় তাদের মন বোঝা। এমন সময়েই তো বেয়ানের মতো সমবয়সী একজনের দরকার—পাশে বসে কথা বললে মনে হবে না পিছিয়ে পড়েছি কিংবা অকেজো হয়ে পড়েছি সবার কাছে।'

আর একটু হলেই মাংসটা ধরে যেত। তবু তা নিয়ে বিচলিত হলেন না সতী, অভ্যস্ত হাতে চট্ করে ওটা নামিয়ে নিয়ে বেগুন ভাজার জন্য কড়া চাপিয়ে দিলেন। কেউ তাঁকে কোনদিন এত আগ্রহ করে কাছে ডেকেছে বলে তো মনে পড়েনা সতীর। তিনিই তো যেচে সেধে পড়ে থেকেছেন পরের সংসারে, প্রাণপ্রণ সেবা দিয়ে সেই আশ্রয়ের মূল্য চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আর আজ শুধুই সঙ্গ দেবার জন্য, কেবলই গল্প করবার জন্য এমন সাদর নেমন্তন্ন? সতীর প্রসন্ন মুখখানা আরও সুন্দর হয়ে উঠল? তাঁর গল্পের, তাঁর সঙ্গের এত দাম হল কবে থেকে?

রাত্রে তিনজনে একসাথে খেতে বসলে রমেশ গৌরচন্দ্রিকা ছাড়াই সোজাসুজি বললেন,—

'এবার বুড়িমা হাসপাতাল থেকে ফিরলে পরে তোমার মাকে কিন্তু একটু ছুটি দেবে সমর।'

শ্বশুরের ভারিক্কী গলার আদেশে একটু বিস্মিত হলেও মৃদুকণ্ঠে সমর জবাব দিল, ' বেশ তো।' তারপর মায়ের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করল। হঠাৎ আবার ছুটির কথা তুলবার মতো অপ্রিয় কিছু ঘটনা তো আজ ঘটেনি—বরং আজ তো মা-র সংসারের টান আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সতী ছেলের বিব্রত ভাবটা বুঝতে পেরে হেসে বেয়াই-কে বললেন—

'একি আমার পরের বাড়ির চাকরি যে ছুটি চাইব?'

'তা যদি হোত তবে তো ভাবনাই ছিল না। এক্ষুনি ইস্তফা দিতে বলতাম। যাক গে সে কথা। ছুটি বলতে না চান, বিশ্রাম বলুন। সুভাষ, তোমার পরীক্ষা হয়ে গেলেই এবার মাকে নিয়ে চল আমার সঙ্গে—তোমাদের দুজনেরই বিশ্রাম চাই।'

সুভাষও মৃদু হেসে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একবার ভুরু নাচালো। তারপর মাথা নীচু করে খেতে খেতেই বলল, 'মায়ের আবার এই বিরাট রাজত্বের চার্জ কাকে দিয়ে যাবেন সেই হল সমস্যা। এই বোতল বোতল আচার, আমসত্ত্ব কাসুন্দির তদারক করা কি বউদির কাজ? তা ছাড়া এই যত হাঁড়ি ভরা পুরানো আতপ চাল, চিনি কিংবা তেঁতুল জমানো রয়েছে সে সব পাহারা দেবে কে? জ্ঞানদা তো দুদিনে লুট করে নিয়ে যাবে মার রাজ্যপাট।'

'হাঁ গো হাঁ, মার রাজত্বি নিয়ে ঠাট্টা যতই কর অমন অল্প অল্প করে তুলে জমিয়ে না রাখলে চলে কখনও এই র‍্যাশানের কালে? যেই যা ফুরুলো, বলে দিলুম ' নেই' আর অমনি ছুটে এনে হাজির করলে তেমনি পাত্র কিনা তোমরা? গুছিয়ে রাখি বলেই সময়ে অসময়ে বিপদে পড়তে হয় না তোমাদের—'

'ওদের কথা বাদ দিন বেয়ান। আজকাল যে-সব ছেলেরা ঘর-সংসার করছে তাদের ক'জন জানে কত ধানে কত চাল? ওরা যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে আর কেবল নাই নাই, কেবল হাপিত্যেশ। নইলে আমারও তো কেউ আর কুবেরের ভাণ্ডার নিয়ে সংসারে ঢুকিনি। তিল কুড়িয়েই তাল হয়েছে ক্রমে...'

সুভাষ চট করে আর একবার মার দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে মাথা নামিয়ে নিল—যার অর্থ—'এবার আর তোমায় পায় কে?'

সুভাষ আর সমর গেল নীলিমাকে বাড়ি আনতে। কালো পাড়ে একটি গরদ হাতে রমেশ এসে বললেন,

'কাল সমরকে দিয়ে এটা আনালুম দেখুন তো বেয়ান পছন্দ হয় কিনা! নাতি কোলে নেবার জন্য একটু সেজেগুজে বসুন দেখি নইলে হয়তো নাতির আবার মনে ধরবে না। আজকালকার ছেলে তো?'—

সতী সলজ্জভাবে হাতে নিলেন গরদটি,

'এ আবার কেন বেয়াই? কত যে মিছিমিছি খরচ করতে পারেন আপনি সত্যি।'

'মনে হচ্ছে সময় থাকতে সৎকাজে খরচ করে না ফেললে শেষে ঠকতে হবে। বেশি কিছু যে সঙ্গে করে ওপারে নিয়ে যেতে দেবে তেমন তো মনে হয় না।'

'আপনার ঐ এক কথা হয়েছে মুখে—আমার সামনে ওকথা আর কখনো মুখে আনবেন না।'

'বেশ তো, তাতে করে যদি আটকায় শেষ যাত্রাটা তবে মন্দ কি? আমি কি আর তাতে অখুশি হব? কিন্তু বেশিদিন ওভাবে ঠেকানো যাবে বলে কি মনে হচ্ছে আপনার?'

সতী জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। রমেশ গলা তুলে বললেন, 'আমার কথা রাখুন বেয়ান, ঐটি আজ পরে নিন ওরা ফিরবার আগেই।'

বেলা দশটা নাগাদ ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই সতী ছুটে গেলেন বাইরে, রমেশও গেলেন পিছু পিছু, আয়া গিয়ে দাঁড়াল খুশিকে নিয়ে। নাতিকে কোলে নিতে নিতে সতী বললেন,

'এই দেখ বৌমা, পাছে ঠেঁটি পরে নাতিকে কোলে করলে পাড়ার লোকে আমায় আয়া মনে করে তাই বেয়াই আমায় আবার গরদ দিয়েছেন।'

'তাই বুঝি? বেশ তো—' নীলিমা সামান্য একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সবিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে তাকালো। রমেশ তা লক্ষ্য করলেন না, নাতির মাথাভরা চুলে দুটি আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সতী চট্ করে বাচ্চার মাথাটি সরিয়ে নিয়ে সহাস্যে বললেন,

'থাক্, অমন আলগোছে আদর চলবে না। চলুন... বসুন এসে ঘরে। দেখব তো কেমন নাতিকে কোলে করে সামলাতে পারেন।'

নীলিমা শাশুড়ি ও বাপের হাস্য-পরিহাসে যোগ না দিয়ে ক্লান্ত পা টেনে টেনে নিজের ঘরে চলে গেল। বাপের দিকেও আর তাকালো না। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে সমরও গেল ওর পিছনে! সুভাষ বয়ে নিয়ে গেল সামান্য কিছু কাপড়-চোপড় আর প্লাস্টিকের ঝুড়িখানা।

খানিক বাদে নাতি কোলে করে বারান্দায় বসলেন সতী, তেলের বাটি সামনে নিয়ে। ঊবুর উপর উপুড় করে ফেলে ছোট্ট পিঠটি ডলাই মলাই শুরু করছেন দেখে রমেশও এসে বসলেন মোড়ায়,

'আপনার নাতির রঙ মনে হয় খুকীর চেয়ে একটু চাপাই হবে—তাই না?'

'চেপে দিয়েছেন আপনিই—হোত আমার মতো...'

'সে আর বলতে? তবে কিনা নিজের মুখে নিজের বড়াই করতে নেই, ওটা যে আমাদের বলবার কথা—'

সতী সত্যিই লজ্জা পেলেন। বাবা ওর ঘরে গিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন না দেখে নীলিমাই বার হয়ে এল বারান্দায়,

'কেমন আছ বাবা? বুকের ধড়ফড়ানিটা কি কমেছে একটু আজকাল? সেদিন যে তুমি কোন্ বুদ্ধিতে হাসপাতালে গেলে... আমি শেষে ভেবে মরি।...'

সতী শুধু একটু মৃদু হাসলেন। রমেশ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ' বোস এখানে—তোর চোখের কোলে যে কালি পড়ে গেছে দেখছি। ঘুমুতে পারিসনি বুঝি এই ক'দিন?'

নীলিমা মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল শাশুড়ির পাশেই, একটু ঠেস দিয়ে বলল, 'নাতির বেলায় দেখছি মা-র অশৌচের বাছবিচার আর তেমন নেই।'

'সত্যি বলতে কি বেয়ান ক্রমে আধুনিকা হচ্ছেন—ওসব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলছেন এবার—'

'ঝেড়ে না ফেলে উপায়? কোথায় কলকাতার এইটুকু ফ্ল্যাটে আঁতুড়ঘর হবে— কোথায় বা কি। ষষ্ঠিটা বাদ দিলে নেহাৎ খুঁৎ-খুঁৎ করবে তাই ওটা—'

'তুমি কেমন আছ বললে না বাবা?'

'কেমন দেখছিস বল্ তো?'

'দেখে কি আর হার্টের খবর বোঝা যায়?'

'যায় না?— দেখছিস না বেশ ভালো আছি? বেয়ানের যা যত্ন ভালো না থেকে উপায় আছে?'

নীলিমা একটু শুকনো হাসি হাসলো। পরমুহূর্তেই যেন মুখটা একটু ভার হল। ছেলের রাঙা পায়ের তলায় আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল,

'যাক এতদিনে তাহলে স্বীকার করলে যে কলকাতারও গুণ আছে—অথচ, তখন রাজি করাতে, শুধু আমার মাথা খোঁড়া বাকি ছিল।'

'কুটুমবাড়ি আসবেন একটু সাধাসাধি করতে হবে বৈ কি মা, তাছাড়া মানী লোক তো—'

সতীর কথার ভঙ্গীতে ঠাট্টার ভাব মোটেই নেই। রমেশ হেসে বললেন, ' কেন মিথ্যে খোঁটা দিচ্ছেন আমায়? কুটুমের মতো ব্যবহার কিছু করেছি কি?'

'আসলে বাবার ভয় ছিল আমাদের এই পায়রা খোপের মতো বাড়িতে পা ফেলতে জায়গা পাবেন না, নিশ্বাস নেবার হাওয়া থাকবে না।'

'কী যে বলিস বুড়ি? তোরা সবাই যেখানে আছিস আমি সেখানে এসে থাকতে পারব না? রমেশ নন্দীর তেমন চালিয়াতি কখনও ছিল না—হবেও না।'

'এতে আবার অভ্যেস কিসের দরকার? ভালো খাওয়া-দাওয়া আর আদরযত্ন তো দুদিনেই অভ্যেস হয়ে যায়। বরং এখন গিয়ে ঐ শ্মশানপুরীতে একা একা থাকার অভ্যেসটাই নতুন করে করতে হবে।'—

এরপর স্বভাবতই কথা থেমে যায়। রমেশ উঠে যান চান করতে—নীলিমা উঠে গিয়ে বিছানায় শোয় একটু।

সেদিন সকালে ছেলেরা বেরিয়ে যাবার পর বাকি কুটনোটুকু নিয়ে বসেছিলেন সতী। রমেশ তেমনি মোড়ায় বসে গল্প করে চলেছেন মহা উৎসাহে—বাগানে কোন্ কোন্ ফলের কলম লাগিয়েছেন কবে, কোন্টায় ফলন কেমন ইত্যাদি। সতীর স্পষ্টতই ঐ গল্পে সমান উৎসাহ—প্রশ্ন করে করে তাঁর বাগান সম্বন্ধে গর্ব আরো বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া নিজের প্রথম জীবনের গ্রাম্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে তুলনামূলক মন্তব্য করে রমেশের নানা কৈশোর স্মৃতি জাগিয়ে তুলছিলেন।

নিজের ঘরে খাটের মাঝখানে ছেলে কোলে নিয়ে বসে নীলিমা দুজনের কথাবার্তা শুনে কেমন যেন একটা বিরক্তি বোধ করছিল। কী যে আজকাল হিজিবিজি গল্প করেন বাবা ঘন্টার পর ঘন্টা। যত মানুষ বুড়ো হয়, তত বোধহয় বক বক করা বেড়ে যায়। হাসপাতালে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত বাপের সঙ্গে বসে রোজ সকালে চা খাওয়ার যে আড্ডাটা জমত এখন সে কথা বাবার মনেও পড়ে না। বাবা নিজের ঘরে আজকাল আর থাকতেই চান না যেন মোটে—আর কী যত মেয়েলী গল্প অষ্টপ্রহর। বাবার সেই গাম্ভীর্য ও দূরত্বের অভাব মেয়ের চোখে মনে হল, কুটুমবাড়িতে নিজেকে খেলো কবা।

রাত্তিরে যখন খেতে বসেছেন তিনজনে সেদিনও, রমেশ সেই প্রসঙ্গটা আবার তুললেন,

'তোমার পরীক্ষা কবে শেষ হবে সুভাষ?'

'২৩শে নভেম্বর—যদি না ছেলেরা কোন পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয়—'

'তাহলে তো আর দেরি নেই—'

নীলিমা সামনেই বসেছিল গালে হাত দিয়ে। এখনও পরিবেশনের দায়িত্ব সে নেয়নি, কোমরে নাকি ভীষণ খোঁচা খোঁচা লাগে ঝুঁকতে গেলেই। তাই সামনে বসে থেকে খাওয়া-দাওয়া তদারক করে। রমেশ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,

এবার বুড়িমা তাড়াতাড়ি সেরে উঠে নিজের সংসার নিজের হাতে নিয়ে বেয়ানকে একটু ছুটি দাও।'

স্পষ্টতই নীলিমা অবাক হল, ভ্রূকুঞ্চিত করে বাপের মুখের দিকে তাকালো। সমরের যে এ প্রসঙ্গটা তাকে জানাবার কথা মনেও পড়েনি তা বোঝা গেল।

' মা বুঝি আবার নবদ্বীপ যাবার তাল তুলছেন?'

'নবদ্বীপ আবার যাবেন কি করতে?'

'আমার বাপু এখানেই নবদ্বীপ, এখানেই বৃন্দাবন যেখানে তোমরা—'

'ওসব নবদ্বীপ টবদ্বীপ নয়। আমি বেয়ানকে বলে কয়ে রাজি করেছি কিছুদিন আসানসোলে গিয়ে থাকতে—'

নীলিমার বিস্ময়ে এবার বিরাগের ছোঁয়া লাগল। তবু সে নির্বিকার মুখে চুপ করেই রইল। রমেশ কিন্তু থামলেন না।

'আর কতকাল বেয়ান এমন করে সামলাবেন বল? এবার তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও বুড়িমা।'

সতী পুত্রবধূর আঁধার মুখের দিখে তাকিয়ে প্রমাদ গুনলেন। ছেলেরা ব্যাপারটা উপভোগ করছে মনে হল—কিন্তু তাঁর উপভোগের অকথা রইল না। উনি আড়চোখে লক্ষ্য করলেন, নীলিমা ঠোঁট চেপেই চুপ করে আছে। কিন্তু রমেশ যেন আজ নাছোড়বান্দা, 'কি বলিস বুড়িমা? চুপ করে আছিস যে?'

'আমি আর কী বলব? তোমরা সবাই মিলে যা ঠিক করবে তাই যখন আমার দাসী-বাঁদীর মতো মেনে নিতে হবে তখন আর—'

মেয়ের গলার ঝাঁজটা রমেশের কানে বেখাপ ঠেকল, 'বলিস কি তুই? তোর সংসারে তুই যদি দাসী-বাঁদী মনে করিস নিজেকে তবে তো—'

মেয়ে তাকে কথা শেষ করতে দিল না।

'তা নয়তো কি? আজকালকার দিনে দাসী-বাঁদীরও শরীরের কথা ভাবতে হয় আমাদের। ইচ্ছেমত তারা ছুটি নেয়। সে যা হোক, আমার যখন সংসার তখন আমাকে তার বোঝা বইতে হবে বৈ কি—আমার শরীর যেমন থাকে থাকুক, তোমাদের কার কী এসে যায়—'

সতী মর্মাহত হয়ে নীলিমার দিকে এক পলক তাকিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলেন। হাসপাতাল থেকে ফিরেছে ও আজ তেত্রিশ দিন, আজ অবধি এক গেলাশ জল তাকে নিজে হাতে নিয়ে খেতে হয়নি। চারবেলা নিজের হাতে ভোগ সাজিয়ে দিচ্ছেন সতী, তা নিশ্চয়ই এ বাড়ির কারুরই চোখ এড়ায়নি। পরশু একাদশীর দিনেও বেলা দুটোর আগে ছুটি পাননি।

রমেশ মেয়ের মেজাজের গতিবিধি দেখে বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেলেন মনে হল। খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়ে গেল বাপের ঘরে। হেঁসেল তুলতে তুলতে চাপা গলায় ক্ষুব্ধ আলোচনা সতীর কানে আসছিল অস্পষ্ট। বুঝতে পারছিলেন তখনকার অসমাপ্ত বোঝাপড়াটা এখন সমাপ্ত করা হচ্ছে—কথা কানে না গেলেও ঝাঁজটা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

পরদিন রমেশকে একটু গম্ভীর আর বিমর্ষ দেখাল—নীলিমার চোখ রাঙা। বোঝা গেল কাল রাতে বাপের কাছে, স্বামীর কাছে অনেক দুঃখের বোঝা সে নামিয়েছে।

নিজের বাপকে সতীর মনে পড়ে না—স্বামীর মুখও ক্রমে আবছা হয়ে এসেছে। সতী ঠোঁটের তিক্ত হাসিটুকু যথাসম্ভব গোপন করে রান্নাঘরের দিকেই রইলেন বেশির ভাগ। বহুদিন থেকেই দুঃখে অপমানে অশান্তিতে রান্নাঘরটিই তার মস্ত বড় আশ্রয়। সেখানে তিনি আত্মগোপন করেন। সকালে রমেশ যতক্ষণ বারান্দায় বসে চা খেলেন, নীলিমা সারাক্ষণ মুখ ভার করে বসে রইল। তখন চুপ করে থেকে দুপুরবেলা কথাটা বললেন রমেশ, 'আর তো ভালো দেখাচ্ছে না বেয়ান। এবার লোকে বলতে শুরু করবে জামাইয়ের কাঁধে ভর করেছে বুড়ো।'

সতী ব্যথিত চোখে রমেশের মুখে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, 'লোকের বলায় কি আসে যায় যদি আপনার জামাই তা না মনে করে?'

'না, না জামাই আমার যে তেমন নয় সেকি আর আপনাকে বলে দিতে হবে? সে যাই হোব এবার ভাবছি—নিজের ঠাঁইয়ে ফিরে যাই—'

ফিরে যাওয়ার তাড়াটা রমেশের গলায় তেমন ফুটে ওঠেনি। আসলে সে তাড়াটা কার সে কী সতী বোঝেন না? জামাইয়ের বাড়ি আর বেশিদিন থাকাটা ভালো দেখায় না সেটা বুঝি মেয়েকেই জানিয়ে দিতে হয়! তা না হলে আর মেয়ে। সতী চুপ করে রইলেন—তাঁর আর কী বলার আছে?

'বুড়িটা বলছে ওর শরীর নাকি এখনও তেমন সারেনি, উঠে দাঁড়াতে একেক সময় মাথা ঘুরে যায়। যদি অনুমতি দেন ক'দিনের জন্য ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

এই অনুমতি পাবার জন্যও খুব একটা ব্যাকুলতা দেখালেন না সতী। নাকি অনিচ্ছাই শুনলেন রমেশের আবেদনে? তবু সতী ব্যস্ত হয়ে বললেন,—

'ওকি কথা বেয়াই? আপনার মেয়েকে আপনি নিয়ে যাবেন তার জন্য আবার অনুমতি কীসের?'

ক'দিন ধরে যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটির বাঁশি শুনছিলেন সতী হঠাৎ সেটা থেমে গেল। আসানসোলের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে মনটা তাকে আবার কলকাতার ফ্ল্যাটে বন্দী করা হল।

'বাঃ তা কি হয়? আপনার অনুমতি ছাড়া কি আপনার ছেলের বৌকে আমি নিয়ে যেতে পারি?' রমেশের গলার স্বর করুণ শোনালো।

'বেশ তো যদি একান্তই অনুমতির দরকার তবে দিলুম আমি অনুমতি।'

অনুমতি পেয়েও তেমন কিছু উৎফুল্ল দেখাল না রমেশকে।

আনমনে ভাতগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ঘরে-পাতা দইয়ের বাটিখানা আনতে উঠে গেলেন সতী। রমেশও উঠে পড়লেন সেইসঙ্গে। সতী ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলেন,—

'ওকি, এক্ষুণি উঠে পড়লেন যে বেয়াই?'

'নাঃ আর পারছি না। অনেকটা খাওয়া হয়ে গেছে। শরীরটাও তেমন জুত নেই আজ। কাল সারারাত ঘুম ভালো হয়নি।'

সতী পুত্রবধূর ঘরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে বোধ হয়।

আসানসোল যাবার আগের দিন নীলিমা সমরকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে। সুভাষ ফেরেনি—পরীক্ষা হয়ে গিয়ে ছেলে এখন আরো লাগাম ছাড়া হয়েছে। সতী তাঁর প্রতিসন্ধ্যার অভ্যস্ত জায়গাটুকুতে বসে বুটি বেলছিলেন। রমেশ ক'দিন পর আবার এসে সামনে বসলেন নিজের মোড়াটি টেনে নিয়ে,—

'একটু গল্প করি বেয়ান, কাল থেকে তো আবার মুখ বন্ধ—'

'তা কেন হবে? মেয়ে যাচ্ছে সঙ্গে—নাতি-নাতনিও যাবে—গল্প করবেন, খেলা করবেন—'

'মেয়ে কি আমার জন্য যাচ্ছে বেয়ান?'

'আপনার জন্যও যাচ্ছে। জানেন না তো ওখান থেকে প্রতিটি চিঠিতে আপনার জন্য দুশ্চিন্তা করত, লিখত, বাবাকে যে কি করে এখানে একা ফেলে যাব ভেবে পাচ্ছি না।'

রমেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেমানুষের মতো ঝুঁকে পড়ে চাকির পাশে ছড়িয়ে পড়া গুঁড়ো আটায় আঙুল দিয়ে এলোমেলো লাইন টানতে লাগলেন।

'এখনই যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? এত বারণ করলুম। কীসের এত তাড়া আপনার?'

'মেয়ে যে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কলকাতায় নাকি শরীর সারছে না ওর। ওখানে খোলামেলায় ক'দিন থাকলে হয়তো—' রমেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কথাটা আর শেষ করলেন না।

'আবার যখন নীলিমা ফিরবে আপনিও চলে আসবেন—আমি সমরকে বলে দেব।'

'ক'মাস পর আবার আসবার মতো ব্যবস্থা কি আমার থাকবে বেয়ান। থেকে থেকে এমন বুক ধড়ফড় করে আজকাল!'

'ও-সব কথা ভুলে যান তো—ওগুলো মনের অসুখ।'

'ভুলতে চাইলেই কী আর ভোলা যায়? আর কী করে ভুলব বলুন? সারাদিন নিজের অসুখের কথা ভাবা ছাড়া কি-ই বা করার আছে ওখানে?'

'নাতি-নাতনির সঙ্গে খেলা করবেন—নাতনিকে গল্প বলবেন'

'ও-সব সাজানো ছেলেখেলা আর ভালো লাগে না। আশেপাশে একটা সমবয়সী লোক নেই যে এসে কাছে বসে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলবে। শুধু বুড়ো মালিটা এসে বসে। এক কোপ মাটি কাটে আর আমার কাছে এসে বসে জিরোয়। ওকে ছাড়াই না—তবু তো একজন কাজ করার নাম করে এসে গল্প করে সকাল-বিকেল। জানি না ও আগে যাবে, না আমি—'

'ফের সেই কথা!' সতী ক্ষুব্ধ হয়ে বাধা দিলেন।

'অন্য কী ভাবব বলুন? আর কীসের যে অপেক্ষা করব তাও তো বুঝি না।'

সতী বুটি বেলা শেষ করে খানিকক্ষণ থেকেই উঠব উঠব করছিলেন—উঠতে পারছিলেন না গল্প ছেড়ে।

'এই ক'মাস যে কী আনন্দ পেলাম বেয়ান। তা বাকি ক'টা দিন আর ভুলব না।—'

'একটু আনন্দ দিতে আমাদের তো অসাধ নয় বেয়াই— থেকে যান না আরো ক'টা দিন।'

কাল থেকে সতী নিজেও কী নিঃসঙ্গ বোধ করলেন!

'আপনি কাল তো আমার ঘর উজাড় করে নিয়ে চললেন, তারপর আবার আমাকে দোষী করে যাচ্ছেন—'

'লোক দিয়েই কি শুধু ঘর ভরে ওঠে বেয়ান?'

'তবে?'

'তবে আর কী? তাছাড়া কোন্ লোকটা এই বুড়োর কাছে পড়ে থাকবে বলুন তো?'

'মেয়েই তো থাকবে—'

'মেয়ের বুঝি বন্ধু-বান্ধবের অভাব আছে ওখানে? হয় পাড়া বেড়াবে, নয় গাড়ি নিয়ে বেরুবে। কত হইচই, কত পিকনিক। আয়া তো আছেই—ভাবনা কীসের?'

সতী চুপ করে রইলেন। কে নালিশ জানাবে কার কাছে? দুজনেই চুপ—সতীর বাঁ হাতে বেলনটা ধরা—ডান হাতটা বুটির থালায় এক্ষুণি উঠে পড়বেন মনে হচ্ছে—কিন্তু উঠছেন না। অনেকক্ষণ থেকেই ঘরের অন্ধকার ছলকে ছলকে এসে পড়ে বারান্দায় গাঢ় হয়ে জমেছে। এবার আলো জ্বালানো দরকার।

'বড় ইচ্ছে ছিল আপনাকে নিয়ে যাব সঙ্গে করে—সকাল-সন্ধ্যা এমনি প্রাণ ভরে গল্প করব দুজনে?'

সতীর বুকটা হা হা করে উঠল। আ-হা এত বড় মান্যগণ্য লোকটার এইটুকু একটা ইচ্ছা! প্রসঙ্গটা

আর বাড়তে দিতে চান না বলেই সতী এবার উঠে পড়লেন হাঁটুতে ভর দিয়ে। বুটিগুলি রান্নাঘরে তুলে রেখে বারান্দায় আলো জ্বেলে দিয়ে দেখেন রমেশ ঠায় বসে আছেন নির্বিকার মুখে।

'কী হল বেয়াই?...আসুন রান্নাঘরের দোরগোড়ায় এবার মোড়াটা নিয়ে বসুন, আমি বুটি ক'টা সেঁকে নিই।'

রমেশ উঠতে গিয়ে কেমন দিশেহারার মতো বসে পড়লেন।

'ও কী অমন করছেন কেন?'

'পারছি না,—পা দুটো কেমন কাঁপছে —একটু ধরবেন আমায় বেয়ান?'

সতী তাড়াতাড়ি এসে হাত ধরলেন। সতীর বাঁ কনুই ধরে প্রায় ঝুলে পড়ে কোনমতে উঠলেন রমেশ।—উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে ডান হাতটি ধরে বললেন,—

'নাঃ আর ওখানে বসব না—আমায় না হয় ঘরেই নিয়ে চলুন—একটু শুয়ে থাকব—'

ঘরে নিয়ে গেলেন সতী। ভয়ে তাঁর নিজেরই হাত-পা হিম হয়ে গেল। হার্টের রুগী যে। ডাক্তারের জন্য পাঠাবেন নাকি?

শুইয়ে দিতে গিয়ে দেখেন, ঘেমে নেয়ে উঠেছেন রমেশ।

'জামাটা খুলে ফেলুন দিকি, আমি পাখাটা চালিয়ে দিই।'

'নাঃ থাক, এখন পারছি না' বলে কাত হয়ে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন রমেশ, দুহাতে সতীর হাতটি কিন্তু তেমনি আঁকড়ে ধরে রইলেন! অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে থেকে অস্ফুট গলায় বললেন,—

'সারা জীবনে এমন করে নির্ভর করবার মতো একটি মানুষ পাইনি বেয়ান।—আমি একটু ঘুমুই, আপনি কিন্তু চলে যাবেন না আমাকে একলা ফেলে।'

'নাঃ—না—সে কি হয়! আমি এখানেই আছি—আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন।'

সতী ডান হাতটি সমর্পণ করে অন্ধকারে বসে রইলেন। গরাদের ছায়া পড়ল মেঝেয়। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে।

বুটিগুলি হয়তো শুকিয়ে উঠল, উনুনটা বোধ হয় জ্বলে জ্বলে ধ্বসে পড়েছে। সতী সম্ভবত এই প্রথম এমন করে নিজের কাজ ভুলে বসে রইলেন বিমনা হয়ে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ অবধি যত্ন তো কম লোককে করেননি, কিন্তু সে যত্ন পাওয়ার জন্য এমন আকিঞ্চন আর দেখেননি। সতী জানালার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। একটিও তারা দেখা যায় না ওটুকু আকাশে।

কাল এই ঘর শূন্য হয়ে যাবে, রমেশ চলে যাবেন। না কি এখনই চলে গেলেন রমেশ? এমন নিস্পন্দ কেন? চিন্তাটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল সতীর। পর মুহূর্তেই ভুল বুঝতে পারলেন সতী। রমেশের সবটুকু প্রাণমন দুটি হাত হয়ে সতীর ডান হাতখানা আঁকড়ে ধরে আছে, তা কি তাঁর শিরায় শিরায় অনুভব করছেন না? কে কবে এমনভাবে নির্ভর করেছিল তাঁর ওপর?

আবার এসেছে আষাঢ়
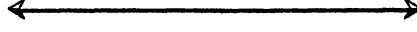
নবনীতা দেব সেন

"একি কাণ্ড! এ যে একেবারে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম বানিয়ে ফেলেছিস অমন দারুণ বৈঠকখানাকে?"—ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি থমকে দাঁড়ান। এই দৃষ্টিটাকেই রবীন্দ্রনাথ বোধহয় বলেছেন 'নিমেষহত'। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চোখ বুলোতে থাকেন ঘরময়। দৃষ্টিটা যেন পুলিশ সার্জেন্টের হাতের টর্চলাইটের মতো থেমে প্রত্যেকটা জিনিস চেঁছেপুছে স্পর্শ করে যায়—আজ লজ্জায় আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত (সংস্কৃতে বলে পা থেকে মাথা) ভারি হয়ে উঠতে থাকে। দাদামণির নজর ফলো করে আমিও ঘরটা নতুন চোখে দেখছি। ঝকঝকে ইতালীয় মার্বেল পাথরের মেঝে। কালো মার্বেল আর মাদার অব পার্ল বসিয়ে বর্ডার দেওয়া।—সেই মেঝের ওপরে থাকার কথা সোফা-কৌচ-কার্পেটের—সাধারণত এ ঘরে তারাই থাকে—কিন্তু এখন আছে? (১) একগাদা লেপ-তোশক, বেডকভারে পুঁটুলি বাঁধা—পুঁটলির ফাঁক দিয়ে ময়লা মশারি উপছে পড়ছে বাইরে। (২) তিনটি বিশাল পুঁটলিতে বহু বাতিল হওয়া জামাকাপড় মাদার টেরিজা রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের জন্য রাখা। (৩) সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা খুলে ফেলে তার ন্যাড়া ড্রয়ারগুলো পাশাপাশি দাঁড় করানো। তার ওপরে কিছু তাকিয়া, কুশন, আর ছ'-সাতটা বক্স ফাইল। টেবিলের মাথাটা বইয়ের তাকের গায়ে হেলানো দেওয়া। তার ওপরে একটা শার্ট ঝুলছে। শার্টের ওপরে বেড়ালটা ঘুমোচ্ছে আরামে। (৪) মেঝেয় একটা বিরাট বারকোশের ওপরে কয়েকটা তেল রঙের টিন, তার্পিন তেলে ভেজানো বুরুশ, বোতল, শিরিষ কাগজ, পুটিং-এর তাল। (৫) চতুর্দিকে সাত-আটটা প্লাস্টিকের শপিং ব্যাগে ভরা দরকারী কাগজপত্র, খেলনাপাতি, চিঠিপত্র, ফটো। (৬) একধামা শিশিবোতল (খালি)। (৭) একধামা সাদা গম। (৮) একটা বিশাল লিটারের বৈয়ামে কেরোসিন। (৯) যে খাটের গদি, সেই খাটটির কাঠের অংশগুলি খুলে উল্টো দিকের দেয়ালে হেলানো। তা থেকে ভিজে তোয়ালে ঝুলছে। (১১) মেঝের ওপরে হার্মোনিয়ামের বাক্স। তার ওপরে টিভি। তার ওপরে একটি কাঁচের বাটির মধ্যে দুটো তাজা বেলফুলের গোড়ে মালা সুরভি ছড়াচ্ছে। (১২) একটি কার্পেটের ওপরে রাণীর মতো সগৌরবে অচল টেলিফোন এবং তার পদতলে মোসাহেবের মতো ভুটানী সারমেয়ী কুতুল বসে আছে। কার্পেটটা আবার উলটো পাতা। (১৩) বাইরের তাক কিছু খালি করা হয়েছে— মেঝেয় বাইরের স্তূপ তারই ওপরে ইতস্ততঃ যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব সেন, দেবীপ্রসাদেরা শুয়ে আছেন, অজস্র রেকর্ড দ্বারা পরিবৃত হয়ে। (১৪) দুটি বিরাট স্টিরিও স্পিকার মেঝের ওপরে পাশাপাশি রাখা। তার ওপরে কিছু শূন্য চায়ের কাপ ও জলের বোতল। একপাশে অযত্নে পড়ে আছে তার রেকর্ড চেঞ্জারটা—তবে ওপরে দুটি আম। এক প্লেট ঝুরিভাজা।

—ছি! ছি! ছি!—দাদামণির ক্ষোভে.দুঃখে বাক রোধ হয়ে যায়। "করছিস কি ! এ যে বন্যার্তদের শিবির!" হাতের ছাতাটা দিয়ে মেঝের কোণটা দেখালেন, যেমন ডেমনস্ট্রেটররা দেখায় ছড়ি দিয়ে—"এসব কী? ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়ার পাট কি তুলে দিয়েছিস?"'

ঘরভর্তি কুতুলের লোমের সাদা সাদা বল উড়ছে। যত্রতত্র চুনবালি। দেওয়াল ও ছাদ থেকে খসে পড়া। ঝুলের টুকরো ইতিউতি উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির মতো, পাখার বাতাসে ডানা মেলে।

—"ইস্‌স চোখে না দেখলে, বিশ্বাস হতো না যে এ ঘরটার এই মূর্তি করা যায়। করা সম্ভব!" লজ্জায় মাথা ঝুলিয়ে বসে আছি।

—"নাঃ, তুই আর ভদ্দরলোক হলি না, খুকু। সংসারী জীব আর হলি না। দেখেছিলি, খবরের কাগজে বেগম অব আউধের ছবি? কেমন গুছিয়ে রাণীর মতোই সংসার করছেন নিউ দিল্লির প্ল্যাটফর্মে? বেয়ারা, বাবুর্চি, ছেলে-মেয়ে, ৬টা শিকারী কুকুর, ফুলের টব, পার্সিয়ান কার্পেট, চাইনিজ ভাস, সব সমেত। যে রাণী হয় সে প্ল্যাটফর্মকেও প্রাসাদতুল্য করে নিতে জানে। আর যে স্বভাব-ভিখিরী সে প্রাসাদকেও প্ল্যাটফর্মে বানিয়ে ফেলে। ছোঃ।"

প্রথমে দাদামণির লেকচারটি হজম করি। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠি।

—"দেখতে পাচ্ছো না? বাড়িতে মিস্ত্রী লেগেছে? ঘরে সোফা কৌচ নেই, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, স্টাডি, সব ঘরের জিনিস এই ঘরে জড়ো করা? সবকিছু মেঝেতে নামানো? খাট টেবিল সবই খোলা? সবকিছু পুঁটলি বাঁধা? এমনিভাবে বুঝি আমি থাকি? এই একটি ঘরই নেয়নি—বাকি সবগুলো ঘরই যে মিস্ত্রীরা নিয়ে নিয়েছে। গুছিয়ে রাখবই বা কী করে, রেখেই বা কী হবে? আবার সে তুলতে হবে যথাস্থানে? এটা তো টেমপোরারি—"

—"নিয়ে নিয়েছে? নেবে কেন? কেন নেবে? তুমি দেবে তো তবে নেবে। তুমি দিলে কেন?"

—"ওরা সব ঘরে কাজ শুরু করে দিলে একসঙ্গে।"

—"বলি, একসঙ্গে সব ঘরে মিস্ত্রী লাগানোর কথা কে কবে শুনেছে? তুই দিয়েছিস কেন ঢুকিয়ে? একখানা ঘর করবে, সব শেষ করে সাজিয়ে দেবে, তারপর আরেকখানা ঘর। এ আবার কেমন ধারা কাজের ছিরি?"

—"আমি কী করব? রহমানকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছি। সে যেমনভাবে করবে তেমনিভাবে হচ্ছে তো। সে একসঙ্গে দু-তিনটে ঘব করছে। আমরা আর সাজিয়ে তুলতে সময় পাচ্ছি না। একে একে সবাই এই বড় ঘরে এসে জমছে। ভাঁড়ার ঘর, শোবার ঘরগুলো, স্টাডি, সবই বেএক্তার হয়ে আছে যে।"

—"শোবার ঘব সব ক'টায় কাজ হচ্ছে?"

—"কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সব আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো। ও ঘরগুলোতে শোয়া যাচ্ছে না। এ-ঘরে আলো পাখা ঠিক আছে।"

—"আলো পাখা নষ্ট হয়ে গেছে তো? কেন গেল?"

—"বলতে পারি না। হয়েছে এটুকু জানি। রহমান বলছে রাশের টানে অমন হয়েই থাকে?"

—"মোটেই হয়ে থাকে না। তোমাকেও পেয়েছে গাধা। তোদের ইলেকট্রিক মিস্ত্রী নেই?"

—"এনেছিলাম। সে বলল ঘড়াঞ্চি ছাড়া পাখা সারবে না। ঘড়াঞ্চি ওর কাছে নেই—অন্যত্র কাজ হচ্ছে। সেখানে আছে।"

—"ঘড়াঞ্চিওয়ালা আর কোনো মিস্ত্রী নেই পাড়ায়?"

—"নাঃ, আর অন্যরা সব মইওয়ালা পার্টি। মইতে হবে না!"

—"তা শুচ্ছিস কোথায়? এ ঘরেই? খাট তো খোলা। এই মেঝের গদিতে তো একজন মাত্র—বড়জোর দু'জন—"

—"ঐ ফোলডিং খাটে আরেকজন। আর মাদুরের ওপর ডানলোপিলো পেতে আরেকজন, ঐ কর্নারে। ভাগ্যিস ঘরটা বড় ছিল।"

—"এই ঝুলকালি-চুনবালির মধ্যে মাটিতে শুস কী করে? ঝাঁটপাট বন্ধ কেন? ঝ্যাঁটা নেই তোদের?"

—ঝাঁ্যাটা থাকবে না কেন? ঝি নেই। কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

—"দেবে না? ঘরদোরের যা ছিরি। থাকলে ও তো পাগল হয়ে যাবে।"

—"সে বলেছে মিস্ত্রী না বেরুলে সে আর ঢুকবে না। তাই নিয়মিত সাফাই হচ্ছে না। ওই মজুরদেরই দুটো করে টাকা দিয়ে ঘরটর মুছিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু রোজা করছে বলে ওরা বেশি খাটতে-চায় না। কাল মোছেনি। কাল আগে আগে চলে গেছে। আজকে ঈদ কিনা। আর্জ ওরা ছুটি করেছে।"

—"আজ ঈদ, প্লাস রথ। কোথাও না কোথাও কেলেঙ্কারি হবেই মনে হচ্ছে। দু-চারটে ভালো রকম হাঙ্গামার স্টোরি আজ না হলেই নয়।" ঘরের সুদূর কোণে একমাত্র চেয়ারটি দখল করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দীপু এতক্ষণে পরিতৃপ্ত সুরে কথাটা বলল, পায়ের কাছে মেঝে ভর্তি সিগারেটের ছাই, দেশলাই কাঠি, পোড়া সিগারেটের টুকরো, শূন্য প্যাকেট। হাত খানেক দূরেই শূন্য অ্যাশট্রেটি ঝকঝকে হাসছে। দাদামণি দেখলেন। এবং হুঙ্কার ছাড়লেন।

—"ওঠ ব্যাটা হিপ্পি। তোল সিগারেটের টুকরো। কেন, ঐ অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে পারো না? পাশেই রয়েছে?'

জগতে সবই নশ্বর, ছাইই বা কী, ছাইদানিই বা কী—এমনি একখানা মুখের ভাব করে দীপু পা দিয়ে ঠুকরোগুলো একত্র করতে থাকে। দেখে দাদামণি খুশি হন। তারপরেই ভুরু কুঁচকে যায়। কান খাড়া করে শুনতে থাকেন। কোথায় একটা ঘস ঘস ঘস ঘস শব্দ হচ্ছে। অনন্ত।

—"ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাও তো মন্দ দিসনি? ও কিসের শব্দ?"

—"পালিশ মিস্ত্রী। বাথরুমের পাথর পালিশ করছে।"

—"পা-লিশ?" দাদামণি হেসে ফেলল। "বাড়ির তো এই অবস্থা, এর মধ্যে পালিশ?"

—"না না, বাথরুম রিপেয়ারিং পেন্টিং কমপ্লিট। পালিশ হলেই এর ঘর শেষ। পঞ্জু এসেছে, ওর তো ঈদ নেই।"

এমনি সময়ে, ঠিক মাথার ওপরে অকস্মাৎ ঠঠাং ঠঠাং করে একটা বিরাট শব্দ শুরু হয়। প্রচণ্ড শব্দ। বাড়ি কাঁপে।

—"ও বাবা!" দাদামণিও দৃশ্যত কেঁপে ওঠেন। "ওটা আবার কীরে? কী পেটাচ্ছে ওটা? লোহার কিছু?"

—"ও কিছু না। ট্যাঙ্কটা ভাঙছে বোধহয়।"

—"ও কিছু না? ট্যাঙ্কটা ভাঙছে বোধহয়? কিসের ট্যাঙ্ক? কে ভাঙছে? কার হুকুমে ভাঙছে?" দাদামণি ক্ষিপ্তপ্রায়।

—"মানে ঐ জলের বড় ট্যাঙ্কটা খুব পুরনো হয়ে ফুটো ফুটো হয়ে গিয়েছিল তো? ওটা বদল করেছি। এক পুরনো লোহাওলা সেটা কিনেছে। সেই এসেছে ট্যাঙ্কটা কেটে টুকরো করে নিয়ে যাবে বলে।"

—"ওহ্। তাই বল। যাই বলিস খুকু বাড়িটাকে সত্যি সত্যি ইস্টিশানে পরিণত করেছিস। ভদ্দরলোকে থাকতে পারে এরকম শব্দের মধ্যে? কাকিমাকে কি ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছিস ভেবে দেখেছিস? ভাগ্যিস আর নিচে নামতে পারেন না—এ ঘরটা দেখলেই সিওর হার্টফেল, কিংবা সেরিব্রাল। ওই বীভৎস আওয়াজেও আয়ুক্ষয় হচ্ছেই—সাউন্ড পলিউশান একেই বলে—" বলতে বলতেই চোখ পড়ল ঘরের আর এক কোণে—"অ্যাঁ! যামিনী রায়, সুনীলমাধব—সব মাটিতে ফেলে রেখেছিস? তোল তোল, তুলে রাখ—কাকাবাবুর যত্নের এসব জিনিস তুই ধ্বংস না করে ছাড়বি না দেখছি"

বলতে বলতে নিজেই তুলতে শুরু করেন ছবিগুলো। "জানিস, আমেরিকায় এ ছবির এখন কত দাম?" তার পাশেই একটা তেতলা রথ—কাগজের শেকলের মালায় অর্ধসজ্জিত। বাকী শেকল, কাঁচি, আঠা, রঙিন কাগজ সমেত ভূলুণ্ঠিত। কারিগরগণ বোধহয় অন্য কোনো দুষ্কর্মের টানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন আপাতত। মোমবাতি, কাঁসর প্রস্তুত।—"ওঃ, আজ রথ। বৃষ্টি হবেই। আকাশও সেজে আসছে। আমি ঘরেই আছি, বৃষ্টি নেমে গেলে মুস্কিল হবে। নে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখ—আমি চারটে-পাঁচটা নাগাদ ফিরে যেন সব টিপটাপ দেখি। ভালো করে চা খাওয়াবি তখন—" যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন দাদামণি। আজকাল দুর্গাপুরে বদলি হয়েছেন—এবার বেশ মাস তিনেক বাদে এলেন।

দাদাবাবু বেরুতেই ঝাঁটা ঝাড়ন নিয়ে লেগে পড়ি চুনবালি কুকুরের লোম সাফাইয়ে। গোপাল ঘোষ, যামিনী রায়দের তুলে রাখি স্টিরিও স্পীকার দুটোর মাথায়। কাপ-ডিশ বোতল-টোতল ট্রেতে করে সরিয়ে ফেলি। টুকরো টুকরোগুলো যথাসাধ্য তুলে ট্রে ভরে ভরে গুছিয়ে রাখি। জুতোটুতো সরিয়ে দিই। গমের ঝুড়ি আর কেরোসিনের টিন রান্নাঘরেই পাঠাতে হবে—তার আগে জানালাগুলো বন্ধ করি। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। দাদামণি না ভিজে যান। বাচ্চারা রথই বা টানবে কেমন করে? আমার পক্ষে অবিশ্যি ভালোই হলো বৃষ্টিটা হয়ে—জলছাদটা এত খরচ করে যে ফের পেটাতে হলো—পড়ার ঘরে জল পড়া বন্ধ হলো কিনা সেটার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে। পড়ার ঘরটা বৃষ্টির জলের চোটে অব্যবহার্য হয়ে গিয়েছিল। রহমান বলেছে তিরিশ বছরের মধ্যে জল পড়বে না, পড়ার ঘর এমনই রিপেয়ার করেছে।

জানালা-টানালা বন্ধ করে ফের নজর করে দেখলুম এত ঝাঁটপাট দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়েও ঘরটাকে থার্ডক্লাস ওয়েটিং রুম থেকে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমেও উন্নীত করা যায়নি। অতগুলো ধ্যাবড়া বড় বেডকভার জড়ানো পুঁটলি, মেঝে ভর্তি বই, খোলা খাট, খোলা টেবিল, খোলা স্টিরিও সিস্টেম দু'খানা ধামা, এসব যাবে কোথায়? হারমোনিয়ামের ওপর টিভি সেট। তার ওপরে গোড়ে মালা? যাকগে যাক। আর পারি না।

পুজোর লেখা সব বাকি। আজ মিস্ত্রী নেই—এই ফাঁকে কাগজ কলম নিয়ে মেঝের গদিতে উপুড় হই। একটা বড় গল্প আধখানা লেখা হয়ে পড়ে আছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কড়কড়াৎ বাজ পড়লো কোথায়। সীজনের প্রথম বড় বৃষ্টি। শব্দটা খুব ভালো লাগছে। ট্যাঙ্ক কাটা বন্ধ রেখে মিস্ত্রী নেমে গেছে নিচে। পঞ্চু অবিশ্যি ঘষে যাচ্ছে।—তার শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃষ্টির ঝমঝম। এই সময়ে এককাপ চা এলে হতো।

—"ঝর্ণা? এককাপ চা হবে নাকি ? ঝর্ণা?"

এই বাক্যের সোনার কাঠিতে হেঁটমুণ্ড দীপু প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেই চেঁচাতে শুরু করে—"ঝর্ণা। ঝর্ণা। চা। চা।" সিঁড়িতে ঝর্ণার মাথা দেখা যায়। একগাল হেসে বলে—

—"চা হবে না—আন্নাঘরে তুলকেলাম।"

"কেন?"

—"জল পড়তেচে গো, জল। আন্নাঘর জলে থৈ থৈ কত্তেচে—চাল আটা তেল চিনি সব ঘেঁটেঘুঁটে একাক্কার"—দুই হাত নেড়ে শূন্যে গ্লোবাকৃতি করে ঝর্ণা।

—"সেকি? কী করে হলো?"

—"কে জানে, কী করে হলো। আমরা তো জিনিস সরাতেই টাইম পাচ্ছিনি—এই বাটি বসাই

তো ঐখেনে জল পড়ে—ওখেনে জল পড়ে—ওখেনে থালা পাতি তো সেইখেনে ঝরঝর করে জল—আমরা খালি ছুটোছুটি করে থালাবাসন পাততিচি আর ঘর পুঁচতিচি—একেবারে বোকা বাইনে দেচে। এ্যাকোন চা-টা হবে না, আগে এট্টু সামাল দিয়েনি।”

—“তা সামাল আর দিচ্ছো কোথায়? দিচ্ছো তো লেকচার”—দীপু বলে।

—“মা তো বলেচে, আজ বিষ্টিতে খিজড়ি আন্না হবে? তাই ভগবানই আন্নাঘরে আবনা-আবনি খিজড়ি এঁধে একেচেন—দ্যাকো গে যাও”—

দীপু এবার বলে, “বাজে বোকো না—রান্নাঘরে আবার জল পড়বে কী করে? জল তো পড়ে পড়ার ঘরে।”

—“ সে ঘর তো শুকনো খটখট কত্তেচে— এ লোতন ফুটো গো—আগ্গে ছেলনি।”

—“জল পড়ছে তো চা করতে কী হয়েছে? আশ্চর্য।” দীপু আর একটা যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করে ঝর্ণার কাছে বকুনি খায়।

—“উদিকে নংকাকাণ্ড হচ্চে—বলে কিনা, কী হয়েছে। তুমি নিজেই চা করে দ্যাকো না?”

—“যা না দীপু, দ্যাখনা একবার ব্যাপারটা কী?”

—“যাচ্ছি, যাচ্ছি। বাব্বা। এককাপ চাও চাইবার উপায় নেই। অমনি অমন সংসারের একটা কাজ ধরিয়ে দেবে।” বলে দীপু টিভির ওপর পা তুলে দিলে—জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে—“ইস দিদি—বাইরেটো কী সুন্দর হয়েছে—” এবং উদাস গলায় গান ধরে—“মেঘছায়ে সজলবায়ে” ওপরে যাবার লক্ষণ দেখায় না।

সত্যি বাইরেটা ভারি মোহময় হয়েছে তো? সামনের কদম গাছটাতে বৃষ্টি যেন মণিমাণিক্যের মতো ঝকঝক করছে —মেঘমেদুর আবছা ঝাপসা আলোর মধ্যেও কী উজ্জ্বল ওর সবুজ রঙটা—কে বলে আমাদের কলকাতা মুমূর্ষু?

—“মা। মাগো। কী মজা। কী মজা। দেখবে এসো দিম্মার বারান্দায় নদী হয়েচে—”, নাচতে নাচতে টুম্পা এল। হাতে স্প্যানের মলাটে বানানো নৌকো।

—“নদীতে কত জল—ankledeep - এর চেয়েও বেশি, আমার প্রায় kneedeep জল—দিদি নৌকো ভাসাচ্ছে। এটা নিয়ে সাতটা হবে—দিম্মা বলেছেন সপ্তডিঙ্গা।”

—“ওগুলো সব গিয়ে নালীর মুখ বুজিয়ে দেয়—এত বৃষ্টির মধ্যে নৌকো তো ভাসবে না।”

—“এঁত বৃষ্টি কোথায়? কঁমে গেঁছে তোঁ? ভাঁসছে তোঁ—বলতে বলতে টুম্পা নৌকা সমেত পালায় তেতলায়। পরমুহূর্তেই তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শোনা যায়—”

—“মা। মা। দেখবে এসো—কী মজা। দিম্মার ঘরের মধ্যেও কি সুন্দর জল ঢুকছে —flood-এর মতন—”

তার পরেই মায়ের সেবিকা পুতুলের আর্তনাদ।

—“ও দিদি। ও কানাই । কী হবে? ঘরে যে জল ঢুকছে। ঝাঁটা, ঝাঁটা কোথায়?”

—“সমস্তই তোমাদের নৌকো ভাসানোর প্রতিফল।”

মূর্তিমতী অবসিকা হয়ে ব্যাঘ্রগর্জনে এবং ব্যাঘ্রঝম্পনে তেতলায় ধাবিত হই। এবং ঝাঁটা হস্তে জলভরা বারান্দায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। কানাই-ই বা অমন কাব্যিক বাক্যবন্ধনে বাস্তবায়িত করার সুযোগ ছাড়বে কেন? ঝাড়ুহাতে এল কানাই—সেও হাঁটু অবধি লুঙ্গি উঠিয়ে ঝাড়ু নিয়ে নেমে পড়ে টুম্পার নদীতে। দুজনে মিলে বুজে যাওয়া নর্দমার ঝাঁজরিকে আক্রমণ করি। এই মিস্ত্রী খেটেছে তো? চুনবালি

সব ঢুকেছে বোধহয়—একগাদা ভিজে কাগজের নৌকোর শব তোলা হয়—ম্লানমুখে পিকো-টুম্পা ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান—তাদের দিম্মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন—"সপ্তডিঙ্গা মাধুকরী ডুবেই থাকে দিদি—কিন্তু আবার ঠিক ভেসে উঠবে দেখো।" কিন্তু ওরা কিছুই শুনছে না। নর্দমার খনিগর্ভ থেকে কানাই একে একে শণের নুড়ো, দেশলাইকাঠি, ইঁটের কুচি, শুকনো ফুলের মালা—এই জাতীয় প্রচুর রত্নরাজি উদ্ধার করছে। আস্তে আস্তে জলটা দিব্যি নামতে শুরু করলো। আমিও ঝাঁটা ফেলে, নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরের 'তুলকালাম' পরিদর্শনে যাই।

ছাদের মাঝখান দিয়ে জল পড়ছে। মেঝেয় আমার একটা ধোয়া শাড়ি ব্লটিং পেপারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চারদিকে থরে থরে থালাবাটি কাপডিশ বিছোনো। তার মধ্যে বৃষ্টির জল ধরা হচ্ছে। আমার সাধের জাপানি ছাতাটি কায়দা করে মিটসেফের সঙ্গে আটকে, তার নিচে একা একাই বেধড়ক রাগারাগি করে মিস্ত্রীদের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বাটনা বাটছে ঝর্ণা। রান্না করবার টেবিলের তলায় গ্যাসরিংটি নামিয়ে তার নিচে সঙ্গোপনে রান্না চড়ানো হয়েছে। ভয়ে চায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে, নিঃশব্দে কেটে পড়াই মঙ্গল মনে করে পা টিপে টিপে সরে আসি—পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন। নিচে গিয়ে লেখাটা ধরতে হবে।

নিচে এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে পায়ে যেন জলের মতোই কী ঠেকলো। আরে, এঘরে আবার জল আসবে কী করে। বোতল ভাঙলো নাকি? নজর করে দেখি বড় খাটের পালিশ করা খোলা অংশগুলি ভিজিয়ে দাপটে জলস্রোত আসছে। কোথা থেকে আসছে? দুটো জানলাই তো বন্ধ? জানলার ওপর বইগুলো তো শুকনো? তবে তো জানলা দিয়ে নয়। ভাঙা কাচ-টাচ দিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না—তবে সদ্য কাচ সবই সারানো হয়েছে—তবে? ঐ তো জলটা ধেয়ে আসছে বইয়ের র‍্যাকের তলা দিয়ে কুলকুলিয়ে। কাপড়ের পুঁটলির গা বেয়ে। কার্পেট ভিজিয়ে কুতুল উঠে গদিতে চড়ে বসেছে—টেলিফোন উঠে সরে যেতে পারেনি, তাই ভিজে যাচ্ছে। সর্বনাশ। এত জল কোত্থেকে আসছে?

কুতুলটাও আশ্চর্য। সত্যি। উঠে গেছে, অথচ একটুও ঘেউ ঘেউ করেনি। করবেই বা কেন? জল তো চোর নয় ডাকাতও নয়, সে ঘরে ঢুকলে কুকুরকে চেঁচিয়ে তার জানান দিতে হবে? জল তো আউট অব সিলেবাস। কিন্তু একটু আগেও তো জলটল ছিল না? এই তো ওপরে গেছি বারান্দা সাফ করতে—এর মধ্যেই এত জল এল কী করে। বৃষ্টি তো কমেই গেছে। দীপুটাই বা কেমন? চুপচাপ এর মধ্যে বসে আছে? দেখছে না?

—"দীপু!" হাঁকটি ছাড়ি, প্রায় কাপালিকদের মতো। কিন্তু কোথায় দীপু? চেয়ার খালি। বাড়িতে চায়ের সুবিধা হবে না বুঝে তিনি নির্ঘাৎ পাড়ার দোকানে গেছেন। আশ্চর্য ছেলে। সংসারসুদ্ধু, চুলোয় যাক, তার দৃষ্টিপাত নেই। চা-সিগারেট হলেই হলো।

"পিকোলো টুম্পা কানাই ঝর্ণা পুতুল শিগগিরি নেমে আয়। শিগগিরি। নিচের বৈঠকখানা ভেসে গেল জলে—", আমি আমার সংসারের টোটাল ম্যান পাওয়ার ব্যবহার করতে চেষ্টা করি—প্রত্যেকটি মানুষকে মোবিলাইজ না করলে ও সংকটের মোচন অসাধ্য।

—"জল? বৈঠকখানায়? ও-স্মা। কী মজা।"

—"কই? কই? কই? সত্যি বলছ তো?"

মহোল্লাসে কলরোল করতে করতে দন্ত বিকশিত করে দুই কন্যা লাফাতে লাফাতে এসে পড়ে। ঠাস ঠাস করে দুই থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করল আমার। এটা যে সমূহ বিপদ, ওরা তা বুঝতে পারছে না? মজা পাচ্ছে? মেঝে ভর্তি আমাদের যাবতীয় ভূসম্পত্তি-বই, রেকর্ড ও অন্যান্য সবই যে মুহূর্তের

মধ্যে জলমগ্ন ও বিনষ্ট হবে। এই ঘরে যে বান ডেকেছে—ওরা কিছুই টের পাচ্ছে না—নির্বোধ শিশু কাঁহাকা। জলের উৎস সন্ধানে তার গতিপথ অনুসরণ করে পাশের ঘরে উপস্থিত হই—কাপড় ঢাকা খাট, কাপড় ঢাকা গডরেজ আলমারির মাঝখান দিয়ে বাঁশের ভারার তলা দিয়ে বিপুল ক্রমবর্ধমান জলরাশি খবরের কাগজ ঢাকা দেওয়া ট্রাংক স্যুটকেস ড্রেসিং টেবিলের তলা ভিজিয়ে ছুটে এসে আমার পদসেবা করে, সানন্দে আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। উৎস, নর্দমা। কোণের নর্দমাটি দিয়ে বাইরের রেনওয়াটার পাইপের প্রবল জলকল্লোল অনায়াসে দোতলার শয়নকক্ষে অনুপ্রবেশ করছে। মাথার ওপর তিনতলার বারান্দায় কানাই তখনও সিংহবিক্রমে ঝাঁটা নিয়ে জলযুদ্ধ চালাচ্ছে, তার সম্মার্জনী ঝংকার শুনতে পাচ্ছি।

মুহূর্তেই ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। যত জল আমরা ওপর থেকে ঠেলে দিচ্ছি, সব জল বেগে পালিয়ে এসে আমারই শোবার ঘরে শেলটার নিচ্ছে। কোনো বিশেষ কারণে জল একতলায় নামতে পারছে না। কি সর্বনাশ। প্রথমে ওপর থেকে জল নামা বুখতে হবে।

—"কানাই। ও কানাই। ঝাঁটা বন্ধ কর, ঝাঁটা বন্ধ কর"—বলতেই কানাইয়ের আরো জেদ চেপে গেল। সে তো নিচের সমস্যা জানে না? আমি যত চেঁচাই—"ঝাড়ু থামা"—ও তত বলে—"আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না দিদি, এই তো আর একটুখানি—জল সব সাবাড়'। তার রোখ চেপেছে, বারান্দা সে নির্জলা করবেই।

—"অ পুতুল। অ ঝর্ণা। প্লিজ কানাইকে থামাও। বারান্দার জল বারান্দাতেই থাকা ভালো, ও জল নাবিয়ে কাজ নেই—জলটা থাকুক, জলটা থাকুক, নর্দমা বুজিয়ে দাও—বরং নর্দমার মুখে ন্যাতা গুঁজে দাও—" শুনে কানাই ভাবলে দিদির মাথা খারাপ হয়েছে, সে আরো জোরে ঝাঁটা চালায়। নিজের কানকে অবিশ্বাস করে, পুতুল ও ঝর্ণা নিচে আসে এবং ব্যাপার দেখেই রান্নাঘরে দৌড়োয়—নাঃ, এ ন্যাতা-বালতির কেস নয়—এ কেলোর কীর্তি—ওয়ার ফুটিংয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে—যে যা পারে, থালা বাসন নিয়ে, বালতি ডেকচি নিয়ে হাজির। টুম্পা পিকো সমেত কাঁসি নিয়ে কড়া নিয়ে মেঝের জল ছেঁচে বালতি ডেকচিতে তোলা হতে লাগলো—কুতুল হঠাৎ জেগে উঠে ঘরে এত লোক এত হৈচৈ দেখে বেধড়ক চেঁচাতে শুরু করলে—হট্টগোল শুনে পালিশ মিস্ত্রি পঞ্চু ছুটে এল, এবং অবস্থা দেখে বললে জালিটা ভেঙে না ফেললে জল বের করা যাবে না। বলেই কোথা থেকে একটা লোহার রড এনে ঝাঁজরিটা ভাঙতে শুরু করে দিলে। আমি চেষ্টা করছি একবার গদিটা টেনে সরাবার—রেকর্ডগুলো ভাগ্যিস জলের যাত্রাপথে নেই—ঘরের অন্যপাশে আছে—একবার লেপ তোশকের পুঁটলিটা নড়াতে চেষ্টা করছি—করতে কিছুই পারছি না—পুতুল দুই হাতে ঝাঁটাটা ক্রিকেট ব্যাটের মতো বাগিয়ে ধরেছে—দু'হাতে জল পেটাচ্ছে, তার চেষ্টা জলটাকে বই আর গদির দিক থেকে সরিয়ে দরজার দিকে পাঠাবার—যে যার পজিশন নিয়ে নিয়েছি। ঝর্ণা দরজার কাছে, দীপুর একটি জীনস জিভছোলার মতো করে দু'টো পা দু'হাতে ধরে ছেঁচে ছেঁচে ঘরের সব জল নিয়ে সিঁড়িতে ফেলছে।

এতক্ষণে কানাইও নিচে এসেছে। এসেই আধোভিজে লেপ তোশকের গন্ধমাদনটা ও-ঘরেব খাটে তুলেছে। স্টিরিও স্পীকারদুটো গদির ওপর তুলেছে। ও ঘরে খাটের নিচ থেকে স্যুটকেসগুলো বের করে শুকনো জায়গায় রাখছে—আর বলছে—"য্যাতো ঢাকন সবই উপ্রে আর য্যাতো জল সবই নিচে—এ্যার বেলাইতি ছুটকেশ সব ভিজে গেল গাঃ।"

হঠাৎ জল ছেঁচা ফেলে টুম্পা কেঁদে উঠলো—"আমার রথ। আমার রথ একদম ভিজে গেল—ওমা! আমার রথ!" আর পিকো চেঁচাচ্ছে—"মা! মা! স্টিরিও! স্টিরিও!"

স্টিরিওর মা কী করবে? অতবড় জিনিসটাকে কানাই দুই হাতে তুলে, হঠাৎ লক্ষ্মণের ফলধরা অকথায় পড়ল—সেটাকে নামানোর জায়গা নেই—বিন্ধ্যপর্বতের মতো কুঁজো হয়ে অনন্ত অপেক্ষায় রয়ে যায় কানাই। প্রত্যেকেই আমরা চেঁচাচ্ছি, প্রত্যেক প্রত্যেককে নির্দেশ এবং উপদেশ দিচ্ছি একই সঙ্গে এবং মা ওপর থেকে অনবরত তাঁর ঘণ্টিটা এক নাগাড়ে বাজিয়েই চলেছেন পাগলা ঘণ্টার মতো, আর বলছেন—"ওরে—তোরা সবাই কোথায় গেলি? ওপরে কেউ নেই কেন? বারান্দায় যে এখনো অনেক জল রয়ে গেল।"

এদিকে দোতালায় তো প্রত্যেকের কাসাবিয়াংকার অকথা। কারুরই স্টেশন ছেড়ে নড়বার উপায় নেই—মা বেচারী কিছুই টের পাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একতলায় তিনটে অধৈর্য ডোরবেল বাজলো। কেউই সাড়া দিতে পারছে না। ও দিকে পঞ্চু ঝাঁজরি ভেঙে ফেলে সর্বনাশ করেছে। "ফুলিয়ে ফুলিয়ে ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে বিপুল রোষে"। বিনা বাধায় দ্বিগুণ বেগে ঘরে জলপ্রবেশ ঘটছে। আবার বেল। আবার! আবার! এবার ঝাঁটা হাতে পুতুল ও সান্কি হাতে পিকোলো উঁকি দিল। নিচে ধোপদুরস্ত দু'জন অধীর, অভিযোগনিরত ভদ্রলোক। আমাদেরই নিচের তলার বাসিন্দারা।

—"আমাদের ঘরে আপনাদের জল ঢুকছে। একটু যদি জলটা না সামলান, তবে—"

—"স্বচক্ষে দেখে যান জল সামলানো হচ্ছে কি হচ্ছে না—" ওপর থেকে উত্তর যায়।

তাঁরা স্বচক্ষে দেখতেই আসছিলেন, কিন্তু অত্যুৎসাহী ঝর্ণা অতো না বুঝে আরেক ক্ষেপ জল ঝাড়ে—এবং নায়াগ্রার মতো জলপ্রপাত হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে নেমে তাঁদের হাঁটু অবধি সিক্ত করে দেয়। দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে জল নেমে একতলার দরজার তলা দিয়ে ওঁদের ঘরে ঢুকছে। চৌকাঠ না থাকার কুফল।

—"দরজার নিচে দুটো বস্তা লাগিয়ে নিন।" এবারে আমিই চেঁচাই—"সিঁড়ির নিচে আছে।"

নিচের ভদ্রলোকরা যথার্থই ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান। মুহূর্তেই বুঝে নেন, এটা সংকটজনক মুহূর্ত—এবং সঙ্গে সঙ্গে রেসকিউ পার্টিতে যোগ দেন। অর্থাৎ দৌড়ে নিচে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বেরিয়ে রেনওয়াটার পাইপটি পরিদর্শনে লেগে যান। উপুড় হয়ে চিৎ হয়ে উঠোনে শুয়ে নানাভাবে নল খোঁচাখুঁচি করে তাঁদের ডায়াগানোসিস হলো—"নল তো জ্যাম। একেবারে অনেকদূর পর্যন্ত। একেবারে কংক্রিট হয়ে গেছে—মিস্ত্রিরা ভেতরে সিমেন্ট ফেলেছে নিশ্চয়ই—অতএব পাইপ ভর্তি হয়ে গিয়ে জলটা দোতলায় ঢুকছে।" এবার শুরু করলেন নলটি ভেঙে ফেলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তাই দেখে আমার মনে পড়ে গেল—আরে। লোহাওয়ালা কোথায় গেল? সেই যে ট্যাঙ্ক ভাঙছিল? তার তো যন্ত্র আছে।

লোহাওয়ালা রকে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। বেণীর সঙ্গে মাথা না হোক, মাথার সঙ্গে বেণী—ট্যাঙ্কের সঙ্গে রেনওয়াটার পাইপও পাবে শুনে মহা উৎসাহে সে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে লেগে পড়ল,ঠঠাং, ঠঠাং, ঠঠাং...কিন্তু তার আগেই যুবক পঞ্চুর রডের অবিরাম ধাক্কার কাছে পঞ্চাশ বছরের পুরনো বেনডটি আত্মসমর্পণ করল। আর কত সইবে? পঞ্চু সমানেই খুঁচিয়ে যাচ্ছে—তার দৃঢ় ধারণা এখানেই কিছু জমে আছে—তার খোঁচানোর চোটে মর্চে ধরা লোহার নলটি গর্ত হয়ে গেল, এবং দোতলার ওপর থেকে দুটো নল দিয়ে নোংরা জল কিছু ইট পাটকেল, শনের নুড়ো সমেত প্রবল ধারায় নিচে কর্মরত পরোপকারী ভদ্রলোক এবং লোহাওয়ালার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ভয়ে কাঁটা। ছি ছিঃ-কী কাণ্ডটাই হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের মন ভারি আশ্চর্য বস্তু—ভিজে যাওয়া মানুষগুলির কণ্ঠ দিয়ে

যে উল্লাসধ্বনি নির্গত হলো—সেটা রবি শাস্ত্রীর ছক্কা মারার সময়েই মানায়। পঞ্চুকে দেখাচ্ছিলও রবি শাস্ত্রীর মতো।

জল ঢোকা বন্ধ। এবারে রিল্যাক্স করে আমরা অর্থাৎ দোতলার জলকর্মীবৃন্দ ঘরের জল, বারান্দার জল, সিঁড়ির জল, যাবতীয় জল সাফ-সুতরো করতে থাকি। আমার হাঁটুর কাছে কাপড় তোলা। হাতে নারকোল ঝাঁটা। একমনে ঘরের জল ঝাঁট দিচ্ছি। ওয়ারফুটিং থেকে এবারে গার্হস্থ্য পর্যায়ে নেমে এসেছে কর্মের জাতীয় চরিত্র। এবার শুনতে পাই পাগলা ঘন্টির সঙ্গে সঙ্গে শয্যাবন্দী মা চেঁচাচ্ছেন- "ওরে! ভাত পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে? ওপরে কি কেউ নেই?"

ঝর্ণা জিভ কেটে ছুটলো ওপরে। হঠাৎ আমার কানের কাছে—

—"দিদি!"

—"কে রে—"! চমকে উঠি। দুটি ছেলে।

—"আমরা এসেছিলাম মধুকৈটভ থেকে—এবারে আমাদের পূজো সংখ্যাটা—"

—"আজ থাক, বুঝলেন? এখন খুব ব্যস্ত—"

—"যদি একটা প্রেমের কবিতা—এটা শুধুই প্রেমের কবিতার সংকলন—"

—"আজ থাক ভাই, আরেক দিন, কেমন? এখন ভাবতে পারছি না—দেখতেই তো পাচ্ছেন—"

—"ও-ঘরে জল ঢুকে গেছে বুঝি? কী করে ঢুকল?"

—"আরেক দিন সব বলব—রোববার সকালে আসবেন—।"

আপনমনে ঝাঁট দিতে থাকি। ছেলেদুটি চলে যায়। প্রেমের কবিতাই বটে।

—"দিদি!"

—"আবা-র?"

—"আমি শওকৎ। ঈদ মুবারক।"

—"ওঃ"—

শওকতের পরনে ধবধবে নতুন পোশাক—হাতে একটা কাগজের বাক্স। খাবারদাবার আছে বলে মনে হয়। মিষ্টি কাবাব? যাই থাকুক—এই কি তার সুযোগ্য সময়?

—"ঈদ মুবারক শওকৎ। স্যরি, আমি আজ একটু —"

—"এটা ধরুন দিদি—পিকো-টুম্পার জন্য একটু পেস্ট্রি।"

—"কেমন করে ধরবো? হাতে তো ঝাঁটা। দেখছো না বাড়ির কী অবস্থা?"

দেখবে না কেন? কিন্তু শওকৎ বড় ভদ্র ছেলে। খানদানী পরিবার তাদের। কে এসব কেলেঙ্কারির মুহূর্তগুলি দেখেও দেখে না। যেন এটাই আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা—এই সিঁড়িতে জলপ্রপাত, এই হাতে ঝাড়ু নিয়ে হাঁটু বের করে অতিথি আপ্যায়ণ। যেন কিছুই হয়নি। সবই যথাযথ আছে। ইংরেজী এবং লখনউয়ী ভদ্রতায় এখানে একটা মিল আছে।

হঠাৎ যেন বাতাসে গন্ধ পেয়ে দুই মেয়ে হঠাৎ উদয় হয়। হাঁটু অবধি গোটানো ভিজে জীনসে একজন, আর যত্রতত্র ভিজে ন্যাকড়ার মতো ফ্রকে আরেকজন। দু'জনেরই হাতে পুষ্পপাত্রের মতো ধরা দুটি সানকি। তাতে নোংরা জল। শওকতের হাতে বাক্স দেখেই লোভী টুম্পা চকচকে চোখে প্রশ্ন করে, "কী গো? শওকৎ-মামা? বাক্সে কী আছে?"

শওকৎ যেন বেঁচে যায়। বাক্স বাড়িয়ে ধরে সে বলে—"কিছু না, সামান্য পেস্ট্রি। নে, তোরা খেয়ে ফ্যাল—"

অমনি ঘাড় কাৎ করে কোঁকড়াচুলভরা-মাথাটা এগিয়ে আকাশ-পাতালব্যাপী একটি হাঁ করে টুম্পা। "দাও।"

তার মুখে ফেলে দিতে হবে। এটা সম্ভব নয়। পিকো ভদ্রভাবে বলে—"ওই টেবিলে রাখো। ওটা শুকনো জায়গা। আমরা পরে নিচ্ছি। তুমি ওই চেয়ারটাতে বসতে পারো। ওটা বোধহয় শুকনো চেয়ার। আজ বাড়িতে যা কাণ্ড। বাপরে—"

—"হামতুমম...এক কামরেমে বন্ধ হো"—নিচে উচ্চৈঃস্বরে গান গাইতে গাইতে চা-প্রীত চিত্তে দীপুর প্রবেশ। এবং অর্তনাদ।—"একী। সিঁড়িতে এত জল কেন? কানাই। কানাই। ন্যাতা আর বালতি নিয়ে আয়। এত জল এলই বা কোত্থেকে —" বলতে বলতে ওপরে এসে দীপুর চক্ষুস্থির।

"সর্বনাশ। বই? রেকর্ড? সব ভিজে গেল নাকি? স্টিরিওটা? টিভি? সব তুলে রেখেছো তো?"

—"গেছে। সব গেছে। তুই যা ফুটপাথের দোকানে গিয়ে চা খা ততক্ষণ। ঘরে যে জল ঢুকছে, খবরটাও তো দিবি? ছিলি তো এই ঘরেই।"

—"জা-জানলে তো দেব? আগে তো ঢুকছিল না। ঢুকল কখন? ইস্। হেভি কেলো করে রেখেছো দেখছি?"

—"আমি ? আমি কেলো করেছি?"

—"না, না, মানে কেলো হয়ে রয়েছে।"

—"কেলোর তুই আর দেখলি কী?"

এখন ঝর্ণা, পুতুল ঘর মুছছে, কানাই সিঁড়ি মুছছে, ঐ জলেই ফিনাইল গুলে নেওয়া হয়েছে। সবাই হাসি হাসি মুখে—তত বেশি ক্ষতি হয়নি যতটা হতে পারতো। এটাই যদি রাত্রে হতো? যখন সবাই ঘুমিয়ে? পর্দা, তোয়ালে, ফ্রক, ইজের যা কিছু হাতের কাছে পাওয়া গেছে সবই তখন ব্যবহার করা হয়েছে ঘরের জল শুষে নেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। একমনে কানাই সিঁড়ি মুছছে যেটা দিয়ে, সেটা দীপুর পাজামা। দীপু দেখেও চিনতে পারলো না।

—"ওকি। ওকি। সর্বনাশ করেছে—" বলে সে লাফিয়ে পড়ে তুলে নিলো ভিজে চুপচুপে একটি চার্মসের প্যাকেট। 'ঈশ-শ-শ।"—বাসা থেকে খসে পড়া মৃত পক্ষিশাবকের মতো ব্যর্থ প্যাকেটটিকে আদর করে আবার ফেলে দেয়।

বৃষ্টি ধরে গেছে। লাজুক লাজুক একটু হলুদ রোদও উঠেছে। পুতুল বসে গেল ভিজে পুঁটলিগুলো নিয়ে। ঘরে ঘরে সর্বত্র মেলে দেওয়া হতে লাগলো ছেঁড়া, ভিজে, বাতিল কাপড়-চোপড়ের রাশি। মা চেঁচাচ্ছেন, "ওকি রে খাটের বাজুতে ভিজে কাপড় দিল কে? তুলে নে। তুলে নে। পালিশের আসবাবে জল ঠেকাতে নেই—" মা যদি জানতেন নিচের খাটটা কেমনভাবে জলসিক্ত হয়েছে আজ।—মেঝেয় বিছিয়ে দেওয়া হলো ভিজে বইয়ের রাশি। "পাখা খুলে দে।" পাখা ঘুরলো না। লোডশেডিং। ঈদ প্লাস রথ। তবুও লোডশেডিং? ওঃ হো! নিচে তো শওকৎ বসে আছে।

—"শওকৎকে চা মিষ্টি দে তো পিকো।"

—"শওকৎমামাকে চা মিষ্টি দাও তো, ঝর্ণাদি।"

অরণ্যদেবের ঢাকবাদকদের মতো নির্দেশটি রিলে হয়ে গেল। কিন্তু আমিও অরণ্যদেব নই, ঝর্ণাও নয় অরণ্যের অধিবাসী। সে সাফ সাফ বলে দেয়—

"আমি কাউকে চা মিষ্টি দিতে পারবুনি বাপু। অগ্রে আমাকে কাপড় ছাড়তে হবেনি? সর্বো অঙ্গ ন্যাতাজোবড়া? ভিজে ঢোল? চা দাও বল্লেই হলো?"

—"থাক থাক দিদি। আমার আজ চা খেতে ইচ্ছে নেই—আমি বরং যাই—পরে একদিন আসবো—" শওকৎ উঠে দাঁড়ায়। এই বাড়িতে এই মুহূর্তে সভ্যভব্য শওকৎ বড্ড বেমানান।

—এতক্ষণে মনের মতো ভূমিকা পেয়ে দীপু এগিয়ে আসে। "চলো, চলো, শওকৎ, আমরা বরং ধীরেনের দোকানে গিয়ে ঈদ স্পেশাল চা খেয়ে আসি—এ-বাড়ি থেকে এখন কাটিয়া পড়াই মঙ্গল—গুড লাক দিদি। ঈদ মুবারক।"

শওকৎও ভদ্রতা ভুলে হেসে ফেলে, পা বাড়ায়।

বারান্দায় ভিজে কার্পেট ঝুলছে। চতুর্দিকে ভিজে কাপড়। ঘরবাড়ি ঝকঝক তকতক করছে। চুনবালি ঝুলকালি সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার। আমরা সবাই পরিষ্কার শুকনো কাপড় পরে চুলটুল বেঁধে আদা-চা খেতে খেতে গল্প করছি। বিদ্যুৎ এসে গেছে। পাখা ঘুরছে। বই শুকোচ্ছে। তবু বুকের সেই ধড়ফড়ানিটা কমছে না কিছুতেই। এখনো বুকের মধ্যে হাতুড়ি, এমার্জেন্সি-কালোচিত উদ্বেগ। কিছুক্ষণ আগের ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত জলরাশিটার দৃশ্য ভুলতে পারছি না।

নিচে বেল বাজলো। পাটভাঙা পাজামায়, ফর্সা গেঞ্জিতে, টেরি-কেটে চুল আঁচড়ে, শ্রীমান কানাই গুন গুন গান গাইতে গাইতে দরজা খুলে দিল।

—"উফ কি বৃষ্টি। কি বৃষ্টি। কাজকম্ম আজ কিছু হলো না।" বলতে বলতে ওপরে এসে পড়লেন দাদামণি। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাদামণি বললেন—"কি রে? রথ সাজানো কমপ্লিট?"

শুকনো মেঝেয় থেবড়ে বসে টুম্পা তখন রথের গা থেকে ভিজে কাগজ খুলছে, আর নতুন কাগজ কাঁচি আঠা নিয়ে পিকো বসে গেছে নতুন মালা-শেকল তৈরি করতে।

চারিদিকে তাকিয়ে দাদামণি উচ্ছ্বসিত—

"বাঃ। এ যে ম্যাজিক রে! এই দেখে গেলুম ঝুলকালি চুনকালি, আর এর মধ্যেই যে দিব্যি ফেসলিফটিং হয়ে গেছে। পরিষ্কার ঝকঝকে মেঝে—সিঁড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত যেন ধুয়ে মুছে রেখেছিস। এই তো চাই। কে বলে খুকু সংসারী হয়নি?" বলতে বলতে দাদামণি চেয়ারে মেলে রাখা দুটো ভিজে বাতিল ব্লাউজের ওপরে বসে পড়লেন।

টুকুর দিনরাত্রি

নন্দিতা ঘোষ

নন্দিনী রায় হাসপাতালে রাউন্ড দিতে দিতে বারবার আজ বড়ো বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হাসপাতালের প্রতিটি মানুষই জানে, ডাক্তার নন্দিনী রায় নিজের কাজ সম্পর্কে খুব সচেতন, প্রত্যেকটি রুগী সম্পর্কে তার সজাগ দৃষ্টি, অপরিসীম মমত্ববোধ। ডাক্তারি শুধু তার কাছে পেশা নয়, এটিকে সে তার সামাজিক কর্তব্য বলেই মনে করে।

তবে নন্দিনী আজ কেন এত চঞ্চল? বাড়িতে সে তার একমাত্র পিতৃহীন কন্যা টুকুকে একা রেখে এসেছে। গত চার-পাঁচদিনের জ্বরে টুকু বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই তাকে সে আজ স্কুলে যেতে দেয়নি। তার সবসময়ের কাজের মেয়েটি, মানদা দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। তার পরেই টুকু পড়লো জ্বরে। এদিকে বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। কিন্তু আশ্বিন মাস শুরু হয়ে গেছে। গত কয়েকদিন আগেই বর্ষণক্লান্ত আকাশ কালিমামুক্ত হয়ে শরতের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। নির্মল আকাশে শরতের টুকরো সাদা মেঘের দল খেলা করে বেড়াচ্ছিল। সল্টলেকের খালি প্লটগুলোতে কাশের অজস্র গুচ্ছ মাথা নেড়ে আসন্ন পুজোকে যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

কিন্তু গতকাল সকাল থেকেই আকাশ আবার কালো মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। সারাদিন একবার সূর্যের দেখা মেলেনি। একঘেয়ে বৃষ্টিতে মনটা যেন বিষণ্ন হয়ে উঠছিল।

অবশ্য বিষণ্ন হওয়ার কারণ নন্দিনীর জীবনে চার বছর আগেই ঘটে গিয়েছিল। নন্দিনী যখন হাউস স্টাফ, তখন ব্যাঙ্কের অফিসার মনোজের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। সেই আলাপ ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হয়, তারপর নন্দিনী আর মনোজ বিয়ে করে সুখের নীড় রচনা করেছিল বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে। ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে মনোজ এই ছোটো বাড়িটি তৈরি করেছিল। মা তখন বেঁচে। বিয়ের সময় পুত্রবধূকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের দু'বছরের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। ততদিনে নন্দিনীর কোলে এসেছে টুকু। নন্দিনী নিজেও বাল্যেই পিতৃহীন, মা দিল্লীপ্রবাসী ভাইয়ের কাছে থাকেন।

মা মারা যাওয়ার পর মনোজ ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু স্ত্রী আর সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল। তারপর হঠাৎ ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মনোজ যেদিন নিজের স্ত্রী-কন্যার কাছ থেকে চিরবিদায় নিল, সেদিন নন্দিনী দিশেহারা হয়ে পড়লো। মাত্র পাঁচটি বছরের মধ্যে তার বিবাহিত জীবন নিঃশেষ হয়ে গেল—স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রইল শুধু টুকু। টুকু ছিল মনোজের নয়নের মণি। টুকুর জন্মের পরে মনোজের বন্ধু-বান্ধবেরা কেউ বা ক্ষুব্ধ হতো, কেউ বা পরিহাস করতো, কারণ, যে মনোজ ছিল একান্ত বন্ধুবৎসল, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব না করলে যার একটি দিনও কাটত না, সে এখন নিজেকে প্রায় আবদ্ধ করে ফেলেছে বাড়ি আর অফিসের সীমানার মধ্যে।

বাড়ি ফিরে জামাকাপড় বদলেই মেয়েকে নিয়ে তার খেলা আর আমোদ শুরু হতো—ছোট্ট টুকুকে নিয়ে যখন সে লোফালুফি করত, তখন নন্দিনী মাঝে মাঝে ভয় পেত—মনোজের ছেলেমানুষি যেত বেড়ে। সেই আনন্দের উৎসটি চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে মনোজ কোথায় পালিয়ে গেল?

টুকুই এখন নন্দিনীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু কতটুকু সময়ই বা সে মেয়েকে দিতে পারে? হাসপাতাল ছাড়া, দু'টি নার্সিংহোমের সঙ্গে সে যুক্ত। তবে ছোটো হলেও মেয়ে তার খুব বুঝদার। এই বয়সেই মায়ের সম্বন্ধে সে সদা-সতর্ক। মার কষ্ট লাঘব করার জন্য টুকু সবসময় উন্মুখ। কাজের লোক না থাকলে ঘরের কাজেও মাকে সাহায্য করতে যতটা সম্ভব সে চেষ্টা করে।

আজ হয়তো নন্দিনী টুকুকে একা বাড়িতে রেখে কাজে আসত না। সকাল থেকেই জোর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কয়েকজন গুরুতর রকমের অসুস্থ রুগীকে দেখা একান্ত দরকার বলেই সে হাসপাতালে এসেছিল। সকালে উঠে দ্রুত হাতে ঘরের কাজকর্ম রান্নাবান্না সেরে নিজে খেয়ে, মেয়েকে খাইয়ে নন্দিনী হাসপাতালে এসেছে। নতুন কেনা একটি গল্পের বই টুকুকে দিয়ে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলে এসেছে—তুমি গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ো সোনা, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। কিন্তু বাইরে বৃষ্টির ধারা ক্রমশ আরো ঝেঁপে আসছে। এর মধ্যেই রাস্তায় জল জমে গিয়ে যানবাহনের বিভ্রাট শুরু হয়েছে। দ্রুত হাতে হাসপাতালের কাজ সারছে নন্দিনী—কেসটা একটু জটিল। মেয়েটিকে দিনকয়েক আগেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

আজ অপারেশন করতে করতে টুকুর জন্মের দিনটির কথা নন্দিনীর বারবার মনে পড়ছিল। তাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়ে দিয়ে মনোজের সে কি ছটফটানি—শেষে মেয়ের মুখ দেখে সে শান্ত হলো, উল্লসিত হলো। মেয়েকে দেখেই সে বলে উঠলো—আরে! এ যে হাত-পা নাড়া সুন্দর একটা টুকটুকে পুতুল।

কিন্তু আজ মনোজ কোথায়! কেন সে তাদের ফাঁকি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল? নন্দিনীর চোখ দু'টি জলে ভরে আসছিল। কিন্তু অন্য ডাক্তার আর নার্সেরা অপারেশন থিয়েটারে ডা: রায়ের চোখে জল দেখে বিস্মিত হবে—নন্দিনী নিজেকে সংযত করলো।

হাসপাতালের সব কাজ শেষ করে নন্দিনী যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, তখন সে চোখে অন্ধকার দেখল। এই বিকেলেই যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে—রাস্তায় এক হাঁটু মতো জল—যানবাহন প্রায় বন্ধ। তার টুকু এতক্ষণ একা একা কী করছে? কেমন করে সে সেই বাঙুরে পৌঁছবে—যেখানে একঘণ্টা বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়? মেয়ের কাছে দ্রুত পৌঁছবার জন্য তার মন হাহাকার করে উঠলো।

নন্দিনীর নিজের ছোটো একটি গাড়ি আছে—কিন্তু গত কয়েকদিন হলো মেরামতের জন্য সেটিকে গ্যারেজে পাঠানো হয়েছে। তার ইচ্ছে ছিল, আজ কাজ সেরে দ্রুত ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি? রাস্তায় যে পরিমাণ জল জমেছে তাতে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। শুধু অনেকক্ষণ পর পর এক একটি প্রাইভেট বাস হাঁক দিয়ে, পথচারীদের গায়ে জল ছিটিয়ে, রাস্তার জমা জলে ঢেউ তুলে ছুটে চলেছে।

নন্দিনীর মানসিক অবস্থা বুঝে হাসপাতালের সহকর্মী ডাক্তারেরা বলেছিলেন, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স আপনাকে পৌঁছে দেবে।'

কিন্তু নন্দিনী শুনলো, দু'টি অ্যাম্বুলেন্সই বের হয়ে গেছে। এই জলরাশি ভেদ করে তারা যে কখন ফিরবে তার কোন ঠিক নেই। মেয়ের জন্য একান্ত ব্যাকুল আর চঞ্চল হৃদয় নিয়ে তার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। সে ছাতা খুলে রাস্তায় বের হয়ে পড়লো।

আজ সকালে মা যখন কাজে বের হয়ে গেল, তখন টুকুর মনটা অভিমানে ভরে উঠেছিল। এই ছোটো জীবনে মা-ই তার একমাত্র অবলম্বন। বাবাকে সে চিনেছে শুধু ছবি দেখে, আর মা'র মুখে

তাঁর গল্প শুনে। দিল্লী থেকে মাঝে মাঝে মামা আসেন, দিদা আসেন—কিন্তু তাঁরা তো ক্ষণিকের অতিথি। দিদার শরীর ভালো নয়, চোখে ছানি পড়েছে ভালো দেখতে পান না, তাই মা তাঁকে নিজের কাছে রাখতে সাহস করেন না। এই ফাঁকা বাড়িতে কে তাঁর দেখাশোনা করবে? টুকুর বাবাও ছিলেন একমাত্র সন্তান। তাই পিতৃকুলের দিক থেকেও সে একা। এই একক জীবনে টুকু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল—কিন্তু আজ শরীর খারাপ, স্কুলে যেতে পারেনি, তাই টুকুর মনের ওপর একাকিত্বের একটা বোঝা যেন চেপে বসেছিল।

যাই হোক, মা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যখন রওনা হয়ে গেল, তখন টুকু নতুন কেনা গল্পের বইটা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল। দুর্বল শরীরে ঘুমটা একটু গাঢ়ই হলো। তার ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বাজে প্রায় চারটে। কিন্তু টুকুর মনে হলো, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলো। মা'র রেখে যাওয়া খাবার খেয়ে দরজা একটুখানি ফাঁক করে দেখলো, তাদের সামনের উঠোনে জল জমে গেছে—বৃষ্টির ছাঁট লাগতেই সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার গল্পের বই নিয়ে বসলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো, মা নিশ্চয়ই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এসে পড়বে।

টুকু যখন অধীরভাবে মায়ের পথ চেয়ে আছে, নন্দিনী তখন বাস স্টপে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে আবার জল ভেঙে হাঁটতে শুরু করেছে। চোখে তার হাই পাওয়ারের চশমা। বৃষ্টির ছাঁটে চশমার কাঁচ দু'টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পায়ের নীচে জলের তোড়, ওপরে প্রবল বৃষ্টির ধারা অগ্রাহ্য করে নন্দিনী হেঁটে চলেছে। একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে কোনোরকমে সে নিজেকে সামলে নিল। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর কোনোক্রমে একটা পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসের ঝুলন্ত ভেজা মানুষদের ভিড় ঠেলে সে ভেতরে উঠে পড়লো। কেউ বা ভ্রূ কোঁচকালো, কেউ বা একটু কটূক্তি করলো।

নন্দিনীর ভাগ্য ভালো, শেয়ালদা'র কাছে একটা লেডিজ সিটে সে জায়গা পেলো। শ্রান্তিতে আর উদ্বেগে তার শরীর তখন ভেঙে পড়ছে।

টুকুর কথা ভাবতে ভাবতে নন্দিনীর মনে পড়লো নিজের শৈশবের কথা, বাল্যের কথা। টুকুর মতো সেও বাবাকে হারিয়েছিল নিতান্ত অল্প বয়সে। তখন তার বয়স দশ আর ছোটো ভাই বুবুনের বয়স ছয়। নন্দিনীর মা ছিলেন সেকালের বি. এ. পাশ। কোনোক্রমে একটি ছোট মফস্বল শহরে শিক্ষিকার কাজ পেয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। তখন তাদের জীবন সংগ্রাম যেমন ছিল, তেমনি আনন্দও ছিল। মা একটি ছোটো বাড়ি পেয়েছিলেন। সামনে ছিল লাল সুরকি ঢালা পথ—দু'দিকে দু'টি গাছ, একটি রাধাচূড়া আর একটি কৃষ্ণচূড়া। গাছ দু'টি যখন ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত তখন কী ভালোই না লাগতো। সেখানকার বর্ষা এত নিষ্ঠুর বলে মনে হতো না। বিশেষ করে গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টির ছোঁয়া লেগে মাটি থেকে যে সোঁদা গন্ধ উঠে আসতো—সে গন্ধ তার বড়ো প্রিয় ছিল। আর প্রিয় ছিল শীতের ভোরে মায়ের হাত ধরে দুই ভাইবোনের বেড়াতে যাওয়া। শহরটি নামে শহর হলেও ছিল গ্রামঘেঁষা। ভোরে খেজুর গাছ থেকে যখন রসের হাঁড়ি নামানো হতো, সে রস খাওয়ার জন্য তারা দুই ভাইবোন উন্মুক্ত হয়ে থাকতেন। সেসব দিন আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়। তার মা তাদের চাকরি করে মানুষ করেছেন কিন্তু টুকুর মতো এমন নিঃসঙ্গ জীবন তাদের যাপন করতে হয়নি। ভাবতে ভাবতে নন্দিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

গল্পের বই টুকুর বড়ো প্রিয়। কিন্তু আজ সে বইতে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। বৃষ্টির দাপটে, ঝোড়ো হাওয়ায় দরজার কপাট আর জানালার কাঁচের সার্সি কেঁপে উঠছে—টুকু মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছে, টুকুর অস্বস্তি ধীরে ধীরে ভয়ে পরিণত হলো। এক একবার দরজায় হাওয়ার আর বৃষ্টির ছাটের ধাক্কা

লাগে, টুকুর মনে হয়, মা বোধহয় এসে গেল। টুকু একবার দরজা খুলে দেখল, উঠোনের জল বাড়তে বাড়তে দুটো সিঁড়ি ডুবে গেছে।

আস্তে আস্তে তার মনটা গভীর অভিমানে ভরে ওঠে—মা এখনো আসছে না কেন? মা তো জানে, তার শরীর ভালো না—এই ঝড়-বৃষ্টিতে তার বুঝি একা একা ভয় করে না?

আবার সে গল্পের বই নিয়ে সোফাতে গিয়ে বসে—এবার সে নিজে নিজে সাহস সঞ্চয় করতে চেষ্টা করে। মা'র মুখে সে শুনেছে, দেশ যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তার এক মামা কেমন বীরের মতো প্রাণ দিয়েছিলেন। যার মামা এত সাহসী ছিলেন, সে মেয়ে কেন ভীতু হবে?

আস্তে আস্তে আটটা বাজে—এবার টুকুর কান্না পেতে লাগল—আজ সে রাতে খাবে না। মা অনেক করে সাধলে—অনেক আদর করলেও না।

তারপর কী মনে করে সে উঠে গিয়ে খাবার টেবিলটা গুছিয়ে রাখল—খাবার দুটো থালা ধুয়ে উপুড় করে রাখল।

খাবার টেবিলে বসে বসে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ দরজায় আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠলো—কিন্তু দরজা খুললো না, ভাবলো এবারেও নিশ্চয়ই হাওয়ার শব্দ। তারপর ডাক শুনলো—'টুকু, আমি এসেছি, দরজা খোল'—টুকু দরজা খুলে লাফিয়ে উঠে দেখে, তার মামণি দাঁড়িয়ে আছে—সমস্ত জামাকাপড় ভেজা—টপ্‌টপ্ করে জল পড়ছে। নন্দিনী মেয়েকে বলে—খুব রাগ করেছিস তো? ভয় পেয়েছিলি নাকি? মায়ের সিক্ত, শ্রান্ত মুখচোখ দেখে রাগ-অভিমান ধুয়ে মুছে গেল। সে তাড়াতাড়ি মায়ের হাত থেকে ভেজা ছাতা আর ব্যাগটা নিল—মাকে তোয়ালেটা এগিয়ে দিল।

স্নান সেরে, শুকনো জামা-কাপড় পরে নন্দিনী বাথরুম থেকে বের হয়ে এসে দেখল—খাবার টেবিলে টুকু খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। মেয়ের কপালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে মেয়ের সঙ্গে খেতে খেতে সে তার বাড়ি ফেরার কাহিনি শোনাতে লাগলো—কেমন করে—অনেকটা পথ জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে, একটা প্রাইভেট বাসে কিছুটা এসে, তারপর পনেরো টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে সে বাড়ি ফিরেছে।

শোয়ার আগে নন্দিনী ঘড়িতে অ্যালার্ম দিল—কাল আবার সকালে উঠে কাজ সেরে হাসপাতালে যেতে হবে—আজ যার অপারেশন করে এসেছে, সেই মেয়েটির অবস্থা ভালো নয়—তাকে দেখতে যেতেই হবে।

মা শুয়ে পড়ার পর টুকু মশারির ধারগুলো গুঁজে দিল—তারপর মায়ের ক্লান্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে তার মন অসীম মমতায় ভরে উঠলো—মা অ্যালার্ম দিয়েছিল ছ'টায়—সে আস্তে আস্তে কাঁটাটা ঘুরিয়ে সাড়ে ছ'টা করে দিল—মা অন্তত আধ ঘণ্টা বেশি ঘুমোতে পারবে।

সদর দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ করা হয়েছে কিনা দেখতে এসে টুকু একবার দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো—চাঁদ একটুখানি উঁকি দিচ্ছে—সেই চাঁদের আলোয় উঠোনের জমা জল ঝিকমিকিয়ে উঠছে—টুকুর হঠাৎ চোখে পড়লো বৃষ্টির জলে ভাসতে ভাসতে একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি তাদের সিঁড়ির পাশে আটকে আছে—তার ওপর চাঁদের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করে উঠছে—এতক্ষণের ভয় আর উদ্বেগ কেটে গিয়ে এবার হঠাৎ টুকুর সুন্দর দু'টি চোখে দু'ফোঁটা জল চিক্‌চিক্ করে উঠলো।

লায়লা
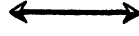
এষা দে

এতকাল বাদে হঠাৎ লায়লাকে মনে পড়ল। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর তিনটেয় ছোট ননদের কন্যা ঝুনু আয়োজিত দুঃস্থ মেয়েদের হস্তশিল্প প্রদর্শনী দেখতে দেখতে। কয়েক দশক প্রবাসে কাটনোর পর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মরচে ধরা সম্পর্কগুলো ঝালানো আবশ্যক। অতএব দর্শনীয় বস্তুগুলি আমার সরলীকৃত প্রৌঢ় জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণ অকেজো হলেও দুটো-একটা কিনতে হচ্ছে। ঝুনুর উৎসাহী বান্ধবীরা হাজির। আলাপ হল। কথায় কথায় প্রকাশ পেল অনেকেই একটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী। কলেজের নাম শুনে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা তোমরা হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের লায়লা আলমকে চিনতে? আমার ক্লাসমেট ছিল এম এ-তে।—লায়লা ম্যাডাম? চিনি বইকি। আমাদের সময় উনি তো হেড। আমাদের তিনজনের হিস্ট্রি অনার্স ছিল। আমাদের পড়িয়েছেন। তবে উনি তো লায়লা আলম নন, লায়লা হোসেন।

লায়লা হোসেন! বিস্মিত হই। আমাদের লায়লা তো? শেষ পর্যন্ত কি বিয়ে করল? জিজ্ঞাসা করি ওদের একজনকে—আচ্ছা তোমাদের লায়লা ম্যাডাম কি ম্যারেড?—হ্যাঁ। আমরা যখন ফাইনাল ইয়ারে, ওঁর মেয়ে এগারো ক্লাসে ভর্তি হল। ঝুনু যোগ করে—এই পাড়াতেই থাকেন। সামনে বাঁ দিকে নেক্সট টার্নের পর একটা মসজিদ, তারপর খানিকটা গিয়ে ডাইনে মোড়। পঞ্চম কি ষষ্ঠ বাড়ি। বড়জোর মিনিট দশেকের রাস্তা। যাও না মামীমা, দেখা করে ফেলো। এতদিন বাদে। খুব মজা হবে। এই মিতা, তুই ফেরার সময় বাড়িটা দেখিয়ে দিস তো। দীর্ঘ সম্পর্কহীনতার সঙ্কোচ ছাপিয়ে যায় ওদের আগ্রহ ও আমার কৌতূহল। বেলা প্রায় চারটে। তখনও বেশ রোদ। পথপ্রদর্শক মিতার সঙ্গে হাঁটছি।

সেদিনও এমন এক অপরাহ্ণ ছিল না? টিউটোরিয়েল সেরে কলেজ স্ট্রিট দিয়ে হাঁটছিলাম। লজ্‌ঝড় স্টেটবাসের ভিড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ি ফেরার নিশ্চিত সম্ভাবনায় বিষণ্ণ। পাশে এসে প্রায় থেমে গেল একটি ঝকঝকে গাড়ি। জানালায় একটি নরম নরম ফর্সা পরিচিত মুখ। জাহানারা। আমার সঙ্গে টিউটোরিয়েলে ছিল।

কোন দিকে যাবে? আশান্বিত আমি পাল্টা প্রশ্ন করি—তুমি কোথায় যাবে?

ওয়েস্ট রেঞ্জ, পার্ক সার্কাস। আসবে?

পার্ক সার্কাসের মোড়ে নামিয়ে দিও। ভেতরে উঠে বসি। গাড়ির গতি বাড়ে।

তোমার বাড়ি কি ঠিক মোড়ে?

না না, হাজরা রোডে। যে কোনও বাসে বা ট্রামে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি চলে যাব। ক'টা স্টপ। ফাঁড়িতে নেমে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা। ব্যস, পৌঁছে যাব।

তোমরা কেমন একলা একলা চলাফেরা কর। আমাদের তো বাড়ি ছাড়া বেরুতেই দেয় না।

'তোমরা' অর্থাৎ সংযুক্তা পুরবী মালা অনসূয়া ও আমার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েরা যারা ক্লাসে অধ্যাপকের ডাইনে বাঁয়ে বেঞ্চিগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। 'আমরা' মানে এই জাহানারা, বিলকিস, দৌলত, হাসিনারা কয়েকজন যারা অধ্যাপকের মুখোমুখি আলাদা একটা বেঞ্চিতে একসঙ্গে বসে।

ক্লাসে আসা-যাওয়ার পথে দু'পক্ষের মধ্যে মধুর হাসি ও ইংরেজিতে ভদ্রতাসূচক বাক্য বিনিময় হয়। ধরেই নেওয়া সুবেশ সুন্দরী স্পষ্টত সচ্ছল লোরেটো কলেজে পড়া মুসলমান মেয়েরা পাঁচাপাচি কালোকেলে বাংলা পড়া মধ্যবিত্ত হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। তারা যেখানে সেখানে হো হো হা হা করে বেড়াবে না, দল বেঁধে লন-এ বা কফি হাউসে অবসর সময় অড্ডা দেবে না। ক্লাস হয়ে গেলেই ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। যে যার গাড়িতে চড়ে চলে যাবে। আজ বাইচান্স এদের একজন, জাহানারার সঙ্গে ওদের একজন মানে আমার এত কাছাকাছি আসা।

—তুমি রোজই সোজা বাড়ি ফিরে যাও, না?

—হ্যাঁ। এখানে আমার একদম ভাল লাগে না।

—কেন?

—ভারি বোরিং। খালি পড়াশুনা আর পলিটিক্সের কথা। আমার হাজব্যান্ড চায় আমি এম এ-টা কমপ্লিট করি। তাই পড়া। পরীক্ষা হয়ে গেলেই তো আমরা ইউ এস এ-তে চলে যাব।

—বাঃ তাই নাকি! কতদিন থাকবে ওখানে?

—বরাবর। আমরা তো ওখানেই সেটল করব।

—সে কি! কেন?

—আমাদের সবার ফ্যামিলির কতজন বাইরে। আমার দুই দাদা মালয়েশিয়ায়। একজন ব্রাদার ইন ল ইংলন্ডে, অন্যজন অলরেডি ইউ এস এ-তে।

—তোমাদের বাবা-মা-রা সব এখানে খুব একলা ফিল করবেন না?

—তা একটু করবেন। তবে সকলেই জানেন এ ছাড়া উপায় নেই। আমরা তো মাইনরিটি। এখানে কোনও ফিউচার নেই। ছেলেদের কাজ পাওয়া, মেয়েদের বিয়ে শাদি....।

খুব অপ্রস্তুত বোধ করি। বাইরে থেকে এদের চেহারা সাজপোশাক চালচলন দেখে ভাবতাম না জানি কী সুখের জীবন। এক একজন হুরী পরীর মতো রূপসী, থাকবে যেন আলমারিতে সাজানো কাচের পুতুল। ভেতরে ভেতরে এদের এত সমস্যা। একসঙ্গে পড়ি, কাছাকাছি বাস করি, তবু কত দূর। যেন অন্য জগতের বাসিন্দা। একমাত্র লায়লা হচ্ছে এ জগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র। একমাত্র ওই বসে আমাদের পাশে। এসেছে ব্রেবোর্ন থেকে। পরিষ্কার কাটা কাটা বাংলা বলে বিন্দুস্থানী টানে। হৈ হৈ করে, আড্ডা দেয়। সবই আমাদের সঙ্গে। পরদিন লায়লাকে জাহানারার ইতিবৃত্তটি শোনাতেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নাক সিঁটকোয়।—টিপিক্যাল মাইনরিটি কমপ্লেক্স। সব সময় একজোট হয়ে 'ঘেটো' বানিয়ে থাকবে। বাইরের কারোর সাথে মিশবে না। এখানে নাকি ফিউচার নেই! কেমন করে থাকবে? কমপিট করতে পারে? পাবে তো একটা লো সেকেন্ড ক্লাস। আমেরিকায় কী হাতিঘোড়া হবে? সাদা চামড়ার দেশে রাস্তা ঝাঁট দেওয়াও এদের ভাল, বুঝলে? ওর ওই কমার্স গ্র্যাজুয়েট হাজব্যান্ড ওয়াশিংটন কি নিউইয়র্কে চিকেনকারি রাইসের স্টল খুলবে ওটাই ওদের বেহেস্ত। লায়লা গড়গড় করে শুধু জাহানারার নয়, বাকি সকলের, বিলকিস.হাসিনা দৌলতের সম্ভাব্য ভবিতব্যের বর্ণনা দিয়ে যায়। টিকাটিপ্পনি সহযোগে।

সত্যি লায়লার তুলনা নেই। এম এ ক্লাসের শুরু শুরুতে ওর সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমাদের তাক লেগে গিয়েছিল। গায়ের রঙ পাকা গমের শীষ। ডিমের মতো ডৌল মুখ, ঈষৎ লম্বাটে নাক, এক ঢাল সোজা সোজা মিশকালো চুল, কপালের ওপর এলিজাবেথ টেলরের ক্লিওপ্যাট্রার ছাঁচে কাটা, হাসিটা মধুবালা না নার্গিস কার সঙ্গে বেশি মেলে সে নিয়ে আমাদের প্রায়ই তর্ক চলে। সবচেয়ে অসাধারণ

ওর ঈষৎ সবু টানাটানা চোখের ঘনকৃষ্ণ তারা। যেন দু'টি কালো মুক্তো। ভেতর দেখা যায় না। দারুণ ফিগার, ইংরিজি আট অথবা বাংলা চার। আমরা যখন বেশিরভাগই লেপাছোঁপা, ওর শরীরে তখন ঢেউ খেলছে। পরিচয়ের পর আমরা সগর্বে ওকে বিজয়কেতনের মতো সঙ্গে নিয়ে কফি হাউসে বসেছি। ও পাটপিট মুখে কথায় কথায় জানালো মেটিয়াবুরুজের নবাববাড়িতে ওর মাসির বিয়ে হয়েছে। আমরা তো থ্রিল্ড। ব্রিটিশ দ্বারা উৎখাত ও নির্বাসিত অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ-র 'যব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ নগরী'র করুণ উচ্ছ্বাসের স্রোতে ভেসে গেলাম। লায়লা শুনতে শুনতে বলে—ওই নবাবের ওয়ারিশ এখন কী করে জানো? একটা মস্ত বিস্তারায় শুয়ে থাকে, মাথায় দুটো বালিশ, সঙ্গে দু'ধারে দুটো পাশবালিশ, দুটো কানবালিশ আর কানবালিশ দুটোর ওপর দু'দিকে রাখা একটা একটা দুটো বই।

—দুটো বই কেন?

—যখন যেদিকে ফিরে শোয় তখন সেদিকে রাখা বইটা পড়ে। হি হি হি হি।

সনাতনী স্বধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশায় লায়লার মুখে খই ফোটে। আমাদের মুখে মোগলাই খানার তারিফ শুনে একদিন নিরীহ মুখে বলে—ওই জাহানারা বিলকিস দৌলতদের বাড়িতে ওরকম রান্না হয়। আমার বাবা তো ডাক্তার, বলেন ওদের সকলের নসিবে লেখা বালতিতে বসা। আমরা অবাক।—বালতিতে বসা মানে?—একটা বড় বালতি ভর্তি উষ্ণুম গরম জলে ক'ফোঁটা অ্যান্টিসেপটিক ঢেলে পিছন ডুবিয়ে বসে থাকা। নির্ঘাৎ অর্শ হবে কি না। নবাবী খানা খাওয়ার পরিণাম। হা হা হা হা।

লায়লারা খুব আধুনিক। বাপঠাকুর্দা সকলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তার উকিল প্রশাসক। লায়লার নিজের রোল মডেল ওর বড়দিদি নূরজাহান। ওদের পাঁচ বোনের মধ্যে বড়দি-ই নাকি মৃতা মায়ের অপরূপ সৌন্দর্যের খানিকটা পেয়েছে (যার তুলনায় সে নিজেকে পেত্নী মনে করে)। যেমন রূপ তেমনি মেধা বড়দির। ইংরেজি উর্দু দুটোতেই দারুণ। বিয়ে হয়েছে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বড় চাকুরের সঙ্গে। স্বামী ঢাকার রহিশ পরিবারের ছেলে। লায়লা একবার রাওয়ালপিন্ডি ঘুরে এসে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, খানাপিনা, চলাফেরা, বাড়িঘরের যে বর্ণনা দিল তাতে আমরা হাঁ। একেবারে জেট্ সেট। সবকিছু ফরেন, গাড়ি থেকে কসমেটিক পর্যন্ত। কলকাতায় যখনই বড়দিরা আসে, লায়লার মুখে শুনি, তাদের উর্দ্ধশ্বাস শপিং আর পার্টি, পার্টি আর শপিং। এরকম যার বড়দি সে যে ট্যানারি কি হোটেলের মালিক বা মালদা-মুর্শিদাবাদের জমিদারির অবশিষ্ট ভোগীদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের চোখে দেখবে সে তো জানা কথা। মজা হল লায়লা যাদের থেকে নিজেকে এত ভিন্ন প্রমাণ করতে সর্বদা উদ্গ্রীব তাদেরই নাড়িনক্ষত্রের সব খবর কিন্তু রাখে। একদিক দিয়ে তাদের বড় কাছের মানুষ। কার সিভিলিয়ান চাচার ইরানি বউ-এর দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, কার ঠাকর্দা খিদিরপুর ডকে মজুর জোগান দিয়ে দেদার টাকা কামিয়েছে, সেন্ট্রাল ক্যালাকাটায় কাদের ক'টা বড় বড় ম্যানসান আছে, এডিনবরায় ডাক্তারি পড়তে গিয়ে কার বাবা কবার ফেল করেছিল, কার দিদির বিয়েতে আলিগড়ের বরপক্ষ এসে চোস্ত লক্ষ্ণৌ উর্দুতে বাতচিত শুরু করলে পার্ক সার্কসের মেয়েপক্ষ একেবারে ডেবলু বনে গিয়েছিল, কাদের বাড়ি একটা চিড়িয়াখানা কারণ বাবা-মা দু'জনেরই আগের পক্ষের ছেলেমেয়েরা এ পক্ষের ছেলেমেয়ের সঙ্গে একই জায়গায় থাকে ইত্যাদি যাবতীয় গোচর-অগোচর বৃত্তান্ত লায়লার মুখে শোনা যায়। সবচেয়ে বেচারি হচ্ছে আমাদের হাসিনা। থাকে ওদের ঠিক উল্টো দিকের বাড়িতে। রাস্তার ওপরে দোতলার খোলা ছাদে ওর চার দাদা নাকি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে পাড়াসুদ্ধ মেয়েদের দেখিয়ে দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে পায়চারি করে। ভারি ডাঁট কারণ ওরা সৈয়দ, ডাইরেক্ট ডিসেন্ডেন্ট

অফ দ্য প্রফেট। একবার যদি পয়গম্বরের বংশধরদের চেহারা আমরা দেখি। সব কটা কালো কালো মোষ। হি হি হি হি।

লায়লার সাংঘাতিক সাহসে আমরা চমৎকৃত। একবার ক্লাসের বাইরে করিডরে হাসিনা লায়লাকে সবিনয়ে কী বলল এবং লায়লার উগ্র সহাস্য উত্তর শুনে ম্লানমুখে ফিরে গেল নিজেদের নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে। লায়লাকে জিজ্ঞাসা করি—কী বলছিল হাসিনা?

এসেছিল ওর ছোট দাদার জন্য টোপ ফেলতে। দিলাম হাঁকিয়ে। এন্তেকাল পর্যন্ত এন্তেজার করুক। পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। তা যাক। মজনু রে! একদম বেহায়া ওরা, বুঝলে? বাপের বিয়ের কিস্‌সা ভুলে গেছে।

—কী কিস্‌সা, কী কিস্‌সা?

—ও! তোমাদের বলিনি বুঝি? হাসিনার ঠাকুর্দা পলিটিক্স করত, কী একটা মিনিস্টার হয়েছিল। একটা ভাল ফ্যামিলির খুবসুরত মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে ঠিক করেছে, শাদির সব এন্তেজাম হয়েছে। রিস্তেদাররা এসেছে, গেস্ট সব হাজির। বর কনে দুটো ঘরে। মৌলবী আর তিনজন সাক্ষী আছেন। আমাদের যেমন কাস্টম তেমন কনেকে পর্দার আড়াল থেকে মৌলবী জিজ্ঞাসা করলেন, অমুকের পুত্র অমুক, এই কাজ করে, এত দেনমোহর দেবে। তুমি কি তাকে কবুল অর্থাৎ গ্রহণ করবে? কনের বলার কথা 'কবুল'। আগে তো মেয়েরা লজ্জায় শুধু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাতো, আশেপাশে বয়স্কারা 'কবুল কবুল' বলে দিতেন। হাসিনার বাবার কনে কী করল জানো? দু'দিকে মাথা নেড়ে জানালো সে কবুল করবে না। হি হি হি।

—তারপর?

—তারপর আর কি, শাদি হল না। শহরসুদ্ধ লোকের কাছে একজন সৈয়দের নাক কাটা গেল। তারপর থেকে ওরা আমাদের ফ্যামিলিকে টারগেট করেছে।

কেন কেন, তোমাদের ফ্যামিলিকে কেন?

বা রে, যে মেয়েটি ওদের বাবাকে কবুল করল না সেই তো আমাদের আম্মি, মা।

কী ফ্যানটাস্টিক। আমরা হৈ হৈ করে আর এক রাউন্ড কফির অর্ডার দিই। লায়লার অসামান্য মায়ের খাতিরে দুটো মসলা ধোসাও বলা হয়, আমরা যদিও পাঁচজন। দুটো ধোসা সমান পাঁচ ভাগ করার দায়িত্ব লায়লার। ও সর্বদা বলে—তোমরা হিন্দুরা ভাগাভাগির কিছুই জানো না। একটা মুসলমান সম্পত্তি রেখে মরলে এত ভাগ হয় গাঁ সুদ্ধ লোক কিছু না কিছু পায়। দাও আমাকে দাও। এত হাসিঠাট্টা, গল্পগুজব, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে কাটানো, তবু কোথায় যেন একটা ব্যবধান। লায়লাকে ঘিরে একটা অজানার বলয়। ও কখন যে কী করে আমরা বুঝি না। আমাদের চোখের আড়ালে ওর যে জীবন তার শুধু আভাসই আমরা পাই। যেমন একদিন কথায় কথায় প্রকাশ পেল ওকে নিয়ে নিয়মিত ছবি আঁকেন ক'জন শিল্পী। হ্যাঁ, তাঁরা সকলেই মহিলা এবং নগ্নচিত্র নয় তবুও চিত্রকরের মডেল হওয়ার কথা ষাটের দশকের গোড়ায় আমাদের কাছে অকল্পনীয়। কী করে হল? ওর ঈষৎ সবুজ টানা টানা চোখের ঘন কৃষ্ণ তারায় উত্তর মেলে না। ওদের বাড়িতে একবার ঈদের নেমন্তন্নে গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে আলাপ। শ্যামবর্ণ লম্বাচওড়া ভদ্রলোক, খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলায় কথা বলেন। রোজা রাখার স্বাস্থ্যসম্মত ব্যাখ্যা দিলেন। দেখা গেল হিন্দুদের কবে কবে উপবাস বিধেয় সে সম্বন্ধে উনি আমাদের সকলের চেয়ে ঢের বেশি ওয়াকিবহাল। হিন্দু বিধবাদের দীর্ঘায়ু লাভের প্রধান কারণ তাঁর মতে নিয়মিত উপবাস। জ্ঞান ট্যান নিয়ে আমাদের লজ্জা না করে খেতে বলে নিজের ঘরে চলে

গেলেন। মনে কোথায় যেন খট্‌কা লাগল। লায়লার দিকে তাকালাম। ওর মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। দু' চোখের তারায় ঘন কালো দু'টি মুক্তোয় অতল রহস্য।

এম এ পরীক্ষা শেষ। আমরা ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। বিবাহ সংসার, কারও বা সঙ্গে চাকরি। অন্য শহরে, এমন কি অন্য দেশে। যে যার নিজস্ব বলয়ে আবর্তিত। সকলেই মাঝে মাঝে উৎসে ফিরি অর্থাৎ পিত্রালয়ে, কলকাতায়। আত্মীয়পরিজন দেখাসাক্ষাৎ ব্যস্ততার মধ্যে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র অনসূয়া। কারণ সে ঘাঁটি আগলে আছে। কলকাতায় স্থায়ী। যেমন লায়লা। সম্ভবত দু'জনেই কুমারী এবং অধ্যাপিকা বলে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রইল। অনসূয়ার পরীক্ষা হতে না হতে অকস্মাৎ পিতৃবিয়োগ। ভাইবোন ছোট। তাদের দায়িত্ব নিতে নিতে কয়েক বছর কেটে গেল। বেচারার চেহারাটাও মামুলি। ফলে সে যুগে মেয়েদের বিবাহযোগ্যতার নির্দিষ্ট বয়সসীমা অতিক্রান্ত। কিন্তু লায়লা তো সুন্দরী, দায়বিহীন পরিবারের আশ্রয়ে নিরাপদ। তার ওপরে চার-চারটে দিদি বিবাহিত এবং প্রতিষ্ঠিত। লায়লার বিয়েশাদি হল না কেন? যাতায়াতের মধ্যে একবার শুনলাম বিলেত গেছে উচ্চতর শিক্ষালাভে। একটু অবাক লাগল। চাকরিতে ঢুকেছে বটে— সে তো পাশ করে অনেকেই ঢোকে— কিন্তু ঠিক বুদ্ধিজীবী পড়ুয়া টাইপ তো নয় লায়লা। কিছুদিন পরে শুনি কোন সাহেবের সঙ্গে ভাব। পরের বার কলকাতায় এসে জানলাম লায়লা এখন দেশে, আবার একলা। কৌতূহলবশে ফোন করি—কী লায়লা, কেমন আছ?

—আরে বিনতা এতদিনে আমাকে মনে পড়ল ইত্যাদি।

—সাহেবকে মনে ধরল না?

—সাহেব! খেপেছ? আলাপ হতে না হতে ওরা শুরু করে কনট্রাসেপটিভ নিয়ে আলোচনা। এত নীরস যে কী বলব! একটা ইন্ডিয়ান হলে অন্তত দুটো শয়ের কি রবি ঠাকুরের লাইন আওড়াবে।

—কিন্তু লায়লা, জীবনে কবিতার চেয়ে কনট্রাসেপটিভ বেশি ইম্‌পর্টেন্ট। সাহেবরা প্র্যাকটিক্যাল।

—উফ্, বিনতা তোমরা নিজেরা গিন্নিবান্নি হয়ে আমাকে দলে ভেড়াতে চাইছ! আমি কবিতা-টবিতা শুনতে ভালবাসি। আমার রোমান্স না হলে চলে না।

বুঝতে পারি ক'বছর স্বামী সন্তান গৃহস্থালির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আমাদের চরিত্র অনেক পাল্টে গেছে। তারুণ্যের আবেগ বা ঔদ্ধত্য কিছুই আর নেই। দেখা না হলে কল্পনা করি লায়লার অপরূপ শরীরে, উচ্ছল চরিত্রে আর সেই চোখের কালো দু'টি মুক্তোয় ধরা আছে আমাদের হারিয়ে যাওয়া যৌবন। আমাদের থেকে ভিন্ন হয়েই লায়লা আমাদের অন্তরে। ভাবতেও ভাল লাগে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর কলকাতায় এলে যথারীতি অনসূয়ার সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে। লায়লার প্রসঙ্গ উঠতেই বলল—জানিস ওর সেই বড়দিদি নূরজাহান মারা গেছে, খুন!

—সে কী রে! কোথায়? কেন?

—বাংলাদেশে। ভদ্রমহিলার স্বামী মুক্তিযুদ্ধের সময় নিখোঁজ হয়ে যান। ওদের এক মেয়ে আমেরিকায় থাকে। লিবারেশনের পর ভদ্রমহিলা প্রথমে মেয়ের কাছে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারেননি। তারপর এখানে মানে কলকাতায় ছিলেন। তখন আমি একবার লায়লাদের ওখানে গিয়েছিলাম। মহিলার বয়স হয়েছে, এত টালমাটাল গেছে, তবু কী অপূর্ব চেহারা! আর খুব ডিগনিফায়েড। দেখলেই মনে হয় অভিজাত। কিন্তু কথাবার্তা খাপছাড়া, মাঝে মাঝে কীরকম অন্যমনস্ক হয়ে যান। বাড়িতেই আছেন অথচ পরনে একটা দারুণ জমকালো দামী ঢাকাই। লায়লার ব্যবহারও

ভারি অদ্ভুত লাগল। তোর মনে আছে এই বড়দিদিকে কীরকম হিরোওয়ারশিপ করত? বড়দি বলতে অজ্ঞান। অথচ সেদিন কেমন মনে হল কোনও টানই নেই। বরং কেমন বিব্রত অপ্রস্তুত।

—স্ট্রেঞ্জ! এরকম ট্র্যাজিক সিচুয়েশান! নিজের দিদি অথচ সহানুভূতি নেই!

—সহানুভূতি নিশ্চয় ছিল কিন্তু ওঁর এখানে থাকাটা আমার মনে হয় অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। হতে পারে সেইজন্যই উনি বাংলদেশে ফিরে গেলেন। এখন কিন্তু লায়লা একেবারে বিধ্বস্ত।

খুব খারাপ লাগল। ভাবলাম লায়লাকে সমবেদনা জানাই। ফোন করলাম। সেই পুরাতন সজীব কণ্ঠস্বর—বিনতা! কতকাল পরে! বল কী কবর? ও বড়দি? হ্যাঁ, মারা গেছে। ট্র্যাজেডি তো বটেই। হবে না, আরও পাকিস্তানি বিয়ে কর! না-পাক অপবিত্রদের দেশে ছেড়ে পবিত্রভূমি পাকিস্তান কেমন জায়গা টেরটি পেল। জান্ দিয়ে।

—কিন্তু লায়লা, ট্র্যাজেডিটা তো ঘটেছে বাংলাদেশে। ওটা তো আর পাকিস্তান নয়।

—নাম পাল্টালেই কি স্বভাব পাল্টায়? সব মোগল যুগে বাস করে। জানো কীভাবে মরেছে দিদিটা? এই বয়সেও জুলুম থেকে রেহাই পায়নি। কী করেনি শরীরটাকে! হাতের আঙুলের নখ উপড়ে দিয়েছে। বুকভর্তি সিগারেটের ছ্যাঁকা....।

প্লিজ চুপ কর! নিজেকে আর কষ্ট দিও না। কিন্তু এসব কেন? কারা মাপল?

আল্লা জানেন। আমরা কী করে জানব, কী করব? এখানে যা হোক শান্তিতে আছি। তোমার ছেলেমেয়ে স্বামীর কথা বল। বলি। শেষে আবার জিজ্ঞাসা করি—জীবনটা এভাবেই কাটাবে? একলা?

কেন নয়, বিনতা? বেশ আছি। সময় থাকলে একদিন এসো না। দেখবে এত বছরে আমার ওজন এক কিলোও বাড়েনি, একগাছা চুলও পাকেনি।

—আর আমার যে কত কিলো বেড়েছে তা তো আর মাপই করি না, চুলের কথা তো ছাড়। সখেদে যোগ করি। সত্যি, বেশ আছে লায়লা। দৈনন্দিন গ্লানি বয়স অভিজ্ঞতা শোকদুঃখ সব দিব্যি হাঁসের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বাস্তবে সাঁতরে চলেছে।

—মামীমা, এই যে লায়লা ম্যাডামের বাড়ি। আমি এবারে যাই? চট্‌কা ভাঙে। এতক্ষণ অতীতে ফিরে গিয়েছিলাম। ভাগ্নির বন্ধু মিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে ইতস্তত পদে গেট খুলে বারান্দায় উঠি। আমাদের লায়লা তো? বছর পঁচিশ আগে অনসূয়ার হঠাৎ এনকেফেলাইটিসে মৃত্যুর পর যোগসূত্রটা ছিন্ন হয়ে গেছে। অনিশ্চিত হাতে দরজার পাশে বেল টিপি। একটা পাল্লা খুলল। ঘোর কালো ভারিক্কি চেহারার বৃদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে। প্রায় দুরুদুরু বক্ষে বলি—লায়লা আছে?—হ্যাঁ, ভেতরে আসুন, বসুন। যাই, বসি। চারিদিকে তাকাই। সেকেলে বাড়ি, বড়সড় ঘর, ভারি আসবাবপত্র, মেঝেতে অস্পষ্ট রঙের গালিচা, উঁচু উঁচু দরজা-জানলায় ঈষৎ বিবর্ণ সিল্কের পর্দা। ঘরে ঢোকে একটি মহিলা, শরীরে মাঝবয়সের ভাঙন, পরনে সাধারণ ছাপা কোটা শাড়ি, কাঁচাপাকা চুল কপাল থেকে টেনে পিছনে গার্ডারে বন্ধ এতটুকু লেজ হয়ে ঝুলছে। নাকের দু'পাশ থেকে গভীর দু'টি রেখা চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। ঠোঁটের কোণ ঝোলা, গায়ের রঙ তামাটে। চোখের দিকে তাকাই। সেই সরু টানা টানা চোখে ঘনকৃষ্ণ তারা। হ্যাঁ, লায়লাই বটে।

আমাকে চিনতে পারছ লায়লা? আমি বিনতা।

বিনতা! কতকাল পরে! এমন বদলে গেছ যে চেনাই যায় না। আমিই বা কি কম বদলেছি। এ বাড়ির ঠিকানা কোথায় পেলে? ও, তোমরা কলকাতায় ফিরে এসেছ। তোমার স্বামী রিটায়ার করেছেন। বল সব খবর কী, ছেলেমেয়ে....।

ওসব পুরোনো ব্যাপার, পরে বলব। আগে তোমার কথা শুনি। লায়লা আলম কী করে লায়লা হোসেন হল। পেলে কোথায় শেষমেষ মনের মানুষকে? তোমার মজনু? আমি স-ব জানতে চাই।

আরে ও তো বরাবরই ছিল। আমাদের ওয়েস্ট রেঞ্জের বাড়ির উল্টো দিকে থাকত। হাসিনাকে মনে আছে? আমাদের সঙ্গে পড়ত? ওরই মেজোদাদা।

এতদিন দেরি হল কেন?

ও তো প্রথমে আমার সেজদিকে লাইন লাগাত। পাত্তা পেল না। সেজদি বিয়ে করল ইউ পি-র বামুনকে। কনভার্ট করে অবশ্য। হ্যাঁ, ওরা আলিগড়ে থাকে। এদিকে এনার রোখ চেপে গেল। সবসময় তো আমাদের সঙ্গে রেষারেষি ছিল। একটা বাঙালি মেয়েকে সিভিল ম্যারেজ করে বসল। আরে বাবা, সেকুলার হওয়া অত সোজা! দিনের পর দিন জিরেবাটা দিয়ে পোনা মাছের ঝোল, শুক্তো, চচ্চড়ি, জলের মতো ডাল খাওয়া! হিন্দু স্ত্রী এদিকে বাড়িতে পুজোর ঘর বানাল। একটা ছেলে হল, তাকে সুন্নত পর্যন্ত করতে দিল না। ভাবো, আফটার অল ডাইরেক্ট ডিসেনডেন্ট অফ দ্য প্রফেট। খুব সাফার করেছে বেচারা। তখন আমাদের বাড়ি আসত খেতে, কথা বলতে। বড়দি মারা যাওয়ার পর আমিও ডিপ্রেসড। বলতে পারো দয়া করতে ভাল লাগত। অন্য দিদিরা সব জোর করতে লাগল, স্ত্রীকে তালাক দিক। সিভিল ম্যারেজ, অত সোজা নয়। সে প্রথমত রাজিই হয় না। যদিই বা হল ছেলেকে দেবে না, তার ওপর খোরপোষের ডিমান্ড। সারাজীবন দেওয়া সম্ভব, বল? ওদের ওয়েস্ট রেঞ্জেব বাড়িটা রিমডেল করে ক'টা ফ্ল্যাট বানিয়েছিল। তারই একটা বৌয়ের নামে লিখে দিয়ে ওয়ান টাইম সেটলমেন্ট। আমি বললাম, বাবা দিয়ে দাও। সম্পত্তির চেয়ে আজাদি বড়। ওই বৌটা কী করল জানো? ডিভোর্সের ক'মাসের মধ্যে ফ্ল্যাট বেচে গড়িয়াতে অন্য ফ্ল্যাট কিনল। আবার বিয়ে হয়েছে। নতুন স্বামী ছেলেটাকে অ্যাডাপ্ট করেছে। তার নাম এখন নীল দাশগুপ্ত। ভাবো, সৈয়দের বংশ!

ভাবলাম তারপর বলি—তাহলে এখন তো তুমি সুখী, আর কোনও সমস্যা নেই; ভালই আছ কী বল?

—কোথায় আর ভাল আছি! লেট ম্যারেজ, পর পর দুটো সিজার করে বাচ্চা, এই বয়সে তাদের মানুষ করে তোলা। শরীরটা একেবারে গেছে, হাইপ্রেসার, তার ওপরে এই ড্যাম্প বাড়ি। বুকে ঠাণ্ডা বসে যায় হরবকত।

—চারিদিকে এত ফ্ল্যাট-ট্যাট হচ্ছে, বাইপাসে, গলফগ্রীনে—একটা কিনে নাও না।

—সব জায়গায় তো আমরা যেতে পারি না। বয়স্থা মেয়ে একটা আছে। এই পার্ক সার্কাসেই দেখছি, পাচ্ছি না। চেনাজানা সোর্স তো কিছু নেই।

—তোমার ছেলেমেয়ে কী, স্বামী কী করেন বললে না তো?

—আর বলার কী আছে। মাইনরিটির কটাই বা রাস্তা খোলা। একটা ছোটমোট মেশিনারির কারখানা করেছে। লোকাল সি পি এমের সঙ্গে ভাল টার্মস। চলে যাচ্ছে একরকম। ছেলেটা তো জয়েন্টে কিছুই পেল না, বি কম পড়ছে। পাশটাশ করে যদি মিড্‌ল ইস্টে যেতে পারে। মেয়ে এম এ-তে চান্স পেল না, কম্পিউটারের কী কোর্স করছে। কোথায় যে বিয়েশাদি দেব! এখানে তো আর আমাদের কোনও ফিউচার নেই....।

শুনতে শুনতে মনে হল লায়লা কত দূরে, আমাদের মধ্যে কত ব্যবধান। আর যেন কাছাকাছি হওয়া যাবে না। লায়লা কথা বলে যায়, আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সেই সরু টানা টানা চোখ দু'টি ঘনকৃষ্ণ তারা, দু'টি কালো মুক্তো। ভেতর দেখা যায় না।

আসন

বাণী বসু

সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল। দর-দাম, দলিল-দস্তাবেজ, ইনকাম-ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সব। সব হয়ে যাবার পর গলদঘর্ম বাড়ি ফিরে একটু জল গরম করে নিয়ে ঠাকুর্দার আমলের বাথটাবটাতে শুয়ে শুয়ে বিকেল সাড়ে তিনটেয় একটা লম্বা অবগাহন স্নান। আ-হ্। যেন অনেক দিনের পুরনো পাপের বোঝা নেমে গেল ঘাড় থেকে। শুধু স্নান নয় শুচিস্নান। সত্যিই, পিছুটান বলে তো কিছু নেই। শুধু আপনি আর কপনি। তা আপনির ইচ্ছেমতো কপনি চলবে? না কপনির ইচ্ছেমতো আপনি! এ ক'দিনের মধ্যে এ নিয়ে বোধহয় সাতবারের বার গুরুদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু'হাত কপালে ঠেকালো সুনন্দা। স্থাবর সম্পত্তি বড় জ্বালা। বড় গুরুভার। হালকা হয়ে যে আকাশে পাখা মেলতে চায় ইঁট-কাঠ তার ঘাড়ের ওপর অনড় হয়ে বসে থাকলে সে বাঁচে কেমন করে? সবই গুরুদেবের কৃপা। বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কিনতে রাজিই হয়ে গেল শরদ দেশাই। তিন শরিকের এক শরিকি অংশ। বাবা নিজের অংশটুকু ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন তাই বাসযোগ্য ছিল এতদিন। সামনের উঠোন চৌরস করে ভেঙে খোলামেলা নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা খানিকটা। একটা আম গাছ, একটা নিম, সেগুলো ফেলেননি। নিম-আমের হাওয়া ভালো। তাছাড়াও আমের কোঁকড়া পাতায় ফাগুন মাসে কেমন কচি তামার রঙ ধরে! বাকি জায়গাটুকু নানা রকমের বাহারি গাছপাতা দিয়ে সাজানো। ফুল গাছ নয়, পাতাবাহার। বাবার শখের গাছ সব। না-বাগান, না-উঠোন এই খোলা জায়গাটুকু পার হতে হতে দোতলার লাল টালি ছাওয়া বারান্দাখানা চোখে পড়বে। তার ওপর ছড়ানো বোগেনভিলিয়ার ফাগ আর মুক্তো রঙের ফুলঝুরি। মার্চ-এপ্রিল থেকে ফুল ফোটা শুরু হবে, চলবে সেই যে অবধি।

বারান্দাটা যেন বেশ বড়সড় একখানা মায়ের কোল। তেমনি চওড়া, নিশ্চিন্ত-নির্ভর। সুনন্দার নিজের মায়ের কোলটিও বেশ বড়সড় ছড়ানো দোলনার মতোই ছিল বটে। মনে থাকার সেই বয়স পর্যন্ত শীতল, গভীর কোলটিতে বসে কত দোল খেয়েছে সুনন্দা। তারপর মায়ের বোধহয় বড্ড ভারি ঠেকল। হাত-পা ঝেড়ে চলে গেলেন, ফিরেও তাকালেন না। টাকার সাইজের এক ধামি সাদা ময়দার গোল পিংপঙ বলের মতো লুচি সাদা আলুভাজা দিয়ে না হলে যে সুনন্দা রেওয়াজে বসতে পারে না এবং সে জিনিস যে আর কারো হাত দিয়েই বেরোবার নয় সেকথা মায়ের মনে থাকল না।

অনেকদিন আগলে ছিলেন বাবা। মায়ের কোল থেকে বাপের কাঁখ, সে তো কম পরিবর্তন নয়! ঈশ্বর জানেন বাবাকে মা হতে হলে স্বভাবের নিগূঢ় বাৎসল্য রসের চালটি পর্যন্ত পালটে ফেলতে হয়। তিনি কি তা পারেন? কেউ কি পুরোপুরি পারে? মায়ের জায়গাটা একটা বায়ুশূন্য গহ্বরের মতো খালি না থাকলে বুঝবে কেন সে কে ছিল? কেমন ছিল? বোঝা যে দরকার। মা হতে পারেননি, কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন। তাই বাবা আরও ভালো বাবা, আরও পরিপূর্ণ বাবা হতে পেরে গিয়েছিলেন। পাঁচজন যেমন বউ মরলেই হুলু দিয়ে থাকে তেমন দিয়েছিল বৈ কি। তিনি চেয়ে ছিলেন মাথায় আধ-ঘোমটা গোলগাল ছবিটির দিকে। চোখ দু'টি ভারি উদাস, কিন্তু ঠোঁটের হাসিতে ফেলে যাওয়া সংসারের প্রতি মায়া ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা। তারপর ফিরে তাকিয়েছিলেন ঘুমন্ত ফুলো

ফুলো মুখ, ফুলো ঠোঁট আর বোজা চোখ দু'টির দিকে। ঘুমের মধ্যে চোখের মণিদুটো পাতার তলায় কাঁপছে। আহা! বড় বনস্পতির বীজ। কিন্তু কত অসহায়। মাতৃকুলে যন্ত্রসঙ্গীত পিতৃকুলে কণ্ঠসঙ্গীত। সরু সরু আঙুলে এখনই কড়া পড়ে গেছে। ওইটুকুন-টুকুন আঙুল তার টেনে টেনে এমন নাজনখরা বার করে যে মনে হবে রোশেনারা বেগম স্বয়ং বুঝি হোরি গুনগুন করছেন।

—'মানুষের আপন পেটের বাপ-মা কি দুটো হয়?' ভ্যাবল মেরে যাওয়া কন্যাদায়গ্রস্ত কিংবা হিতৈষীদের তাঁর এই একই উত্তর। নাও এখন মানে কর।

বালিকা থেকে কিশোরী, কিশোরী থেকে তরুণী, তরুণী থেকে যুবতী বাবা ঠায় কাঁধে মাথাটি নিয়ে। আয় ঘুম যায় ঘুম বর্গীপাড়া দিয়ে। একটি দিনের জন্যও ঢিলে দেননি। 'সুনি, নতুন শীত পড়েছে, বালাপোষখানা বার কর', 'সুনি, আদা তেজপাতা গোলমরিচ দিয়ে ঘি গরম করে খা, গলাটা বড্ডই ধরেছে', 'টানা তিন ঘণ্টা রেওয়াজ হল সুনি, আজ যেন আর খুন্তি ধরিসনি, তোর বাহন যা রেঁধেছে তাই ভালো।'

মাতৃহীন, অবুঝ, অভিমানী, তার ওপর অমন গুণী পিতৃদেব কিছুতেই আর বিয়ের জোগাড় করে উঠতে পারেন না। পাত্র ঠিক বলে তো পাত্রের বাড়ি যেন উল্টো গায়। বাড়ি ঘর ঠিক আছে তো পাত্র নিজেই যেন কেমন কেমন! অমন ধ্রুপদী বাপের সেতারী মেয়ের পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি নয়। গুণীর পাশে দাঁড়াতে হলে গুণী যে হতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু সমঝদারিটাও না জানলে কি হয়? বাবার যদি বা পছন্দ হয়, মেয়ে তা-না-না-না করতে থাকে।

—'অমনি রাঙা মুলোর মতো চেহারা তোমার পছন্দ হল বাবা? সব শুদ্দু ক'মণি হবে আন্দাজ করতে পেরেছো?'

মেয়ের যদি বা পছন্দ হল তো বাপের মুখ তোম্বা হয়ে যায়—'হলোই বা নিজে গাইয়ে। দুদিন পরেই কমপিটিশন এসে যাবে রে সুনি, তখন না জানি হিংসুটে-কুচুটে তোর কি হাল করে!'

এই হল সুনির বিবাহ বৃত্তান্ত। বেলা গড়িয়ে গেলেও উৎসুক পাত্রের অভাব ছিল না। কে বাগেশ্রী শুনে হত্যে দিয়ে পড়েছে, কে দরবারীর আমোদ আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু পিতা-কন্যার মন ওঠেনি। আসল কথা ধ্রুপদী পিতার ধ্রুবপদটি যে কন্যা! আর কন্যা তার পরজ-পঞ্চমের আরোহ-অবরোহ যখন ঘাট নামিয়ে-নামিয়ে বেঁধে নিয়েছিল পিতার সুরে, জীবনের সুরটিও তখনই ঠিক তেমনি করেই বাঁধা হয়ে গেছে।

বেলা যায়। বেলা কারো জন্যে বসে থাকে না। একটু একটু করে একজনের মাথা ফাঁকা হতে থাকে। আরেকজনের মাথায় রূপোর ঝিলিক দেয়। বাবার মুখে কালি পড়ে। শেষে একদিন পাখোয়াজ আর পানের ডিবে ফেলে উঠে আসেন শীতের মন-খারাপ করা সন্ধ্যায়।

—'কি হবে মা, বেশি বাছাবাছি করতে গিয়ে আমি কি তোর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দিলুম?'

ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সুনন্দা—'করেছোই তো, খুব করেছো, বেশ করেছো। এখন তোমার ডিবে থেকে দুটো খিলি দাও দেখি, ভালো করে জর্দা দিও, কিপটেমি করো না বাপু।' হেসে ফেলে মেয়ে। বাপের মুখের কালি কিন্তু নড়ে না।

অবশেষে সুনন্দা হাত দুটো ধরে করুণ সুরে বলে—'বাবা, একবারও কি ভেবে দেখেছো, আর কেউ সেবা চাইলে আমার সেতার, সুরবাহার, আমার সরস্বতী বীণ সইবে কি না। 'এই দ্যাখো,' কড়া পড়া দু'আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে সুনন্দা বলে—'এই দ্যাখো আমার বিবাহ-চিহ্ন, এই আমার শাঁখা, সিঁদুর।'

—'আমি চলে গেলে তোর কী হবে সুনি?' আঁধার মুখে বাবা বললেন।

—'বাঃ, এই আমার একলেশ্বরীর শোবার ঘর, ওই আমার তেত্রিশ কোটি দেবতার ঠাকুরঘর, ওই আমার জুড়োবার ঝুল-বারান্দা, আর বাবা নিচের তলায় যে আমার তপের আসন। আমি তো আপদে থাকবো না। এমন সজ্জিত, নির্ভর আশ্রয় আমার, কেন ভাবছো বলো তো?'

বাবার মুখে কিন্তু আলো জ্বলল না। সেই আঁধার গাঢ় হতে হতে যকৃৎ-ক্যান্সারের গভীর কালি মুখময়, দেহময় ছড়িয়ে পড়ল। অসহায়, কাতর, অপরাধী দু'চোখ মেয়ের ওপর নির্নিমেষ ফেলে রেখে তিনি পাড়ি দিলেন।

তার পরও দশ এগারোটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে, সুনন্দা খেয়াল করতে পারেনি। রেডিওয়, টেলিভিশনে, কনফারেন্সে, স্বদেশে বিদেশে উদ্দাম দশটা বছর। খেয়াল যখন হল তখন আবারও এক শীতের মন খারাপ-করা সন্ধ্যা। এক কনফারেন্সে প্রচুর ক্লিকবাজি করে তার প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দেয়নি, চটুল হিন্দি ফিল্মের আবহসঙ্গীত করবার জন্য ডাকাডাকি করছে এক হঠাৎ-সফল সেদিনের মস্তান ছোকরা, যে গানের গ-ও বোঝে না এখনও, এই বয়সেও এক আধা বৃদ্ধ গায়ক এতো কাছ ঘেঁষে বসেছিলেন যে টেরিউলের শেরওয়ানির মধ্যে আটকে পড়া ঘামের দুর্গন্ধ দামী আফটার শেভের সৌরভ ছাপিয়ে যেন নাকে চাবুক মেরেছে।

সামনের কম্পাউন্ডে নিমের পাতা আজ শীতের গোড়ায় ঝরে গেছে। আম্রপল্লবের ফোকরে ফোকরে শীতসন্ধ্যার কাকের চিকারি কানে তালা ধরায়, শরিকি বাড়ির ডান পাশ থেকে স্বামী-স্ত্রীর চড়া বিবাদ সান্ধ্য ভূপালির সুর বারবার কেটে দিয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকের বাড়ি থেকে কৌতূহলী জ্ঞাতিপুত্র বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে থেকে থেকেই কি যেন দেখে যাচ্ছে। এতো রাগ-রাগিণীর ঠাট মেল জানা হল, নিজের রক্তের এই রক্ত বীজটি যে কোন ঠাটে পড়ে, কি যে ও দ্যাখে আর কেন যে, সুনন্দা তা আজও ধরতে পারল না। শিল্পীবাড়ির শরিক যে কি করে এত রাম-বিষয়ী হয়, তাও তার অজানা। দেখা হলেই বলবে—'তোমাদের ড্রেনটা ভেন্ন করে ফ্যালো, আমি কিন্তু কর্পোরেশনে নোটিফাই করে দিয়েছি, এর পরে তুমি শমন পাবে।' হয় এই, আর নয়তো বলবে—'ইস, মেজদি, চুলগুলো তোমার এক্কেবারেই পেকে ঝুল হয়ে গেল। বয়ঃ কতো হল বলো তো!'

চুল পেকে গেলে যে কি ঝুল হয় তা সুনন্দা জানে না। আর, বিসর্গ যে উচ্চারণ করতে পারে 'স' উচ্চারণ করতে তার কেনই বা এতো বেগ পেতে হবে, তা-ও না। ও যেন যমের দক্ষিণ দুয়ার থেকে রোজ এসে একবার করে জানান দিয়ে যায়। 'এই যে মেজদি, তুমি হয়ে গেলেই আমার হয়ে যাবে।'

সামনের ঝুপসি অন্ধকারের দিকে চেয়ে সুনন্দা হঠাৎ বলে উঠল—'ধ্যাত্তেরি।'

বারান্দার আরাম-চেয়ার থেকে সে উঠে পড়ে, শোবার ঘরে ঢুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার একলা খাট-বিছানা, চকচকে দেরাজ-আমলারি, দেয়াল-আয়নার গোল মুখ, আবার বলে—'ধ্যাত্তেরিকা।' পাশে ছোট্ট ঠাকুরঘর। সোনার গোপাল, কষ্টিপাথরের রাধাকৃষ্ণ এসব তাদের কুলের ঠাকুর। মার্বেলের শিব, কাগজমণ্ডের বুদ্ধ, পেতলের নটরাজ, এসব শেলফের ওপর, নানা ছাত্র-ছাত্রী, গুণমুগ্ধ অনুরাগীর উপহার। চারদিকে সাদা পঙ্খের দেয়াল, খালি, বড্ড খালি। সীলিং থেকে জানলার লিনটেন বরাবর বেঁকা একটা চিড় ধরছে। সেই খালি দেওয়ালে একটি যোগীপুরুষের ছবি। সেই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে সে বলে—'তুমিই ঠিক। তুমিই সত্য। তুমিই শেষ আশ্রয়।'

ড্রয়ারের ভেতরে ফাইল, ফাইলের ভেতর থেকে 'মধুরাশ্রম' ছাপ মারা খামটা দিনের মধ্যে এই ায়বার সে তুলে নেয়।

মোটা সুতোর কাগজ। হাতের লেখা খুব জড়ানো। ঠাকুর এক বছর ধরে রোগশয্যায়। স্মিতমুখে শরের মতো টান-টান শয়ান। বুকের ওপর খাপ কাটা হেলানো লেখার ডেস্ক, মাথার দিকটা তোলা। ঠাকুর সিদ্ধদাস নিজ হাতে সুনন্দাকে এই চিঠি দিয়েছেন অন্তত ছ'মাস আগে।

সুরাসুর সিদ্ধাসু মা সুনন্দা,

তোমার সমস্যা নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ অনেক ভাবাভাবি করেছি মা। আমি ভাবার কেউ নয়, যাঁর ভাবনা তিনি ভাবছেন বলেই বুঝি তোমার সুরসমুদ্রটি এবার এমন স্রোত গুটিয়ে ভাটিয়ে চলল। তোমার হৃদয়ে যখন তাঁর ডাক এমন করে বেজেছে তখন দরজা দু'হাতে বন্ধ রাখবে সিদ্ধদাসের সাধ্য কি? তুমি এসো। মনের সব সংশয়, দ্বিধা ছিন্ন করে চলে এসো। বিষয়-সম্পত্তি তুমি যেমনি ভালো বুঝবে, তেমনি করবে। আশ্রমে খাওয়া-থাকার জন্য নামমাত্র প্রণামী দিতে হয় সে তো তুমি জানোই। এখানে বরাবর বাস করতে গেলে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরার বিধি। নিজের পরিধেয়র ব্যবস্থা তুমি নিজেই করবে। খালি এইটুকু মনে রেখো মা, তোমার বস্ত্র যেন অন্য আশ্রমিকাদের ছাড়িয়ে না যায়। তোমার মন্ত্র সব অবশ্যই আনবে না। তাঁর আশ্রম স্বর্গীয় সুরলাবণ্যে ভরিয়ে তুলবে, তাতে কি আমি বাধা দিতে পারি? তোমার সিদ্ধি সুরেই। সে তুমি এখানেই থাকো, আর ওখানেই থাকো। আমি ধনঞ্জয়কে তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে রাখতে বলছি। আসার দিনক্ষণ জানিও। গাড়ি যাবে। শ্রীভগবানের আর্শীবাদ তোমার ওপর সর্বদা থাকে প্রার্থনা করি।

সিদ্ধদাস

কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ঠাকুরঘরে জোড়াসনে বসে থাকে সুনন্দা। তারপর আস্তে আস্তে ওঠে। ঠাকুরকে ফুল জল দেয়, দীপ জ্বালে। ধূপ জ্বালে। একলা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, কালো পাথরের চকচকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। নিচের ঘরের তালা খুলে সুইচ টিপে দেয়। অমনি চারদিক থেকে ঝলমল করে ওঠে রূপ। আহা! কি রূপ, কত রূপ! কাচের লম্বা চওড়া শো-কেসে শোয়ানো যন্তরগুলো। সবার ওপরে চড়া সুরে বাঁধা তার হালকা তানপুরা। পরের তাকে ঈশ্বর নিবারণচন্দ্র গোস্বামীর নিজহাতে তৈরি, তার ষোল বছর বয়সে বাবার উপহার দেওয়া তরফদার সেতার। তারপর লম্বা চকচকে মেহগনি রঙের ওপর হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা সুরবাহার। আর সবার শেষে, একেবারে নিচের তাকে অপূর্ব সুন্দর সমান সুগোল দৈবী স্তনের মত ডবল তুম্বিশুদ্ধ সরস্বতী বীণা। তানসেনের কন্যা সরস্বতীর নামে খ্যাত সুগম্ভীর গান্ধর্বী নাদের বীণা। ডান দিকে নিচু তক্তাপোশে বাবার খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। কোণে বিখ্যাত শিল্পীর তৈরি কাগজের সরস্বতী মূর্তি— কাগজ আর পাতলা পাতলা বেতের ছিলে। বাঁ দিকে শ্বেতপাথরের বর্ণহীন-সরস্বতী, গুরুদেব জব্বলপুর থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলতেন 'অবর্ণা মা'। এই মূর্তির সানুদেশ ঘেঁষে মেঝের ওপর সমুদ্র নীল কার্পেট। তার ওপর সাদা সাদা শুক্তি-ছাপ। পাশেই আর একটি নিচু কাচের কেসে তার শেখবার সেতার এবং ডবল ছাউনির টঙটঙে তবলা। ঘরের মাঝখানে নিচু নিচু টেবিল-সোফা-মোড়ায় বসবার আয়োজন। মায়ের হাতের নকশা করা চেয়ার-ঢাকা, কুশন-কভার এখনও জ্বলজ্বল করছে।

সুনন্দা এই সময়ে রেওয়াজে বসবার আগে এ ঘরেও দীপ ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। ঘর খুলতেই যেন কতকালের ধূপগন্ধ তার নাকে প্রবেশ করল। অগুরু গন্ধে আমোদিত ঘর। মার্বেলের প্রতিমার সামনে দীপগাছ জ্বালিয়ে বিজলিবাতি নিবিয়ে দিল সুনন্দা। আধা-অন্ধকার ঘর যেন গন্ধর্বলোক। বাবার পাখোয়াজের বোল কি শুনতে পাচ্ছে সুনন্দা? না, না, সেখানে শুধু ইষ্টনাম। শুনতে পাচ্ছে কি গুরুজীর

সেই অনবদ্য বঢ়হত, আওচার, মন লুটিয়ে দেওয়া তারপরণ? দীপালোকে অস্ফুট ঘরে প্রতিমার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে সুনন্দা। হাতে নিবারণ গোঁসাইয়ের সেতার। সোনালি রূপালি তারে মেজরাপের ঝঙ্কার। রাগ দেশ। গুরুজী সিদ্ধ ছিলেন এই রাগে। সেতার ধরলেও যা সুরবাহার ধরলেও তা। বীণকারের ঘরের বাজ। সুরে ডুবে ডুবে বাজাতেন। আলাপাঙ্গে তাঁর অসীম আনন্দ। আলাপ থেকে জোড়, মধ্য জোড়, ডুব সাঁতার কেটে চলেছেন। নদীর তলাকার ভারী জল ঠেলতে ঠেলতে গর্তের মুখটাতে এসে যখন তেহাই মেরে ভেসে উঠতেন তখন আঙুলে সে কী জয়ের উল্লাস! অনেক দিনের স্বপ্ন বুঝি আজ সত্য হল। যা ছিল রূপকথার কল্পনাবিলাস তা বুঝি ধরা পড়ে গেল প্রতিদিনের দিনযাপনের ছন্দে রূপে। এমনিই ছিল গুরুজীর বাজের তরিকা। কনফারেন্সে বাজাতে চাইতেন না। অভ্যাস ছিল নিজের গুরুদেবের ছবির সামনে বীণ হাতে করে বসে থাকা। কিংবা গুটিকতক নিষ্ঠাবান তৈরি ছাত্র-ছাত্রী ও সমঝদারের সামনে আনন্দসত্র খুলতেন। বলতেন, 'আজ তোদের কাঁদিয়ে ছাড়ব। লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদবি বাবারা।'

কিন্তু সুনন্দা আজ জানতেই পারল না কখন তার দেশ তিলক কামোদ-এর রাস্তা ঘুরে ঘুরে বৃন্দাবনী সারঙের মেঠো সুর তুলতে লেগেছে। একেবারে অন্যমনস্ক। ক'দিন ধরেই এই হচ্ছে।

দিন না মাস! মাস না বছর! যেখানকার সেতার সেখানে শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে বলল 'আমি চললুম আমায় মাফ কর।' অবর্ণা সরস্বতীর দিকে ফিরে বদ্ধাঞ্জলি আবারও বলল, 'পারলে ক্ষমা কর, আমি চললুম।'

মধুরাশ্রমে ধনঞ্জয়ের সাজানো ঘরে, নিশ্বাসে মালতীফুলের গন্ধ আর দু'চোখ ভরা তারার বৃষ্টি নিয়ে তবে যদি এ হাতে আবার সুরের ফুল ফোটে। আর যদি না-ই ফোটে তো না ফুটুক। অনেক তো হল। আর কিছু ফুটবে। তাই আর কিছুর জন্যে সে বড় উন্মুখ হয়ে আছে।

২

মধুরাশ্রমে ঢোকবার গেট বাঁশের তৈরি। তার ওপরে নাম না-জানা কি জানি কি নীল ফুলের বাহার। মধুর মধুর। জমিতে মধু, হাওয়ায় মধু, জলে মধু। ভেতরে দেখো বিঘের পর বিঘে বাগান, ফলবাগান, ফুলবাগান, সবজিবাগান। প্রতি বছরেই একবার করে এখানে এসে জুড়িয়ে যায় সুনন্দা। কোলাহল নেই। না যানের, না যন্ত্রের, না মানুষের। নিস্তব্ধ আশ্রয় জুড়ে শুধু সারাদিন বিচিত্র পাখির ডাক। সন্ধান দিয়েছিল আজ দশ এগার বছর আগে—মমতা বেন। এক ছাত্রী। মমতার বাপের বাড়ির সবাই সিদ্ধদাসের কাছে দীক্ষিত। বাবার মৃত্যুর পর তখন সেই সদ্য সদ্য সুনন্দার মধ্যে একটা হা-হা শূন্যতা তেপান্তরের মাঠের মতো। সব শুনে বুঝে ছাত্রী মমতা গুরুগিরি করল। ঠাকুর সিদ্ধদাসের হাতের ছোঁয়ায় অনেকদিনের পর সেই প্রথম শান্তি।

দেশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও মমতার মাধ্যমে মধুরাশ্রমে যখন মন টানল তখন শরিকি বাড়ির অংশটুকু নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছিল সুনন্দা। মোটে আড়াই কাঠার বাস্তু, তার ওপরে তো আর জগদ্দল কংক্রিট-দানব তৈরি করা যাবে না, সুতরাং প্রোমোটারে ছোঁবে না। যারা বাস করবার জন্য কিনতে চায় তারাও দু'দিকে শরিকি দেয়াল দেখে সরে পড়ে। জমির দাম আকাশ-ছোঁওয়া। কে আর লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিবাদ-বিসংবাদ কিনতে চায়? এই রকম হা-হতোস্মি দিনে মমতা বেন দেশাইয়ের খোঁজ দিয়েছিল। কোটিপতি ব্যবসায়ী, কিন্তু সমাজসেবার দিকে বিলক্ষণ নজর। সোশাল সার্ভিস সেন্টার খুলবে। একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনতে চায়। পরিবার-পরিকল্পনা, ফার্স্ট এড, শিশু

কল্যাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সুনন্দার বাড়ি তার খুব পছন্দ হয়ে গেল। বসবার ঘরটাকে পার্টিশন করেই তিনটি বিভাগ খুলে দেওয়া যায়। ভালো দাম দিল দেশাই।

সবটুকুই সামলালো মমতা আর তার স্বামী। সমস্ত আসবাবসমেত বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছে সুনন্দা। মায়ের বিয়ের আলমারি, খাট দেরাজ, সোফাসেট, রাশি রাশি পুতুল আর কিউরিও ভর্তি শো-কেস, বাহারি আয়না, দেওয়ালগিরি, ঝাড়বাতি, সমস্ত সমস্ত। শ্বেতপাথরের সরস্বতী প্রতিমাটি মমতাকে সে উপহার দিয়েছে। বেত-কাগজের শিল্পকীর্তি দেশাইয়ের বড় পছন্দ। তার নিজস্ব বাড়ির হলঘরে থাকবে। বিক্রিবাটার পর যতদিন সুনন্দা থেকেছে, বাড়ি যেমন ছিল তেমনি। আশপাশের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কিচ্ছু।

ঠাকুরঘরের ফাটল আর শোবার ঘরে বাঁ কোণে চুঁইয়ে-পড়া জলের দাগটার দিকে তাকিয়ে সুনন্দা মনে মনে ভেবেছিল 'বাব্বাঃ, এসব কি একটা একলা মেয়ের কম্মো!' ওই ছাদ কতবার হাফ-টেরেস হল, টালি বসানো হল, তা সত্ত্বেও জল চোঁয়াচ্ছে দেখে মাঝরাত্তিরে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল সে। এখন বেশ ঝাড়া হাত, ঝাড়া পা, পরনে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর হাতে সেতার, বাঃ!

এবার যেন মধুরাশ্রম আরও শান্তিময় লাগল। গুরুভাই ধনঞ্জয় সেই ঘরটাই ঠিক করে রেখেছে যেটাতে সে প্রত্যেকবার এসে থাকে। সরু লম্বা। ছয় বাই বারো মতো ঘরটা। ঢোকবার নিচু দরজা সবুজ রঙ করা। উল্টো দিকে চার পাল্লার জানলা। খুলে দিলেই বাগান। এখানকার সবাই বলে মউ-বাগান। মউমাছির চাষ হয় ফুলবাগানের এই অংশে। ঘরের মধ্যে নিচু তক্তাপোশে শক্ত বিছানা। একপাশে সেতার রেখে শুতে হবে। একটিমাত্র জলচৌকি। ট্রাঙ্ক সুটকেস রাখতে পারো, সেসব সরিয়ে লেখার ডেস্ক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো, কোণে চারটে ইটের ওপর মাটির কুঁজো। আশ্রমের ডিপ টিউবওয়েলের জল ধরা আছে। ঘরের বাইরে টিউবওয়েলের জলে হাত পা ধুয়ে পাপোশে পা মুছে, কুঁজো থেকে প্রথমেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল সুনন্দা। আহা! যেন অমৃত পান! ধনঞ্জয় বলল, 'দিদি, ঠাকুরের সঙ্গে যদি দেখা করবেন তো এই বেলা।'

ট্রেনের কাপড় ছেড়ে সঙ্গে আনা বেগমপুরের লাল পেড়ে শাড়িটি পরে দাওয়া পেরিয়ে ঠাকুর সিদ্ধদাসের ঘরে চলল সুনন্দা। চারদিকে খোলা আকাশ, একেবারে টইটুম্বুর নীল। সেই আকাশটা তার রঙ, তার ব্যাপ্তি, তার গাঢ়তা আর গভীরতা নিয়ে ফাঁকা বুকের খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে টের পেল সে। প্রণাম করল যে, আর প্রণাম পেলেন যিনি উভয়েরই মুখ সমান প্রসন্ন। সিদ্ধদাস বললেন, 'মা খুশি হয়েছ তো?' আলোকিত মুখে জবাব দিল সুনন্দা।

ঠাকুর সিদ্ধদাস তাঁর পুবের ঘরে আসন থেকে বড় একটা নড়েন না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে একবার, সন্ধ্যায় একবার আশ্রমের চত্বর বাগান ঘুরে আসেন। নিত্যকর্মের সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে তিনি তাঁর আসনে স্থির। ভোরবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সুনন্দার। সে-ও সে সময়টা বেড়াতে বেরোয়। কিন্তু তখন সিদ্ধদাস তদগত তন্ময়। কারো সঙ্গে কথা বলেন না, হনহন করে খালি হেঁটে যান। কে বলবে ক'মাস আগেও কঠিন রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

এখানকার দিনগুলি যেন বৈদিক যুগের। শান্তরসাস্পদ। পবিত্র, সরল, উদার, সুগন্ধ। একটু কান খাড়া করলেই বুঝি মন্ত্রপাঠের ধ্বনি শোনা যাবে। নাসিকা আরেকটু গ্রহিষ্ণু হলেই যজ্ঞধূমের গন্ধ পাওয়া যাবে। যেন জমদগ্নি, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, উপমন্যু এই বন বাগানের অন্তরালে কোথাও না কোথাও নিজস্ব তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু কী আশ্চর্য, আশ্রমের রাতগুলি যে আরব্য উপন্যাসের! তারার আলো যেন একটা রহস্যজাল বিছিয়ে দেয় রাত আটটা নটার পরা। কে যেন ট্যাঁও ট্যাঁও করে

রবাবের তাঁতের তারে চাপা আওয়াজ তোলে, চুমকি বসানো পেশোয়াজ, ওড়না সারা আকাশময়, ঘুঙুর পায়ে উদ্দাম নৃত্য করে কারা, হঠাৎ কে তীব্র স্বরে চিৎকার করে বলে 'খামোশ'। একদিন দু'দিন করে মাস কেটে গেল। আকাশে বাতাসে চাপা রবাবের আওয়াজ শুনে শুনে সুনন্দা আর থাকতে পারে না। ব্রাহ্ম মুহূর্তে বেড়াতে বার হয় না সে, চৌকির ওপর বিছানা গুটিয়ে রাখে। সদ্যতোলা গোলাপফুল রেকাবির ওপর রেখে অদৃশ্য সরস্বতী মূর্তিটির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সেতারের তারে মেজরাপ ঠেকায়। ললিতে আলাপ। মন্দ্র সপ্তকে শুরু। খরজের তারে অভ্যাস মতো হাত চালায়, টাঁই আওয়াজ করে তার নেমে যায়, নামিয়ে তারগুলোকে আবার টেনে টেনে বাঁধে সুনন্দা। কান লাগিয়ে লাউয়ের ভেতরের অনুরণন শোনে। আবার আলাপ ধরে। তারগুলি কিন্তু সকালে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে, সুনন্দার তর্জনী আর মধ্যমার তলায় যেন কিলবিল করছে অবাধ্য, সুর ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া কতকগুলো সাপ, জোর হাতে কৃন্তন লাগাতে গিয়ে আচম্‌কা ছিঁড়ে যায় তার।

সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরের ঘরের ধ্যানের আসর থেকে নিঃশব্দ পায়ে উঠে আসে সুনন্দা। সকালবেলাকার সেই ছেঁড়া তার যেন আচমকা তার বুকের মধ্যে ছিটকে এসে লেগেছে। সারি সারি নিস্তব্ধ, তন্ময় গুরু ভাইবোনেরা। কেউ লক্ষ্যও করে না। কিন্তু তার মনে হয় ধূপজ্বালা অন্ধকারের মধ্য থেকে জোড়া জোড়া ভুরু তার দিক পানে চেয়ে কুঁচকে উঠছে।

রাতে তার ঘুম আসে না। সকালের ডাকে কলকাতার চিঠি এসেছে। অন্তরঙ্গ এক সহকর্মী দুঃখ করে লিখেছেন, তিনি ছিলেন না বলেই সুনন্দা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। তিনি থাকলে নিশ্চয় বাধা দিতেন। কেন যে এ কথা লিখেছেন পরিষ্কার করে বলেননি। সুনন্দার ভালো-মন্দ সুনন্দা কি নিজে বোঝে না। জানালা দিয়ে কত বড় আকাশ দেখা যাচ্ছে। শহরে সেই গলির বাড়িতে এতো বড় আকাশ অকল্পনীয় ছিল। আস্তে আস্তে মনটা কি রকম ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ছে ওই আকাশে, তার যেন আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব থাকছে না। কিছুতেই তাকে গুটিয়ে নামাতে পারছে না সে আঙুলে।

মাস তিনেকের মাথায় সিদ্ধদাস নিভৃতে ডেকে পাঠালেন—'মা, খুবই কি সাধন ভজন করছ?'

সুনন্দা চুপ।

'তোমার বাজনা শুনতে পাইনে তো মা!'

—'বাজাই না ঠাকুর?'

চমকে উঠলেন সিদ্ধদাস, 'বাজাবার কি দরকার হয় না মা? এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন বাজাবার দরকার আর হয় না, মন আপনি বাজে।'

—'আমার সে দিন তো আসেনি!' সুনন্দা শুকনো মুখে বলল—'আঙুলে যেন আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। হাত চলে না। সুর ভুলে যাচ্ছি, হৃদয় শুষ্ক। সুনন্দার চোখ দিয়ে এবার অধৈর্য কান্না নামছে, 'অপরাধ নেবেন না ঠাকুর, কিছু ভালো লাগছে না, সব যেন বিষ, তেতো লাগছে সব।'

সিদ্ধদাস বললেন, 'অপরাধ কি নেবো! তুমিই আমার অপরাধ মার্জনা করো না। তোমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারিনি। কিছুদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছি তুমি খাচ্ছো না ভালো করে, ঘর ছেড়ে বেরোও না, ধ্যানের সময়ে আসো না। মন অস্থির চঞ্চল হয়েছে বুঝেছি। তুমি আর কিছুদিন অপেক্ষা করো, একটা না একটা উপায় বার হবেই, আশ্রম কখনও তোমাকে জোর করে ধরে রাখবে না। তোমার যেখানে আনন্দ, তাঁরও যে আনন্দ সেইখানেই।'

সেই রাত্রে অনেক ছটফট করে ঘুমিয়েছে সুনন্দা, দেখল সে সমুদ্রের ওপর বসে বাজাচ্ছে। বার বার ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। বিশাল তুম্বি সুদ্ধু বীণ বারবার তার সিল্কের শাড়ির

ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। খড়খড়ে তাঁতের কাপড় পরে এলো সে। বীণে মিড় তুলেছে। পাঁচ ছয় পর্দা জোড়া জটিল মিড়। কার কাছে কোথায় যেন শুনেছিল। কিছুতেই পারছে না। বীণ শুধু গ্যাঁও গ্যাঁও করে মত্ত দাদুরির মতো আওয়াজ তুলে চলেছে, হাত থেকে ছটাং ছটাং করে তার বেরিয়ে যাচ্ছে। এক গা ঘেমে ঘুম ভেঙে গেল, বীণ কই? সুরবাহার কই? সে সব তো এখনও আসেইনি। আঁচল দিয়ে সেতার মুছে দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল সুনন্দা। শেষ রাতে আবার চোখ জড়িয়ে এসেছে। আবারও সেই স্বপ্ন। সমুদ্রের ওপর বীণ হাতে একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। হাত থেকে বীণ ফসকে যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সুনন্দা।

দরজার কড়া নড়ছে জোরে। ঝাঁকাচ্ছে কেউ। খুলতেই সামনে মমতা।

—'সারা রাত কী বৃষ্টি! কী বৃষ্টি! এখানে পৌঁছে দেখি বালি মাটির ওপর দিয়ে সব জল কি সুন্দর সরে গেছে', মমতা একগঙ্গা বকে গেল, তারপর অবাক হয়ে বলল—'একি সুনন্দাদি, কাঁদছ কেন!'

সুনন্দা চোখের জল মুছে বলল, 'তুই হঠাৎ? কি ব্যাপার? আমার বীণ নিয়ে এসেছিস?'

মমতা বলল, 'ব্যাপারই বটে সুনন্দাদি। বীণ আনবো কি? গোটা বাড়িটাকেই বুঝি তুলে আনতে হয়।'

ঘরে এসে বলল মমতা, 'শোনো সুনন্দাদি, রাগ করো না। দেশাই তোমার বাড়ি নিতে চাইছে না। বলছে ওখানে ভূত আছে। রি-মডেলিং করার আগে যোশী আর দেশাই কদিন তোমার নিচের ঘরে শুয়েছিল, অমন সুন্দর ঘরখানা তো। তা সারা রাত বাজনা শুনেছে।

—'যাঃ'—সুনন্দা অবাক হয়ে গেছে, 'কী বাজনা।'

—'ওরা কি অত জানে! খালি বাজনা, কত বাজনা। ঘুম আসলেই শোনে, চোখ মেললেই সুর মিলিয়ে যায়, ঘরের একটা জিনিসও সরাতে পারেনি।'

—'কেন?' মমতাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুনন্দা।

—'কেন আর? কিছুই না। জিনিস সরাতে গেলেই অমন কাঠখোট্টা ব্যবসাদারেরও মনে হয় আহা থাক। বেশ আছে, বড় সুন্দর আর ক'দিন যাকই না।'

সুনন্দা বলল—'তুই বলছিস আমার ঘর যেমন ছিল তেমনি আছে?'

—'শুধু ঘর নয় গো। বাড়ির আসবাব যা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে।'

সুনন্দা হঠাৎ উত্তেজিত পায়ে বাইরে ছুটল, 'ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয় !'

—'কি দিদি!'

—'আমি আজকের গাড়িতেই কলকাতা যাচ্ছি। আমার বাজনা প্যাক করে তুলে দেবার ব্যবস্থা করো ভাই।'

বৃষ্টি ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ঘরে ফিরছেন ঠাকুর সিদ্ধদাস। উদ্‌ভ্রান্ত সুনন্দা উল্কার মতো ছুটে আসছে।

—'ঠাকুর ঠাকুর, আমি বাড়ি ফিরছি, বাড়ি।'

স্মিতমুখে ডান হাত তুলে সিদ্ধদাস বললেন, 'স্বস্তি স্বস্তি।'

কেউ নেই এখন। কেউ না। না তো। ভুল হল। আছেন। অবর্ণা, বর্ণময়ী আছেন। সর্বশুক্লা। তাই লক্ষ সুরের রঙবাহার তাঁর পায়ের কাছে মিলিয়ে গিয়ে আরও লক্ষ সুরের আয়োজন করে। সেতার নামিয়ে আজ বীণ তুলে নিয়েছে সুনন্দা, গুরুজীর শেষ তালিম ছিল বীণে। বলতেন, 'নদী তার নাচন-

কোঁদন সাঙ্গ করে সমুদ্রে গিয়ে মেশে বেটি, বীণ সেই সমুন্দর সেই গহিন গাঙ। বীণ তক পঁহুছ যা।' সুনন্দা তাই বীণে এসে পৌঁছেছে। মগ্ন হয়ে বাজাচ্ছে, হাতে সেই স্বপ্নশ্রুত মিড়। সুরের কাঁপনে বুকের মধ্যে এক ব্যথামিশ্রিত আনন্দ, তবুও মিড়ের সুক্ষ্ম জটিল কাজ কিছুতেই আসছে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, সুনন্দা অসম্পূর্ণ সুরের জাল বুনেই চলেছে, বুনেই চলেছে। খোলা দরজা, বাইরের ছায়াময় উঠোন বাগান দেখা যায়। কিন্তু সুর বন্দিনীর মতো গুমরে গুমরে কাঁদছে ঘরময়। কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না। সেই সঙ্গে মুক্তি দিচ্ছে না তাকেও। দরদর করে ঘাম নামছে, ঘাম না কি চোখের জল যা দেহের রক্তের মতোই গাঢ়, ভারী! পরিচিত জুতোর শব্দ, খোলা দরজা দিয়ে গুরুজী এসে ঢুকলেন, বললেন 'সে কি? এতোক্ষণেও পারছিস না বেটি। এই দ্যাখ।' চট করে দেখিয়ে দিলেন গুরুজী। কয়েকটা শ্রুতি ফসকে যাচ্ছিল। স্মৃতির কোণে কোথায় লুকিয়ে বসেছিল। গুরুজী তাদের টেনে আঙুলে নামিয়ে আনলেন। সুনন্দা বাজিয়ে চলেছে। হুঁশ নেই আনন্দে। গুরুজী যে চলে যাচ্ছেন, ওঁকে যে অন্তত দু'খানি পান দেওয়া দরকার সে খেয়ালও তার নেই। যাবার সময়ে বলে গেলেন—'আসন, বেটি। আসন! তুই যে আসনে ধ্যান লাগিয়েছিস, তুই ছাড়লেই সে তোকে ছাড়বে কেন?' বলতে বলতে গুরুজী মসমস করে চলে গেলেন। হঠাৎ দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সুনন্দা যেন এতক্ষণ ঘোরে ছিল। সে বীণ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। গুরুজী এসেছিলেন এত রাত্রে? সে কি? পান? আন্তত দু খিলি পান...কাকে পান দেবে? গুরুজী তো বাবা যাবার তিন বছর পরেই কাশীতে...। চার দিকে চেয়ে দেখে সুনন্দা। খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়। নিমের পাতায় হু হু জ্যোৎস্না। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল সে, তারপর তীব্র ভঙ্গিতে এসে বীণ তুলে নিল। মিড় তুলল। সেই জটিল, অবাধ্য মিড়। হ্যাঁ। ঠিকঠাক বলছে। অনেক দিনের স্বপ্নের জিনিস তুলতে পেরে এখন সুনন্দার হাতে সুরের জোয়ার। আরও মিড়, জটিলতর, আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রাণমন কাঁদানো, সব মানুষের মধ্যেকার জাত-মানুষটাকে ছোঁবার মিড়। গুরুজী সত্যি এসেছিলেন কি আসেননি তৌল করতে সে ভুলে যায়। সে তার আসনে বসেছে, তার নিজস্ব আসন। সমুদ্র নীলের ওপর বড় বড় শুক্তি ছাপ। সাত বছর থেকে এই আসনে বসে সে কচি কচি আঙুলে আধো আধো বুলির মতো কতো কবিতা সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম নাজ নখরা ফুটিয়েছে ত্রিতন্ত্রী বীণায়। ঠিক যেমনটি কেশরবাই কি রোশেনারা রেকর্ডে শুনেছে। অবর্ণা দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে, কিন্তু নতমুখ আত্মমগ্ন হয়ে, সারারাত সুনন্দা সমুদ্রের দিকে চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। পাশে শোয়ানো সেতারের তরফের তারগুলি ঝংকৃত হয় থেকে থেকে। কাচের কেসের ডালা খোলা। সেখান থেকে সরু মোটা নানান সুরে আপনা আপনি বেজে ওঠে সুরবাহার, তানপুরা।

কে আছে দাঁড়িয়ে এই সুরের পারে? তারের ওপর তর্জনীর আকুল মুদ্রায় প্রশ্ন বাজতে থাকে। কে আছে? কে আছে? ঝংকারের পর ঝংকারে উত্তর ভেসে আসে সুর। আরও সুর। তারপরে? আরও সুর। শুধুই সুর। ধু ধু করছে সুরের কান্তার। ঠিক আকাশের মতোই। তাকে পার হবার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু সেই সুরের ধূলি বৃন্দাবন রজের মতো সর্বাঙ্গে মাখো। সেই সুরের স্রোতে ভেসে যাও, আর সুরের আসনে স্থির হয়ে বসো। 'মন রে, তুই সুরদীপ হ'।

মৈনাক

কণা বসু মিশ্র

বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। 'ভালোবাসি' কথাটা বলার সাহস সেদিন পাইনি। আমি জানি সাহস তৈরি করতে তুমি সাহায্য করতে, যদি জানতে তোমার প্রতি আমিও দুর্বল। পুরনো সংস্কারের ঘেরাটোপ থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারিনি। মামলা, মকদ্দমা হোক, কাগজে কাগজে ছাপা হোক আমার মশলা মাখা কাহিনী, তা আমি চাইনি। সম্মান, আর আভিজাত্যের মোহ আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছিল। আমি শুধু ওপরের সিঁড়ির কথাই ভেবেছি । কিছুতেই নামতে পারিনি কয়েক ধাপ নিচে নেমে তোমার হাত ধরতে।

মৈনাক! তোমার বুকের মধ্যে রক্ত ঝরে যেত আমি কি জানি না? তোমার একের পর এক টেলিফোনে আমি নিরুত্তর। সন্ধের অন্ধকার নেমে আসত, আমি চুপচাপ একলা গিয়ে দাঁড়াতাম আমাদের বাংলোর রেলিং ধরে পাহাড়ের ওপরে। নিচে অশান্ত ব্রহ্মপুত্র। তার ঢেউ আচাড় খাচ্ছে পাড়ে। তখন তোমার জন্যে কান্না পেত। তোমায় কতদিন দেখেছি বিকেলে আমাদের বাংলোর দিকে উঠে আসছ'। পাহাড়ের ঘোরানো রাস্তার চক্কর বেয়ে বেয়ে। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছে। আমার স্বামী রৌরবের তখন অফিস থেকে ফেরার কথা । চাপরাশিকে ডেকে বলেছি, দরওয়ানকে বলে দাও, ওকে যেন গেটের ভেতরে ঢুকতে না দেয়। ওই যে বাবু আসছে, ওকে। দরওয়ান যেন বলে দেয়—মেমসাব ঘরমে নেহি হ্যায়।

মৈনাক! তোমার ফিরিয়ে দিয়ে কতদিন কৌতুকবোধও করেছি। একদিকে নিজেকে দামি রাখার দুর্লভ বাসনা, অন্যদিকে জ্বালা। মাঝে মাঝে দুর্লভ বাসনা, অন্যদিকে জ্বালা। মাঝে মাঝে এমন হয়েছে, পাগলের মতো তুমি একটার পর একটা ফোন করে গেছ। টেলিফোন বেজে বেজে থেমে গেছে। প্রথমবার গলা শোনার পরই। তুমি নিজেকে যত সস্তা করেছ, আমার দাম ততই বেড়েছে। অথচ তুমি তো মূল্যহীন অযোগ্য কেউ ছিলে না। তুমি তোমার প্রেমের জন্যে আমার জন্যে যে সব করতে পার, এ কথা ভেবেই আমার জীবন রসের রসিকতা।

সরকারি তকমা আঁটা এ শহরের ডেপুটি কমিশনারের স্ত্রী আমি। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে পাহাড়ের ওপর আমাদের বিশাল বাংলো। হতে পার তুমি একজন অধ্যাপক, সমাজে কিছু সম্মানের সেলাম পেয়ে থাক, ছাত্র গড়ার কারখানার একজন মেধাবী অধ্যাপক হিসেবে। কিন্তু আমার স্বামী ধনে, মানে, জনে তোমার থেকেও বড়। এই অহংকারে গাড়ির ধুলো উড়িয়ে তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে কতদিন যে চলে গেছি মৈনাক! তোমার বারোহোলিয়ার পুরনো একতলা বাড়িটার ছ্যাঁতাধরা দেওয়ালের গায়ে মানিপ্ল্যানটের বিশাল ঝাড়টার আড়ালে খোলা জানলার গরাদের মধ্যে চোখে পড়েছে টেবিল লাইটের আলোয় ঝুঁকে পড়া তোমার গম্ভীর মুখটা। সামনে বই খোলা। কতদিন গাড়ির শব্দে চোখ

দুটো তুলে তুমি তাকিয়েছ রাস্তায়। কিন্তু মুহূর্তে ছুটে গেছে আমার মুখ গাড়ির জানলা থেকে। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেছে গাড়ি। অথচ জানতেও পারনি তোমার পাশে পাশে আমি ছায়ার মতো রয়েছি। আমি বিশ্বাসঘাতক, অহংকারী বড়লোকের বউ, এটাই শুধু পরিচয় হয়ে থাকল তোমার কাছে।

জানো মৈনাক! আমি ডায়েরি লিখতাম। সেই রোজ নামচায় তোমায় বিলকুল বদলে দিয়েছিলাম। সেখানে তুমি ছিলে আমার গল্পের এক নায়ক। সুব্রাম্মনিয়াম, যার বাড়ি ছিল চেন্নাই। ওই দক্ষিণ ভারতীয় যুবকটির প্রেমিকা একটি অসমীয়া মেয়ে। লপং আমার স্বামী রৌরব চুরি করে ডায়েরি পড়ত প্রায়ই। ওকে ফাঁকি দেবার এ একটা কায়দা। গল্পের নায়িকার জন্য সমবেদনা থাকত রৌরবের। কখনও গল্পের নায়কের জন্যেও। মাঝে মাঝে ও কিছু মন্তব্য করত লাল পেনসিলের আঁচড়ে। কড়া দাগে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠত।

—তুমি আমার ডায়েরি পড়েছিলে?

—কারও ডায়েরি পড়ার বদ অভ্যেস আমার নেই।

—তবে কে দিয়েছে লাল পেনসিলে দাগ, তোমার হাতের লেখায় মন্তব্য।

—ওটা তো তোমার ডায়েরি নয়। গল্প।

—তাই বলে, তুমি চুরি করে পড়বে?

—ইয়েস্ সেই অধিকার আমার রয়েছে! বিয়ে করা বউ, এক ছাদের তলায় বাস করছি। বউ কার সঙ্গে প্রেম করছে খবর রাখব না?

—আমি প্রেম করছি?

—ওই হল, তোমার গল্পের নায়িকা।

জানো মৈনাক। একদিন কী হল? ডায়েরি খুলে দেখি, রৌরব লিখে রেখেছে, লপং! তুমি ইচ্ছে করলে সুব্রাম্মনিয়মের সঙ্গে চলে যেতে পার। সুব্রাম্মনিয়মকে কাঁদিয়ে লুকিয়ে প্রেমের জ্বালা ভোগের কোনও মানেই হয় না। আর সুব্রাম্মনিয়ম! তোমায় বলি, তুমিই বা প্যানপেনে কেন? সোজাসুজি ঢুকে যাও বড়লোকের ড্রইংরুমে। বুক ফুলিয়ে দাবি কর তোমার নায়িকাকে।

তারপর থেকে আমার গল্পের নায়ক আর নায়িকার ওখানেই ছেদ্ পড়ল। মৈনাক! আমি ডায়েরি লেখা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু মনে মনে আমার ডায়েরি লেখা তো বন্ধ হয়নি। স্বামীর সঙ্গে সহবাসের একান্ত মুহূর্তে মৈনাক নামের যুবকটির জন্যে চোখের জল কী যে কষ্ট!

—তোমার ভালো লাগছে না?

শরীর শরীর মিশিয়ে রৌরবের প্রশ্ন।

—খুব।

—তবে কাঁদছ কেন?

—আনন্দাশ্রু।

স্বামী, মেয়ে নিয়ে আমার তো সুখের সংসার। রৌরবের অফিস থেকে ফেরার পর লনে বসে দু'জনে চায়ের পর্ব। সবুজ নরম ঘাসের কার্পেটের ওপর বাগানের গার্ডেন চেয়ারে দু'জন মুখোমুখি। টিপট থেকে চা ঢেলে কাপে চামচে দিয়ে চিনি নাড়তে নাড়তে এগিয়ে দিই রৌরবকে। মেয়েটা ব্যাডমিন্টন খেলছে। ওর এক বন্ধুর সঙ্গে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি অন্যমনস্ক। ব্রহ্মপুত্রের গর্জন ভেসে আসছে। ঢেউ ভাঙছে।

ছোটবেলা থেকেই ঢেউ গোনাটা আমার ভালো লাগে। কখনও জীবনের, কখনও নদীর, কখনও সমুদ্রের। ঘনটার ঢেউ ভেঙে আবিষ্কারের নেশা। মোবাইল বেজে উঠল। আমি ফোনটা তুলে হ্যালো! বলতেই তোমার গলা। ভয় পেয়ে বললাম, রং নাম্বার।

—তুমি বললে, কী যা-তা বলছ?

আমার গলার স্বরে ঝাঁজ।—দিস ইজ রং নাম্বার।

কী বুঝলে তুমি জানি না। তারপর সাতদিন চুপচাপ।

মৈনাক! ওই সাতদিন আমারও ভালো কাটেনি। স্বামীর সঙ্গে সেই একঘেয়ে মৈথুন,..রোটারি ক্লাবের পার্টি, ইউরোপিয়ান স্টেশন ক্লাবের ক্ল্যারিওনেটের সুর, কিছুই আমার বুকের ঝড় থামাতে পারেনি। হৃদয় ছেঁড়া যন্ত্রণার তারগুলো শুধুই বেজে বেজে গেছে।

একটার পর একটা চিঠি লিখে লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। সে চিঠির টুকরোগুলো ভেসে গেল ব্রহ্মপুত্রের জলে। মৈনাক! আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। এতদিন যা ছিল খেলা, আজ সেটা আর খেলা নয়। মধ্য তিরিশের জোয়ার-ভাঁটায় অনেকেই যা পারে, আমি তা পারিনি কেন? আমাব বুকের মধ্যে যন্ত্রণার মাছ হেঁটে গেছে, তবু তোমার কাছে নিজেকে খুলে দিইনি।

আরেকদিন মধ্যরাতে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙতেই দেখি, রৌরব বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিল রিসিভার।—ইয়েস, চৌধুরী হিয়ার। লাইন কেটে গেল। রৌরব ঘুম জড়ানো চোখে বলল—নন্‌সেন্স!

ফের বাজল। কিন্তু ও রিসিভার ধরার আগেই আমি তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম। কেন জানি না, তোমার কথাই মনে পড়ল। বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। তোমার মাথাফাতা কি খারাপ হয়ে গেল? তুমি তো জানো আমার স্বামী আমার পাশে?

রিসিভার কানে চেপে, হ্যালো! বলতেই আমার ভাবনাটাই সত্যি হল। মৈনাক! তুমি জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, তুমি আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছ। আমি যে কত রাত ঘুমাইনি রাই। আমার জিভের ডগায় একটা কথা এসে থেমে গেল, সেজন্যে কি আমি দায়ী?

কিন্তু বলা হল না রৌরবের সামনে। নিঃশব্দে নামিয়ে রাখলাম রিসিভারটা। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। আবার ফোন বাজল। এবার ভয়ানক রাগ হল। তবু রিসিভারটা না তুলে উপায় নেই। ওদিকে রৌরব নড়েচড়ে উঠে বসল—দাও তো ওটা আমায় দাও। শাল্‌লা! সারারাত জ্বালাবে নাকি? দিচ্ছি কড়কে।

কিন্তু রৌরবকে ফোনটা না দিয়ে আমি লাইন কেটে দিলাম। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। মৈনাক! তুমি যাতে কিছুতেই আর লাইন কেটে দিলাম। রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। মৈনাক! তুমি যাতে কিছুতেই আর লাইন না পাও। যাতে ধরা পড়ে না যাও আমার স্বামীর কাছে। তোমার গলার স্বর শুনে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি প্রচুর মদ গিলেছ। বলছিলে, যদি রৌরবের কাছ থেকে তোমায় ছিনতাই করি? বিলিভ মি, আই লাভ ইউ....।

আমার কানের ভেতর তোমার কথাগুলো গরম সিসের মতো জ্বলে উঠল। একটু একটু করে যে প্রেম আমার তৈরি হয়েছিল, যে প্রেম আমায় কুরে কুরে খাচ্ছিল, যা ছিল যন্ত্রণার ঝড়, তা যেন নিমেষে উঠে গেল। তোমার কামনার আগুন টের পেয়ে আমি শিউরে উঠলুম।

আমার রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে রৌরব বলল, কী হল?

—কই কিছু না তো?

—কী বলল ওপারের গলা ?

—আরে রং নাম্বার। কোন একটা অদ্ভুত লোকের নাম বলল। জিজ্ঞেস করল তার বাড়ি কিনা?

—রিসিভার উঠিয়ে রাখ তো। দেখি, আবার ফোন করে কিনা?

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আরে দূর! কোন একটা মাতাল। রিসিভার নামিয়ে না রাখলে বাকি রাতটুকুও ঘুমের দফা রফা করে ছেড়ে দেবে।

—আনসারিং মেশিনটা লাগিয়ে রাখলেই হয়, ধরা পড়বে, ওর টেলিফোন নম্বর।

—কী দরকার গো। রিসিভার নামিয়ে রেখেছি, ল্যাঠা চুকে গেছে।

কিন্তু পরদিন আবার সেই রাত দুটোয় টেলিফোন বাজল। রৌরবের ঘুম ভাঙার আগেই আমি বাজ পাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিলাম রিসিভার। হ্যালো! বলতেই তুমি বললে, প্লিজ, আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও।

—রং নাম্বার।

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই রৌরব বলল, রাবিশ। মাতালটা আজও জ্বালাচ্ছে?

তোমার গলার স্বরে পরিষ্কার বুঝলাম, আজও তুমি প্রকৃতিস্থ নও। লাইন কেটে কালকের মতোই নামিয়ে রাখলাম রিসিভার। কিন্তু রৌরব কিছুতেই রিসিভার নামিয়ে রাখতে দিল না। ও তড়িঘড়ি আনসারিং মেশিনটা লাগিয়ে দিল। আমার বুকের মধ্যেকার ধুকপুকুনি বাড়তে লাগল। না জানি কী কাণ্ড হবে আজ। আনসারিং মেশিনে টেলিফোন নম্বরটা ধরা পড়লে কিংবা ওই বিকৃত ব্যাকুল গলার স্বর মাঝরাতে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ বরদাস্ত করবে না রৌরব। ও থানায় ডায়েরি করবে। তোমার নামে মামলা। আর সেই কুৎসিত মামলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে আমার ভবিষ্যৎ। তুমি তো পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তুমি নাকি ছাত্রদরদি! কোথায় থাকবে তোমার শ্রদ্ধার আসন?

নসিব ভালো। টেলিফোনটা আর বাজল না। যদিও কাল রাতের মতোই আমার ঘুম চটকে গেছে আজও। বোবাধরা দানবটার মতো বুকের মধ্যে ভয় চেপে থাকল। যদি ফোনটা আবার বাজে! আমার স্বামী হাই তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশ বালিশটা বুকে চেপে ধরে বলল, ফের যদি টেলিফোন বাজে আমায় ডাকবে। রাত দুপুরে প্রেম?....

ওর গলার স্বরে অদ্ভুত ব্যঙ্গ। আমি চমকে উঠলাম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ওকে। ও কি টের পেল কিছু? রৌরবকে আজও আমি চিনে উঠতে পারিনি। মৈনাক! আমি নিজেকেই ধিক্কার দিলাম। তোমার সাহসটা কেন বাড়তে দিয়েছিলাম? তুমি আত্মকেন্দ্রিক। নিজের ইচ্ছের দিকটাই ভাবলে? আমার বিপদের দিকটা একবার ভেবে দেখলে না?

আমি তো কোনওদিনই তোমায় আমার হৃদয় নামের সেন্টিমেন্টের জেরক্স কপি দিইনি! দু'-একটি দুর্বল মুহূর্তের কার্বন কপি থাকলেও থাকতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে একেবারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাব! স্বামীর পদমর্যাদা, সামাজিক সম্মানের ভিত থেকে তো একটুও নড়িনি। আমার স্বামীকে আমি ভালোবাসি। ও আমায় এখনও বিশ্বাস করে মৈনাক! তোমার জন্যে আমার গোপন মনের চোরা কুঠুরিতে যে জায়গাটুকু ছিল, সে খবর তোমারও তো জানার কথা নয় তেমন করে? মাঝ রাত্তিরে টেলিফোনে বিরক্ত করে তুমি আমায় দখল করার বাহাদুরি নিচ্ছ? আমার স্বামী যদি এখন সন্দেহ করে, তাহলেও তো দোষের কিছু নয়। কিন্তু সন্দেহই বা করল কোথায়? আনসারিং মেশিনটা লাগিয়ে আর পাহারাদারের মতো আমায় জাগিয়ে রাখাটাই যেন ওর পরম নিশ্চিন্ততা। ওর মাথায় কোনওভাবেই খেলল না টেলিফোনের নায়কটি কে?

জোয়ারের জল আছাড় খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। ব্রহ্মপুত্রের জল বাড়ছে। খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ছে পূর্ণিমার ভরা চাঁদটা। ওই বাঁধভাঙা চাঁদের হাসিতে এই মুহূর্তে আমার আর কোনও উন্মাদনা নেই। বরং চরম ঠাট্টার মতো মনে হচ্ছে আকাশ ভরা ওই জোছনাকে। মৈনাক!

তোমার মতো মাতাল অথবা আবেগের ফানুশের জন্যে আমার দামি মনের চোরা কুঠুরিতে জায়গা রেখেছিলাম বলে। জানলার বাইরের বাগানে হাসনুহানা ফুটছে। তার সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের এই চার দেওয়ালে। এখন আমার কোনও প্রেম নেই। প্রেমিক নেই। রাগ হচ্ছে, আমার শান্তির সংসারে তুমি কেন অশান্তির দাবানল হয়ে ঢুকে পড়লে? কেন চুরি করেছিলে আমার কিছু সময়?

কাক ডাকছে। ভোর হয়ে এল। আকাশের গায়ে এখনও লেপটে আছে চাঁদ আর অন্ধকার। দরজা খুলে বাইরে এলাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে মানুষের পায়ে চলার পথ আর গাড়ির রাস্তা। সামনেই অগ্নিগড় পাহাড়। তার মাথায় আরেকটু পরেই সূর্য উঠবে। ড্রাইভিং লাইসেন্স পয়েছে। ভালোই গাড়ি চালাতে জানি। গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বের করে যদি বেরিয়ে যাই? পাশেই আউট হাউসে ড্রাইভার, আর্দালিদের ঘর। গেটে দরোয়ান। দবোয়ানটাও ঘুমচ্ছে ওর ডিউটি রুমে। আমাব সাহস হল না বেরিয়ে যাবার। দাঁড়িয়ে রইলাম পাহাড়ের ওপরে রেলিং ধরে। তোমার ওপরে একরাশ ঘেন্না আর বিরক্তি, রাগের শেকড়টা গেঁথে রইল আমার বুকের ভেতরে।

রৌরব সকালের প্রাতঃরাশের টেবিলে এসে বসল গম্ভীর মুখে।—ভোরবেলাও টেলিফোনের রেহাই নেই? নাম্বারটা রেকর্ড হয়ে গেছে। বারোহেলিয়ার নাম্বার। আমি ফ্যাকাশে মুখে ফ্যাশফেশে গলায় প্রশ্ন করলাম— বারোহেলিয়ার?

রৌরব বলল, অবাক হচ্ছ মনে হেচ্ছে?

ও ভুরু কুঁচকে আমায় দেখল। বলল, নাম্বারটা খুব চেনা তোমার।

—আমার?

কাঁপা গলায় আমার প্রশ্ন। রৌরবের তেজি গলা, ইয়েস। আমি সাহসী হবার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমার হতে যাবে কেন? আশ্চর্য কথা।

রৌরব চামচে দিয়ে ডিমের পোচ থেকে কুসুমটা মুখে পুরতে পুরতে বলল, হ্যাঁ, তোমাকেই তো উনি কার্ডটা দিয়েছিলেন? মৈনাক চট্টরাজ!

আমি বিস্ময়ে ফেটে পড়ার ভান করলাম, কেন উনি আবার ফোন করবেন কেন?

—তুমিই জানো?

—আমি কী করে জানব?

—আমিও তো সেই কথাই বলি।

—রাতের ফোনের সঙ্গে সকালের ফোনের কী সম্পর্ক? একই লোক যে ফোন করছে, তারই বা কী মানে?

—ইয়েস, একই লোক, একই পদ্ধতিতে নইলে লাইন কাটে? অ্যানসারিং মেশিনে রেকর্ড হচ্ছে বুঝতে পেরে।

—ভুলও তো হতে পারে? ডক্টর চট্টরাজ হয়তো অন্য কোথাও ফোন করতে গিয়ে...

—হ্যাঁ, ভুল করে তোমার নাম্বারটা টিপে ফেলেছেন?

—তাছাড়া আবার কী?

—উইল ইউ স্টপ?

রৌরব এত জোরে চেঁচাল যে ওর গলার স্বর খাদে নেমে গেল। তারপর কেটে কেটে ব্যঙ্গের গলায় বলল—সারারাত ধরেই উনি ভুল করে তোমার নাম্বারে...। থানায় যদি ডাইরি করি, ব্যাপারটা কিন্তু খুব ঘুরপথে যাবে।

—এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে থানায় ডাইরি কেন?

—আমার ঘুম ভাঙিয়ে শান্তি নষ্ট করবে? লোকটাকে একটু টাইট দেওয়া দরকার। পরের বউয়ের ওপরে নজর কেন?

আমি কৃত্রিম রাগে বলি, কী যা তা বলছ?

—ঠিকই বলিছ। আমার অ্যাবসেন্সে এ বাড়িতে ও আসে কেন?

—তোমার অ্যাবসেন্সে?

—ইয়েস। আমি কি কিছুই খবর রাখি না?

—হ্যাঁ, এসেছিলেন একদিন। ওই একটা নাটকের ব্যাপারে বাঙালি থিয়েটার হলে নাটক...। আমায় অনুরোধ...। কথা শেষ করতে না দিয়ে রৌরব বলল, নায়িকার রোলটা যদি তুমি কর তাই না?

—ঠিক তাই। তবে আমি রাজি হইনি।

—কেন?

—তোমায় জিজ্ঞেস না করে...।

—তো মাস ছয়েকের মধ্যে নাটক নামল না? আমায় জিজ্ঞেস করার সময়ও তোমার হল না?

—ডক্টর চট্টরাজ বোধহয় পিছিয়ে গেলেন।

—কেন?

—জানি না। নইলে আমার সঙ্গে আর তো কোনও যোগাযোগ...।

—ও তাই বুঝি এই মাঝরাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে ইচ্ছে হল ওঁর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে?

—আপনভোলা অধ্যাপক। কাকে ফোন করতে কাকে করেছেন।

—বাহ্! ওয়ান্ডারফুল! আচ্ছা, চট্টরাজের জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বল তো?

—মাথাব্যথা হতে যাবে কেন?

আমার পনেরো বছরের মেয়ে তিন্নি আমায় আড়চোখে দেখল।

মৈনাক! দুপুরে রৌরবের অনুপস্থিতিতে তুমি হঠাৎ এসে হাজির। গেটের দরওয়ান খবরটা পৌঁছে দিতেই আমার বুক কেঁপে উঠল। একবার মনে হল, বলে দিই দেখা হবে না।

আবার মনে হল, সারা রাত টেলিফোনে জ্বালাতনের ঝালটা মিটিয়ে নিই। তিন্নিও তো স্কুলে। সামনেই ওর আই সি এস সি পরীক্ষা। মেয়ে বড় হচ্ছে। ওর সামনে মৈনাক তোমায় আমি আড়ালে রাখতেই পছন্দ করি।

তুমি এলে। বেল বাজালে। বন্ধ কাচের দরজার পর্দা সামান্য ফাঁক করে দেখলাম তোমায়। পরে সাধনকে ডেকে বললাম, দরজাটু খুলি তেওঁক বহিবলৈ দিয়া।

সাধন অসমীয়া। বাড়িতে কাজ করে। মৈনাক! পাক্কা পনেরো মিনিট তোমায় বসিয়ে রেখে, বসার ঘরে এলাম। তুমি চোখ বুজে বসেছিলে। তোমার ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছিল। কার্পেটের ওপর আমার হালকা চপ্পলের আওয়াজ পেতেই চোখ খুলে আমায় টান টান চোখে দেখতে থাকলে। তুমি নড়েচড়ে বসলে।—কী ব্যাপার। এত দেরি হল?

—তুমি কেন এসেছ?

—ইচ্ছে হল।

—তোমার ইচ্ছেটাই সব?

—তোমায় অনেকদিন দেখিনি।

—দেখতেই হবে। যখন আমার স্বামী অফিসে, মেয়ে স্কুলে?

—এ ছাড়া উপায় কী? টেলিফোন করলেও তো কথা বলবে না?

—যখন তখন টেলিফোন করতে হবে? কাল সারাটা রাত। উহ্‌! অসহ্য! তুমি কি আমায় ঘর করতে দেবে না? কী চাও তুমি বল তো?

—তোমায়।

—অসম্ভব।

—অর্থডক্স মেন্টালিটি। চল ঘুরে আসি।

—মৈনাক! তোমার এই বেপরোয়া ভাবটা ছাড়ো! তুমি ভুলে যাচ্ছ এ শহরে আমি কার স্ত্রী?

—জানি, রৌরবের প্রচুর ক্ষমতা। দরকার হলে আমায় শ্রীঘরেও পাঠাতে পারে।

—রৌরবকে রৌরব বলার অধিকার তোমায় কেউ দেয়নি। ওর নাম বলছ কোন সাহসে?

—থুড়ি। বলতে হবে, ডি সি? অথবা ডেপুটি কমিশনার সাহেব। কিংবা চৌধুরী সাহেব?

—তাই তো বলা উচিত।

—বলব। তোমার জন্যে সব করতে পারি।

—ছাই পারো। নইলে মদ্যপ অকথায় টেলিফোনে?

ছিহ্‌ মৈনাক! ছিহ্‌! তুমি অধ্যাপনা কর, তোমার স্ট্যাটাস্‌টা পর্যন্ত ধুলোয় গুঁড়িয়ে....!

—কী করি বল তো? ক'দিন ধরে ঘুমের সঙ্গে বয়কট।

—তাই বলে আমাদের ডিসটার্ব করবে?

—তোমার জন্যই স্লিপিং পিল খেয়েও...। তোমার ভয়েসটা শুনব বলে, বিলিভ মি...।

—মৈনাক! তোমার পাগলামি আর সহ্য হয় না। বিয়ে করচ না কেন?

—তুমি করবে আমায় বিয়ে?

—কী বাজে কথা বলছ?

—আমার দরজা তোমার জন্যে সব সময় খোলা।

—তবে আর কী? খোলা থাকলেই আমি যাচ্ছি যেন...।

—আমায় ভালোবাস না?

—কী অদ্ভুত প্রশ্ন।

—যেদিন তোমার পাশে কেউ থাকবে না, সেদিন...।

—হ্যাঁ, বুঝেছি, তুমি থাকবে তো? কিন্তু তোমায় যে আমি চাই না।

—আমি তো চাই।

—তোমার চাওয়াতেই চলবে? আর কোনওদিন এ মুখো হবে না। আমার সঙ্গে কোনওভাবেই কোনও সম্পর্ক রাখবে না।

মৈনাক! পোড়া সিগারেটটা অ্যাস্‌ট্রেতে টিপে ফেলে তুমি আরকেটা সিগারেট ধরালে। তুমি আমার দিকে সটান তাকিয়ে থাকলে। তোমার ওই চাউনির দিকে তাকিয়ে আমি দুর্বল হয়ে পড়লেও নিজেকে কঠিন রেখে বললাম, টেলিফোন করলেও বিপদে পড়বে। রৌরব আনসারিং মেশিন লাগিয়ে রেখেছে। তোমার নাম্বার টেলিফোনে উঠেছে।

—জানি। তাতে আমার কিস্যু এসে যায় না। ডি সি সাহেবের কোনও কড়া পাহারাকে আমি গ্রাহ্য করি না।

—মৈনাক! প্লিজ, আমায় শান্তিতে থাকতে দাও। তুমি সরে যাও।

—সত্যিই বলছ?

—হ্যাঁ, আমি একজনের স্ত্রী।

—তো কী হয়েছে? সারা জীবন ধরে দাসখত লিখে দেবার তো কোনও প্রশ্ন নেই? ইচ্ছে করলেই স্বামী পালটানো যায়।

—আমি তা পারব না।

—কোন যুগের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছ রাই?

—যে যুগেই হোক। মৈনাক! সেই আশা যদি করে থাক, তবে ভুল করেছ।

—কেন তোমার সাহস নেই?

—রৌরবকে ছেড়ে আমি যাব না।

—কেন? প্রেম?

—নিশ্চয় তাই।

—আর আমি? আমার জন্যে প্রেম নেই?

—ভেবে দেখিনি। মনে হয় না।

—গুড। চললাম।

মৈনাক! বেশ কয়েক মাস তোমার টেলিফোন নেই। কেমন আছ জানি না। তোমার জন্যে যে আমার সত্যিই মন কেমন করছিল। একদিকে যেমন তোমার নীরবতায় স্বস্তির নিঃশ্বাস, অন্যদিকে তেমনি ঘুরে ফিরে তোমার কথাই মনে হত বার বার। কিন্তু গাড়ির ধুলো উড়িয়ে আর কখনও বারোহোলিয়ার রাস্তায় যাইনি। টেলিফোন বাজলেই চমকে উঠতাম। হয়তো তুমি ভেবে রিসিভার কানে চেপেই হতাশ। আমার অজান্তেই কবে থেকে তোমার গলার স্বরটা দারুণ জরুরি হলে গেল। ফোন করিনি। ব্রহ্মপুত্রের বালির চরে কত ঢেউই তো আসে। সাময়িক দাগ রেখে গেলেও পরের ঢেউয়ে মুছে যায়। মাঝে মাঝে তারই যেন প্রস্তুতি চলছিল মনের ভেতরে।

রৌরব প্রায়ই সন্দেহজনকভাবে আমায় প্রশ্ন করত, কী ব্যাপার? তোমার প্রেমিকটি যে থেমে গেল, কেন? আর তো টেলিফোন করছে না?

আমি আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বলি, কার কথা বলছ?

—কেন, মৈনাক চট্টরাজ?

—আমি ঠোঁট উলটে বলি, ও আমার প্রেমিক হতে যাবে কেন? ও তো বন্ধু, সাধারণ আলাপ।

—নিতান্তই সাধারণ? নির্ভেজাল বন্ধুত্ব? আর কিছু নয়?

আমি তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, তাছাড়া আবার কী? আচ্ছা, আমায় তুমি কী ভাব বল তো? যার তার সঙ্গে?... আমার কোনও ডিগনিটি নেই?

রৌরব খুশি হল। আমার থুতনিটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ মাই ডার্লিং...।

যদিও আমি জানতাম, এ কথা শুধু আমায় নয়, ও অনেককেই বলতে অভ্যস্ত। ক্লাব, পার্টির মেকি দুনিয়ায় অনেক মেয়েকেই ও এই কায়দায় আদর করে থাকে। ব্যাপারটা একঘেয়ে বলে আমার মনকে কোনওদিনই ছোঁয় না।

মৈনাক! তুমি যেন ছিলে সাইক্লোন। আমায় উড়িয়ে নিয়ে আবার ফেলে দিয়ে গেলে। মুখের কথাটাই কি সব? আমায় বুঝতে পারলে না কেন?

একদিন বেলা গোটা দশেকের সময় সেন্ট জোসেফ কন্‌ভেন্টে যাচ্ছিলাম, আমার মেয়ের স্কুলে

অভিভাবকদের মিটিং-এ। আমার গাড়ি উঁচু রাস্তার চড়াই ভাঙছে, হঠাৎ দেখলাম, তোমার স্কুটার আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল ঢালু রাস্তার বাঁকে। আমি পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, তুমি গণেশ ঘাটের দিকে চলে গেলে। আমার গাড়িটা তোমার যে খুব চেনা। গাড়ির আমাকেও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলে? ইচ্ছে করলেই আমায় থামিয়ে দিতে পারতে। স্কুটার ঘুরিয়ে এনে যদি হাত দেখিয়ে থামাতে আমার গাড়ি? আমি অবাক হলাম তোমার সংযমে। তুমি কি সত্যিই আমায় ভুলতে চাইছিলে মৈনাক? আমি কেন ভুলতে পারছিলাম না বল তো? অথচ আমিই তো আমায় ভুলতে বলেছিলাম আমায়। তুমি তো সেদিন আমার গাড়ির দিকে পেছন ফিরে তাকিয়েও ছিলে? পরিষ্কার বোঝা সত্ত্বেও তোমার উপেক্ষায় আমি অপমানিতবোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল, খুব নিষ্ঠুর। ধৈর্য, সহ্য, অপেক্ষা, এই শব্দগুলোর সঙ্গে তোমার বোধহয় পরিচয় নেই? অথবা ওটা কি ছিল তোমার ক'দিনের খেয়াল কিংবা খেলা? আমি আমার ড্রাইভারকে বলেওছিলাম গাড়ি ঘোরাতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল কী দরকার? আমার মনকে বোঝালাম মৈনাককে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। লালমাটির সুরকির রাস্তায় ধুলোয় তোমার স্কুটারের দাগ। হাওয়ায় উড়ছে পেট্রোলের গন্ধ। আমি আছি জেনেও তোমার কাছে নেই হয়ে গিয়েছি। এই আছি আর নেইয়ের মাঝখানের দিনগুলো কি একবারই অস্বীকার করার?

আমাদের বাংলোর পাহাড়ের নিচে দিয়ে তুমি ভোরবেলা প্রাতঃভ্রমণে যাও অগ্নিগড় পাহাড়ে। সে খবর পাই সাধনের কাছে। কেন যাও? স্মৃতির অ্যালবামের যন্ত্রণা কি তোমারও আছে? বুঝতে পারি না।

তিন্নিও কতদিন বলেছে, মা মৈনাককে দেখলাম, আমার স্কুলের পাশ দিয়ে চলে যেতে।

—তুমি মৈনাক বলছ কেন?

—তবে কী বলব মামা? কাকা? আঙ্কেল?

—তাই তো উচিত?

—তুমি, বাপি কেউই তো পছন্দ কর না মৈনাককে?

মেয়ের কথায় আমি চমকে উঠি। এত কথা ও জানল কী করে। তিন্নি বলল, মৈনাককে আমার দারুণ লাগে। কী স্মার্ট? কত ভালো।

আমি কিছু বলি না। শুধু বলি, তিন্নি! তুমি বড়দের কথায় থাকবে না। মৈনাককে দেখলে কথা বলবে না।

—কেন বলব না। ও আমায় ক্যাডবেরি দিয়েছে দু'দিন। তারপরই দুষ্টুমির হাসি হেসে তিন্নি বলেছে, না মা! আমি বানিয়ে বললাম। মৈনাক আমায় দেখতেই পায়নি। আমি স্কুলের গেটের ভেতরে তখন। আমাদের টিফিন চলছিল।

ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে তোমায় প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম মৈনাক! আমায় জড়িয়ে ধরে তোমার চুমু! আমায় পাঁজাকোলা করে ব্রহ্মপুত্রের ধারে বর্ষার রাতে দাঁড়িয়ে থাকার সুখস্মৃতি স্বপ্নের মধ্যে আমায় পাগল করে দিত।

রৌরব গুয়াহাটি গিয়েছিল। সেদিন রাত্তিরে...। তিন্নি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওর পড়ার ঘরে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। তুমি এসেছিলে ভিজতে ভিজতে। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে। গেটে তোমার স্কুটারের শব্দ পেতেই সাধনকে বললাম, তেওঁক আইবলৈ দিয়া। সাধন ছুটল গেটের কাছে। দরওয়ানকে বলল, গেট খুলে দিতে। তুমি এলে। তখন সন্ধে সাতটা। গায়ে তোমার কোনও বর্ষাতি ছিল না।

—তোমার কি রেনকোটও জোটেনি?

—তাতে বৃষ্টির আনন্দ কোথায়?

—যদি নিউমোনিয়া হয়?

—প্রেমজ্বরে নিউমোনিয়া পালায়।

আমি হেসে উঠলাম। আষাঢ়ের বর্ষার গন্ধ তখন যে আমায়ও পাগল করে দিয়েছে। ঠিক দিনে, ঠিক মুহূর্তেই এসে পৌঁছেছিলে মৈনাক। আমি যে তোমাকেই চাইছিলাম মনে মনে।

রৌরব বাইরে গেছে শুনে তোমার চোখে খুশির ঝিলিক। বললে যাবে নাকি ব্রহ্মপুত্রের ধারে?

—এই বৃষ্টিতে?

—বিষ্টিতেই তো ভালো জমবে। চোরাবালির পাড় ভাঙছে এখন ব্রহ্মপুত্রের ঢেউ। তোমার দেখতে ইচ্ছে করছে না বর্ষার নদী?

—নদী নয়। ব্রহ্মপুত্রটা নদ, জানো না?

—তবে তো আরও ভালো। দামালের পাশে দামাল হয়ে যাব। চল, নিচে নামি।

—কিন্তু তিন্নি?

—আরে ও তো ঘুমচ্ছে।

পেছনের পাথরের সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলুম আমরা দু'জন। তুমি আমার হাত ধরে সাবধানে নামালে সবুজ শ্যাওলা ধরা পেছল সিঁড়ি দিয়ে। তোমার পেন্সিল টর্চটা ঘুরতে লাগল আমার পায়ে পায়ে।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল। ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, মিলে চমৎকার অর্কেষ্ট্রা। প্রেম রাখবার ঝুলিটা সেদিন কিন্তু আমি হাতড়ে ছিলাম। কয়েকটা মাসের ভেতর তুমি যা আমায় দিয়েছিলে মৈনাক!

ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে আমার জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলে আমার শরীর, মন। মনের মধ্যেও মন থাকে। শরীরের মধ্যেও শরীর। সেই শরীরের জাদু, মনের জাদুর কারবারি মৈনাক তুমি কেন আমায় সেদিন অস্থির করলে? আমায় পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে তুলে নিয়ে চোখে চোখে রেখে গাঢ় করে তাকালে। বললে, আমায় ভুলে যাবে না তো রাই?

—কী করে ভুলব?

আমি আমার আঙুল তোমার গোঁফে, তোমার থুতনিতে তোমার গালে, কপালে বুলোতে বুলোতে বললাম। তোমার ভিজে লোমশ বুকে কতবার লিখলাম আমার নাম। 'রাইকিশোরী', 'রাই', 'রাই', 'রাই' ...সময়, তারিখ এবং সাল। রাস্তার লাইট পোস্টের আলোটাও নিভে গেছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ছাইরঙা আকাশের নীচে বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলাটে জল তবু সাদা। বিশ্বচরাচরে কোথাও কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি।

জানো মৈনাক। দিনগুলো আজও ফিরে ফিরে আসে। আমার মনের বন্ধ দরজায়। প্রচণ্ড তুফানে সব এলোমেলো হয়ে যায়। চোখের জলে ঝাপসা মাটি। যখন তুমি দূরে সরে গেছ।

শিবরাত্তিরের দিন মেয়ের বায়নার ওকে নিয়ে যেতে হল মেলায়। ভৈরব মন্দিরের পাহাড়ে। ছোটবেলা থেকেই শিব পুজোর উপোস করার অভ্যেস ছিল। ঠাকুমার সঙ্গে যেতাম শিলংয়ের লাবাণের শিবমন্দিরে, কখনও বরখোলায়ল, কখনও রিলবঙের কাছে ক্যান্টেনমেন্টের দিকে। আমি তো শিলংয়ের মেয়ে। শিলং-এ আমাদের চার পুরুষের বাস। মনে পড়ে মৈনাক? তুমি আমাদের সঙ্গে শিলং বেড়াতে যেতে চেয়েছিলে? আমি এখনও স্বপ্নে ওয়ার্ড লেক দেখতে পাই। বিশপ, বিডন ফলসের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে হেঁটে যাই তোমার হাত ধরে। গভীর খাদের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে

যায়। মঙ্গলের গাছ-গাছালির ফাঁকে আকাশ। সেই নীল আকাশের গায়ে জাল দেওয়া শীতের মিষ্টি রোদ্দুর আর নকশি কাঁথার ফোঁড় এখনও চলছে। আমার সঙ্গে শিলং আসা তো আর তোমার হল না? কিছুদিন তোমার নৌকার দাঁড়টা আটকে রাখলে হাওয়া হয়তো অন্যদিকে বইত।

শিবের মাথায় এখন আর আমি জল ঢালি না। আচার বিচারের যুপকাষ্ঠে বলি আর হতে চাই না। হাজার সেলাম জানিয়ে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে লড়াই করছি, তখন তুমি পাশে নেই। স্বাতন্ত্র্যরক্ষার অধিকার আর পায়ের মাটিটাকে যখন শক্ত করছি, তখন তুমি কোথায়?

আমার বাবাও ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। শিলং থেকে গুয়াহাটি, গুয়াহাটি থেকে ডিব্রুগড়, ডিব্রুগড় থেকে তেজপুর বাবার বদলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। সরকারি আমলের বাংলোগুলিতে সেদিনও ছিল অহংকারের দাপট। প্রবল প্রতাপ ছিল বাবার। তারপর সেই প্রতাপেরই প্রতিফলন দেখলাম স্বামীর মধ্যে। রৌরবের মতামত আমার কাছে আজ মূল্যহীন। আমার মেয়ে তিন্নি ওই অহংকার নামের ভয়ানক রোগের শিকার না হয়, তার জন্যে আমি লড়ে যাচ্ছি মৈনাক। ওর স্বাধীন মতামতটাকে দাম দেবার জন্যে রৌরবের চোখের ঠুলি খুলে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। মৈনাক! আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে আর ভয় পাই না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করে আমায় বাজিয়ে দেখলে না কেন?

শিবরাত্তিরের মেলায় ছিল কত রং-বেরঙের পুতুল, ঘোড়া, হাতি, কাচের চুড়ি, কাচের বাসন, চুলের ফিতে, বাঁশি। ঘর সাজানোর কত জিনিস, কত বাঁশি, কত বিচিত্র সুরের অর্কেস্ট্রা। গ্যাস ভরা বেলুনের রং-বেরং ছড়িয়ে পড়ছিল মহাভৈরবের মন্দিরের আকাশে। গাছে গাছে বাঁদর। ঝুল কেটে কেটে লাফ মারছিল এক গাছ থেকে আরেক গাছে। মানুষের হাতের পুজোর রেকাবি থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছিল কলা, পেঁপে, আঙুর, আপেল। আমার মেয়ে তিন্নি ভয় পেয়ে আমার গা ঘেঁষে যাচ্ছিল। আঙুল দেখিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল,

—ওই দেখ মা, মৈনাক!

আমার বুকের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ। বললাম, কোথায়?

—ওই তো, হিপিদের সঙ্গে গাঁজা টানছে।

আমি দেখলাম মস্তবড় একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে, একটা গাছের নিচে বসে রয়েছ তুমি মৈনাক। তোমায় ঘিরে রয়েছে জনা তিনেক মেমসাহেব, আর কিছু সাহেব। তারা মার্কিন, ইংরেজ না জার্মান জানি না। সেই সোনালি চুলের আপেল মার্কা চেহারার সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে গেছ তুমি। অতিরিক্ত মদ্যপান করা তোমার লাল চেহারা নিয়ে। কিন্তু ঘন কালো চুল আর কালো চোখের পাতার তলায় কালো মণিদুটো নিয়ে এখনও তুমি সেই আগের মৈনাক।

খবর হাওয়ায় ভাসত। শুনতাম তুমি নাকি বোতল টেনে কলেজে ক্লাস নিতে যাও? তখন তোমার জন্যে আমার করুণা হত। মৈনাক চট্টরাজের গায়ে ছিল আদর্শের স্ট্যাম্প। তার নাম হল মাতাল মৈনাক। তুমি কি দেবদাস হতে চেয়েছিলে? কিন্তু রাইকিশোরী যে সেদিন কিছুতেই পার্বতী হতে পারত না!

আমরা বদলি হয়ে চলে এলাম গুয়াহাটিতে। তার আগের দু'বছর তোমার কোনও খোঁজই পাইনি তেজপুরে। শুনেছিলাম, তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে চলে গেছ কোথায়?

ক'দিন আগে দিল্লি যাচ্ছি আমরা। রৌরব, আমি আর তিন্নি। পানবাজারের ওদিক থেকে এয়ারপোর্টে যাবার রাস্তায় মনে হল তোমার মতো কেউ হাঁটছে। এক ধরনের চেহারা অনেকেরই তো হতে পারে।

গাড়ির জানলা দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম তুমিই। আগের মতো বাউন্ডুলে চেহারা, হিপিদের সঙ্গে যেমন দেখেছিলাম, তেমন আর নেই। তুমি যেন তোমার পুরনো জায়গায় ফিরে এসেছ।

সিকিউরিটি চেকিংয়ের পর প্লেনে উঠে সিটের বেল্টটা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে রৌরব বলল,

—তোমার এক্সপ্রেমিককে দেখলাম মনে হল?

—কে?

—কে আবার মৈনাক চট্টরাজ?

রৌরব তেরছা চোখে তাকাল।

মৈনাক! এখন আর তোমায় প্রেমিক বলায় আপত্তি নেই। দু'বছর ধরে প্রচুর সাহস আমি তৈরি করেছি। হয়তো তুমি কাছে থাকলে যা হত না, তোমায় হারিয়ে তাই হল। যদি তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও, আমি ঠিক দুর্বল হয়ে যাব। রৌরবের কাছে আজ তোমার জন্যে ডিভোর্স চাইলেও চাইতে পারি। ও আজকাল আমার সাহস দেখে অবাক হয়। ভয় পায়। ওর বান্ধবীদের যদি সহ্য করতে পারি, তবে আমার বেলায় নয় কেন? আমার প্রতিবাদে রৌরব চুপ করে থাকে।

দিল্লি থেকে ফেরার পর এক রোববার সন্ধেবেলা এস পি সাহেবের পার্টিতে যাব বলে তৈরি হচ্ছি। বেয়ারা খবর দিল, সাব আপনাক মাতিছে মেমসাব।

ততক্ষণে রৌরবই চেঁচিয়ে গলা ফাটাল, রাই! রাই! আমি ভাবলাম ব্যাপারটা কী? ওর গলায় এত উচ্ছ্বাস? আধখানা মেকআপ অবস্থায় বললাম, আসছি।

বসার ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা দিতেই অবাক। বিশ্বাস করেত পারছি না নিজের চোখ দুটোকে। মৈনাক! দেখলাম তুমি এসেছ। তোমার পাশে তিরিশ, বত্রিশ বছরের একটি সুন্দরী ছিপছিপে যুবতী। তার পরনে জিনসের আকাশি প্যান্ট। গায়ে হলুদ টপ। তুমি আগে যা মোটেই পছন্দ করতে না।

রৌরব বলল, তোমার বন্ধুটিকে চিনতে পারছ?

আমি কিছু বলিনি। তোমার চোখ আর আমার চোখ তখন এক হয়ে গেছে। তুমি মিট মিট হাসছ। তারপর ঠিকঠাক হয়ে বসে বললে, পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বউ অহনা। দুম করে একটা বিয়ে করে ফেললাম। আমরা দু'জনেই কলেজে পড়াই। শিলং-এ ও লেডিকিন্-এ আছে। আমি এডমান্ডস কলেজে।

রৌরব বলল, বেশ করেছেন। কনগ্র্যাচুলেশনস্। বাঁচা গেল। অ্যাদ্দিনে আপনার একটা হিল্লে হল মশাই।

কথাগুলো বলেই রৌরব আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল, যার মানে কী, কেমন জব্দ?

মৈনাক! তুমিও কি রৌরবের মতো আমায় জব্দ করতে পারার হাসি হাসছ? কিন্তু তারপরই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একটু যেন দম নিলে। অহনাকে বললে,

—ও রাইকিশোরী।

—নমস্কার। প্রচুর শুনেছি আপনার কথা।

মৈনাক! তুমি কেন আর হাসতে পারলে না তেমন করে? রৌরবের মতো? রাইকিশোরীকে জব্দ করাতে পারার হাসি? আমিও তো হেরে যাবার পাত্রী নই। অহনাকে গাল টিপে আদর করলাম। যদিও একটা কান্নার দলা আমার গলায় আটকে ছিল। তবুও হেসে তোমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললাম, রিয়েলি সারপ্রাইজ......।

কনগ্র্যাচুলেশন মৈনাক!

কালো ছায়া সাদা ছায়া

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দূর থেকেই আওয়াজটা কানে আসছিল রাবেয়ার। তীক্ষ্ণ মেয়েলি কান্নাকে তাড়া করে বুনো চিৎকার ঘাপটে বেড়াচ্ছে ঝাঁ ঝাঁ রোদে। নিঝুম দুপুরের নেশা প্রায় ছুটে যায়। এমন ভরা বেলায় কাদের ঘরে কাজিয়া বাধল গো?

রাবেয়ার দু চোখ পিটির পিটির। আলপথটুকু পার হয়ে থমকে দাঁড়াল, সিরাজুলদের পুকুরপাড়ে খোঁদলে নেমে যাওয়া চৈত্রের পুকুরজলে বাসন ধুচ্ছে সিরাজুলের বউ। শুকনো গাছের বাঁকা গুড়িতে ঠেসান দিল রাবেয়া। হা হা শ্বাস নিল,—আ লো ও আমিনা, কার ঘরে নাগল রে?

আমিনা ফিক করে হাসল, —কানের মাথাও খেলে নাকি? নিজের বউ ছাওয়ালের গলা চিনতি পারো না?

—হাই মা, বলে কি গো! রাবেয়ার চোখ বড় বড়। বুড়ি শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। তবে কি অ্যাদ্দিনে বুড়ো ফকিরের শিকড়ে গুণ ধরল?

হাতের প্লাস্টিক প্যাকেট আর বাদামী খামখানা বুকে চাপল রাবেয়া। চোক ঘুরিয়ে বলল,— কী নে নাগল?

—তোমার বেটার বুঝি ঘরে চাল আনার কথা ছেল। আনেনি। সেই টাকা দে এড়ুয়া সাইরেছে। গান শুনবে বলি । বাসন হাতে তরতর উঠে আসছে আমিনা,—এক জোড়া বেটারিও কিনেছে গো।

—তারপর?

—তারপর আর কী। সে ঘরে ঢুকতেই হেই চিচ্‌কার, হেই ঝগড়া... তোমার বউ-এর মুখ তো কম নয়, খুব চোপা করতেছেল। মুজিবর জোর ক ঘা বইসে দেছে। জয়নাল চাচা, আকবর সব এসেছেল তো থামাতি, তা কে কার বাক্যি শোনে! কথার তোড়ে হাঁপাচ্ছে আমিনা। গুড়িটা ধরে দাঁড়াল —তা তুমি কোত্থিকে? হাঁসপাতাল?

—আমার আর কোথায় যাওয়ার আছে। মরণ যদ্দিন না আসতিছে, শুধু বড়ি গেলো, আর বড়ি গেলো...

—ক্যানো, তোমার কাশি তো নরম হয়ে গেছে!

—দূর দূর, শুলি পরেই বুক এখনও ছিঁড়ি যায়। আতভোর জেগি বসি থাকি।

—কোমবে, কোমবে, বড় ওগ কি অমনি বললিই সারে! ...যাও, ঘরে গে জিইয়ে নাও। সিরাজুলের বউ কোমর দুলিয়ে চলে গেল।

সামনেই, ঝাল মরিচের ক্ষেতের ধারে সিরাজুলের ঘর। তার ওপারে রাবেয়ার ভিটে। চালা এখন দু'ভাগ, এক ভাগে চলছে দাপাদাপি। হঠাৎ হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ে মুজিবর, ওমনি বউ-এর নাকি সুর খনখন করে ওঠে।

টুকুন খানিক খেজুর গাছের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রাবেয়া। কান খাড়া করে পালা্গান শুনছে! লাগ্ লাগ্ লাগ্, আরও জোর লাগ্ , হাড়ে এটু বাতাস লাগুক রাবেয়ার। মিঞা বিবি মিলে কম

জ্বালান জ্বালাচ্ছে তাকে। পেটের ছাওয়াল যদি মা ভুলে বউ সোহাগী হয়ে যায়, তার বাড়া দুঃখ আর কী আছে!

তা রাবেয়া সর্দারের কপালটাই বুঝি এরকম। আঁধার রাত চলছে তো চলছেই, দিন বুঝি আর ফুটবে না। তাও একরকম চলছিল সময়, নিত্যি দুখ নিত্যি অভাব নিয়ে। আজিজুল সর্দার মাটি নেওয়ার পর থেকে চার দিক শুধু মিশমিশ কালো । গেল বছরের আগের বছর দিব্যি টগবগে মানুষটা মুহরমের জুলুসে গেল, ফিরল গায়ে তাতল আঁচ নিয়ে। ডাক্তারবদ্যি করার অবসরটুকু দিল না, রাত পোহানোর আগেই চোখ বুজল জন্মের মতো। তাকে গোর দিতে ঘরের সঞ্চয় শেষ, মৌলবীকে তুষ্ট করতে ছাগল দুটোকে পর্যন্ত বেচে দিতে হল। মুজিবরের তখন সবে শাদি হয়েছে। শেয়ালদায় মাছের ঝোড়া বয়ে কোনদিন দশ টাকা ফেলে সংসারে, কোনদিন বিশ। ওদিকে ঘরে চার চারখানা পেট হাঁ হাঁ করে সর্বসময়। শেষে কলকাতার বাবুদের বাড়ি কাজ নিল রাবেয়া, ঠিকে কাজ। নাম ভাঁড়িয়ে রাবেয়া থেকে সীতা হল। কুলসম বলেছিল, হিঁদুর বাড়ি মোচলমানের মেয়ে রাখতি কোনো সমিস্যে নেই রে, শুধু ডাকার সময়ে গিন্নিমা-রা হিঁদু নামটাই চায়। তা সে কাজ ছিল উদয়-অস্ত। আঁধার থাকতে থাকতে কারখানার চক থেকে হাঁটা দাও, দু ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে ঘুটিয়ারি থেকে ট্রেন ধরো, ফেরো আবার সেই আঁধারে। তাও দু মুঠো জুটছিল তখন, আল্লাতালার সেটাও সইল না। বছর না ঘুরতে কাশ রোগে ধরল রাবেয়াকে। সারাক্ষণ গায়ে ঘুসঘুসে জ্বর লেগে থাকে। বুকের ভেতর চাপা কাশি ঝিলিক মেরে বেড়ায়। সেই কাশিই দ্যাখ না দ্যাখ বুকছেঁড়া রক্ত হয়ে গেল। রক্তকাশি চলকে ওঠে যখন তখন আঁশটে স্বাদে গাল ভরিয়ে দেয়।

মুজিবর তখনও এমনটা ছিল না, মার জন্য খুব করেছিল সে সময়ে। শেয়ালদার কোন্ বন্ধু তাকে খবর দিয়ছিল, পার্কসার্কাস হাসপাতালে নাকি বিনি পয়সায় কাশরোগের ওষুধ দেয়। মাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল মুজিবর, কার্ড করিয়ে দিয়েছিল, বুকের ফটো তুলিয়ে দিয়েছিল। ফি জুম্মা বারে নিজেই গিয়ে ওষুধ এনে দিত মাকে। আপেলটা আঙুরটাও আনত মাঝে মাঝে।

এরই মধ্যে আবার অঘটন। পরী ফিরে এল শ্বশুরঘর থেকে। বাস সেও এল, ছেলেও পর হয়ে গেল। এমনই পর, যে মায়ের পেটের ভাই বোন দুটোও তার দু চোখের বিষ।

ওই হারামীর বেটি হারামজাদীই তো পর করল মুজিবরকে। খা মার খা মর্ মর্। বুড়ো ফকিরের শেকর কি মিথ্যে হয় রে। দেখি, তোরে কুস্তে পেটা করে বার করলে কোন শউর এসে এখন বাঁচায়।

বউকে প্রাণ ভরে গাল পাড়তে পাড়তে ভিটেয় পা দিল রাবেয়া। ভিন্ন হওয়ার পর নিজের ভাগের দাওয়া উঠোন আড়াল করতে তালপাতার বেড়া তুলে নিয়েছে মুজিবর। সেই বেড়া টপকে একটানা কান্নার সুর সাঁতার কাটছে এপারে, পাক খাচ্ছে। মুজিবরের কোনো সাড়াশব্দ নেই। আজও কি খানিক মদ গিলে এসেছিল ছেলে? ইদানীং মুজিবর খুব নেশা করা শিখেছে। আর উপায় যা হয় বোতলের গর্ভে ঢেলে দেয়। যদ্দিন রাবেয়ার সংসারে ছিল, এমনটি তো ছিল না। ন-মাসে ছ-মাসে একদিন দলে পড়ে... ব্যস্। কেন এমন হয় রে বাছা? পীরিত কি শুকিয়ে গেল?

নিজের দাওয়ায় চোখ পড়তেই রাবেয়ার খুশি খুশি মন ভারী আবার। দাওয়ার কোণটাতে চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে তার ছোট ছেলে মুনাবর। মুড়ো। ইয়া সাজোয়ান দেহ ছেতরে আছে প্রকাণ্ড এক মরা ব্যাঙের মতো, মুখের হাঁ বেয়ে লালা টপটপ। জন্ম থেকেই ছেলেটা এরকম, হাবাগোবা। থপথপে কাল্লো শরীর, বিশাল এক মাথা, ঘাড়ে গর্দানে একাকার, উঁচু কপালের নিচে এতখানি ড্যাবড্যাবে চোখ। অন্ধকারে ভূতের চোখের মতো জ্বলে চোখ দুটো। কপাল, কপাল, এও তো রাবেয়ার কাপালেরই

দোষ। দুটো মাত্র ছেলে, দু জনের দু ধরন। ছোটটা যদি জন্মহাবা, জড়বুদ্ধি, বড় উল্টো। যেমন মতলবি, তেমনই বুদ্ধিধর। আকৃতিতেও তফাত কত। মুজিবর রোগাসোগা, গেঁড়েপানা। মুড়োর দেহে দানোর শক্তি, সেই ছোট্টটি থেকে ধাঁই ধাঁই বেড়ে চলেছে। তবে যা বাড়, সব ওই দেহেই, মনের বাড় নেই এতটুকু। এক সময়ে ওই ছেলের জন্য অনেক ওষুধপালা করেছিল আজিজুল রাবেয়া। তাবিজ কবজ জলপড়া কত কী। আজিজুল কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল ছেলেকে, বড় ডাক্তারও আশা দেয়নি। এ রোগ নাকি মায়ের পেটে থাকার কালেই বাসা বেঁধেছে মুড়োর দেহে, রাবেয়ার গর্ভদোষেই মুড়ো নাকি এরকম। শুনে অনেক ভেবেছে আজিজুল আর রাবেয়া। দোষটা ঠিক কার ছিল? রাবেয়ারই নাকি আজিজুলের? কুল পায়নি। কুল পাওয়া যায়ও না বোধহয়। গর্ভদোষই যদি থাকে তবে মুজিবর আর পরীও তো...! কপাল, কপাল, এর পিছনেও সেই রাবেয়ারই কপাল।

দাওয়ায় উঠে মুড়োকে ঠেলল রাবেয়া, —অ্যাই ওট্। ওট্ দিকি।

মুড়োর নড়াচড়ার লক্ষণ নেই।

রাবেয়া জোরে জোরে ঝাঁঝাল ছেলেকে, উঠে পড় বাবা মানিক আমার। বেলা যে দুপুর গইড়ে বিকেল হল বাপ।

মুড়ো পাশ ফিরে শুল। নিশ্বাস যেন অনিয়মিত কয়েক পল, আবার স্বাভাবিক। ফরর ফরর নাক ডাকছে।

নিচু হয়ে ছেলের পেটে আলগা হাত বোলাল রাবেয়া। না, যা ভেবেছে তা নয়, মুড়ো খেয়েই শুয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রাবেয়ার শরীর ছেড়ে গেল। ভেবেছিল মায়ে বেটায় ভাগাভাগি করে খাবে পাতে, মুড়ো যখন খেয়ে নিয়েছে তার মানে সব শেষ। কী যন্ত্রণা, আবার চুলো ধরাও, ভাত ফোটাও ... ভাবতেই পেটে খিদে খলবল, গা গুলিয়ে উঠল রাবেয়ার। সেই কোন সকালে চাট্টি পান্তা খেয়ে হাসপাতালে ছুটেছিল, মাঝে দু গাল মুড়িঘুগনি মাত্র পড়েছিল খোলে, ট্রেন উজিয়ে এতখানি পথ ফিরতে সব কখন হজম। এখন আর নতুন করে ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে!

পা টেনে টেনে রাবেয়া ঘরে ঢুকল। বড়ি ক্যাপসুলের প্যাকেট আর হলুদবরণ খাম রেখেছে তক্তপোষে। নিচে চালের বস্তা, কমে কমে তলানি, বড়জোর আর হপ্তাখানেক চলবে। পরী মাইনে পেলে প্রথমেই কিছু চাল কিনতে হবে।

কলসী থেকে জল গড়িয়ে ঢকঢক ঢালল রাবেয়া, মুখে ঘাড়ে ছিটোল। বড় তাপ, বড় তাপ, একটু বুঝি শীতল হল তাও। মাটিই যখন ফুটিফাটা, দেহের আর দোষ কী! আঁচল লেপে লেপে রাবেয়া গা কপাল মুছল ভাল করে। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসবে নাকি? থাক বাবা, ডাক্তারের বারণ, অবেলায় আর চান নাই করল। মুখে আমিনা যাই বলুক রোগের তেজ নরম হয়েছে তো বটেই। আরও কটা মাস নিয়ম মেনে চললে ...

উঠোনে শুকনো কাঠিকুঠি, ক-টুকরো বেড়ির কাঠও। মুড়ো আর কিছু না পারুক ডালপালা জুটিয়ে আনে বেশ। উনুনে কাঠকুটো গুঁজল রাবেয়া, বোতল থেকে মেপে কেরোসিন ঢালল। তেলও প্রায় বাড়ন্ত, পরীকে বলতে হবে আবার লিটার পাঁচেক জোগাড় করতে। ছকুর দোকানে বড় বেশি দাম নেয়, শহর থেকে পরী কমে আনে।

দেশলাই মারতেই আগুন লকলক। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে দাওয়া উঠোন, মুড়োর হুঁসটি নেই। বেড়া টপকে ওপারেও ছুটছে ধোঁয়া, গুলগুল ঘুরছে। অন্যদিন হলে ঘুমের ব্যাঘাত হত জাহানারার, শির ফুটিয়ে ঝগড়া বাধাত। আজ রা কাড়ছে না, খুনখুন কেঁদে চলেছে, কাঁদ্ কাঁদ্।

চারদিক ভারি নিশুত এখন। গনগনে সূর্য একটু আগেও বাদায় আগুন ছড়াচ্ছিল, গড়াতে গড়াতে সে কখন হিন্দু পাড়ার গাছগাছালি মাথায়। ধুলোর ঘূর্ণি উঠছে থেকে থেকে, কুটোকাটা নাচছে। কাদের যেন ছাগল পথ হারিয়েছে, পথে পথে কেঁদে মরছে বেচারা। পেঁপে ডালের ডগায় ঝুপ করে একটা কাক এসে বসল, ডাকছে কা কা।

চুলো ধরে উঠেছে। চাল ধুয়ে ভাত বসাল রাবেয়া। বগবগ ফুটছে ভাত, ফ্যান লাফাচ্ছে।

রাবেয়া খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে নাক টানল। আহ্ কী সুবাস!

—সাঁঝের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস যে বড়? টেমিখান পর্যন্ত জ্বালতি পারিসনি?

আমানির সুখনিদ্রা ভেঙে গেল রাবেয়ার। ধড়মড় করে উঠে বসল। এত আঁধার নামল কখন! চোখ রগড়াতে রগড়াতে রাবেয়া দেশলাই হাতড়াল,—আজ মনে হয় তাড়াতাড়ি ফিরি এলি?

—এলম, ক্যানো আসতে নি?

—তা নয়। রাবেয়া কোমর চেপে উঠে দাঁড়াল, —ওজই তো আত হয়।

—কাজ থাকলিই হয়।

গাঁ-ঘর থেকে আর যেন কেউ কাজে যায় না। কথাটা বলতে গিয়ে বলল না রাবেয়া। বললেই এক্ষুণি খরখরিয়ে উঠবে পরী। কেউর সঙ্গে আমার তুলনা দিস নি। আমি বাবুগার ঘরে ঝি খাটতি যাই না। পেলাসটিক কারখানার লেবার আমি, আমার ওভারটাইম থাকে।

কী থাকে কে জানে! রাবেয়ার মেয়েকে ঘাঁটতে বেশি সাহস হয় না। যে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বেঁচে থাকা, তার গায়ে কি বাড়ি মারা চলে!

রাবেয়া টেমি ধরাল। হ্যারিকেনটাও। ঘরের ম্লান আলোয় যতখানি উজ্জ্বলতা, ততখানিই অন্ধকার।

কাপড় ছাড়ছে পরী। ইদানীং নাইলনের শাড়ি পরে মেয়ে, খোঁপায় বাহারি ক্লিপ লাগায়, কপালে লাল নীল টিপ। বাইরের সাজ খুলে সবজে ডুরে শাড়িখানা জড়িয়ে নিল গায়ে। পুকুরধারে যেতে যেতে বলল, —মুড়ো ইস্টিশানে গে বসে আছে।

—ওমা সি কী কথা! এই তো দাওয়ায় শুয়েছেল!

—বাবুরা সব তারে নে সেকেনে মজা করতিছে। কত করে ডাকলেম, এলুনি। আবোদটারে টুকুন চোখে রাখতে পারিস না? কোনদিন নাইনে ক্যাটা পড়বে, তখন বুঝবি।

রাবেয়ার বুক ধড়াস করে উঠল,—তো এখুন কী হবে? কারে দে ডাকতি পাঠাই?

—সিরাজুল চাচা ইস্টিশনে ছেল। তারে বলে এইছি। আসার সময়ে নে আসবে।

রাবেয়ার প্রাণ শান্ত হল। মেয়ে ঘর থেকে বেরোতেই, মেয়ের থলি উপুড় করল মেঝেতে। কুমড়োর ফালি আছে একখানা, গোটা দুয়েক ছোট বেগুন, আলু, কাঁচালঙ্কা, আর কটা কাদা চিংড়ি। রাবেয়ার চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল। যাক, মেয়ে আজ তাও মনে করে দুটো মাছ এনেছে।

হ্যারিকেন এনে দাওয়ায় রাখল রাবেয়া। চিংড়ির খোসা ছাড়াচ্ছে। মেয়ে ফিরতেই চাপা স্বরে বলল, —খপর আছে রে পরী।

পরী ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—বুড়ো ফকিরের শেকড় অ্যাদ্দিনে ধরেছে রে। মাগীরে আজ গোবেড়েন দেছে মুজিবর। খুব পিটেছে।

পরী থমকাল। বুঝি ওপারের বাতাস শুঁকে নিল একটু। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—হঠাৎ?

—তোর বাপের এড়ুয়াটা নিয়েই গোল। চাল না এনে বুঝি বেটারি কিনেছে মুজিবর...

—কই, এখুন তো সাড়া পাই না। পরী মায়ের সামনে উবু হয়ে বসল।

—এই তো রে, এই বিকেলেও চলতেছেল। খুব কান্‌ছিল মাগী!

—কান্নার হইয়েছে কী। ও মাগীর আরও কত সব্বোনাশ হবে দ্যাখো। মিঞা বিবি এক্কেরে জ্বলে পুড়ে মরবে।

—আহা, এর মদ্যি তোর ভাইজানরে টানিস ক্যানো?

—বকুনি। তোমার বেটাও এমন কিছু পীরপয়গম্বর নয়। দুটোই সমান। আমারে কম পোড়ান পুইড়েছে।

রাবেয়া আর ছেলের হয়ে ওকালতি করতে ভরসা পেল না। মুজিবরের ওপর পরীর রাগের যথেষ্ট কারণ আছে। অথচ এককালে এই মুজিবর আর পরীতে কী ভাবটাই না ছিল! যে বোনকে চোখে হারাত মুজিবর সেই হল কিনা তার জনমশত্রু! বোনটাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল তার কোনো প্রতিকার নেই, আবার এই ভিটেতেও তাকে ঠাঁই দিবি না, মেয়েটা তবে যায় কোথায়! যুক্তি কী ছেলের। পরীর যখন একবার সাঙা হয়ে গেছে, আর তার বাপের ভিটের ভাগ নেই!

রাবেয়া বলেছিল, —এ কেমন ধারার কথা হল বাপ? তোর বোনটারে তেইড়ে দেছে কে?

—কে আবার! তার ভাতার আর শউড় শাউড়ি।

—সেই শুউড় শাউড়ি তোর কে হয়?

—আমারও তারা শউড় শাউড়ি।

—তবে? তবে?

—কী তবে?

—তোর বা'জানের সঙ্গে তোর শউড়ের কী কথা হয়েছেল? আমগার মেয়ে তারা নিলি পর তাদের মেয়ে আমরা নেব, ঠিক কি না?

—তা সে মেয়ে যদি বাঁজা হয় তবু তারে নে ঘর করতি হবে? কথার মাঝে কালনাগিনীর মতো ছোবল মেরেছিল জাহানারা, —মোর ভাইজান যদি ফের সাঙা করি থাকে তো বেশ করেছে। আরেট্টা বিবি আনার তার হক আছে।

—সে হক তো তবে আমার বেটারও আছে। আম্মোও ফের তার শাদি দুব।

—গায়ের জোর নিকি? দেখি তোর বেটার কত বড় কলজে, ফের নিকে বসুক দিনি।

রাবেয়ার খুব আশা ছিল, ছেলে তার পক্ষ নেবে। পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেছে, একটা কেন চারটে বউ এনে দেখিয়ে দেবে। জাহানারাকে তালাক দিতে চাইলে কানে জল ঢুকবে তার শ্বশুর শাশুড়ির, রাবেয়ার পায়ে ধরে সুড়সুড় ফেরত নিয়ে যাবে পরীকে। হায় আল্লা, ভেড়ামুখো ছেলে দিব্যি মাগের আঁচল ধরে বসে রইল, রা-টি কাড়ল না।

পরী ঝাপটে উঠেছিল,—তোর এই গুমোর থাকবেনি রে ভাবী। এই আমি বলে দিলম।

বউ-এর ঝটপট উত্তর,—আঁটকুড়ি মাগীর শাপ বাতাসে উপে যায়। তুই আমার কচু করবি।

সব মনে আছে রাবেয়ার। পুঙ্খানুপুঙ্খ খুঁটিনাটি, সব। কথায় কথা বাড়ল, বিবাদে বিবাদ, গাঁয়ের পাঁচজন প্রথমটা মজা চেটে নিল খুব। তারপর বিচারসভা বসল। একদিন নয়, দু-দিন নয়, তিন দিন। পরীর শ্বশুরঘর থেকে কেউ এল না, রাবেয়ার জামাইও না। শেষমেশ সবাই মিলে রায় দিল, পরী যদি ফের নিকে না বসে তবে সে এখানেই থাকবে, আজীবন তাকে সমান ভাগ দিতে হবে সব কিছুরই। জমিজিরেত বাস্তুভিটে সবেরই চার আনা শুধু মুজিবের। ব্যস, ওমনি দানোয় পাওয়া মানুষ

বনে গেল মুজিবর। বাসন কোসন থালা কম্বলেরও ভাগ চাই তার, এমন কী ছেঁড়া কাঁথাখানিরও। ভাতের হাঁড়ি ছিল তিনখানা, বউ তার একটা নিল। কলাই করা থালা বাটি নিল দুটো, জামবাটি একখানা। শেষ লড়াই বাধল আজিজুলের রেডিওখানা নিয়ে। মুজিবর সেটা নেবেই, রাবেয়াও দেবে না। এক গলা তাড়ি গিলে মাকে কাটতে এল মুজিবর, রাবেয়াও আঁচল পেতে শাপমন্যি করল ছেলেকে। পরীই বুঝি শেষে রেডিওটা দিয়ে দিল ভাইকে। রাতারাতি তালপাতার বেড়া ওঠে গেল উঠোনে, দাওয়ায়। ওপার থেকে উড়ে এসে পড়ল রাবেয়ার হাসপাতালের কার্ড, বুকের ফটো, এপার থেকে ভেসে গেল ঝাঁঝ। ওপারে নেচে নেচে খেউড় গাইছে বউ বেটা, এপারে পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে মা মেয়ে।

রাবেয়ার সব মনে আছে। রাবেয়া কিছুই ভোলেনি। আনাজ কাটতে কাটতে টুকরো টুকরো গাল ছুঁড়ছে পরী, শুনতে শুনতে চোয়াল কঠিন হল রাবেয়ার। বাতাসে কান পাতল, নাহ্ বউ-এর কান্নার সুর একেবারেই থেমে গেছে। ব্যাপার কী, অমন ঘরকাঁপানো গান ফুরিয়ে গেল? নাকি খালি পেটে আর গলা খুলছে না? বোঝ্ রে বোঝ্, উপোসী থাকার কত জ্বালা। দ্যাখ্ এবার, চার ভাগের এক ভাগ ধান খেয়ে কত গলার তেজ থাকে!

মুজিবরের গলা শোনা গেল। কী যেন হুকুম ছুঁড়ছে। জড়ানো গলা, চুল্লু টেনে ঘুমেচ্ছিল বোধহয়, জাগল বুঝি। রেডিওটা বেজে উঠল হঠাৎ। ঘোড়ে জেইসে চাল, হাতি জেইসে দুম্...! উদ্দাম সুর, উচ্চকিত বাজনা। ঝুপ করে বন্ধ হয়ে গেল গান। আবার বেজে উঠল। আবার বন্ধ হল, আবার বাজছে। ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে ওপারে। কী যে একটা ভারী কিছু ছিটকে পড়ল উঠোনে, কঁকিয়ে উঠল জাহানারা। লাথি খাওয়া কুকুরছানার মতো। রেডিও কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মুজিবর, দাপাতে দাপাতে হিন্দি গানের কলি ক্রমশ আবছা হয়ে এল।

রাবেয়ার ঠোঁটের কোণে মিটমিট হাসি, —দেকলি তো?

পরীর বাদামী মুখে আলো ছড়িয়ে পড়েছে, —আর একদিন যা না রে মা ফকিরের দোরে। তারে গে বল, কাজিয়া ঝোগড়া নয়, এক্কেরে তালাক চাই। শেকড় আমি ঠিক নিজে হাতে ভাইজানের বালিশির মধ্যি ঢুইকে দে আসব।

রাবেয়া মাথা দোলাল, —যাব। যাব।

কাশতে কাশতে দম ছিঁড়ে যাচ্ছিল রাবেয়ার। ভোরের মুখে এমনটাই হয়। প্রতিদিনই। বুকের ভেতর হঠাৎ যে পিঁপড়ে বাইতে থাকে, বিষ পিঁপড়ে। গলায় এসে আঁচড় কাটে। ঘুম তো দূরস্থান, রাবেয়ার তখন শুয়ে থাকারও জো নেই। তক্তপোষে বসে বসে কাশে আর হাঁপায়, হাঁপায় আর কাশে। আঁচল মুখে চেপে দেখে মাঝে মাঝে, আবার সেই মারণ ছিটে আসছে কিনা।

আজ যেন কাশতে কাশতে পিঠটাই নুয়ে এল। দমক একটু জিরেন দিতেই বিছানা ছাড়ল রাবেয়া, কলসী থেকে গড়িয়ে ঢকঢক জল খাচ্ছে। মাগো মা, শ্বাসবায়ু বুঝি বেরিয়ে যায়। পাশে পরী মুড়ো ঘুমোচ্ছে অঘোরে, অভ্যস্ত শব্দে তাদের আর আজকাল ঘুম ভাঙে না।

একটু বুঝি বাতাস নিতেই রাবেয়া ঝাঁপ খুলে দাওয়ায় এল। নতুন ভোর ফুটছে, ফ্যাকাসে হচ্ছে আকাশ। শিরশির হাওয়া বয়। রাবেয়া গলায় আঁচল জড়াল। ধানবাদার ওপার থেকে ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এল ট্রেনের, মিলিয়েও গেল।

ঘরে আর ফিরতে ইচ্ছে করছিল না রাবেয়ার। শুয়ে থাকা বড় কষ্টের এখন, বসে আছে ঠায়। ঢুলতে ঢুলতে আলোর অপেক্ষা করছে।

সহসা এক আওয়াজে ঢুলুনি ছিঁড়ে গেল। বেড়ার ওপারে ওয়াক ওয়াক করে কে! মুজিবর নাকি।

পায়ে পায়ে উঠল রাবেয়া। উঠোন টপকে বেড়ার ওপারে গেছে। মুজিবর নয়, জাহানারা। মাইলো গাছের নিচে উবু হয়ে বসে বমি করছে।

ফিরে আসতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রাবেয়া। ঘড়ঘড়ে গলায় প্রশ্ন করল,

—বমি করিস ক্যানো?

—জাহানারা মুখ তুলে দেখল শাশুড়িকে, মুখ নামিয়ে নিল। ছায়া ছায়া আঁধারেও জাহানারার দৃষ্টি যেন পড়তে পারল না রাবেয়া। অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করল,

—পেটে ছাওয়াল আসতিছে?

টিপ করে মাথা নাড়ল জাহানারা, পরক্ষণে আবার ওয়াক ওয়াক। থেবড়ে বসে পড়ল মাটিতে, গোঙাচ্ছে। চোখের জল আর নাকের জলে মুখ একাকার।

রাবেয়ার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—কাল দুপুর থিকে তো কিছু পেটে পড়েনি। খালি পেটে থাকলি...কটা মুড়ি গালে ফ্যাল গিয়ে।

জাহানারা হাঁপাচ্ছে। দু-দিকে মাথা নাড়াল, —এক দানা কিচ্ছু নি।

—মরণ। রাবেয়া ঝুপ ঝুপ করে ঘরে ফিরে এল। ঢাকা খুলে বার করেছে পান্তার বাটি। কাঁপা হাতে বাটি ধরে আবার বেড়ার ওপারে। শুকনো গলায় বলল, —খেইয়ে নে। কাউরে কিছু বলতি হবে নি, কেউ যেন না জানে।

গোগ্রাসে খাচ্ছে জাহানারা, পলকে বাটি চেটেপুটে সাফ।

শূন্য বাটি হাতে ফিরতে ফিরতে টনক নড়ল রাবেয়ার। ঝোঁকের মাথায় এ কী করে বসল। ওই পান্তাটা খেয়েই না পরীর কাজে বেরনোর কথা। কোত্থেকে এত দরদ এল অবাগীর বেটির জন্য? কেন এল? তার মেয়ের ছাওয়াল হয় না বলে তাড়িয়ে দিয়েছে জাহানারার বাপ মা, আর তাদের মেয়ে পোয়াতি দেখে রাবেয়ার প্রাণ উথলে উঠল? নিজের ছেলের ছাওয়াল বলে কী? ওই বউকে তাড়িয়ে অন্য বউ-এর পেটেও তো তার নাতি আনতে পারত মুজিবর। তবে? পরীর সঙ্গে কি ঘোর শত্রুতা করা হল না? রাবেয়া কি তা হলে মনে মনে চায়, ওই মাগীটা বহাল তবিয়তে টিকে থাকুক ওপারে, পরীও আর শ্বশুরঘরে না ফিরুক? কেন চায়? পরী চলে গেলেও মুজিবর যদি ভিন্ন হয়েই থাকে, সেই ভয়ে?

রাবেয়ার চিন্তাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছিল। বুকের ভেতর এত খেলাও চলে। হায় রে বুক! ঘর থেকে হলুদ খামখানা নিয়ে এল রাবেয়া, কাঁপা কাঁপা পায়ে দাওয়ায় এসে বসেছে। বুকের ফটোগুলো বার করল একটা একটা করে, ফুটন্ত আলোয় ধরছে চোখের সামনে। জমাট কালো রঙের মাঝে তেড়াবেঁকা কিছু সাদাটে ছায়া। ওই বুঝি তার হৃদয়?

হৃদয় মানে তবে ঘন কালো অন্ধকারে ছোপ ছোপ কিছু ছায়া! সাদা সাদা! রাবেয়া বুঝতে পারছিল না।

অন্ধকারের উৎস থেকে

জয়া মিত্র

'নাম?'

'শান্তবালা কুইলা'।

'স্বামীর নাম?'

শান্তবালা চুপ করে থাকে। সামনের লোকটি ছাড়ে না। আবার শুধোয়—'বল বল—চুপ করে থাকলে হবে না। এ সরকারের ঘর, এখানে আইন মানতে হবে, কি নাম স্বামীর?'

'হরিধন কুইলা'।

'পরিষ্কার করে জোরে বল'।

এবার শান্তবালা মাথা তুলে লোকটার চোখের দিকে তাকায়। বলে—'হরিধন কুইলা'।

'সাকিন'?

এখন এ সব কথার মানে শান্তবালা জেনে গেছে। প্রথম প্রথম তো কিছুই বুঝত না। এত এত বাইরের লোকজনের মাঝখানে, কী যে তারা বলে, কী শুধোয় কোন কিছুই তার মাথায় ঢুকত না। কেবল জল আসত চোখে। তা ছাড়া, চিরকাল সে আর করেছেই বা কী? বাবা যখন ছেলে ঠিক করে এল বিয়ের জন্য, মা বলেছিল 'আমার কোলপোছা অতোটুকু বয়সের মেয়ে, বাপের বয়সী একটা দোজবরে পাত্র ঠিক করে এলে?' বাপ কাঁধে রাখা গামছায় হাত পায়ের জল মুছতে মুছতে বলেছিল, 'একমুঠো টাকা যে দিচ্ছে ধরে? তার ওপর মেয়ের হাতে সোনা গলায় সোনা, আমার সাধ্য আছে যে কেষ্টঠাকুরের মতো বরের পণের খাই মেটাবো?'

ছ্যাঁচা বেড়ার দেওয়ালের ওপাশে বসে পান সাজতে সাজতে শান্ত কাঠ হয়ে যাবারও সময় পায়নি, তার আগেই আবার মায়ের গলা কানে এসেছিল।

'অতো দূরে বে দেবে, কোনদিন হয়ত আর দেখতেও পাবনি, রেলগাড়ি চেপে মেয়ে দেখতে যাওয়া কি আর হয়? তাদের হাতে কেমন থাকবে আমার কচি মেয়ে আনতেও পারবনি—' এবার বাবা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল।

'তবে যাও, সোয়াগি মেয়ে কোলে করে বসে থাকো, মেয়ে বেড়ে বেড়ে গাছসমান হলে রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চাপিয়ে নে যাবে তোমার মেয়েকে'।

'না না আমি কি তাই বলেছি? একটা মেয়ে—তাই একটু ভাবি গো। শান্ত যে আমার বড়ো ভালোমানুষ মেয়ে, সাত চড়ে একটি রা করে না। তাই ভাবনা হয় অতো বড়ো বয়সের জোয়ান লোকের সঙ্গে কি ঘরবসত করতে পারবে ওইটুকু মেয়ে? সে হোক, যা ওর কপালে আছে হবে'।

'আমি-তুমি ভেবে করব কী?' এবার বাবার গলাও আস্তে, বুঝদার। 'সে সব কথা কী আমিও ভাবিনি? কিন্তু কি করবি, মেয়ে-সন্তান মায়া করার জিনিস তো নয়। আমার মা বলত না খুকিকে কোলে নিয়ে, মেয়েরে নাম দেলি, যমকে দিলেও গেলি, জামাইকে দিলেও গেলি—, এ হল সেই

তখন ভয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদা ছাড়া শান্ত কি আর করেছিল? বিয়ের পর যখন দেখল যম যা, বাবা মায়ের দেখে দেওয়া জামাইও তাই তখন থেকে তো বাঁ হাতটা তার প্রায় বেশির ভাগ সময়ে কাপড়ের আঁচলেই থাকত, চোখের জল মোছার জন্য। বড় কষ্টে কাটাত দিন মাস। বছরও কেটেছিল, এক দুটো নয় তের বছর পুরো। নটা সন্তান। পাঁচটা মরে আরও চারটা বেঁচে ছিল। সেই বিয়ের পর অতো বড়ো লোককে নিজের বিছানায় দেখে ভয়ে একেবারে মরে গিয়েছিল শান্ত। তারপর কি যে যন্ত্রণা, বিছানার চাদর ভরে গিয়েছিল রক্তে, তখনও চোখ বেয়ে জল গড়িয়েছিল যখন মরতে মরতে বারে বারে মিনতি করেছিল, 'আমাকে ছেড়ে দাও গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি ... ছেড়ে দাও আমাকে',

ছেড়ে দিয়েছিল হরিধন কুইলা? ঠাস্ ঠাস্ করে চড়ায়নি দু গালে? হাত মুচড়ে দেয়নি পিঠের দিকে? সোনার চুড়ি পরিয়ে যে হাতের মালিকানা সে আদায় করেছিল। তেরো বছরের শরীর ছিঁড়ে টুকরো করে বেরিয়ে আসে তার প্রথম ছেলে। একটুও ভালোবাসেনি তাকে, ভয়ে লজ্জায় সেই ছেলের দিকে চাইতে ইচ্ছে করত না। নিজের বাপ মা কেন সব জেনে শুনে এতো কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিল? এমন সংসারে যেখানে তাকে বাঁচাবার আর কেউ নেই-না শাশুড়ি-না অন্য কোন ননদ কি দেওর। আশাপাশের পাড়া প্রতিবেশিনীদের ঠারে ঠেরে ততদিনে প্রায় জানা হয়ে গেছে-দুবার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল আর শেষে জীবন ছেড়ে যায় হারাধনের আগের বউ। জল আনতে গিয়ে এমন মন্তব্য অনেক শুনেছে শান্তবালা।

'ওই চণ্ডালের খাই মেটাতে পারবে এই কচি মেয়ে?' 'মা আবাগীই বা কেমন, মেয়েটাকে বাঘের গর্তে ঢুকিয়ে দিল'। তাকে কেউ সরাসরি শুধোয়নি কোনদিন কিছু। প্রথম ছেলেটা চারমাসের হয়ে মরে যায়। তার দু'মাসের মধ্যেই শান্ত বোঝে আবার মা হতে চলেছে সে। কতবার তার ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়তে কুয়োর মধ্যে, কতবার মনে হয় গলার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে গোয়ালের আড়া থেকে। গোয়ালে তো রাতে সে থেকেছে কতবার। ছেলে নিয়ে যখন সে আঁতুড়ে তখনই দেখেছিল অন্য একজনাকে স্বামীর ঘরে ঢুকতে। কচি যখন কোলে, যখন তার গা শুকোয়নি তখনও সে জনা আসত, খুব অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এসে ঘরে ঢুকে দোর দিত, আবার বেরিয়ে তাড়াতাড়ি পায়ে মিলিয়ে যেত অন্ধকারে। সেইসব রাত্রে শান্তকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বার করে দিত তার স্বামী। প্রথম কয়েকবার কাঁথাজড়ানো ছেলেকে নিয়ে আর তারপর খালি কোলে গোয়ালের এককোণে কাটিয়েছে। এখানে তবু তো কটা জ্যান্ত প্রাণী আছে, শ্বাস ফেলে। নড়াচড়া করে। এক একদিন মনে হত ওই লোকটার কাছে আবার যাওয়ার চেয়ে এই একটা গরু যদি অন্ধকারে তার বুকে বা পেটে পা চালিয়ে দেয়, বেশ হয়।

এই সবই মনে হত প্রথমে দু'-তিনটা বছর, তারপর আর কিছু মনে হত না। শান্ত জেনে গিয়েছিল এররকমই চলবে জীবন। কিংবা জীবনের কথাও আর কিছু ভাবত না। বছরের পর বছর রাত্রির আতঙ্ক তাকে কেমন ভোঁতা করে দিয়েছিল। আলাদা আর কোন ভয়ের বোধ ছিল না। লাথি মেরে ভাতের হাঁড়ি উল্টে দেওয়া, দাওয়ার খুঁটিতে বেঁধে গরুর গলার মোটা দড়ি দিয়ে পেটানো। গর্ভধারণ করেছে, একটার পর একটা ছেলে-মেয়ের জন্মের সময় পার করেছে, শান্তবালা মনে করতে পারে কতো বছর ধরে বুকে নয় পেটে একটা বাচ্চার ভাঁর সে ক্রমাগত বয়ে চলেছে। সমস্ত জীবন ধরেও কি? ধানসেদ্ধ করার সময়, মাহিন্দারদের ভাত বেড়ে দেবার সময়, গোয়াল ঘরে সাঁঝাল দেবার সময় তার শরীর ভারী হয়ে থেকেছে, কোমর, উরু ব্যথায় আড়ষ্ট। কত যুগ পার করবার পর তার বয়স

হয়েছিল পঁচিশ। ততদিনে সে পড়শিনীদের সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলতে পারে কিন্তু তখন আর সে সময় পায় না। জল আনতেও যায় না, জল আনে তার বড়ো মেয়ে যামিনী। কালেভদ্রে কখনও একজন মানুষ ঘরে এসে কথা বলে তার সঙ্গে। সেসব দিন কবে চুকেছে যখন রোহিনী অন্ধকার দিয়ে লুকিয়ে এসে শান্তর স্বামীর সঙ্গে ঘরে কপাট বন্ধ করত, এক প্রহর পরে হনহন হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। এখন হরিধন কুইল্যা বাড়িতে না থাকলেও রোহিনী আসে। দিনের বেলাতেই আসে। শান্তর কাছে বসে সুখ-দুঃখের কথা বলে। ছেলেপুলে ঘর-সংসার কিছু নেই রোহিনীর। কবে যে বিয়ে হয়েছিল ভালো মনেও পড়ে না, বিধবা হবার কালে বয়স হয়েছিল পনের। যা জোয়ান লোকটা তার বর মরে সাপের কামড়ে। কাঁদাকাটা চুকে যাবার পরও শ্বশুরবাড়িতেই ছিল পড়ে। সারাদিন কাজপাট সব করে রাত্তিরে অনুমার ঘুম আসত। ষোল বছরে রাতে জল ফিরতে বাইতে যেতে উঠোনের কোণে ঠেসে ধরেছিল ভাসুর। সে নাকি ছোট বৌকে দেখে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না। শাসিয়ে দিল 'টু' শব্দ করলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। রোহিনী ভয় পেয়েছিল খুবই কিন্তু খারাপ লাগেনি সেও সত্যি। চলছিল ওই মতই। শ্বাশুড়ির গাঢ় ঘুম হয়েছে দেখলে উঠে ঘরের কপাট খুলে উঠোনে যাওয়া। তা সত্ত্বেও তাড়িয়ে দিল, শরীরে গর্ভলক্ষণ ফুটে উঠতে। দূরে কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, সাহসও ছিল না। ভাসুর-শাশুড়ির পায় ধরল। ভাসুর লাথি দিয়ে পা সরিয়ে নিল 'নষ্ট মেয়েমানুষ, গঞ্জের বাজারে গিয়ে ঘর নিক' বলে। তার সংসারের, তার বাড়ির বদনাম হবে সেই রাগে অধৈর্য হয় উঠোনে দপদপিয়ে উঠে গিয়েছিল সে। তবু শাশুড়িই থাকতে দিল, ঘরে নয়, জমির কিণারে আলাদা ঘর বেঁধে। ওই জমি শাশুড়ির বাপের কাছে পাওয়া। নাপিতানীর কাছ থেকে ওষুধ করিয়ে মুক্ত হয়ে এলো রোহিনী, শাশুড়িই দু'দিন বড় নাতনিকে দিয়ে এক কলসি খাবার জল পাঠায়। সুস্থ হয়ে ওঠা থেকে বাড়ির বাইরের কাজ সব করে দিত রোহিনী। পাহাড় প্রমাণ খড় কুচোনো, গোয়াল কাড়া, বালতি বালতি জল তোলা, ক্ষারকাচা—সব। সে ঘরও রাখতে পারল না, অতো খেটেও না। ভাসুর এতদিন বিয়ে-থা করেনি, এধার-ওধার কীর্তন-টির্তন গেয়ে বেড়াত। মা মরার আগে জেদ ধরে কান্নাকাটি শুরু করতে বিয়ে করল, কিন্তু তার আগে রোহিনীকে উচ্ছেদ করল বাড়ির সীমানা থেকে।

পাঁচবাড়ি নানারকম তোলা কাজ করে বেড়ায় রোহিনী। একটা বড় গুণ পোয়াতী বা কাঁচা নাড়ির বৌদের মালিশ করে। ডাকতে হয় না, খবর পেলে আপনি গিয়ে পড়ে। সেঁক-তাপ দিয়ে, মালিশ করে, দলে মা-ছা দুটোকেই শক্তপোক্ত করে রেখে আসে। তবে হ্যাঁ রাত-বিরেতে অন্য কাজেও যায়, এখনও যায়। তেমন দু'-চারজন ডাকলে। জ্বালা তার শরীরেও আছে। রাগও আছে। তার ঘর তার জীবন যদি না ভাবল, সমাজে সে বা কাকে ভয় করে!

কিন্তু হরিধন কুইল্যার বৌটার ওপর কেমন মায়া পড়েছে তার। তার সন্তান বাঁচলে কি এত বড় হত? হয়ত হত না। তবু শান্তবালার মুখখানা দেখলে, মাথায় ঢিবির মত একতাল খোঁপা, বড় বড় গালের একটু উঁচু হাড় আর গোরুর চোখের মত কালো মস্ত মস্ত চোখ বসানো মুখ, রোহিনীর ভিতরে অন্য কেমন একরকম কষ্ট হয়। ওই রাক্ষসটার অত্যাচার সহ্য করে এই মেয়েটা। 'আর তাকেই কিনা পাঁচজনে বলে আসছে পতিসেবা, মেয়ে লোকের পরম ধর্ম। তিন ঝাড়ু অমন ধর্মের মুখে।'

শান্ত এখন আর সেইসব কথা ভাবে না। কেবল ভাবে নিজের মেয়ে দুটোর কথা। ছেলেদের কথাও অতো ভাবে না, তারা যে করে হোক খুঁটে খেতে পারবে, তাদের তেমন সামর্থ তো আছে। কিন্তু যামিনী, কামিনী? ওদের তো বিয়ে হবে। কোথায় হবে কত দূরে? তার মতো এতদূরে? যেখান

থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে একবার মাত্র বাড়ি যেতে পেরেছিল, কেবল বাবা মরে যেতে, দু'দিনের জন্য। সে তো মেয়ে সন্তান, চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করে তার শোক শেষ না হলে তার শ্বশুরবাড়ির ভাত রাঁধবে কে? স্বামীসেবা করবে কে? একটা কথা সে মনে ঠিক করে রেখেছিল, যেমন করে হোক, মেয়েদের একটু লেখাপড়া সে শেখাবেই। যতটুকু শিখলে অন্তত মাকে একটা চিঠি লেখা যায়। এই এত বছর ধরে একটু একটু করে টাকা সিকে জড়ো করে রেখেছে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। এখন তো গ্রামেই প্রাইমারী স্কুল হয়েছে। শহর থেকে বাসে করে দিদিমণি আসে পড়াতে। শুধু ওদের বাবার চোখের আড়ালে করতে হয়। অন্তত শুরুটা। তারপর দেখলেই বা, ছাড়িয়ে কি আর আনবে? কিন্তু সেইসব ভাবনা যাচিয়ে দেখবার সময় পেল কোথায় শান্ত? তার আগেই না যামিনীর বাবা শান্তর চেয়েও বয়সে বড় একটা চোয়াড়ে চেহারার লোককে নিয়ে বাড়ি ফিরল একদিন। আসন পেতে দাওয়ায় বসিয়ে খাতির-যত্ন করল। শান্তকে ডেকে জলপানের কথা বলল। তারপর লোকটা চলে যেতে ফিরে এসে দাওয়ায় বসে সন্তুষ্ট হাসিমুখে বলল—

'যামিনীর বে ঠিক করে ফেললাম বুঝলি?'

'কি!' মুহূর্তে শান্তর মাথার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠেছে রক্ত উঠে এসেছে চোখে। এগারো বছর পেরোয়নি যামিনীর।

'বিস্তর জমিজমা এক লপ্তে, ঘরে এক খুনখুনে বুড়ি মা ছাড়া কেউ না। বিয়ে-শাদি করবে না ঠিক করেছিল কিন্তু একা হাতে সব জমি সামাল দিতে পারে না। তা আমিই বুদ্ধি দিলাম বৌ আনো ঘরে, ছেলেপুলে না থাকলে এত জমি এত সম্পত্তি কী হবে? বুড়ো বয়সে দেখবে পাঁচভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে। তোকে দেখে মেয়ের চেহারা ছাঁদও বুঝে নিতে পারল খানিক—' এতটুকু যামিনীকে নিয়ে এখনই আলোচনা হয়ে গেছে বিয়ে করে এনে ছেলেপুলে করার। তারপরের আর কোন কথা কানে ঢোকেইনি শান্তর।

'এ বিয়ে হবে নে।'

হরিধন অবাক হয়ে তাকায়। এরকম স্বর শান্তর গলায়, সে এ যাবৎ কখনো শোনেনি।

'কেন শুনি? কি খারাপ দেখলি?'

'অতটুকু মেয়ের আমি বে' দেব না। যামিনী-কামিনীকে আমি ইস্কুলে পাঠাব। মানুষ করব, শান্ত জানে না এতগুলো কথা এরকম ঠিক ঠিক জোর গলায় সে বলতে পারে। হরিধন খানিক সময় একেবারে যেন হাঁ করে শান্তর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর উঠে গোয়ালের দিকে চলে যায়। আর শান্ত ঘরের ভিতর ঢুকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হরিধন ঢুকে পেছন থেকে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে 'এত বড়ো বাড় হারামজাদি, মেয়ে ইস্কুলে পাঠাবি বলে আমার মুখে জবাব করিস! নে পাঠা তোর মেয়ে ইস্কুলে—' গরুর গলায় বাঁধবার 'পাখা' সাঁই সাঁই পড়তে থাকে মাটিতে পড়ে যাওয়া শান্তর শরীরে। অনেকক্ষণ পর, ক্লান্ত হয়ে দড়িটা উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে হরিধন ঘুরে আসে নির্জীব শরীরটার সামনে।

'দুকান খুলে ভালো করে শুনে রাখ যামিনীর সঙ্গে সঙ্গে কামিনীরও আমি বে দেব এই এক মাসের মধ্যে। ইস্কুলে পাঠানোর তোর ফন্দি আমি বের করে দেব হারামজাদি মাগী—'

ঠিক কোন মুহূর্তে ভেবেছিল কথাটা শান্তর মনে পড়ে না কিন্তু তার মাথাটা একেবারে ফেটে যাচ্ছিল। বহু বছর ধরে চোখের সামনে থাকা কাঠ চেলা করার কুড়ুলটা রাত্রে ঘুমন্ত হরিধনের মাথায় গায়ের জোরে বসিয়ে তার মন শান্ত হয়ে যায়। পুকুরে ডুব দিয়ে কাপড়

ছেড়ে এসে যে যামিনী-কামিনীকে ডেকে তোলে। চার গাছা চুড়ি আর গলার সরু হার যামিনীর হতভম্ব মুঠোয় গুঁজে দিয়ে বলে, 'আমি একটা জায়গায় যাচ্ছি, ভায়েদের ঘুম থেকে তুলে নে, চটপট করে রোহিনী মাসীর বাড়ি চলে যা। এগুলো তার হাতে দে' বলবি তোদের যেন ইস্কুলে ভর্তি করে দেয়। তারপর ওকেনেই থাকবি। আমি না ফেরা পজ্জন্ত মাসীর কতা শুনে চলবি।' তারপর কুড়ুলটা পেটকাপড়ে ঢেকে নিয়ে প্রায় সাত মাইল পথ হেঁটে দুপুর রোদে থানায় গিয়ে পৌছেছিল সে।

'আমার ঘরের লোককে কেটে এইছি মোকে কি করবে কর'-কুড়ুলটা অফিসারের সামনের বড় টেবিলটায় নামিয়ে দিয়ে সে ভারমুক্ত হয়েছিল।

'সাকিন?'

লোকটার মুখের দিকে তাকায় শান্তবালা! সে দেখায় পাশের ঘরের ভেতরে বসে থাকা জেলারের দিকে।

'ঘোড়াপাড়া মেদিনীপুর'।

কোর্টে একদিন এসেছিল রোহিনী। কেঁদে আকুল হয়ে বলেছিল 'তুই রেতেতেই মোর ঘরে এলিনি কেন? দু'জনে মিলে ওটাকে মাটি চাপা দিয়ে দিতুম।'

শান্ত ধীরভাবে মাথা নেড়েছিল 'না গো, তাই হয়? ভগবানের জীব একটা মানুষকে মারলে পাপ তো হয়ই। তার সাজা পেতে হবে নে?'

তারপর একটু ঢোক গিলে বলেছিল—

'দিদি, ছেলেমেয়েদের—'

সেপাইদের হাতে রোহিনী যে পাঁচ টাকা দিতে পেরেছিল তার মেয়াদ ফুরিয়েছিল। 'চলো চলো, সাহেব দেখতে পাবে' বলে তাড়া দিয়েছিল তারা। রোহিনী পেছন থেকেই বলেছিল,

'তুই ভাবিসনি, ওরা ভালো আছে।'

পুরো কেস টিকিট মিলিয়ে নেওয়া হলে ঘরে টেবিলের পেছনে বসে থাকা জেলার বলেন—

'শান্তবালা কুইল্যা স্বামীকে খুনের দায়ে তোমার বিশ বছর সাজা হয়েছে। তুমি যদি হাইকোর্টে আপীল করতে চাও সরকার নিজের খরচে তোমাকে উকীল দেবেন।'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা জামা-চাদর পরা মেট্রন বলে—

'চলো'।

শান্তবালার পেছনে বহরমপুর জেলের ফিমেল ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

বি পজিটিভ

সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার

সূর্যর বাবা ডাক্তার। সেই কারণেই হয়ত ছোটবেলা থেকে সূর্যর শরীর খারাপ। বড় কোনও অসুখ নয়। পেটখারাপ, সর্দিজ্বর, কাশি, পায়ে ব্যথা, দাঁত কনকন—সারাক্ষণ একটা না একটা লেগেই আছে। বাবা ডাক্তার তাই বাড়ির লোকের চিকিৎসা করেন না। কিন্তু ডাক্তার বন্ধুর অভাব নেই। তাঁদের আসা যাওয়া লেগেই থাকত সূর্যর ছোটবেলা থেকে। আর লেগে থাকত মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের আসা-যাওয়া। সূর্যর জ্ঞান হওয়ার আগে থেকেই তাদের দিয়ে যাওয়া ওষুধে বাড়ি উপচে উঠত। সূর্যর অক্ষর পরিচয়ের পর থেকে নানা ওষুধের নামের সঙ্গে ওর বিলক্ষণ পরিচয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছোট মামার এনে দেওয়া রবিনসন ক্রুসো, ট্রেজার আইল্যান্ড, চাঁদের পাহাড় শেষ করার আগেই ও ওষুধের গায়ে লেবেলে ছাপা লম্বা লম্বা সব রাসায়নিক নাম শিখে ফেলেছিল। লেবেল ছাড়াও শিশির ভেতরে চিরকুটেব সন্ধান পেয়ে সেই অল্পবয়সেই সূর্য বিভিন্ন ওষুধের কন্ট্রা-ইন্ডিকেশন পর্যন্ত মুখস্থ করে ওষুধ সম্পর্কে ছোটখাট বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

ক্লাস এইট।

স্কুলে খেলার মাঠের ধারে বেঞ্চিতে বসে ক্লাসের ছেলেদের খেলা অবজ্ঞাভরে দেখছিল সূর্য। মাকে বলে বাবাকে দিয়ে নোট লিখিয়ে খেলা থেকে স্থায়ী ছাড় আদায় করেছে। সুতরাং অন্যরা যখন হৈ হৈ করে মাঠ দাপিয়ে বেড়ায়, সূর্য তখন বেঞ্চিতে বসে বসে খেলোয়াড়দের সমালোচনা করে। এদিনও আপনমনে সহপাঠীদের খেলার নিম্নমান নিয়ে মনে মনে আলোচনা করছিল আর মাঝে মাঝে নিতান্ত বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করছিল। পাশে বসে নিবিড়, ফার্স্ট বয়। পাড়াব টিমে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পা মচকে আহত। ব্যান্ডেজ বেঁধে স্কুলে আসছে বটে কিন্তু খেলার ক্লাসে মাঠে নামার মতো জোর এখনও পায়ে নেই। অনেকক্ষণ ধরে সূর্যর আপনমনে বিড়বিড় আর মাথা নাড়া লক্ষ্য করে মনে মনে কৌতূহল হচ্ছিল।

এক সময় সূর্য মাথা ঘোরাল। নিবিড়ের সঙ্গে চোখাচোখি হল। পায়ের দিকে তাকিয়ে সূর্য জিজ্ঞেস করল, 'কী ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার?'

ওষুধের নাম শুনে আবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

—মাথা নাড়লি যে। জিজ্ঞেস করল নিবিড়। অনেকক্ষণ ধরেই ওর এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে।

—কী আর বলব। আজকালকার ডাক্তাররা...তুই কি জানিস, ওষুধটা বেশিদিন খেলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়?

ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ওষুধের লিটারেচারে 'রেয়ার কেসেস' লেখা শব্দ দুটো ও ইচ্ছে করে চেপে গেল নাকি সত্যি মনে ছিল না, জানা গেল না।

নিবিড় গম্ভীরভাবে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। গোলাপি রঙের ক্রেপ ব্যান্ডেজের ধারগুলো ময়লা হয়ে এসেছে। কষে বাঁধা। চলাফেরা করতে ইদানীং আর তেমন লাগছে না। মনোযোগ দিয়ে

ব্যান্ডেজ পরীক্ষা করতে করতে অন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা কতটা তা নিয়ে একটু যে চিন্তিত সে ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

বাড়ি ফিরেই সূর্য গম্ভীর চালে মাকে বলল, আজকালকার ডাক্তারদের আর বিশ্বাস করা যায় না।

—কেন, আবার কী হল? ছেলের রায়ে বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মা।

—আমার আবার কী হবে? হয়েছে নিবিড়ের।

তের বছর বয়সে তেত্রিশ বছরের গাম্ভীর্য আয়ত্ত করে সূর্য মাঝে মাঝেই তা মায়ের ওপর প্র্যাকটিস করে। ধনী পরিবারের পুত্রবধূ তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রতিটি আচরণে যে মুগ্ধতা প্রকাশ না করার কোনও কারণই খুঁজে পান না।

—নিবিড়ের ডাক্তার ওকে যে ওষুধ দিয়েছে তাতে ও শিগগিরই অন্ধ হয়ে যাবে।

—তুই কী করে জানলি?

—ওষুধের নাম বলতেই বুঝতে পারলাম। সেবার যখন পড়ে গিয়েছিলাম, সঞ্জয়কাকুর বন্ধু সেই বসাক বলে ডাক্তার আমাকে ওই ওষুধই দিয়েছিল। তখনই তো জানতে পেলাম। তারপর অবশ্য আর ওই ওষুধ খাইনি।

আরতি ছেলের বিচক্ষণতায় অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বলবেন কি বলবেন না ভাবতে ভাবতে বলেই ফেললেন, বাবু, তুই বড় হয়ে ডাক্তারি পড়লে পারিস, তোর এত জ্ঞান!

অবজ্ঞাভরে মার দিকে তাকাল সূর্য।

—তুমি ক্ষেপেছ! বাবাকে দেখেও তোমার শিক্ষা হয় না! সারাক্ষণ হাসপাতাল ক্লিনিক আর পেশেন্ট। তাছাড়া আমার শরীরের এই অবস্থা—অত স্ট্রেন করা সম্ভব নয়।

বিহুল হয়ে আরতি ছেলের কথা শুনলেন। সত্যিই তো, শরীরের কথাটা আরতিরই ভাবা উচিত ছিল। মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। একই সঙ্গে একটু গর্বিতও ছেলের জন্যে। কী বিচার ক্ষমতা! এমন বোদ্ধা ছেলে লাখে একটা মেলে। তের বছরের ছেলের ন'বছরের পাঁকাটি চেহারা আরতির চোখ এড়িয়ে গেল। মোটা চশমার আড়াল থেকে মায়ের মুখে খেলে যাওয়া বিভিন্ন অনুভূতি সূর্যর চোখ এড়াল না। অসাধারণ আত্মপ্রসাদে আপ্লুত সূর্য অসুখের ভারে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে, চটি ঘষতে ঘষতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

২

স্কুল পাশের পরীক্ষায় সূর্য কোনও মতেই আশাতীত ফল করেনি। মোটের ওপর মন্দ নয়, বাবা-মায়ের গর্বে বুক ফুলে ওঠার মতো কিছু নয়। সত্যি বলতে কি, রেজাল্ট দেখে সূর্যর বাবা সুধাংশুশেখর ব্যানার্জির মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। আশেপাশে সূর্য নেই স্থির করার পর বিরসমুখে স্ত্রী আরতিকে বললেন, এই রেজাল্ট নিয়ে ডাক্তারিতে চান্স পাবেই না, ভাল কোনও কলেজে ঢোকা মুস্কিল হবে।

—ডাক্তারি! আঁতকে উঠলেন আরতি। 'তুমি কি ওকে মেরে ফেলতে চাও? এই শরীর নিয়ে ও ডাক্তারি পড়বে!

নামকরা, রাশভারি ডাক্তার স্বামী আর ক্ষণজন্মা, ক্ষীণজীবী ছেলের মাঝখানে পড়ে আরতি চিরতটস্থ, চিরউদ্বিগ্ন। গত কুড়ি-বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনে কখনও জোর গলায় কথা বলতে শোনা যায়নি তাঁকে। সেই আরতির গলা চড়ে গেল দেখে সুধাংশুশেখর যত না বিরক্ত তার চেয়ে অবাক হলেন বেশি। তাহলে কি আমি অন্যায় কিছু বলে ফেললাম, ভবলেন মনে মনে। ডাক্তার

হয়েও নিজের ছেলেকে স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলতে পারেননি ঠিকই, তাই বলে ডাক্তারি পড়ার পরিশ্রমটুকুও সে যে করতে অক্ষম, সে কথা তাঁর জানা ছিল না। রুগি, ক্লিনিক আর হাসপাতাল করতে করতে তাঁর দিন কেটে যায়। বহুকাল স্ত্রী-পুত্রের খবর নেওয়া হয়নি।

—সূর্যর কি আবার শরীর খারাপ হয়েছে? সাবধানে জানতে চাইলেন।

—শরীর তো চিরকালই খারাপ। হঠাৎ চেঁচিয়ে ফেলে আরতি কেমন ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন, স্বাভাবিকের চেয়েও মলিন গলায় স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন—তোমার তো অনেক চেনাজানা আছে, তুমি বরং দেখেশুনে ওকে একটা ভাল কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দাও।

—দেখি কী করতে পারি। সুধাংশুশেখর পাইপ ধরালেন। আজ বহুদিন পরে স্ত্রীর সঙ্গে বসেছেন। সাধারণত এই সময়ে চেম্বারে বসেন। আজ চেম্বার বন্ধ, মেরামত হচ্ছে। খুব জরুরি কিছু কেস এক ঘণ্টা পরে বাড়িতে আসবে।

বেশ লাগছে আরতির সঙ্গে বসতে। অনেকদিন পরে দু'-চারটে সুখ-দুঃখের কথা বলতে, শুনতে ইচ্ছে করছে। স্বামীর সংসর্গে আরতিও কিছুটা অভিভূত। বছরের পর বছর কত কথা জমেছে, একে একে মনে পড়তে শুরু করেছে।

—পারুলের মেয়ের বিয়েতে এক জোড়া বালা গড়িয়ে দিলে কেমন হয়? স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন।

প্রস্তাবটা সুধাংশুশেখরের খারাপ লাগল না। আজকাল সোনার অনেক দাম, তবু ছোট বোনের মেয়ে, আপন ছোট বোন, আরতি মন্দ বলেনি। মনে মনে জুতসই একটা বাহবা ভাঁজতে ভাঁজতে মুখ থেকে পাইপ বের করলেন। পর্দার ওদিকে চটি ঘষার শব্দ হল। পরমুহূর্তেই পর্দা সরিয়ে সূর্য ঢুকল।

—তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে! আজকাল কেউ সোনা দেয়? সেই তো ঘরের সোনা দিতে হবে। একবার আমার কথা ভাবলে না? এই তো শরীরের হাল, যদি কিছু হয়ে যায় তখন থাকার মধ্যে একমাত্র ওই সোনাই তো সম্বল হবে। না না, সোনা-ফোনা দিতে হবে না। মোটা দেখে গিফট চেক দিয়ে দাও, তাতেই ওরা খুশি হবে। ফিক্সড ডিপজিট করে রাখবে, সুদে বাড়বে।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে হাঁপাতে সূর্য বসে পড়ল।

আরতি অসহায়ভাবে একবার স্বামীর দিকে একবার ছেলের দিকে তাকালেন। উনি জানতেও পারলেন না সুধাংশুশেখর ওঁর কথায় সায় দিতেই যাচ্ছিলেন। ফলে নিজের নির্বুদ্ধিতায় ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন, না না, তুই ঠিক বলেছিস। সোনা দিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং একখানা বেনারসী কিনে দেব, কী বলো?

সুধাংশুশেখরের মুখে আবার পাইপ ঢুকেছে। আরতির মতো সূর্যকে উনি ঠিক সমীহ না করলেও, ডাক্তার বাবা হয়ে ছেলের স্বাস্থ্যের কোনও রকম উন্নতি না ঘটাতে পেরে মনে মনে সর্বদা একটু কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন। কাজেই আরতির প্রশংসা শুধু ভাঁজাই হল, উচ্চারণ হল না।

—আমার যে খাওয়ার সময় হয়েছে মা, তুমি কী করছ বসে বসে?

ছেলের মুখে বিরক্তির ছাপ দেখে আরতি তাঁর মোটা শরীর নিয়ে যতদূর সম্ভব লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর মনেও হল না উনিশ বছরের ছেলেকে বলি, গীতাকে গিয়ে বল, খাবার দিয়ে দেবে। বাবার সঙ্গে আমার জরুরি-কথা আছে।

চশমার ভেতর দিয়ে বাবাকে লক্ষ্য করছিল সূর্য। বয়সের ছাপ পড়েছে। আজকাল আর আগের মতো অত কঠোর মনে হয় না।

ইদানীং সুধাংশুশেখর শাসন তো নয়ই, আগবাড়িয়ে ছেলের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন না। নিজেরই ছেলে, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। আচমকা এমন সব কথা বলে, অস্বস্তি হয়। অথচ খতিয়ে ভাবলে দেখা যায়, যা বলে, নিতান্ত মন্দ বলে না। বিয়ের পর বোনই বলো আর দিদিই বলো, সব তো সত্যিই পর হয়ে যায়। সেই পরের ঘরেই সোনা দেওয়ার কথা হচ্ছিল, তাতে কার লাভ! বুদ্ধি আছে ছেলেটার! দেখতে তো হবে কার ছেলে! ভেবে আত্মতুষ্টি হচ্ছিল সুধাংশুশেখরের, স্বপ্ন ভাঙল সূর্যর কথায়।

—রেজাল্ট দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখলাম। সুধাংশুশেখর এরপর কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

—আজকাল কোনও পরীক্ষার খাতা ঠিকমতো দেখা হয় না। আমার বন্ধু কুনালের বাবা একজ্যামিনার। কুনালকে দিয়ে খাতা দেখান। এ দেশের কোনও আশা নেই। ঠিকমতো খাতা দেখা হলে আমার রেজাল্ট নিয়ে ভাবনা থাকত না। তোমাকে আমার জন্যে ধরাধরিও করতে হতো না।

সুধাংশুশেখর স্তম্ভিত হয়ে সূর্যের দিক তাকালেন। কিছুক্ষণ আগে আরতি একথা বলছিল ঠিকই, তাই বলে উনি যে চেষ্টা করবেন এমন কথা তো দেননি। অথচ সূর্য ধরেই নিয়েছে ধরাধরি উনি করবেনই, ওর জন্যে চেষ্টা করবেনই! হঠাৎই সুধাংশুশেখর মনে মনে প্রতিবাদ করে উঠলেন। কেন করবেন? যার ভর্তি হওয়ার সে নিজে চেষ্টা করুক। বিরক্তিতে পাইপ কামড়ালেন। কিন্তু তারপরেই চিরাচরিত কুণ্ঠা কুর্নিশ করে দাঁড়াল। মুখে কিছু বলতে পারলেন না।

—তুমি বরং কালই চৌধুরীকাকুকে ফোন করে বলে রেখো। গম্ভীরভাবে সূর্য পরামর্শ দিল। ওর শ্যেনদৃষ্টি সুধাংশুশেখরের মুখের উপর।

—হ্যাঁ, তাই ভাল হবে। শুভস্য শীঘ্রম।

সুধাংশুশেখর উঠে পড়লেন, রুগি আসার সময় হয়েছে।

৩

কথাটা শুনে আঁতকে উঠেছিলেন আরতিও।—শেষে বাবুকে মেয়েদের সঙ্গে ক্লাস করতে হবে?

—আহা, শুধু তো মেয়ে নয়, ছেলেরাও আছে। হাসপাতাল সেরে রুগীর বাড়ি যাওয়ার ফাঁকে স্ত্রীকে সংক্ষেপে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন সুধাংশুশেখর। কো-এড কলেজের ব্যাপারে আপত্তি ওঁরও ছিল। কিন্তু আজকাল ভাল কলেজ নাকি সবই কো-এড। তাছাড়া এই কলেজে চেনাজানা বেরিয়েছে। অন্য কলেজে কে কোথায় পরিচিত লোক আছে খোঁজার মতো সময় তাঁর কোথায়!

—বাবু শুনলে বিরক্ত হবে।

কেন যে আরতি একথা ধরে নিলেন জানা গেল না। হয়ত ওঁর ধারণা সূর্যের মতো বিচারবোধসম্পন্ন বিচক্ষণ ছেলেদের মেয়েদের মতো হাল্কা, পাতলা, অগভীর জীবের প্রতি কোনও আগ্রহ থাকে না। আশেপাশের ওই বয়সী ছেলেমেয়েদের তুলনায় সূর্য যে অনেকটাই আলাদা সেকথা তাঁকে বলে দেওয়ার দরকার নেই। ওরা সব যখন করিশমা কাপুর, মাধুরী দীক্ষিত, সলমন খান আর শাহরুখ খানকে নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই সূর্য হঠাৎ শেয়ার বাজার আবিষ্কার করল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বিভিন্ন খবরকাগজের বাণিজ্যের পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কোন শেয়ারের কী দর ওর নখদর্পণে। শুধু উপযুক্ত রেস্ত না থাকায় কেনাবেচা করতে পারে না।

আরতি ভাবেইনি এহেন ছেলে মেয়েদের প্রতি কোনওভাবে আকৃষ্ট হতে পারে! তবু প্রথম দু'-

এক মাস ক্লাসে ছেলে মেয়েদের বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব জেনে নেওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

—সব বোগাস!

দুটো শব্দে সূর্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রী, টিচার, লাইব্রেরী ইত্যাদি যাবতীয়দের বর্ণনা দেওয়ায় আরতি মোটামুটি নিশ্চিন্তই ছিলেন। চমক ভাঙল যেদিন প্রথম ফোন এল।

—আন্টি, আমি মোনা বলছি, সূর্য আছে?

সূর্যকে ডেকে দিয়ে আরতি সোজা পুজোর ঘরে ঢুকলেন।

জয় ঠাকুর, জয় মা! জয় ঠাকুর, জয় মা! মোনা যদি লক্ষ্মী মেয়ে হয়, তাকে আমি সোনা দিয়ে মুড়ে ঘরের বউ করে আনব। সবই তোমাদের ইচ্ছে। কিন্তু দেখো আমার সোনার টুকরো ছেলে যেন ডাইনির পাল্লায় না পড়ে। একটু দেখো ঠাকুর, মা মাগো।

বারবার কপালে হাত ঠেকাতে লাগলেন আরতি। কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। একবার ভাবলেন সুধাংশুশেখরকে ফোন করে জানাই। তারপরেই দ্বিধা হল। হয়ত উনি হেসে উড়িয়ে দেবেন। তারপরেই মনে হল সূর্যর কথা। বাবাকে জানিয়েছি টের পেলে যদি বিরক্ত হয়। সূর্যর অসন্তুষ্ট মুখটা মনে হতেই আরতি ফোন করে সুধাংশুশেখরকে জানানোর কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন।

মোনার ফোন নিয়মিতই আসে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বাবু যে খুব অনিচ্ছুক, আরতির তা মনে হয় না। ছেলের পছন্দ হলেই হল, ভাবেন মনে মনে, একবার যদি চোখে দেখা যেত।

ঋতু পরিবর্তনের সময় যথারীতি সূর্য থেকে থেকে অসুখে পড়ে। ক্লাসে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এবারে আর ফোন নয়, সশরীরে মোনা এসে হাজির। দরজার বাইরে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরতি প্রথমদিন থমকে গিয়েছিলেন। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সপ্রতিভভাবে হেসেছিল মেয়েটি।

—সূর্য আছে? আমি মোনা!

নাম শুনে হুঁশ ফিরল আরতির।

—এসো। ওর শরীরটা ভালো নেই, শুয়ে আছে।

সূর্যর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন আরতি। বেশ সুশ্রী মেয়েটি। কি সুন্দর স্কার্ট ব্লাউজ পরেছে। আজকালকার মেয়েরা কত সুন্দর সাজতে জানে, লেখাপড়াও করে, একা একা ঘুরেও বেড়ায়। বন্ধুর বাড়ি যায়। ভাবতে ভাবতে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে আরতি ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

বছর ঘুরতে থাকে। ঋতু পাল্টায়। সূর্যর শরীরও খারাপ হয়। মোনার আসা-যাওয়া চলে নিয়ম করে। সূর্য ওদের বাড়ি যায় না, মোনাই আসে। একদিন আরতি বলেছিলেন, 'একবার গিয়ে দেখে আয় না কেমন বাড়ি! তোর যখন পছন্দ হয়েছে...।'

মাঝপথে থেমে যেতে হয়েছিল, সূর্য কড়া মুখে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল।—পছন্দ অপছন্দ আবার কী? ক্লাসে পড়ে, ব্যস, চুকে গেল।

টেস্টপরীক্ষার ঠিক আগে জ্বরে পড়ল সূর্য। এমনিতেই নিয়ম করে ক্লাস করা হয় না। তার ওপর যদি পরীক্ষা না দিতে পারে, আরতি উদ্বেগে উদ্ভ্রান্ত। পরীক্ষার চাপেই বোধহয় মোনা আজকাল আসছে কম। কী যে হবে!

সূর্যর ফলের রস নিয়ে ওর ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন আরতি, সূর্যর গলার আওয়াজ পেয়ে থেমে গেলেন।

—পরীক্ষা একা তোমার, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না? একেই বলে মেয়েদের বুদ্ধি! নোটগুলো নিয়ে আসবে, আর কোনও সাজেশন দিলে ভুলে বসে থেকো না। তোমার মেমারি তো বাঁধিয়ে রাখার মতো।

আরতি শিউরে উঠলেন। এইভাবে ধমকাচ্ছে, মেয়েটা বেঁকে বসবে না তো। বাবুর মুখটাই ওইরকম। ভেতরটা তো সবাই চিনতে পারে না। বাবুকে চেনা সহজ! আমিই মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারি না।

—থাক, আর বড়াই করতে হবে না! আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অত সোজা! তাছাড়া যে কোনও শিক্ষিত লোক জানে মেয়েদের মগজের ওজন ছেলেদের মগজের ওজনের চেয়ে কম। তার মানে যে কী, মাথায় ঢুকল?

পরেরদিন দরজার সামনে মোনাকে দেখে আরতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক, তাহলে বাবুকে চিনতে ভুল করেনি। বুদ্ধিমতী মেয়ে বলতে হয়। আহা, এমন একজনকে যদি বাবুর বউ করার জন্যে পেতাম! বাবুরও তো পছন্দই হয়েছে মনে হয়। নাহলে রোজ বাড়িতে ডেকে আনে! আহা ঠাকুর বাঁচিয়ে রাখুন। এইবেলা বরং ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপটা সেরে ফেলতে হয়।

আরতিকে হাল্কা হাসি দিয়ে সূর্যর ঘরে ঢুকল মোনা।

ঘণ্টা দুয়েক কেটে গিয়েছে। রোজকার মতো কথাবার্তার কোনও শব্দ নেই দেখে আরতি বিচলিত হয়ে পর্দা ফাঁক করলেন। চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় ঘুমোচ্ছে বাবু আর ওর টেবিলে বসে একমনে নোট টুকে যাচ্ছে মোনা।

আরতির চোখে জল এসে গেল। আবেগে বুক কেঁপে উঠল। এই না হলে ভালবাসা! পারবে—এই মেয়েই পারবে। আমরা যখন কেউ থাকব না, তখন বাবুর ভার ওই নিতে পারবে। জয় ঠাকুর!

চেয়ার সরানোর আওয়াজ হল।

—সূর্য, এই সূর্য! মৃদু গলায় মোনা ডাকল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরতি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর পায়ে যেন হঠাৎ শেকড় গজিয়ে গিয়েছে।

আবার ডাকল মোনা।—কী, হল-টা কী? বিরক্তিতে সূর্যর গলা তীক্ষ্ণ।

—নোট লেখা হয়ে গিয়েছে, রাত হয়ে যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি।

—যাচ্ছ তো যাও না, আমাকে বিরক্ত করছ কেন? দেখতে পাচ্ছ না রেস্ট নিচ্ছি! সব ঠিকমতো লিখেছো, নাকি এমন কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং করে লিখেছ যে পড়া যাবে না।

টেবিল থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে, পর্দা সরিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মোনা। আরতিকে দেখে ছোট্ট করে হাসার চেষ্টা করল। ঠিক হল না।

—একবার শুনবে? আরতি ডাকলেন ওকে। তারপর সূর্যর ঘর থেকে যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে বললেন, কোথায় থাকো মা তুমি?

— বেকবাগান। বলল বটে, কিন্তু মোনার চোখ সামান্য বড় হয়ে গেল।

—বাড়িতে কে কে আছেন?

এবার হাঁ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল মোনা।

—মা-বাবা আছেন তো? আরতি কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

—হ্যাঁ, সবাই আছেন।

—তোমাদের ঠিকানাটা দেবে মা? অনুনয় করে উঠলেন আরতি।

—ওর ঠিকানা নিয়ে তুমি কী করবে? জলদগম্ভীর গলায় বলে উঠল সূর্য। আরতি খেয়ালই করেননি ও কখন ওঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—না, মানে...বলতে শুরু করে থেমে গেলেন আরতি।

—তুমি আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও যাও! হাত নেড়ে মোনাকে বিদায় করে দিল সূর্য। তারপর গম্ভীরমুখে মার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

—কী ব্যাপার, ওর ঠিকানা চাইছিলে কেন? তীক্ষ্ণ গলায় আবার বলল।

—না, মানে...তোর ওকে পছন্দ হয় বাবু?

—পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। ক্লাসে পড়ে, আমার প্রয়োজন হলে নোট দিয়ে যায় ব্যাস। এখানে পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে লাফালাফি করছ কেন?

—না, ভাবছিলাম, তোকে তো খুব ভালবাসে। আরতি আমতা আমতা করে থামলেন।

—এইসব তোমাকে বুঝিয়েছে বুঝি? আমি তখনই বুঝেছি, মেয়ে সুবিধের নয়। বড়লোকের বাড়ি দেখেছে, অমনি পাকড়ানোর তাল করতে শুরু করেছে। কী বলেছে তোমায়?

—আমাকে কিছুই বলেনি। অসহায়ভাবে বলে উঠলেন আরতি।

—তাহলে আবোল-তাবোল বকছ কেন?

—না ভাবলাম, তোকে ভালবাসে, তোর যদি পছন্দ হয়, তাহলে...

—কী তাহলে? খেঁকিয়ে উঠল সূর্য।

—না, মানে, তাহলে ওর বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে রাখতে পারি, মিনমিন করে বললেন আরতি।

—নোট লিখে দিচ্ছে বলে ওকে বিয়ে করতে হবে নাকি?

—তোকে ও ভালবাসে তো!

—তাতে কী হল? জানো ওরা কোথায় থাকে? কী রকম বাড়িতে থাকে? একতলার ঘুপচি ফ্ল্যাট। তাও আবার ভাড়া করা, নিজেদের নয়। তুমি ভাবছ ওই হাভাতে ঘরের মেয়েকে আমি বিয়ে করব? কী দিতে পারবে ওরা? নোট লিখে দেয় বলে তাকে বিয়ে করতে হবে নাকি?

অসুস্থ সূর্য ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আরতি শেষ চেষ্টা করলেন।

—মেয়েটা কিন্তু ভাল রে।

—ওরকম বহু ভাল মেয়ে শহরে আছে। বড় ঘরেরও ভাল মেয়ে আছে। তাদের খোঁজো—খুঁজে বের করো। বাড়িতে বসে বসে তো আর মেয়ে পাওয়া যাবে না!

আরতি চুপ করতে বাধ্য হলেন। সত্যিই তো, ছেলের বউয়ের খোঁজ করতে হলে কাঠখড় পোড়াতেই হয়। বাবু আমার ঠিক বলেছে। সত্যি তো, গরীব ঘরের মেয়ে আনলে যদি বাবুর পছন্দ না হয়! হাজার হোক, আজকালকার ছেলে! সমানে সমানে না হলে যদি মনের মিল না হয়।

পা টেনে টেনে সূর্য নিজের ঘরে ঢুকল। আরতি মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৪

সমানে সমানেই সূর্যকে বিয়ে দিতে পারলেন সুধাংশুশেখর আর আরতি। উত্তরপাড়ার ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র মেয়ে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর আর পড়াশোনা করেনি। অনেক খাট-পালঙ্ক, গয়নাগাঁটি নিয়ে এসে উপস্থিত হল সূর্যর জীবনে। আরতির একটা ক্ষীণ আশা ছিল, এবারে বোধহয় ছেলের মন

গলবে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেল, তেমন কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না।

এদিকে সুধাংশুশেখরের মধ্যস্থতায় সূর্য বেসরকারি সংস্থায় মোটামুটি চলনসই মাইনের চাকরি করছে। খুঁটির জোর থাকায় অফিসে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তার ওপর গুরুগম্ভীর হাবভাব, বাড়ির মতো কাজের জায়গাতেও লোক ওকে একরকম এড়িয়েই চলে।

বছর ঘুরতে লাগল। আরতি আশায় আশায় ছেলে, ছেলের বউয়ের মুখের দিকে তাকান। সুখবর পাওয়ার সময় কি এখনও হয়নি? বউমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। প্রথম প্রথম নতুন অবস্থায় যে উচ্ছলতা দেখে আরতি ভেবেছিলেন, সূর্য হয়ত এবারে ওঁদেরও কাছাকাছি চলে আসবে। সেই প্রাণবন্ত ভাব আর নেই। কেমন চুপ হয়ে গিয়েছে। কথা বলেই না, মেশিনের মতো কাজ করে যায়।

—মা আপনার পান!

আরতি মুখ তুলে তাকালেন। চোখের কোণে কালি, শীর্ণ মুখ, বড় বড় চোখ। বড় মায়া হল।

—বসো। শরীরটা বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে, ঠিক আছো তো?

মুখ নিচু করে মাথা নাড়ল আরতির ছেলের বউ বিজয়া। খারাপ লাগল আরতির। ছেলের জন্যে প্রাণ দিয়ে করে। বউ করে এনে ঠিকই করেছেন জানা সত্ত্বেও অপরাধী লাগল নিজেকে।

—বাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

—নাহ্। ছোট্ট উত্তর, চাপা নিঃশ্বাস।

—ক'দিনের জন্যে ও বাড়ি ঘুরে আসবে? অনেকদিন ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়নি, আমিও খবর নিতে পারি না—উত্তরপাড়ার ওঁরা সব ভাল আছেন তো? ফোন করেছ?

বেশি কথা বলতে চায় না বিজয়া। ঠিক যে চায় না, তাও নয়। চায় হয়ত, কিন্তু বলে উঠতে পারে না, কোথায় যেন বাধা পায়।

—উত্তরপাড়া যাবে? আবার জিজ্ঞেস করলেন আরতি।

—বারণ করেছে।

—কে, বাবু?

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে প্রশ্ন করতে করতে আরতি উদ্ধার করলেন সূর্য বিজয়ার বাপের বাড়ি যাওয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে।

—আমাকে দেখাশোনা করবে বলেই তোমাকে বিয়ে দিয়ে আনা হয়েছে। সেসব ফেলে রেখে নাচতে নাচতে বাপের বাড়ি দৌড়লে, তাহলে সেখানেই থাকো—আর এ বাড়িতে আসার দরকার নেই।

মা-বাবার জন্মদিন, ভাইফোঁটা, এমনকি দিদির মেয়ের অন্নপ্রাশনও ফোনে সারতে হয়েছে। অন্নপ্রাশনের আগের দিন সূর্য সুস্থ বোধ করছিল না। আরতি তবু অনেক করে বিজয়াকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন।

—একটাই দিদি, তার প্রথম সন্তান। বউমা ঘুরে আসুক না, আমি তো আছি।

—যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলার অভ্যাস তোমার গেল না। একবার হাতের বাইরে চলে গেলে তখন কে সামলাবে, তুমি?

বড় হওয়ার পর থেকে সূর্যর ওই তির্যক ভঙ্গীর সঙ্গে আরতির পরিচয়। ভয় পান। তবু চেষ্টা করলেন আর একবার।

—লৌকিক

বউমাকেও যেতে

—বাজে ভ্যান ভ্যান করো না তো কানের কাছে! ওকে পাঠিয়ে দাও, গা হাত পা টিপে দেবে—ব্যথা করছে। দেখছ সকাল থেকে অফিস যাওয়া হল না, হুঁশ নেই—যত্তসব জুটেছে!

অতক্ষণ ধরে বউমার সঙ্গে কথা হল, কই কিছু বলল না তো! ভেবে আরতির অত আনন্দের মধ্যেও একটু দুঃখ হল।

ঘণ্টাখানেক আরতির সঙ্গে কথা বলে বিজয়া ফলের রস করে সূর্যকে দিতে গেল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সুধাংশুশেখর পাইপ থেকে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বললেন, তাহলে আর কি, আনন্দের আর সীমা রইল না যে!

আরতি অবাক হয়ে সুধাংশুশেখরের মুখের দিকে তাকালেন।

—কী বলছ গো?

—বউমা আমাদের জননী হতে চলেছে। বলে হাসলেন সুধাংশুশেখর।

—সেকি! তোমাকে কে বলল?

—কে আর বলবে! হপ্তাখানেক আগে দেখি বেটি গুটি গুটি করে চেম্বারে ঢুকছে। শরীর ভাল যাচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না, এইসব। আমার তখনই সন্দেহ হল। পরীক্ষা করতে পাঠালাম। দু'দিনের মধ্যেই জেনে সূর্যকে ডেকে পাঠালাম। ও শুনেটুনে অবশ্য তোমাকে বলতে বারণ করল। ভাবলাম বোধহয় নিজে বলতে চায়। বলেনি?

—কই না তো! আরতি বিহ্বল হয়ে সুধাংশুশেখরের দিকে তাকালেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন, হঠাৎ মনটা খচখচ করে উঠল।

—কেন বলল না? আমি জানলে কী হবে? বউমা আজ অত কথা বলল, কই এ ব্যাপারে তো কিছু জানাল না।

—সে আমি কী করে বলব বলো, তোমার ছেলে তুমিই ভাল জানো। বলে সুধাংশুশেখর পাইপে আগুন দিতে দিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

ইচ্ছে সত্ত্বেও ওঁর হাসিতে আরতি যোগ দিতে পারলেন না।

৫

সূর্যর ছেলে বিদ্যুৎ। দু'বছর হতে না হতেই নামের সার্থকতা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। মা-ঠাকুমা তো দূরের কথা পেশাদার আয়াও সামলাতে গিয়ে হিমসিম। অবশ্য বজ্র নাম রাখলেও ভুল হত না। দু'বছরের ওইটুকু শরীর থেকে যে এত আওয়াজ বেরোতে পারে, আরতি বা সুধাংশুশেখরের ধারণাই ছিল না। মাঝে মাঝে আরতির মনে হয়, বাবা-মায়ের প্রায় নির্বাক জীবনযাপনই যে বাঁচার একমাত্র উপায় নয়, তা প্রমাণ করতেই যেন বিদ্যুৎ দিনরাত চেষ্টা চালাচ্ছে। ওদের নিঃশব্দ জীবনের বিরুদ্ধে এটাই ওর সরব প্রতিবাদ।

বিদ্যুৎ আসার পর থেকে সূর্য আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। বাড়ির সকলের মনোযোগ এখন আর ওর দিকে নেই দেখে সূর্যর মেজাজ আরও চড়ে যাওয়ার কথা ছিল, তেমন কিছু হয়নি। বরং আগের চেয়ে আরও খানিকটা গুটিয়ে গিয়েছে। আপিস থেকে ফিরে নীরবে নিজের ঘরে আশ্রয় নেয়। আরতি, বিজয়া বা কাজের মেয়েটি জলখাবার দিয়ে যায়।

এক একদিন হুলস্থূল চলতে থাকে। বিদ্যুতের দৌরাত্ম্যে সকলের অস্থিরতা তুঙ্গে পৌঁছে যায়, জলখাবার দেওয়ার কথা আর মনে থাকে না। সূর্যকে তখন নির্বিবাদে বিছানায় শুয়ে বই পড়তে দেখা যায়, এমন সময় ছুটতে ছুটতে বিদ্যুৎ পৌঁছে যায়। সে বেচারা বাবার গুরুগম্ভীর ভাবমূর্তির তাৎপর্য কিছুই বোঝে না, আর নয়ত সবই বুঝে তোয়াক্কা না করে হেঁচড়পেঁচড় করে খাটে উঠে বাবার পিঠের ওপর সটান ডাইভ দেয়। এই সময় সাধারণত সূর্যর হাত থেকে বই পড়ে যায়, দু'-একবার চশমাও ছিটকে যেতে দেখা গিয়েছে।

এতক্ষণ ধরে বিদ্যুতের পেছনে যে সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, সেই আয়া ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য মোছা ন্যাতার মতো বিদ্যুৎকে ধরে খাট থেকে নামিয়ে দেয়।

—সারাদিন তো এই একটাই কাজ করার জন্যে মাইনে করে রাখা হয়েছে। সেটাও ঠিক মতো করতে পারো না। নিয়ে যাও ঘর থেকে, পড়াশোনার সময় খবরদার যেন বিরক্ত না করে।

সূর্যর ধমকে চটস্থ আয়া বিদ্যুৎকে কোলে তোলা মাত্র সে প্রবল উৎসাহে চিৎকার সহকারে হাত-পা ছুঁড়ে মুহূর্তের মধ্যে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে। ঠিক তার পরেই শোনা যায় সরবে শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। বাড়ির সবাই জানল, সূর্য পড়াশোনা করছে। আর তখনই আরতি, বিজয়া আর কাজের লোকের মনে পড়ে যায়, জলখাবার দেওয়া হয়নি। পা চালিয়ে রান্নাঘরে ফেরে ওরা।

সূর্যর জীবনে বাকি সকলের মতো বিদ্যুতের প্রতিও ওর যে বিশেষ টান নেই, তা বাড়ির লোকের বুঝতে কোনরকম অসুবিধা হয় না।

তবু কাণ্ডটা যখন হল, তখন শুধু আরতি বা বিজয়া নয়, সুধাংশুশেখরও সূর্যকে জানাতে ইতস্তত করেছিলেন।

কাজের মেয়ের দু'হাত জোড়া। এদিকে ভাতের ফ্যান উথলে যাচ্ছে। ঢাকা সরাতে যেটুকু সময় লাগে, আয়া সেইটুকু সময়েই বিদ্যুৎকে ছেড়েছিল। সেই মওকায় সিঁড়ি বেয়ে না নেমে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন বিদ্যুৎবাবু। পরমুহূর্তে পরমাণু বিস্ফোরণের মতো চিৎকার।

গোটা বাড়ি যখন ছুটে এসেছে তখন মেঝেতে রক্তের ছোটখাট পুকুর, বিদ্যুতের ঘাড় বেয়ে রক্তগঙ্গা। অভিজ্ঞ, প্রবীণ সুধাংশুশেখর যখন অনেক চেষ্টা করেও সেই রক্ত থামাতে পারলেন না, তখন নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া স্থির হল।

—একবার দাদাবাবুকে জানাবেন না? কথাটা কাজের মেয়ে মুখ ফসকে বলে উঠতে আরতি আর বিজয়া প্রমাদ গুনলেন। ওঁদেরও যে মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু কেউই মুখ ফুটে বলতে চাইছিলেন না। বলা মানে ফোন করা। সেই ফোন করবে কে?

—তুমি সূর্যকে জানিয়ে দাও, আমি দাদুভাইকে নিয়ে যাচ্ছি। আরতির দিকে তাকিয়ে সুধাংশুশেখর বললেন। আরতির সেই মুহূর্তে মনে হল, ওঁর চেয়ে সুধাংশুশেখরের দায়িত্ব অনেক সোজা। আরতি তাকালেন বিজয়ার দিকে। সে বেচারি হয় ছেলের দুর্ঘটনা আর স্বামীকে সেই খবর দেওযার যৌথ চাপে পড়ে কিংবা সূর্যকে ফোন করার দুরূহ কাজটা এড়াতে ঠিক সেই মুহূর্তে হাপুসনয়নে কাঁদতে শুরু করল।

সুধাংশুশেখর বিদ্যুৎ নামের আওয়াজ ও আস্ফালনের পুঁটুলিটিকে নিয়ে রওনা দিয়েছেন। ফোন তুললেন আরতি। থরথর করে হাত কাঁপছে।

—বাবু, দাদুভাই পড়ে গিয়েছে, মাথা ফেটে গিয়েছে। তোর বাবা নার্সিং হোমে নিয়ে গেছেন।

এক মুহূর্ত কোনও কথা শোনা গেল না। আরতির অন্তরাত্মা হিম হয়ে গেল। নিজেদের অপদার্থতায়

কুঁকড়ে গেলেন। দুর্ঘটনা ওঁর মনে কম আঘাত করেনি, তার ওপর সূর্যর মর্মান্তিক ধাক্কার জন্যে অপেক্ষা করে রইলেন।

—আমি আসছি। বুলেটের মতো দুটো শব্দ। ওই গলা আরতি চিনতে পারলেন না। জীবনে শোনেননি।

—বাবু! বলে ডেকে উঠলেন।

লাইন কেটে গিয়েছে।

সামনে এসে ধমকাবে ভেবে সিঁটিয়ে গেলেন আরতি। সত্যিই তো, এই অপরাধের ক্ষমা নেই। বিজয়া চোখ মুছতে মুছতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আসছে বলল। ম্লানমুখে জানালেন আরতি। দু'জনের কারও অজানা রইলো না, ওই ম্লানমুখের কারণ যত না বিদ্যুৎ তার চেয়ে অনেক বেশি সূর্য।

শাশুড়ি-বউ প্রায় প্রাণভয়ে সূর্যর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ফোন বাজল। সুধাংশুশেখর নার্সিং হোম থেকে জানালেন, রক্ত লাগবে। বি পজিটিভ গ্রুপের।

—আমার ভাইকে ডাকি, মা? ওর তো অনেক চেনাজানা আছে। কয়েকজন মিলে এলে একজন না একজনের রক্তের সঙ্গে মিলে যাবে নিশ্চয়।

—তাই ডাকো। সায় দিলেন আরতি। বাবু ফেরার আগে যতদূর সম্ভব কাজ এগিয়ে রাখতে ওঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। তার পরেই সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজের ঝড়। বিজয়া আরতির শরীর ঘেঁষে প্রায় শরীরের আড়ালে চলে যাওয়ার চেষ্টা কবছে প্রাণপণ।

—বাবা ফোন করেছিলেন? ঘরে ঢোকার আগেই জিজ্ঞেস করল সূর্য।

—রক্ত লাগবে। বি পজিটিভ। বউমা তপনকে লোক জোগাড় করে আনতে বলেছে। ওরা তো ক্যাম্পট্যাম্প করে। আরতির গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

—বি পজিটিভ? আমার বি পজিটিভ! কোথায় আছে, লেক ভিউতে?

দু'জনে সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে সূর্য—নামছে তো না, উড়ছে।

—বাবু, তুই দিস না, তোর শরীর খারাপ হবে। চিৎকার করে উঠলেন আরতি।

—কিচ্ছু হবে না। রুখে উঠল সূর্য। পরমুহূর্তে ফিরে পেছন ফিরে তাকাল—বিজয়া চলো।

হলুদ লাগানো তাঁতের শাড়ি আর হাওয়াই চটি পরে বিজয়া সূর্যর পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

—ভাই আসবে, মিনমিন করে বলতে শুরু করল বিজয়া।

—আসুক। আমার ছেলেকে রক্ত আমি দেব। পাড়ার লোকে নয়।

কথাগুলো আরতিও শুনতে পেলেন। হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওদের চলে যাওয়ার দিকে। বোঝার চেষ্টা করলেন, বিদ্যুতের মাথা ফেটে যাওয়ায় আজ যে সূর্যর দেখা পেলেন, এতদিন কোন মেঘের আড়ালে সে লুকিয়ে ছিল!

স্থানান্তর

অনিতা অগ্নিহোত্রী

আঙিনার করঞ্জ গাছের মাথায় আজ বোধহয় সূর্য ভর করেছে। গাছটা অস্থির হয়ে মাথা দোলাচ্ছে, কিন্তু ডালাপালার জটের মধ্যে থেকে সূর্যটাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছে না। গোরখপ্রসাদ মুখ তুলে দেখলেন রান্নাবাড়ির দেয়ালে জলে মেশা আলো ছায়ার ঝিলিমিলি। তারপর ডান হাতে ধরা জলের গ্লাসটি ধীরে ধীরে মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলেন। তাঁর মনের মধ্যে যেন কেউ বলে দিল যে, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে।

লক্ষ্মী চিলের মতো তীক্ষ্ণ চোখে গোরখপ্রসাদের থালার দিকে চেয়েছিলেন। দেখলেন করলা ভাজা পড়ে রইল, অস্পৃশ্য রয়ে গেল হাটবারে অনেক খুঁজে পেতে নিয়ে আসা কুমড়ো ফুল ভাজাগুলি। তাও সইল। কিন্তু সব শেষে যখন ঘন করে জ্বাল দেওয়া মোষের দুধ ও খেজুর গুড় দিয়ে খাবার জন্য চূড়া করে রাখা ভাত হাত দিয়ে ঠেলে গোরখপ্রসাদ ডান হাতে জলের গ্লাসটি তুলে নিলেন, লক্ষ্মীর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠল। গোরখপ্রসাদ করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর যেন লক্ষ্মীর অন্তরের ভাষা পড়তে পড়তে বলে উঠলেন, লক্ষ্মী সত্যি আজ আর পারছি না। তাঁর মনে হচ্ছিল, নির্বোধ জেদের সঙ্গে গত চারদিন ধরে যে কথাটি তিনি লক্ষ্মীর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে নিজের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করে ফিরছেন, সেটা বোধহয় অবলীলায় তাঁর মুখ থেকে এক্ষুণি বার হয়ে পড়বে। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে জিহ্বাগ্র থেকে কথাটি যেন আবার কোষের মধ্যে ফিরে গেল। নিজের দু'চোখ স্ত্রীর ব্যথিত মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিলেন গোরখপ্রসাদ। তারপর চৌবাচ্চার পাড়ে গিয়ে আঁচাতে লাগলেন।

ভাদ্র মাসের রণরঙ্গী রোদ চড়চড় করে তেঁতুল গাছের মগডালে চড়ে বসেছে। আজকাল বেশিক্ষণ রোদে থাকলে চোখ জ্বালা করে, ভিতরটা দুর্বল লাগে, অথচ হাতে ছাতা বইবার অভ্যেস নেই কোনওকালে, ছাতা নিয়ে বেরোলে বিরক্তি লাগে। গোরখপ্রসাদ কুলথী ও সরষের ক্ষেতের ধারে ধারে পায়েচলা-পথ ধরে নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। চার মাস আগেও নদীর এই খাত একটা বিশাল সাপের খোলসের মতো নির্জীব পড়েছিল।

ধু ধু বালির মধ্যে শুধু দু'-তিনটে সর্পিল রেখায় জল বইত। ওপরের প্রায় সত্তর-আশি একর জমির ছোট-বড়ো কৃষাণদের এক ডেলিগেশন নিয়ে সরপঞ্চ সহদেব রাম, বি ডি ও অফিসে হানা দিয়েছিলেন। সেইদিনই কথাটা গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে যায়। 'পঞ্চায়েতকে কন্টাক্ট আমি দেব না।' সহদেবের মাথায় যেন লাঠির ঘা পড়ল। 'সরকারি কাজ হবে। তবে, ছোটো ডুংরী, কানহা, আর তেতরা পঞ্চায়েতের জন্য যে তের হাজার টাকা রাখা আছে, তার পুরোটাই আমি আপনার পঞ্চায়েতকে দেব। একটি ইমানদার ছেলে দেবেন, আর অন্তত একশজন কৃষাণকে তিনদিন ধরে শ্রমদান করতে হবে।' ব্যস! অস্থায়ী যোজনার খসড়া তৈরি হলো, কুন্তী নদী, মাটির বাঁধ, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়র শত্রুঘ্ন শর্মাকে জনচাপে তিনদিনের মধ্যে এসটিমেট তৈরি করে দিতে

হলো, আর পনেরদিনের মধ্যে এই মিট্টিকা বাঁধ নদীতে আড়াআড়ি বেঁধে ফেলল। পাথর নেই, সিমেন্ট নেই, অস্থায়ী যোজনা, কাজেই বর্ষার তোড়ে ভেসে যাবে জানাই ছিল, কিন্তু কী আশ্চর্য, ভাঙল না। বাঁধের পশ্চিমে টলটল করতে থাকল, কানায় কানায় জল। পুবে ধু ধু বালি। দুই তীরের জমিতে অগুনতি পাঁচ পাঁচ হর্সপাওয়ারের পাম্পের ভটভট—দুই কূল যেন জেগে উঠেছে রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যার মতো। ধান লাগল, কুলথী, আখ—ভাদ্রের মাঝামাঝি এসেও আজ বাঁধের পশ্চিমে টলমল করছে ঐশ্বর্যময়ী নদী।

পায়ে-চলা কৃশ পথটি নদীতীর ঘেঁষে চলে গেছে পুবে। আম, মহুয়া ও বড় বড় বাবলা গাছের গম্ভীর ছায়া। এক জায়গায় এসে পথ ফুরিয়ে গেছে। রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি ছোট বর্গক্ষেত্র। সিমেন্টে তৈরি একটি স্তম্ভ, তাতে শ্বেত পাথরের ফলক। সপ্তাহে অন্তত দু'বার গোরখপ্রসাদ এখানে চলে আসেন, যখনই সময় পান—। বিশ্বনাথের চিতাভস্ম এখানে এনে দিয়েছিলেন নদীকে—তারপর বড়া-ডুংরীর মানুষ চাঁদা তুলে এই স্তম্ভটি তৈরি করে দিয়েছিল।

অফিসের ঘাড়ভাঙা কাজের চাপ, উমেদার, ঠিকাদার ও দালালদের মিলিত কা-কা, গরম ও একঘেয়েমির মধ্যে এই জায়গাটি তাঁকে ডাকে। মনে হয় আরে, বিশ্বনাথকে কতক্ষণ একা রেখে এসেছি। ওপরে সন্ধ্যের আকাশ, সামনে অথৈ বালি, দূরে সবুজ তীরের রেখা, বিকেলের ঝিরঝির বাতাসে এখুনি যেন সে ঘুম ভেঙে উঠে বসল, ঘুমভাঙা চোখে কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না, আর আশ্চর্য, তখন বিশুর তেইশ বছরের চন্দনলিপ্ত মরা মুখ মনে পড়ে না, দেড় বছরের বউয়ার ঘামে ভেজা নিদ্রিত শিশুমুখটিই বার বার মনে আসে—।

জেপুটি কমিশনার এসেছিলেন—বিশুর মৃত্যুর মাসখানেকের পর, অফিসে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। 'যদি আপনি চান—আপনাকে ট্রান্সফার করার কথা আমরা বিবেচনা করব—কবে রিটায়ার করবেন? তাহলে আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টেই—কিংবা কাছাকাছি ধরুন, মুংগের বা ঔরঙ্গাবাদ?' খরার দিনে ঠাণ্ডা জল পানের স্মৃতির মতন এক পরিপূর্ণ তৃপ্তি হঠাৎ আকণ্ঠ ভরে গেছিল।

'নহী স্যার, মুঝে য়হী রহনে দেঁ তো বেহ্‌তহর হোগা, রিটায়ারমেন্ট তক। য়হা মেরে বচ্চেকো হি মৈ নে খো দিয়া, মৈ আউর কঁহী নহী জানা চাহ্‌তা...।'

উত্তরে সমতলে তাঁর দেশঘর। আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের এই পাহাড়ি বিসর্পিল নদীতীরে, সেগুন, মহুয়া ও বাবলার ছায়ায় তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানের দেহাবশেষ রয়ে যাবে—ওকে একা এখানে ফেলে কোথাও কী শান্তি পাবেন গোরখপ্রসাদ? প্রাইমারি স্কুল বিল্ডিংটি সরকারি দাক্ষিণ্য ছাড়াই শেষ হয়ে এলো প্রায়, আজকাল ছেলেমেয়েগুলোকে গাছের নিচে চট পেতে বসতে হয় না, বৃষ্টি এলে ভিজতে হয় না অবলা জন্তুদের মতন!

সামনের মাসে উদ্বোধন হবে, তারপরেও অনেক কাজ বাকি। সরকারি কাজের জন্য ফাইল যাবে রাজধানী। সেখানে ফাইলটিকে তার কক্ষপথে দু'-একটি বিশ্বস্ত লোক দিয়ে কেবলই তাড়া করে বেড়াতে হবে...না। এখন গোরখপ্রসাদ কোথাও যাবেন না।

ডি সি-র মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠেছিল। 'আপনি যা চান তাই হবে। আপনার মতামত জানতেই আমি আজ এসেছিলুম। এখানে ওর স্মৃতির ভার আপনাকে হয়তো দিন-রাত্রি কষ্ট দেবে তাই ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো বদলি চান।'

এম এল এ কাশীরাম মহতো সত্যিই বিরক্ত হয়েছিলেন। জাহ্নবীপ্রসাদের হার্ডওয়্যারের দোকানে বসে এম এল এ গরম সিঙাড়া খাচ্ছিলেন, সঙ্গে চার-পাঁচটি উঠতি মস্তান ছেলে। গোরখপ্রসাদও জীপ থামিয়েছিলেন। জাহ্নবী এখনও লেভী সিমেন্ট ওঠায়নি। রোজ টালবাহানা করছে।

'বি ডি ও সাহাব' কাশীরাম মহতো বাঁকা হেসে বলেছিলেন, 'আপ নে হোম ডিস্ট্রিক্ট মে বদলী হোনে কা ইত্না বড় মওকা কিস্‌লিয়ে খো দিয়া? বড়া-ডুংরীর লোক তো আপনার স্বর্গবাসের জন্য হাজার বাতি জ্বালিয়ে বসে রইবে!'

গোরখপ্রসাদ সহাস্যে বলেছিলেন—'কিঁউ? য়হ্ মেরা হোম ডিস্ট্রিক্ট নহী হো সকতা?'

'নহী'। বলে সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল ওঁর ঠিক সামনে। 'নর্থকে লোগ্ তো যঁফ। সির্ফা পৈসে কমানে আতে হৈঁ!'

একটি নিস্পন্দ মুহূর্ত। তার পরেই গোরখবাবুর একটি বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় ছেলেটির হাড্ডিসার চোয়ালে এসে পড়েছিল, বাঁ হাত দিয়ে তার নোংরা কলারটা ধরে আরও দুটো রদ্দা মারতেই দোকানের বাইরে ছিটকে পড়েছিল সে। 'এই ইঁদুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে কবে থেকে ঘুরছেন?'

কাশীরাম মাহতো গোরখপ্রসাদকে এই ঘটনার পর আর কখনও ক্ষমা করেননি। জেলামন্ত্রীকে বলেছেনও দু'-একবার। তাতেও লাভ হয়নি। গরম কালের বিষ ফোঁড়ার মতন সইতেই হয়েছে গোরখপ্রসাদকে।

রাজধানীর নির্বোধেরা বুঝেও না বোঝার ভান করে কেন? শুক্রাচার্যের মতো কমণ্ডলুতে বসে যে লোক সব আমদানির রাস্তা সিল করে দেয়, তাকে প্রিয় সরকারি দোকান বললেও, রাজনীতি করে যারা বাঁচে তাদের কী হবে? দেখতে দেখতে তবু কেটে গেল তিন বছর।...সামনের ফেব্রুয়ারিতে গোরখপ্রসাদ রিটায়ার করে যাবেন এই বড়া-ডুংরী থেকেই।

ইস্ সাড়ে বারটা বেজে গেল। রিভিউ মিটিং-এর জন্য গ্রামসেবকেরা এসে বসে থাকবে দূর-দূরান্ত থেকে। ঐ, কে যেন আসছে!

'সাব, সাব, বড়াবাবু...' পায়ে চলা পথটা ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে অর্জুন মুণ্ডা। উত্তেজনায় মুখটা কালচে বেগুনি, গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে।

'আ-রে বেওকুফ, চেঁচাচ্ছিস কেন? কী হলো বল্ না—'

বিশু যেদিন সদর হাসপাতালে মারা যায়, ওঁর জুনিয়র ক্লার্ক এইভাবে আর্তনাদ করতে করতে বড় রাস্তা থেকে ঘরের দিকে দৌড়ে আসছিল, যেখানে গোরখপ্রসাদ বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন—দৃশ্যটা তার অবশ্যম্ভাবী সমান্তরালতায় হঠাৎ গোরখপ্রসাদের গা গুলিয়ে তুলল—অশুভ সংকেত।

আর কী অশুভ হবে তাঁর জীবনে—যা হয়ে গেছে তারপর। কিন্তু লক্ষ্মী! লক্ষ্মীর কী কিছু হলো হঠাৎ?

'হজৌর নয়ে সাহাব বৈঠে হৈং অফিস মে, গুসসা কর রহেঁ হৈ, উন্‌কা সামান আউর নঈ মেমসাহাব ঘর পঁহুচ গঈ হৈঁ—সাহাব, আপ জলদি চলিয়ে!'

ঈশ্বর! আজই! ঘর থেকে বেরোবার আগে আজও লক্ষ্মীকে কিছু বলে আসা হয়নি। ভেবেছিলেন সন্ধ্যেবেলা বলবেন রয়ে সয়ে।

অমিতকুমার তাঁর আগমনের অগ্রিম সংবাদ পাঠাননি। গোরখপ্রসাদ ভেবেছিলেন, হয়তো তিন-চারদিনের আগে পৌঁছতে পারবেন না পাটনা থেকে। কেন ভেবেছিলেন সেটাই আশ্চর্য, বাস্তব বুদ্ধিমান মানুষ অনিশ্চিতটাই আগে ভাবে।

'তুই চল, আগে আগে, আমি যাচ্ছি।' অর্জুন মুণ্ডাকে এগোতে বলে পা চালাচ্ছিল অনভ্যস্ত দ্রুততায়, বেশ বৃষ্টি হয়েছে এবার, আর অন্য বছর এই সময়ও মাটি পায়ে ফাট ধরায়। তাঁর চিন্তার মধ্যে অজস্র বৃষ্টি পড়ছিল, খসে পড়ছিল রক্তাক্ত ছিন্ন পাতা, ফুল, ফল, অতীতের নিশ্চিন্ত অবলম্বনচ্যুত

হয়ে। কুলথী ও মড়ুয়ার ক্ষেত যেখানে শেষ, আলাভোলা পথটা দু'ভাগ হয়ে চলে গেছে—দু'দিকে, সরল অন্যমনস্কতায়। এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশর জন্য গোরখপ্রসাদ ভাবলেন, বাড়িই যাবেন, না, অফিস। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রমহিলা এবং একটি সংসারের জিনিসপত্র যদি অখণ্ড আত্মবিশ্বাসে তাঁর ঘরের বারান্দায় চড়ে বসে, তার ধাক্কা কিভাবে একা সামলাবেন লক্ষ্মী। কিন্তু মোড় ঘোরার ঠিক আগেই মনের মধ্যে এই একগুঁয়েমিটা তাঁকে অফিসের দিকে ঘুরিয়ে নিল। আগে অফিস। অন্য সব তারপর।

অফিস আজ সরগরম। চার-পাঁচজন গ্রামসেবক হাতে খাতা খতিয়ান নিয়ে শুকনো মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে। পঞ্চায়েতের সদস্য কয়েকজন, বোধহয় তামাশা লম্বা হবে জেনেই সিঁড়ির কাছে বেঞ্চিতে রুমাল পেতে বসে পড়েছেন। পাড়ার কিছু বেকার ভবঘুরে। এফ সি আই গোদামের ম্যানেজার ও তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিংস্রভাবে দাঁড়িয়ে। পাখা চলছে না—লোডশেডিং।

তাঁরই চেয়ারে, দুই পা সামনের চেয়ারে লম্বা, ইস্ত্রি করা রুমাল চোখের ওপর চেপে ধরে অমিতকুমার বসে আছে। মুখ লালচে। সামনে দাঁড়িয়ে নাজিরবাবু মাথায় সাদা পাকা কোঁকড়ানো চুলগুলোকে মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে খামচে ধরছেন। খুব সম্ভবত এঁরাই আনিয়ে দিয়েছেন জলখাবার—সিঙাড়া, পান্তুয়া, একগ্লাস জল ও পান। অমিতকুমার কিছুই এখনও ছোঁননি—ফলে মাছি বসতে আরম্ভ করেছে খাবারে।

আকস্মিক দেখা অমিতের সুশ্রী গৌরবর্ণ তরুণ মুখ গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে আনন্দ বিষাদের এক তীব্র রেখা টেনে দিল। মনে হলো রাত্রি অন্ধকার। নির্জন বালির ধারে সেই স্মৃতিফলকটি একা দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রাত পাখির দল। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য অব্যর্থ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করে হাত দু'টি কপালে তুলে আনলেন। অমিত উঠল না, তার ডান হাত পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম নমস্কারে কপাল না ছুঁয়েই টেবিলে নেমে এলো।

'আপনি আমার টেলিগ্রাম পাননি? গাড়ি পাঠাননি কেন?'

'টেলিগ্রাম? গাড়ি?' গোরখপ্রসাদ বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন। নাজিরবাবু পকেট থেকে লজ্জিতভাবে বার করলেন ভাঁজ করা গোলাপি তারের কাগজটি। 'এটা আজই এসেছে।'

'হুজুরকে কষ্ট করে জিনিসপত্র নিয়ে বাসে আসতে হয়েছে। কিছুই তো খেলেন না এখনও।'

নাজিরবাবুর এই কথা বোমার মতো ফাটিয়ে দিল অমিতের সংযম।

'খাচ্ছেন না! আর আমার স্ত্রী—ওঃ গড! হয়তো একগ্লাস জলও পাননি—কোয়ার্টার রেডি নেই, নট আ সিংগল থিং ইন অর্ডার।'

গোরখপ্রসাদ সামনের চেয়ারে বসলেন অমিতের। হয়তো প্রথমবার, তাঁর নিজেরই অফিসে। পকেট থেকে ছোট ডায়েরিটি বার করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলেন, 'লক্ষ্মী, আমার বদলি হয়ে গেছে। বলি বলি করেও তোমাকে তিন-চারদিন ধরে বলতে পারিনি। নতুন বি ডি ও সাহেব—বড় পাস করা অফিসার। এখানে ট্রেনিং-এ এসেছেন। ছ' মাস থাকবেন। আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। বাকি কথা তোমার সঙ্গে পরে হবে। তুমি নতুন সাহেবের স্ত্রীর জন্য চা ও কিছু নাস্তা এইটুকু করবে তো?' চিঠির ভাঁজ করে অর্জুন মুণ্ডার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোর মা-জীকে দিয়ে আয়।'

অমিতের দিকে ফিরে বললেন, 'স্যার, আপনি আমার সন্তানের বয়সী। আজ আপনার যে কষ্ট হলো, তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। টেলিগ্রামটা দু'দিন আগে এলেই এইসব এড়ানো যেত। যাইহোক, মাফ করে দেবেন আমাদের। আমি আমার পোস্টিং অর্ডার এখনও পাইনি। আজই রাত্রে রওনা হব পাটনা। দু'-তিনদিনের মধ্যে ফিরে এসেই ভাবছি চার্জ দিতে পারব।'

—দু'-তিনদিন। শুনে অমিতের ভ্রূযুগলে সংশয় ঘনিয়ে উঠল। উহুঁ! উহুঁ! তাকে অগ্রজ ও বন্ধুরা বার বার করে বলেছে, খবরদার। চার্জ নিতে দেরি মানে গণ্ডগোল, কাগজপত্রে হিসেবের গরমিল, বুড়ো অফিসারদের টিপিক্যাল ডিলেয়িং ট্যাকটিকস—মাঝখান থেকে অর্ডারটাই ক্যানসেল করিয়ে দেবে।

ভীষণ গুমোট হচ্ছে ঘরের মধ্যে—বাইরে শিরীষ গাছটায় ভূতুড়ে স্তব্ধতায় বিষণ্ণ। অমিত পকেটে দু'হাত ভরে উঠে দাঁড়াল। 'না, আমি অপেক্ষা করতে পারব না'। তার না এর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর দ্বিধা ও সন্দেহ পড়তে পড়তে গোরখপ্রসাদ মনে মনে হাসলেন।

'বেশ তাই হবে। এখনই । নাজিরবাবু হ্যান্ডওভার রিপোর্টটা টাইপ করতে দিন।'

দপ করে, মনে হলো, আলো জ্বলে উঠল। ঝুলমাখা লম্বা আলমারিটির ভিতর তাকে সাজানো গোরখবাবুর নিজের কেনা বইপত্র, কিছু জরুরি ফাইল, ম্যাপ নকশা, ক'দিন ধরে একটি নোট তৈরি করছিলেন—উত্তরসূরীর হাতে দেবেন বলে—শেষ করা হয়নি। এই ব্লক—উত্তরে যার ধানক্ষেত, নদী ও সমতল। দক্ষিণে নীলকৃষ্ণ পাহাড়, মহুয়ার বন, মিশ্র জঙ্গল ও টাঁড়...নিজের করতলের মতো পরিচিত ছিল। গাঁয়ের ভিতরে গিয়ে মানুষের নাম ধরে ডাকার অভ্যাস ছিল। মুণ্ডা ও বিরহোর পল্লীতে ছেলেবুড়ো বেরিয়ে এসে আত্মীয়তার আনন্দে ওঁকে ঘিরে ধরত। শীতের রাত্রে রাত জেগে কুয়াশামাখা পেনশন ক্যাম্পে বসে—পেনশন বাঁটছেন, কাপের পর কাপ চলেছে ধূমায়িত চা। একবার বিনা সশস্ত্র এসকর্ট টাকা নিয়ে বেরিয়ে কানহাতে প্রায় ডাকাতের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলেন—কত আনন্দের, কত ব্যর্থতার বেদনাদীর্ণ স্মৃতি। বিশ্বনাথ যাবার পর এরাই তাঁকে বাঁচিয়ে, তরুণ করে রেখে দিয়েছে। লক্ষ্মী শুধু বুড়ো হয়ে কুঁজো হয়ে গেছেন রাতারাতি—চলতে গেলে পা কাঁপে, চোখে ভালো দেখতে পান না—কারণ লক্ষ্মী যে শাবকহারা পাখির মতো শোককে কেবলই লালন-পালন করে বড় করে তুলেছেন নিজের বুকের মধ্যে আর নিজে ক্ষয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

কত কিছুই যে ভেবেছিলেন গেরাখপ্রসাদ। ভেবেছিলেন আদর্শবাদী তরুণ অফিসার আসবেন। স্নিগ্ধ এক সন্ধ্যেবেলা বাড়ির অঙ্গনে বসে চা খেতে খেতে তাকে শোনাবেন নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনী। বলবেন—আমার সন্তানের মতো প্রিয় এই এলাকা এবার তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। এবার আমার মুক্তি হলো। নদীর ধারের তাঁর সেই নির্জন স্মৃতিকুঞ্জটি শোনানোর ছিল, কাকেই বা?

চার্জ রিপোর্টে সই করে উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন, ঘরে যাই, চা খাব।'

ঘরে গিয়ে দেখলেন, চার-পাঁচটি লণ্ঠন কোত্থেকে জুটিয়ে অর্জুন তেল ভরছে উঠোনে। যদিও বিজলী এখনও যায়নি। তেল চলকে পড়ছে নিচে। বোধহয় প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে অর্জুন। শোবার শূন্য ঘরটিতে ক্যাম্পখাট পড়েছে। পাখার হাওয়ায় মশারি ফুলে ফুলে উঠছে। কেউ শুয়ে আছে খাটে। শুধু রমণীর দু'টি পা দেখা যাচ্ছে দরজার বাইরে থেকে। রান্নাঘরে আলোটা নিষ্প্রভ, ঝুলমাখা। দরজা ধরে লক্ষ্মী ভূতের মতো দাঁড়িয়ে।

'আমার স্ত্রী।'

অমিত হাতটা কপালে ছোঁয়াল।

'আপনারই ঘরে আপনাকে চা খাওয়াই এক কাপ।'

গোরখপ্রসাদ লক্ষ্মীর পিঠে একটি সস্নেহ হাত রাখলেন। 'অর্জুনকে ডাকো না—এ অর্জুন—চায় বনা। আর তুমি জিনিসপত্র যা পারো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। ডাকবাংলোয় খবর পাঠাচ্ছি—রাত্রে ওখানেই থাকব। বাকি পরে হবে।'

অমিতকে বললেন, 'আপনার অনুমতি নিয়ে আমাদের কিছু জিনিস রাতের মতো এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি, কাল সকালেই নিয়ে যাব।'

ডাকবাংলোর চৌকিদার একটা লুপ্তপ্রায় মোমবাতি বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার আলোতে লক্ষ্মীর ম্রিয়মাণ চেহারার আলোকচিত্রটি প্রত্যক্ষ করে গোরখপ্রসাদ ধীরে ধীরে পথে বেরিয়ে পড়লেন। আজ মোড়ের দোকানে দোকানে মৃদু গুঞ্জন। জাহ্নবী তার গদীতে বসে পায়ের ওপরে মোটা হাতটি আনন্দে বোলাচ্ছে। ফুটপাথের দোকানিরা বিষণ্ণ। একটা বাল্ব কিনলেন গোরখপ্রসাদ। তারপর মিঠাইওয়ালার দোকানের সামনে গিয়ে একটি দীর্ঘ মলিন ছায়া ফেললেন।

মশা বিনবিন করছে। ডাকবাংলোর পিছনের জমিতে আশশ্যাওড়া, বাবলা ও শালের জঙ্গলে অবিশ্রাম ঝিঁঝিঁ ডাকছে। বোধহয় আবারও বৃষ্টি আসবে। অরণ্য তার গাঢ় উৎকর্ণ পাঠাচ্ছে সোঁদা মাটি থেকে। অন্ধকারের মধ্যে অনেক ঢেউ দুলছে, তরঙ্গভঙ্গ হয়েই চলেছে। পাতায় করে দু'টি পরোটা ও তরকারি, শেষে মিঠাই খাওয়া হয়ে গেছে কখন।

লক্ষ্মী হঠাৎ আর্ত গলায় বলে উঠলেন, 'ভাদ্র মাসে কুকুর বেড়ালও বাড়ি ছেড়ে যায় না, আর আমাদের—? কেন এমন হলো গো?'

তার মুখের দিকে চোখ দু'টি স্থাপন করেও ফিরিয়ে নিলেন গোরখপ্রসাদ। যেন বলতে চাইলেন—আর কী, আর কী হওয়ার ছিল আমাদের? সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে সেই তোমার হাতের ভাত, রুটি, আচার ও তরকারির পৌনঃপুণিকতার মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে মৃত্যুর দিকেই তো ভেসে যাচ্ছিলাম আমরা! কোনও আশাই কী ছিল, কোনও সম্ভাবনা!

লক্ষ্মী আবার বলে উঠলেন, 'এতগুলো জেলার কোথাও সরকার ওঁকে ট্রেনিং-এ পাঠাতে পারল না, এই বয়সে তোমাকে শেষে কেন ওরা'— বলতে বলতে কান্নায় গলা বুজে গেল ওঁর, আর শেষ করতে পারলেন না।

কথাটা গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে একরাশ শুকনো পাতা উড়িয়ে চলে গেল। আমাকেই কেন? অমিতের স্ত্রীর মাতুলালয় এই বড়া-ডুংরীর থেকে এগার মাইল দূর। অমিতের শ্বশুরের প্রবল প্রতাপ। তারা কেন বেছে নেবে না তাদের পছন্দের জায়গা, ঘরের কাছের জেলা? গোরখপ্রসাদের ইচ্ছের শক্তি তো দাঁতভাঙা সাপের মতো। নিষ্ফল ব্যথায় সে শুধু নিজের দেহেই দংশন করতে পারে। আর কিছুই না। কালকের নিষ্ফল বাসযাত্রা—রাজধানীর দিকে। সচিবালয়ের বরিষ্ঠ কেরাণিদের ঔদাসীন্যের সামনে মান-সম্মান লুটিয়ে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বার ঘণ্টা শিরদাঁড়া-ভাঙা জার্নির পর। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে বার করে আনতে হবে নিজের ট্রান্সফার অর্ডার—তারপর আবার সেই অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা—সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অন্তর্নিহিত নিরর্থক ক্লান্তি গোরখপ্রসাদকে যেন হঠাৎই লক্ষ্মীর মতো বার্ধক্যের আঘাতে পরাভূত ও জীর্ণ করে দিল।

আঃ বৃষ্টি আসছে—যতই মশারির ফুটো দিয়ে গলে আসুক জঙ্গলের হিংস্র মশারা, বৃষ্টি তো পড়ছে দূরের পর্বতশৃঙ্গে। মেঘ ক্রমশ ছেয়ে গেল অরণ্যের নীলকৃষ্ণ অন্ধকারে। টুকরো টুকরো স্মৃতি স্বপ্ন গোরখপ্রসাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যে অনাবিল আসা-যাওয়া করে। এবার বিশুকে ছেড়ে যেতে হবে। ছায়াঘেরা তার নদীতীরের বিছানায় বিশ্বনাথ রয়ে যাবে একা। একেবারে একা! ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ে...নদীর খাত, নদীর কূল এবং সেই ফলকটির ওপরেও বৃষ্টি পড়ে। ঐ জলে ভিজে বিশ্বনাথ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ছাতা নিয়ে যায়নি? দরজা ধাক্কাচ্ছে, ইস ভিজে চুপসে হয়ে গেল এতক্ষণে—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! টুকরো টুকরো হয়ে যায় ঘুম—সারা ঘরে অন্ধকার, বাকি রাতটা জেগেই কেটে যায়। চিন্তার ফাঁক দিয়ে কোথাও যেন আলো এসে পড়েছে।

ঝড় জল সবে থেমেছে। দরজায় ধাক্কা। অর্জুনের হাতে ধরা পরনের কাপড়ের কষি, ঘুম চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খুলতে এসেছে। 'হুজৌর, আপ?'

'নয়ে সাহাব উঠে হৈঁ?' অমিত মুখ ধুতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাতজাগা রক্তচোখ, বিস্রস্তকেশ, গোরখপ্রসাদকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল—'আপ?'

'আপনি তৈরি হয়ে নিন' গোরখপ্রসাদ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, 'এক জায়গায় যেতে হবে, এখুনি। কাল আপনাকে পুরো চার্জ দেওয়া হয়নি।'

'কোথায় যাব?' মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো অমিত মাথা নামিয়ে নিয়েছে। আগে আগে চলেছেন গোরখপ্রসাদ, পিছনে সে। সূর্য উঠছে, নদীর ওপারের সুগন্ধি সবুজের মধ্যে দিয়ে, পায়ে চলা পথটি এখনও রাত্রির স্মৃতিতে আকুল। ঠাণ্ডা। সম্মৃতিফলকটির কাছে এসে স্নেহে তার সারা শরীরে হাত বুলোলেন।

'এই আমার একমাত্র পুত্র। এখানে একে রেখে যাচ্ছি। আপনি এর চার্জ নিলেন কথা দিন। না হলে আজ তো যেতে পারব না।'

ফলকের সম্পূর্ণ লেখাটি পড়ে অমিত ধীরে ধীরে মাথা তোলে। যেন সূর্যোদয় হয়েছে তার ললাটে। স্মিত মুখে বলে, 'আপনি বিশ্বনাথের বাবা? আমি ওর রুমমেট ছিলাম একবছর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

গোরখপ্রসাদের মনের মধ্যে কে যেন আড়াআড়ি বাঁধ বেঁধে দিল—কানায় কানায় ভরে নদীর পুবপারের মতন। 'না, না আপনিই আসুন আমার সঙ্গে।'

লক্ষ্মী ঘুমভাঙা চোখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে এসে খুঁজছিলেন স্বামীকে। হাতে ধরে টানতে টানতে অমিতকে সেখানে নিয়ে এলেন গোরখপ্রসাদ। 'লক্ষ্মী, এ আমাদের বিশুর বন্ধু। বিশুর দায়িত্ব ওকেই দিয়ে এলাম।'

অর্জুন মুণ্ডা এসে দাঁড়িয়েছে ডাকবাংলোর দরজায়। 'এ অর্জুন, চায় আন, জিলেবী আন, আজ সাবকে দোস্ত আয়েঁ হেঁ।'

'আপনি আজ পাটনা যাচ্ছেন কখন?' অমিত প্রশ্ন করে।

'আমি? যাচ্ছি না।' লক্ষ্মীও আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

'আমি ও লক্ষ্মী ঘরে ফিরে যাচ্ছি। আমার বুড়ো মা আছেন সেখানে। সেখান থেকেই ভলানটারি রিটায়ারমেন্টের চিঠি দেব সরকারকে। আজ বোধহয় এগারটায় বাস।'

অর্জুন আসে, হাতে ঢাউস কালিপড়া কেটলিতে চা ও ঠোঙায় সিঙাড়া, জিলিপি। বলে, 'এম এল এ সায়েব আসছেন, সরপঞ্চ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, সবার জন্যে হিসেব করে নিয়ে এলাম।' কথার পিঠে পিঠেই কাশী মহতো গাঁক গাঁক করে এসে পড়েন। 'একী, একী ভইয়া, ফেয়ারওয়েল হলো না, তুমি না দিলে মালা পরাতে, না ভাষণ, এভাবে তো তোমায় আমরা ছাড়ব না। মহল্লার ছেলেরা এরই মধ্যে তোড়জোড় আরম্ভ করেছে, ওরা শুনতে চায় না।'

'ওদের তাহলে বারণ করতে হবে।' গোরখপ্রসাদ স্মিতমুখে বললেন, 'আর ফেয়ারওয়েলই বা কেন, কাশীবাবু আপনারাই তো বলেছিলেন মিডিল স্কুলের উদ্বোধন আমাকে দিয়েই করাবেন, যেদিনই হোক, যেখানেই থাকি। এখন দু'গাছা মালা পরিয়ে ভাগিয়ে দিতে চান?'

ভিড় হেসে ওঠে। বাসের সময় হয়ে এলো। বাঁধা-ছাঁদা শেষ। জিনিসপত্র মোটামুটি পাঠিয়ে দিয়েছেন আগেভাগে। বাসের মাথায় চড়বে। গোরখপ্রসাদ ও লক্ষ্মী এগিয়ে চলেছেন। পেছনে দু'টি

বাক্স, একটি বেডিং ও ছাতা নিয়ে অর্জুন। দারোয়ান স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। এফ সি আই গোদামে র‍্যাশন দোকানিরা হাত তুলে নমস্কার করল। যত আগে যাচ্ছেন পেছনে ভিড় ঘন হচ্ছে। গোরখবাবু হঠাৎ ঘুরে তাকালেন।

'হুজৌ...র, বাবু...' বলে দূরে কে ডাকছে ব্যাকুল হয়ে।

অর্জুন বলল, 'বাবু ও লখমন পর্‌সাদ আ রহা হৈ। লাংড়া।' লক্ষ্মণপ্রসাদ। তার বাড়ি তো পীরটাঁড়, বিশ মাইল দূর। সে কোত্থেকে এলো? দু' বছর আগে লক্ষ্মণের দু'টি পা-ই কাটা গেছিল ট্রেনের তলায়। রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটাকে লোকেরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়েছিল সদর হাসপাতালে। তারপর অনেকদিন পর দুই পা অ্যাম্পুটেশন হয়ে গেলে লক্ষ্মণ অফিসের বারান্দায় এসে বসেছিল। সেদিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় ভিড়ের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের দিকে চেয়ে গোরখপ্রসাদ হাসলেন। লক্ষ্মণ পাঁচ হাজার টাকার জন্যে দরখাস্ত করেছিল লোনের, গ্রামে একটি কিনারায় দোকান খুলবে। ম্যানেজার বেঁকে বসেছিলেন। যদি লোন রি-পে না করে? বি ডি ও সায়েব, আপনারা টাকা দানখয়রাত করেন, আমাদের পাই-পয়সাও হিসেব করে ঘরে তুলতে হয়। গোরখপ্রসাদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। মুখে হেসে বলেছিলেন, 'আইআর সাহেব আপনি এই ব্লকে আসার পর যে পাঁচটি পার্টিকে ট্রাক, ট্রাক্টর ও মাটাডর কেনার জন্য লোন দিয়েছেন, তারা আগে এক চৌথাও শুধুক। তারপর এ বেচারার টাকা শোধবার জন্য আমি শিওরিটি রইলাম।'

লোন পেয়েছিল লক্ষ্মণ, বিস্তর অপেক্ষার পর। ইতিমধ্যে জেলা রেডক্রশের সঙ্গে লেখালেখি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন গোরখপ্রসাদ। লক্ষ্মণকে আবার ডাকালেন। 'তুই জয়পুর যা। ট্রেনভাড়া দেবে সোসাইটি। ওখানে এক ডাক্তার সাহেব পা-কাটা মানুষদের নতুন পা লাগাচ্ছেন। সেই পায়ে লোক গাছে চড়ছে, দৌড়চ্ছে, যাবি?'

শুনে লক্ষ্মণের ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। ওর বাবা-মার ধারণা, ছেলে সেখান থেকে আর জ্যান্ত ফিরবে না। লক্ষ্মণ শুকনো মুখে দু'-একবার এলো—'কী করব সায়েব, কিছু বুঝতে পারছি না। যাব কি যাব না।'

আরে, লক্ষ্মণের নতুন পা তো লেগে গেছে। জয়পুর থেকে ফিরল কবে? এখনও ক্রাচ নিয়েই হাঁটছে, তবে দেখাচ্ছে তো পুরো মানুষের মতো। অনভ্যাসে একটু বোধহয় হোঁচট খেয়েই হাঁটছে লক্ষ্মণ, বারবার যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠছে তার মুখে—অতিবিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিতেই বোধহয়। কাছে এসে পড়েছে লক্ষ্মণ। 'হুজৌর' হাঁপাচ্ছে বেচারা। একহাতে তার ফুল ও পাতার এক বিশাল তোড়া।

'রাম রাম হুজৌর...।' কাল হি মৈনে শুনা। আপকী বদলী হো গঈ সাব? আজ সবেরে চার বাজে বস্ পকড়া। লেকিন সুন্দরপুরকে মোড় পর বস্ খারাব হো গয়া—ওঁহি সে চল্ রহে হৈঁ হুজৌর!'

সুন্দরপুর—সাত মাইল এখান থেকে। সাত মাইল হাঁটছে লক্ষ্মণ—এক বছর আগের সেই মাংসপিণ্ড। সমস্ত ভিড়টা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লক্ষ্মণের দিকে।

বাস ছাড়বে এবার। সময় হয়ে গেল। ঘন ঘন কাতর হর্ন দিচ্ছে লগনু ড্রাইভার। গোরখপ্রসাদের হঠাৎ মনে হলো, যে লোহার দরজাটা খোলার জন্য হয়রান আকুল হয়ে এতদিন ঠেলাঠেলি করছিলেন, তা যেন এক লহমায় নিঃশব্দে সরে গিয়ে দেখিয়ে দিল ভিতরের অন্ধকারে যা দেখার ছিল। গলার মধ্যে বাষ্পের ভিড় আচ্ছন্ন করে নিল তাঁর কথা বলার শক্তি। শুধু অমিতকে একপাশে ডেকে নিলেন এবং যেন আর কেউ শুনতে না পায় এইভাবে মৃদুস্বরে বললেন, 'বেটা যদি কোনদিন তোমাকে, একজন খঞ্জ বিশ মাইল পথ ভেঙে একগুচ্ছ ফুল দিতে আসে, সেদিন জেনো, তোমার জী ভরে গেছে, ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে তোমার! গর্দীশ-এ-আয়াম, তেরা শুক্রিয়া—' গোরখপ্রসাদ একহাত ধরে লক্ষ্মীকে পাদানিতে চড়ালেন বাসের, 'মৈনে হর পহলু সে দুনিয়া দেখ্ লী।'

উত্তর

সুদেষ্ণা রায়
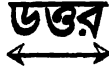
গতকাল দুপুরের ডাকেই এসেছিল চিঠিটা। বাবুই-এর চিঠি। ইতিমধ্যেই সায়ন্তনী চিঠিটা বারচারেক পড়ে ফেলেছে। যাতবার পড়ছে, আরও আরও বিস্মিত হচ্ছে সায়ন্তনী। একেই বলে রক্তের টান। এতদিনে, এতদিনে সায়ন্তনীর মন শান্ত হল। আজ বুঝতে পারল বাবুই কার সন্তান। গত একুশ বছর, থুড়ি বাইশ বছর, মানে যেদিন থেকে বাবুইকে ধারণ করেছে, সেদিন থেকেই এই একটি প্রশ্ন ওকে কুরে কুরে খেয়েছে। বাবুই কার সন্তান? সৌম্যর, কল্যাণের নাকি মনীশের? গত দুই দশক ধরে এই তিনজন সায়ন্তনীর জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে ছিল। এঁদের তিনজনেকই একসময় সায়ন্তনী প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। পরে সময়ের স্রোতে সেই ভালবাসার জোয়ারে পড়লেও, বাইশ বছর ধরে এদের সাহচর্য পেয়ে এসেছে সায়ন্তনী। আর পাবে নাই বা কেন, সৌম্য সায়ন্তনীর স্বামী, কল্যাণ ওর সহকর্মী আর মনীশ, মনীশ সেই মানুষটি কুড়ি বছর ধরে সায়ন্তনীর জীবনের নেপথ্য কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে রয়েছে।

সায়ন্তনীর বয়স তখন বাইশ পেরিয়ে সবে তেইশে পড়েছে। বিজ্ঞাপন সংস্থায় ওর চাকরিটা কনফার্মড। সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সৌম্যর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তখন বছর খানেক হয়ে গেছে। সৌম্যেরও টকটক করে পদোন্নতি হচ্ছে। হবে নাই বা কেন? ওর বায়োডাটাটি যে একেবারে নিখুঁত, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি। আই আই টি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং, তারপর হার্ভার্ড থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পাশ করে ফিরে আসে ভারতে। কারণ সৌম্য আদর্শবাদী। সরাসরি রাজনীতি না করলেও সৌম্য দেশপ্রেমী। দেশকেই দিতে চায় ওর শ্রম। ফেরত এসে মোটা মাইনেরই চাকরি পেল নামী কোম্পানীতে। অবশ্য অ্যামেরিকায় সৌম্য যে চাকরি পেয়েছিল তার যা মাইনে ছিল সেটার তুলনায় এ হয়তো তুচ্ছ। কিন্তু সৌম্য পরোয়া করে না। নিজের দেশে, ডাল-ভাত খেয়েও মাথা উঁচু করে চলতে চাই। এখানে আমার মারুতি গাড়িই ভাল। বি এম ডব্লু নাই বা হল। আমার মতো ছেলে, যার দেশে একটা শিকড় আছে, ভাল চাকরি আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, তার পক্ষে বিদেশে গিয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না।' এই ছিল সৌম্যর বক্তব্য। কিন্তু তা বলে সৌম্যর গতিবিধি কম। আন্তর্জাতিক নয়। চাকরির খাতিরে বিদেশে প্রায়ই যেতে হয় সৌম্যকে। 'এভাবে যাওয়ার একটা মর্যাদা আছে, বলত সৌম্য। আর সৌম্যর এইসব কথাবার্তাই সায়ন্তনীকে আকৃষ্ট করেছিল। ওদের আলাপ হয় এক বন্ধুর বাড়িতে। তারপর মাস ছয়েকের মধ্যেই সায়ন্তনী ও সৌম্য ঠিক করে বিয়ে করবে। প্রায় এক সপ্তাহের নোটিসেই বিয়ে হয়ে যায়। যেহেতু সায়ন্তনী তখন নতুন চাকরিতে জয়েন করেছে তাই ছুটি পায়নি। হানিমুনও হয়নি। অবশ্য সৌম্যর মতে, 'হানিমুনটা একটা বিদেশি কনসেপ্ট। আর আমাদের দেশে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হলে হানিমুন যাওয়ার মানে আছে, নিভৃতে একে অন্যকে জানার জন্য। আমরা ছ'মাস ধরে প্রায় প্রতিদিন মিট করেছি, আমাদের আবার হানিমুন! তাই ওদের

বিবাহোত্তর জীবন শুরু সৌম্যর সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এর কোম্পানি ফ্ল্যাটেই। সুন্দর করে বাড়ি সাজিয়েছিল সায়ন্তনী। সৌম্যও যথেষ্ট তারিফ করত সায়ন্তনীর এই দিকটাকে সৌম্যকে ভালওবেসেছিল সায়ন্তনী।

কল্যাণ, সায়ন্তনীর সহকর্মী। ভীষণ স্মার্ট, আর্টিস্টিক অথচ এফিশিয়ান্ট-ও। শিল্পী মানুষ যাদের সায়ন্তনী চিনত তাদের থেকে কল্যাণ আলাদা। ও দারুণ কপি লেখে, গান লেখে, ছবি আঁকে। অ্যাড-ফিল্ম সম্পর্কেও ওর ধারণা খুব স্বচ্ছ। মাত্র ২৯ বছর বয়সেই ওদের নামী এজেন্সির ক্রিয়েটিভ হেড কল্যাণ। প্রথম থেকেই কল্যাণের সুনজরে পড়েছিল সায়ন্তনী। কল্যাণ ওকে কাজে সাহায্য করত খুব। কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কিছু কথা বলেনি কল্যাণ। এমনকি সায়ন্তনীর বিয়ে ঠিক হওয়ার পর, কল্যাণই অফিসের সবার তরফ থেকে একটা অসাধারণ কার্ড তৈরি করে দিয়েছিল। সেটা আজও রাখা রয়েছে সায়ন্তনীর আলমারিতে। কল্যাণের একটা অভ্যেস সবার নাম ছোট করে ডাকা। সায়ন্তনীকে তাই সায়ো বলেই ডাকত ও। প্রায়ই বলত, 'আমার নিজের এজেন্সি হলে শুধু একজনকে আমি নিয়ে যাব সেটা কে জানো? সায়ো, কারণ ওর মধ্যে রয়েছে জীবনীশক্তি। ও কাজ করতে ভালবাসে। কাজ করলে সায়ো সুস্থ থাকে, ওকে আরও সুন্দরী লাগে।' —কল্যাণের এ ধরনের মন্তব্য সবার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কারণ ও ওরকমই। সায়ন্তনীর বিয়ের মাস ছয়েক বাদে ওর পদোন্নতিব পিছনে কল্যাণের হাত ছিল। তাই সায়ন্তনী প্রোমোশন-এর চিঠি পাওয়ামাত্র ছুটে গিয়েছিল, কল্যাণের কিউবিকল-এ। 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ কল্যাণ, আমি ভাবতেই পারছি না, এত কম সময়ে এই চিঠি। সত্যি আমি... ' কথাটা শেষ হওয়ার আগেই কল্যাণ চেয়ার ছেড়ে উঠে সায়ন্তনীর মুখ দুটো হাতে ধরে, ওর ঠিক ঠোঁটের মধ্যিখানে একটা চুমু খেলো।

সাযন্তনী অবাক, কিন্তু বিরক্ত হল না। কেমন যেন ভাল লাগল ওর। কারণ কল্যাণ শুধু সুন্দরই নয়, ক্যারিসম্যাটিক, ক্রিয়েটিভ। যেসব গুণ চিরকালই সায়ন্তনী অ্যাডমায়ার করেছে। 'সায়ো, তুমি কী বোকা। বোঝো না আমি সেই প্রথমদিন থেকেই তোমাকে ভালবেসেছি।'

—কিন্তু কোনওদিন বলোনি তো।

—বলাটাই আসল?

—না, তা নয় কিন্তু আমার যখন বিয়ে ঠিক হল তখনও তুমি ...

—ভালবাসা মানেই বিয়ে করতে হবে? সায়ো ইউ আর সো অ্যান্টিকোয়েটেড। আমি তোমাকে ভালবাসি তোমার জীবনীশক্তির জন্য, তোমার ভিতরের মানুষটিকে। আর আমি জানি তুমিও আমাকে ভালবাস। আমাদের ভালবাসাটা বিয়ে, সংসার এসবের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। কিন্তু আমি চিরকালই থাকব তোমার। তুমিও আমার। জেনো যে কোনও সময় মুশকিলে পড়লে আমি আছি। সেই শুরু হয়েছিল কল্যাণ-সায়োর ভালবাসা। প্রথমে তা ছিল গল্প-কাজ-করার মধ্যেই আবদ্ধ। মাঝে মধ্যে সৌম্যর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সায়ন্তনীর মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে উঠত। ছিঃ! সৌম্যর মতো মানুষের ভালবাসা পেয়েও কী করে আমি আরেকজনকে ভালবাসি। কল্যাণকে একথা বলামাত্র ও যুক্তি দেখিয়েছিল সায়ন্তনীর এই দুজনকে ভালবাসার পক্ষে।

—দেখো সায়ো, কখনও কেউ সারাজীবন একজনকে ভালবেসে কাটাতে পারে না। মেয়েই হোক বা ছেলে। কিন্তু সমাজ সেটা চায়। ছেলেরা তবু বাইরে কিছু একটা করার সুযোগ পায়। মেয়েদের সাধারণত সেটা হয় না। স্বামী ছাড়া আর কাউকে ভাল লাগলেও তারা সেই ভাললাগা দমিয়ে রাখে।

মনে মনে ভালবাসে। আচ্ছা, যদি মনে মনে স্বামী ছাড়া কাউকে ভালবাসলে সেটা দোষ না হয়, তাহলে সেই ভালবাসাটা পূর্ণ হলে কেন দোষ হবে? এটা শুধু সমাজের একটা সিলি নিয়ম। সত্যি, সায়ন্তনীও ভেবে দেখেছে কল্যাণের কথাটা কত ঠিক। ও তো সৌম্যকে ভালবাসে, ওকে সঙ্গ দেয়, ওর বাড়ি ঘরদোর দেখে, কল্যাণের সঙ্গে প্রেম করলেও সেটা প্রকাশ্যে করে না। কাউকে কোনওদিন অপ্রস্তুত করে না। ওদের ভালবাসাটা ওদের নিজের একেবারে নিজস্ব, কেউ জানে না। কল্যাণের মাধ্যমেই মনীশ মিশ্রর সঙ্গে সায়ন্তনীর আলাপ। মনীশ বড়লোকের একমাত্র ছেলে হয়েও চাকরি করে। কলেজে পড়ায়। দিল্লির জে এন ইউ-তে। টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ওর এডিট পেজ-এ লেখা ছাপা হয়। ও বছরে একবার অন্তত ভিজিটিং প্রোফেসর হিসেবে কোনও না কোনও বিদেশি ইউনিভার্সিটিতে যায়। মনীশ যেন সবকিছু জানে। ভারতের পলিটিক্স থেকে শুরু করে সংস্কৃতি শিক্ষাব্যবস্থা সব বিষয়েই ওর একটা মতামত আছে এবং তা মনীশ যুক্তি দিয়ে বোঝায়। প্রথম দিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো মন দিয়ে মনীশের কথা শুনেছিল সায়ন্তনী। সৌম্য সেদিনই দিল্লি গেছে, তাই সায়ন্তনীর হাতে খানিকটা সময় ছিল। মনীশের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে বাড়ি ফিরেছিল রাত বারোটায়।

শুধু কথা দিয়ে কেউ যদি জাদু করতে পারে তো সে মনীশ। সৌম্য ফিরে আসতে মনীশের কথা সায়ন্তনী সৌম্যকে বলেছিল। সৌম্য ওকে নেমন্তন করতে বলে। মনীশ এসেছিল ওদের বাড়িতে। সৌম্যর সঙ্গেও পটেছিল ওর। যাওয়ার অগে মনীশ সৌম্যকে বলেছিল, 'দ্য মোস্ট প্রেশস থিং ইউ হ্যাভ ইজ ইওর ওয়াইফ, ট্রিট হার ওয়েল।' এরপর মাসখানেক মনীশের কোনও খবর নেই। হঠাৎ মনীশ আবার এল কলকাতায়, এয়ারপোর্ট থেকেই ফোন করেছিল সায়ন্তনীকে। বিকেলে চা-খাওয়ার নেমন্তন। সায়ন্তনীর সেদিন কাজ কম ছিল। এ গেল মনীশের সঙ্গে দেখা করতে। চায়ের অর্ডার দিয়েই মনীশ বোমাটা ফাটাল।

—'তোমাকে আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারিনি সায়ন্তনী, তাই তো কাজের ছুতো করে কলকাতায় চলে এলাম। তোমাকে আমি চাই। না, বলতে দাও, তোমার সংসার ভাঙতে বলছি না, কেবল আমাকে একটু সময় দিও।' সায়ন্তনীর তেইশ বছরের জীবনে এই তৃতীয় পুরুষ। সায়ন্তনী কিন্তু মনীশকে চড় মেরে চলে আসেনি। বলেওনি, 'না আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।' কারণ সায়ন্তনীও মনীশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ও সৌম্যকেও এর জন্য কম ভালবাসেনি, কম পড়েনি কল্যাণের প্রতি ভালবাসারও। তিনজনকেই সায়ন্তনী সময় করে দিয়েছিল সুন্দরভাবে। এমনকি ওরা তিনজনে কতদিন সায়ন্তনীর বাড়িতে আড্ডা মেরেছে একসঙ্গে। কেউ কখনও ঝগড়া করেনি নিজেদের মধ্যে, কল্যাণ বা মনীশ কেউই কখনও সৌম্যকে বলেনি তোমার স্ত্রীকে ভালবাসি। কিন্তু সৌম্য জানত শুধু ওর জন্য ওরা আসে না, সায়ন্তনীকেও ওরা চায় ওদের মধ্যে। মাঝে মাঝে রাতে সায়ন্তনীকে সৌম্য বলেওছে সে কথা, 'আমি কিন্তু এতে রাগ করি না, আমার গর্ব হয়, যাকে ওরা চায়, সে শুধু আমার। কথাটা শুনে সায়ন্তনীর অপরাধবোধটা ছ্যাৎ করে আঘাত করত ওকে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ও বোঝাত নিজেকে, আমি তো সৌম্যকে কোনওভাবে আঘাত দিচ্ছি না সুতরাং...

এভাবেই চলছিল সায়ন্তনীর জীবন। তারই মধ্যে এল সেইদিন। যেদিন ভোর রাত্রে সৌম্যর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পর, সৌম্য সকালের ফ্লাইটে দিল্লী চলে যায়। সেদিনই লাঞ্চ-এর সময় কল্যাণের বাড়িতে যায় সায়ন্তনী। এটা ওরা প্রায়ই করত। লাঞ্চ খেয়ে কল্যাণের ভালবাসার তোড়ে ভেসে যায় সায়ো, কল্যাণের সায়ো। অফিসে ফিরে শোনে ফোন এসেছিল তাজ বেঙ্গল থেকে, মনীশের। তাড়াতাড়ি ডায়াল করল সায়ন্তনী।

—সায়ন্তনী, আজ দেখা করতেই হবে।

—আমার আজ রাত হবে মনীশ, প্লিজ, আজ নয় কাল।

—না, আমি এসে সৌম্যর সঙ্গে আড্ডা মারব, তুমি যখনই আসো এসো। শুধু তোমাকে আজ দেখতে চাই।

—সৌম্য নেই। দিল্লি গেছে।

—দেন আই মাস্ট সি ইউ। তুমি তাজ-এ এসো, রুম ২০৩।

—কিন্তু...

—কিন্তু টিন্তু নয়, তুমি আসছ, আমার গাড়ি আছে তোমাকে পৌঁছে দেবে। আমার নতুন বই বেরুবে তোমাকে সেটা আজ দেখাতেই হবে।

সেদিন রাত্রে প্রথম মনীশের কাছে সায়ন্তনী আত্মসমর্পণ করে। রাতে বাড়ি ফিরে বহুক্ষণ জেগেছিল সাযন্তনী। নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিল। আমি কি মানসিক রোগী? আমি কি বারবনিতারও অধম? একদিনে তিনজনের সঙ্গে...

পরদিন সকালেই কল্যাণ সায়ন্তনীকে বলে ওকে বম্বে যেতে হবে বম্বে ব্রাঞ্চ-এর একটা ক্যাম্পেন-এর জন্য। হয়তো মাসখানেক থাকতে হতে পারে। কালই যেতে হবে। এটা বিশাল একটা কাজ, সায়ন্তনীর জীবনের একটা বড পদক্ষেপ। তড়িঘড়ি সায়ন্তনী ফোন করল সৌম্যকে। সৌম্য খুশি।

—নিশ্চয় যাবে। বাড়িব চাবিটা মার কাছে রেখে যেও। ডোন্ট ওয়াবি, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব সব। তুমি তো জানো, আমি বিশ্বাস করি আধুনিক দাম্পত্য সুখের অন্যতম উপাদান স্বামী-স্ত্রী দু'জনেব সাফল্য। মনীশ সেদিন বিকেলেই দিল্লী ফিরে যায়। হোটেল-এ ফোন কবে সায়ন্তনী ওকে জানায ওর পক্ষে সেদিন দেখা করা অসম্ভব, কারণ ও কালই বম্বে যাচ্ছে। মনীশ হতাশ হলেও জোর করে না। কারণ মনীশ ওরকমই। ও কেবল সায়ন্তনীকে মাঝে মধ্যে চায়। কিন্তু ওর কোনও কাজে বাধা হতে চায় না। বম্বেতে দেড়মাস কাটাতে হ" সায়ন্তনীকে। সকাল বিকেল, কাজ আর কাজ। কখনও মডেল শ্যুট করছে, কখনও আর্টওযার্ক লে-আউট। তারপর আউট-ডোর-ইনডোর। দিনের শেষে হোটেল-এ বালিশে মাথা দেওয়া মাত্র ঘুম। মনীশ ও সৌম্য নিয়মিত ফোন করেছে সায়ন্তনীকে, উৎসাহ দিয়েছে। অবশেষে কাজ শেষ। ক্লায়েন্ট খুশি। সাযন্তনীর জয়জযকার। কলকাতাব প্লেনে উঠে চোখ বন্ধ করে সায়ন্তনী ভাবতে শুরু করল গত দেড়মাসের কথা, সেই দিনটির কথা। কই এই দেড়মাসে তো এত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কাউকে তো সেইরকম ভাল লাগেনি। ও তো কোনও পুরুষেব আলিঙ্গন পাযনি, কই তাতে তো ওর কোনও পূণ্যতাবোধ আসেনি ও কাজের আনন্দেই মেতেছিল। তাহলে, তাহলে ও তো মানসিক রোগী নয়। শুধু সৌম্য, কল্যাণ, মনীশকেই ও ভালবাসে। সে তো বাসতেই পারে। কাবণ কোনও একজন পুরুষ কি ওকে সব দিতে পারবে? হঠাৎ গা-টা গুলিয়ে উঠল সায়ন্তনীর। প্লেনটা কি এয়াব পকেটে ঢুকল? কই না তো। গা গুলোনো ভাবটা বেড়েই চলল। শেষে ও বাথরুমে গিয়ে বমি করল। ব্রেকফাস্ট খেল না। ওই দু'ঘন্টা যে কী কষ্টে কাটল তা ওই জানে। কলকাতায় ফিরে বাড়ি এসেও বমি ভাব যায় না। মাথা ঘুরছে। ওভারওয়র্ক। সেদিন অফিস গেল না সায়ন্তনী। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার বমি ভাব। বমি করলও ও। এবার সায়ন্তনীর ভয় হল? কী হয়েছে ওর। সৌম্যকে বলল ভয়ের কথা। সৌম্য শুনে হেসে খুন।

—সায়ন্তনী তুমি পাগল। এটা তোমার মর্নিং সিকনেস হচ্ছে। ইউ আর পেগনান্ট। সেদিন বিকেলেই

ডাক্তারের কাছে যায় সায়ন্তনী। হ্যাঁ, কনফার্মড, ও ফোর উইকস প্রেগনান্ট। বাড়ি এসে সৌম্যকে কথাটা বলায় সৌম্য খুশিতে মগ্ন। কিন্তু সায়ন্তনী ভয়ে মরছে। ও তো জানে ও কবে প্রেগনান্ট হয়েছে। সেই যে সেদিন, যেদিন ও তিনজনের কাছেই নিজেকে মেলে ধরেছিল। তাহলে, তাহলে, এই শিশুটির বাবা কে?

এরপর একুশটি বছর কেটে গেছে। এর প্রতিটি দিনই সায়ন্তনী ভেবেছে বাবুই কার? কখনও ওর কথা বলার স্টাইল দেখে মনে হয়েছে মনীশ ওর বাবা। আবার যখন ছবি এঁকেছে বা কবিতা লিখেছে তখন মনে হয়েছে তাহলে কি কল্যাণই ওর বাবা? আবার যখন খুব মেথডিকালি অঙ্ক করেছে, তখন মনে হয়েছে, না সৌম্য ওর বাবা। আসলে বাবুই একেবারে ছোট সায়ন্তনী, ওর রেপ্লিকা। তাই চেহারা দেখে বোঝা কঠিন। কেবল বাবুই সায়ন্তনীর চেয়ে অনেক লম্বা। তবে? মনীশ, কল্যাণ, সৌম্য তিনজনই ছ'ফুটের মতো লম্বা। সুতরাং এটা কার কাছ থেকে ও পেয়েছে, তা সায়ন্তনী জানে না। বাবুই আই সি এস ই পাশ করেই পরীক্ষা দিয়ে অ্যামেরিকায় চলে যায়। সেখানে তিন বছর পড়ে, এবার ওর গ্র্যাজুয়েশনের ইয়ার। সায়ন্তনী ও সৌম্য যাবে অ্যামেরিকা। কল্যাণ বলেছে ও চেষ্টা করবে যেতে। মনীশ অ্যামেরিকায়ই পড়াচ্ছে, তাই বলেছে যাবে ওর গ্র্যাজুয়েশন-এ। গ্র্যান্ড একটা ব্যাপার হবে। এই সময়ই এল বাবুই-এর চিঠি। সেই মোক্ষম চিঠি। বাবুই লিখেছে—মা, তোমরা আসছ, খুব ভাল কথা, আমি খুব খুশি। জানো তো টেড বলেছে আগামী বছরই আমরা বিয়ে করব। কারণ আমি পেগনান্ট। বাচ্চা হওয়ার পরই বিয়ে করব। কিন্তু মা আমার সমস্যা হয়েছে। আমি জানি না এটা টেড, না পাবলো, না পিয়ের-এর সন্তান। টেড আমার বয়ফ্রেন্ড। কিন্তু আমি পাবলো ও পিয়েরকেও ভালবাসি। ওদের বিয়ে করব না, কিন্তু ভালবাসি ওদের। জানো তো, ওরা তিনজনে তিনরকম—আমি তিনজনের কাছে পেয়েছি তিন ধরনের আস্বাদ। মা, জানো তো আমি নিশ্চয় অস্বাভাবিক, আমি তিনজনের সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনবার... বুঝতে পারছ তো মা, আর ওইদিনেই আমি কনসিভ করেছি, আমি একেবারে পজিটিভ। মা কী হবে...?

সায়ন্তনী আজ বুঝেছে বাবুই কার মেয়ে। বাবুই ওর মেয়ে, আর কারও নয়। শুধু ওর।

আকাশের রং নীল

বিনতা রায় চৌধুরী

প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব কিছু কষ্ট থাকে। যা কাউকে বোঝানো যায় না। আনন্দ প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিলেই উপভোগ্য হয় কিন্তু দুঃখের ভাগ কাউকে দেওয়া যায় না। তা একান্ত আপনার। কৌশিকীর মন যখন নোনা জলে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন ও সুরের কাছে আশ্রয়ী হয়ে ওঠে। কৌশিকীর গলায় গজল অপূর্ব খেলা কবে। এক সন্ধ্যায় কৌশিকী মগ্ন হয়ে গাইছিল—

'ইউ জিন্দেগী কি রাহা মে মজবুর হো গয়ে
ইতনে হুয়ে করীবকে হাম দূর হে গয়ে...'

এমন সময় প্রেমজিৎ ঘরে ঢুকল। কৌশিকীর একেবারে কাছে এসে গালে আঙুল রেখে বলল, 'তোমার কীসের দুঃখ?' কৌশিকী কোনও জবাব দিল না, গানও থামাল না। একটু সরে গিয়ে পরের লাইন গাইল,

'অ্যায়সা নেহি কে হামকো কোই ভি খুশি নেহি
লেকিন ইয়ে জিন্দেগী তো কোই জিন্দেগী নেহি।'

'কেন, কোথায় তোমার দুঃখ?' প্রেমজিৎ ঘন হয়ে এল। কৌশিকী তানপুরা শুইয়ে রাখল। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বুকের মধ্যেটা দেখাল, 'এইখানে ঘুমিয়ে আছে।'

'হোয়েন সরো ইজ আ স্লিপ, এয়েক আপ ইট নট।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জোরে হেসে উঠল প্রেমজিৎ।

কৌশিকী প্রেমের হাসিতে যোগ না দিয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'না জাগালেও অনেক সুখের মধ্যে সে কাঁটা হয়ে ফোটে প্রেম, তাকে ভোলনো যায় না।'

'বেশ তো, সে একরম ভালই। শুধুই সুখ, সে বড় একঘেঁয়ে কুশি। 'আনব্রোকেন হ্যাপিনেস ইজ বোবিং, ইট শুড হ্যাভ আপস অ্যান্ড ডাউনস।' কৌশিকী আর কোনও কথা বলল না। প্রেমজিতের সঙ্গে কথায় সে কখনও জিততে পারেনি। তর্ক করতেও পারে না কৌশিকী। যেটুকু বলে, শুধু মনে মনে।

প্রেমজিৎ এখনও ফেরেনি। এই সময়টা স্বামীর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কৌশিকীর আর কোনও কাজ নেই। ও ঘরে একা। একা থাকলে মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। প্রেমজিৎ যেমন ভালবেসে ওকে মাঝে মাঝে কুশি বলে ডাকে, মাও ওকে কুশি বলে ডাকত। কবে চলে গেছে মা, কিন্তু অমন করে কুশি বলে আর কেউ ডাকতে পারে না। যে যতই ভালবাসুক। আর প্রেমজিতের ভালবাসা? দীর্ঘশ্বাস পড়ল কৌশিকীর।

কেন এই দীর্ঘশ্বাস। নিজেরই রাগ হল কৌশিকীর, কী দেয়নি প্রেমজিৎ ওকে। যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছে, না চাইতেও দিয়েছে। প্রেমজিৎ দু'হাতে দিয়েছে। অজস্র। গাড়ি, বাড়ি, গয়না-টাকা, অফুরন্ত বিলাসিতার সুযোগ। সত্যি বলতে কী, এতসব কৌশিকী চায়নি কখনও। চাওয়া তো দূরের কথা, বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি। কত সাধারণ জীবন ছিল কৌশিকীর। দু'বেলা খাওয়া পরার কোনও অভাব ছিল না সত্যি কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। গোনা-গুনতি শাড়ি। ঠিক চারটে ব্লাউজ ছিল ওর আর বোনের মিলিয়ে। দুটো দুজনকরে। ওরা মিলিয়ে পরত, যাতে সুবিধা হয়।

পুজোর সময় বন্ধুদের বাজার করা দেখত হাঁ করে। এক একজন তো একটার পর একটা শাড়ি কিনত। তবে যো যতই কম কিনুক, তিনটের কম শাড়ি কারোরই হত না। কৌশিকীর শাড়ি হত একটা। একেবারে গুনে একটা। বাবা ঠিক পুজোর মুখে মুখে গিয়ে কিনে দিতেন। তাও তেমন আহামরি কিছু নয়। ওর একটা, বোনের একটা।

আর এখন? কৌশিকী জানে না ওর কতগুলো শাড়ি আছে। আলমারি উপচে পড়ছে। ব্লাউজও যে কত অজস্র, তারও হিসাব নেই। শুধু আছে তাই নয়, চোখ বুজে কত শাড়ি যে ও দান করে দেয় তার ঠিক নেই। ওর দিতে এত ভাল লাগে। আর প্রেমজিৎ? সে বউয়ের শাড়ি-গয়নার হিসাব রাখে না। কুশি কাউকে দিয়ে দিলেও তার কোনও আপত্তি নেই। শাড়ি কুশির, সে ইচ্ছে হলে দেবে, যা খুশি করবে।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। প্রেমজিৎ এসেছে। ঘড়ির দিকে তাকাল কৌশিকী, প্রায় এগারোটা বাজে। আজ একটু রাত হল প্রেমের। ঘরে ঢুকেই পেছন থেকে প্রেমজিৎ কৌশিকীকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বুকে টেনে এনে চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দিল ওকে। আর কী আশ্চর্য। এত আদর ভালবাসা পেয়েও কুশির শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। ভেতরে ভেতরে সে একটা নিষ্প্রাণ পুতুল যেন। বাইরে অবশ্য সেভাব প্রকাশ করল না। প্রেমজিতের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু কৌশিকীর মন বিবমিষা বোধ করছিল, কারণ ও জানে প্রেমজিৎ সন্ধ্যেটা নিশ্চয় অন্য কোনও নারীর সঙ্গে কাটিয়েছে। হয় সে প্রেমের পার্সোনাল-সেক্রেটারি কিংবা পুরনো বান্ধবী কিংবা নতুন পরিচিত কোনও সুন্দরী।

প্রেম যেদিন পরনারী অনুগমন করে সেদিন এসে কৌশিকীর ওপর ভালবাসা উজাড় করে দেয়। এটা প্রেমের কোনও অপরাধবোধজাত ব্যবহার কি না কৌশিকী জানে না। তবে এটাই প্রেমের স্বভাব বা স্টাইলও বলা যেতে পারে। প্রেম যে তার সব সঙ্গিনীকে শয্যা-সঙ্গিনী করে তোলে তা নয়, ওদের সঙ্গে সময় কাটানো, পান-ভোজন, লং-ড্রাইভ, হাসি-হুল্লোড় খুব ভালবাসে। তার মধ্যে কারও সঙ্গে হয়তো আরও বেশি কিছু করে। সে যাই হোক, কুশির ওপর তার ভালবাসা আর আদর উপচে পড়ে সেদিন। কোশিকী জানে বলেই ভেতরে ভেতরে কাঠ হয়ে ওঠে। প্রেমের চরিত্র অনেকেরে জানা। কৌশিকীর দু-একজন বন্ধু-বান্ধব বলে, 'তুই নীরবে এ সব কিছু সহ্য করিস কী করে?'

কৌশিকী নিস্পৃহ সুরে জবাব দেয়, 'কী করব? আমার তো কিছু করার নেই। যা হবার, হবেই।'

আজ পার্টি দারুণ জমে উঠেছে। প্রত্যেকেই এখানে চূড়ান্তভাবে নিজেকে জাহির করে। কে কাকে দেখে আর কে যে কাকে দেখায়! অনুষ্ঠানটা যাই হোক না কেন, সেটা একটা অজুহাত মাত্র।

তরুণ সেনগুপ্ত-মানসী সেনগুপ্তর বিবাহ-বার্ষিকীর রজতজয়ন্তী বর্ষ পালিত হচ্ছে। বাড়িতে কোনও ঝামেলা না করে চিররোম্যান্টিক দম্পতি হোটেলেই পার্টি থ্রো করেছে। তাতে বন্ধু-বান্ধবরা বেশি খুশি। হোটেলের মেজাজই আলাদা, ইচ্ছে মতো এনজয় করা যায়। বোধহয় যা-খুশি করাও যায়। আনন্দর মাত্রা অতিক্রম করে গেলেও সংকুচিত হবার কারণ নেই।

সবাই সেজেছে। পার্টি মানেই তো সাজ কিংবা সাজ দেখানোর সুযোগ। একটি ছদ্ম উদাসীনতার আড়ালে সবাই খুব সচেতন। অন্যদের মধ্যে আমার সাজ-পোশাক সবার চোখে পড়ার মতো হয়েছে কি না, এসব জানতে প্রত্যেকেই আগ্রহী। কৌশিকীও বেশ যত্ন করে সেজেছে। আর সাজবে নাই-বা কেন? কে না চায় নিজেকে সুন্দর দেখাতে। সুন্দর যে, সে আরও সুন্দর দেখানোর জন্য সাজে। আর অসুন্দর যে, সে নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্য সাজে।

কৌশিকী পরেছে একটা কমলা রঙের ক্রেপ সিল্ক, পার্লার থেকে হেয়ার-স্টাইল করে এসেছে।।

আর গালার এই হারটা, ভারী সুন্দর। কৌশিরীর গত বছর জন্মদিনে প্রেম এটা দিয়েছিল। কৌশিকী 'না-না' করেছিল, বলেছিল, ' সোনার হারই যথেষ্ট। আবার হিরের লকেট দেবার কী আছে?' প্রেম কোনও কথা শোনেনি। নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছিল।

সত্যি কথা বলতে কী, এইসব পার্টিতে কৌশিকী যত্ন করেই সাজে। যাতে প্রেমের পাশে ওকে মানায়। প্রেমকে দেখতে কামদেবতা বলা চলে। তেমন সুন্দর আর স্মার্ট কথাবার্তা। পার্টিতে মেয়েরা ওর উপর ঝুঁকে পড়ে। প্রেমও খুব এনজয় করে। কৌশিকী কিচ্ছু বলতে পারে না। আসলে ও এত ঠান্ডা মানুষ। কখনও কোনওদিন কারও সঙ্গে ঝগড়া করেছে বলে মনে পড়ে না। রেগে গেলে চুপ করে থাকে আর আড়ালে গিয়ে কাঁদে।

আজ পার্টি জমতেই ডান্সিং-ফ্লোরে নাচের আসর জমে উঠেছে। প্রেমের সঙ্গে নাচবার জন্য অনেক মেয়েই ছটফট করছে। তার মধ্যে মিসেস কাপুর অগ্রগণ্য। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। মি. কাপুর বেশি বয়সে এই দুরন্ত অগ্নিশিখাকে বিয়ে করেছেন। একেই বলে মতিভ্রম। একটি কৌচে বসে এখন অবিরাম মদ্যপান করে যাচ্ছেন। আর মিসেস কাপুর পার্টিতে ঢুকেছে স্বামীর সঙ্গেই কিন্তু একটু পরেই সে তার সঙ্গী নির্বাচন করে নেবে। আজ সম্ভবত তার লক্ষ্য প্রেমজিৎ, প্রেমও মেয়েটির সঙ্গে তাল দিচ্ছে।

প্রথম প্রথম প্রেম স্ত্রীকেই ডাকত তার সঙ্গে নাচে অংশ নেবার জন্য, কিন্তু কৌশিকী নাচতে জানে না। সে বাধ্য হয়েই মাথা নেড়েছে। প্রেম নাচতে ভালবাসে, সে উঠে গেছে ফ্লোরে। হয়তো পরে কৌশিকী নাচটা শিখে নিতে পারত কিন্তু ওর ইচ্ছে হয়নি। পার্টিতে গিয়ে তাকে নাচতেই হবে এর কোনও মানে আছে নাকি?

প্রেম আজও অন্যান্য দিনের মতো উঠে গেল। যাবার সময় বলেও গেল কৌশিকীকে। কৌশিকী হেসে মাথা নাড়ল। সে আরও কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করছিল। তার কিছু খারাপ লাগে না। এইসব পার্টিতে আসতে তার ভালও লাগে না। আবার খারাপও লাগে না। আসতে হয়, আসে। কথাবার্তা বলতে হয়, বলে। পানীয়র গ্লাসও কখনও কখনও খেতে হয়, নেয়। কিন্তু পান করে না। ঠোঁটে ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে। কেউ অভিযোগ করলে, হাসে। রাগেও না, তর্কও করে না।

আজ প্রথম থেকেই কৌশিকী লক্ষ্য করছে, মিসেস কাপুর তার বরকে নিয়ে যেন একটু বেশি মশগুল। নিজের কর্তাটি তো কাত হয়ে পড়েছে কৌচে। প্রেম যখন ওকে নাচতে ডাকল, একেবারে ছুটে এল যেন। কৌশিকী মনে মনে নাক কোচকাল।

দূরের ফ্লোরে প্রেম আর অঙ্কিতা কাপুর ঘন হয়ে নাচছে। একটা চেয়ারে বসে কৌশিকী সফ্‌ট ড্রিঙ্কস হাতে অন্যদের সঙ্গে হালকা মজার কথা বলছিল। ওর সামনে এসে বসল কাকলি দুগার। এই মেয়েটি প্রেমজিতের আর একজন ভক্ত। আজ অঙ্কিতার জন্য প্রেমের কাছে পাত্তা পায়নি। এমনকী প্রেম ওকে আজ একবার 'হাই-হানি'-ও বলেনি। কাকলির বেশ বেজার মুখ। চেয়ারে বসে বলেই ফেলল, 'অঙ্কিতাটা একটা বেহায়া, কীভাবে প্রেমের সঙ্গে নাচছে দেখো। নিজের স্বামীর সঙ্গে নাচলেই পারে।'

কোশিকী হাসল, কোনও কথা বলল না।

কাকলি আবার বলল, 'তুমি প্রেমকে এভাবে ছেড়ে দাও কেন?'

'আমি নাচতে জানি না আর ও নাচতে ভালবাসে।'

'শিখে নিলেই পারো।' ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল কাকলি।

'শিখব না, কারণ নাচে ভালবাসি না।' স্পষ্ট গলায় বলল কৌশিকী। কাকলি একটু অবাক হয়ে কৌশিকীর কথা শুনল। কৌশিকী নিস্পৃহ সুরে বলল, 'ও নাচতে ভালবাসে, যার সঙ্গে খুশি নাচুক, আমার কোনও আপত্তি নেই।' একটু থেমে চাপা গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে নাচলেও না।' কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে গেল কাকলি। কিন্তু পার্টি শেষ হয়ে যাবার পর কৌশিকীর কানে কানে জানিয়ে গেল—নাচের সময় যখন 'সুইট অফ ফর এ মোমেন্ট' হয় তখন ও নিজের চোখে দেখেছে অঙ্কিতাকে চুমু খেয়েছে। যথারীতি এবারও কৌশিকী কোনও উত্তর দেয়নি।

পার্টি থেকে ফেরার সময় প্রেমজিৎ নিজে গাড়ি চালাচ্ছিল। ওর ড্রাইভিং দেখে কেউ বলতে পারবে না যে ও মদ্যপান করেছে। কোথাও এতটুকু শিথিলতা নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে প্রেম কৌশিকীর কোমর জড়িয়ে কাছে টানল, 'কাছে এসো কুশি।'

কৌশিকী নড়ল না, শক্ত হয়ে বসে রইল। প্রেমের সর্বাঙ্গে অঙ্কিতা ছড়িয়ে আছে এখনও। হয়তো প্রেমেব ঠোঁটেও অঙ্কিতার মসৃণ ত্বকের গন্ধ লেগে আছে। কৌশিকী এখন আর কাঁদে না কিন্তু কষ্ট তো হয়। বিশেষ করে এই লোকটাকে যে ভালবাসে, কী করবে ও। মানুষ কত অসহায়! অথচ এমন স্বামীকে তো ঘৃণা করাই উচিত। কৌশিকী বোঝে।

প্রেমজিৎ এবার কৌশিকীর কোমর জড়িয়ে শক্ত হাতে কাছে টেনে নিল। ডান হাতে স্টিয়ারিং বাঁ হাতে স্ত্রীর কোমর। ওকে দেখে এই মুহূর্তে কেউ বলতে পারবে না যে মানুষটা পরনারী আসক্ত হতে পারে। মনে হবে একজন আদর্শ পত্নীপ্রেমিক।

কৌশিকী অনুচ্চ স্বরে কেবল বলল, 'কী করে যে পারো।'

প্রেমজিৎ হাসল। ঋজু গলায় বলল, 'হ্যাঁ, আমি পারি একটু আগের আমিও যেমন খাঁটি এখনকার আমিও তেমন খাঁটি। ভগবান যদি দু'হাত ভরে দেন তাহলে আমার নিতে আপত্তি কোথায়? জানো না, আমার নাম প্রেমজিৎ। আমি ভালবাসা দিতেও পারি, নিতেও পারি—অগাধ অজস্র প্রেম জিতে নেওয়াই আমার নেশা। আমার চরিত্রের কোথাও কোনও কার্পণ্য নেই।' কৌশিকী বোঝাতে পারে না যে পৃথিবীতে এমন কোনও স্ত্রী নেই যে স্বামীর প্রেম অন্য নারীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে রাজি হবে।

প্রেম বউকে জড়িয়ে হেসে বলল, 'কুশি, কোনওদিন তোমার কোনও অমর্যাদা করেছি?'

'না।' মাথা নাড়ল কৌশিকী।

'তোমাকে সুখী করিনি আমি।'

'করেছ, অনেক বেশিই করেছ। কিন্তু সুখ কি শুধু জাগতিক বস্তু প্রেম?'

কথার স্রোতের দিক বদল করল প্রেমজিৎ, 'একটা গান গাইবে? তোমার গান শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।'

নাচতে জানি না বলা চলে, কিন্তু গাইতে জানি না, তা তো বলা চলে না। ওর গান শুনেই প্রেমজিৎ একদিন মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে একটুও গাইতে ইচ্ছে করছে না। আজ কৌশিকী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অঙ্কিতার সঙ্গে ওইরকম না করলেই কি চলছিল না প্রেমের? কাকলির কথার হুল এখনও যেন বিঁধে আছে কৌশিকীর গায়ে।

প্রেমজিৎ হালকা স্বরে বলল, 'তোমার বাবার কাছে গেছিলাম আজ, ওনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।'

কৌশিকী কোনও উত্তর দিল না। বাবার সঙ্গে প্রেমের দরকার থাকে না, বাবারই নিশ্চয়ই কোনও

সাহায্যের প্রয়োজনে প্রেম তার সঙ্গে দেখা করেছে। বাবার ছেলে নেই, এই বড় জামাই-ই বাবার ছেলের মতো। বাবাকে কখনও কোনও-অসুবিধায় ভুগতে দেয় না প্রেমজিৎ।

কৌশিকী ভাবল, এই মানুষটা সব দিক থেকে তাকে কিনে ফেলেছে। এর ওপরে রাগ করে আর কী হবে। রাগ করবেই বা কী করে? এতক্ষণ পর স্বামীর কাঁধে মাথা রাখল কৌশিকী।

অফিস-ট্যুরে বাইরে গেছে প্রেম। চেক্ বই সই করে কৌশিকীকে দিয়ে গেছে। ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারে কুশি। বন্ধুদের নিয়ে পার্টি দিতে পারে। খুশিমনে কাউকে কিছু দিতে পারে। প্রাণ ভরে শপিং করতে পারে। প্রেম কোনও কৈফিয়ত নেবে না। কুশি তাকে নিজে থেকে না জানালে, সে জানতেও চাইবে না।

প্রথম প্রথম কৌশিকী দেদার খরচ করত। এখন কিচ্ছু করে না। যে বন্ধুদের পার্টি দিয়ে ভাল মন্দ খাওয়াবে, সেই বন্ধুরাই আড়ালে গিয়ে হিংসেয় আঙুল মটকাবে। হয় বলবে—কৌশিকীর কপাল দেখ, স্বামী একেবারে হাতের মুঠোয়, জলের মতো টাকা খরচ করে ফুর্তি করছে। নয়তো বলবে—আরে যা-যা, বরের ওরকম কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকলে, আমরাও বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়ে বুক ফোলাতুম।

আর শপিং? কী কিনবে কৌশিকী? নতুন নতুন শাড়ি আলমারিতে পচছে। গয়নাও আর কিনতে ইচ্ছে করে না। দু'ব্যাঙ্কে দুটো লকার, হিসাব করে সব লকারে তোলো, নামাও, বিরক্তিকর। আসলে, অঢেলের পর অঢেল আর কাজে আসে না।

চুপ করে ঘরে বসেছিল কৌশিকী। এ ঘরখানা মাঝারি মাপের। পূব-দক্ষিণে বড় বড় জানলা অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে কৌশিকীর। ঘরের তিন দেওয়ালে তিন রকমের ল্যাম্প-শেড। আর অন্য দেওয়ালটা জুড়ে এক ঘন অরণ্য। এই ওয়ালপেপার পোস্টারটা কৌশিকী নিজেই পছন্দ করে কিনেছিল। মাঝে মাঝে এই অরণ্যে একা একা ঘুড়ে বেড়ায় কৌশিকী। অন্য দুই দেওয়ালে নামী শিল্পীর দু'খানা দামি ছবি। এছাড়া বিশেষ কোনও আসবাব নেই এখানে, শোবার ঘরে। বরং বসার ঘরটা অনেক বেশি সাজানো-গোছানো।

কিছু ভাল লাগছে না কৌশিকীর। আগে ভাল না লাগলে গান গাইত। এখন তাও আর ভাল গালে না। প্রেম অফিস-ট্যুরে গেছে, তিনদিন হয়ে গেছে। কাল ফেরার কথা ছিল, ফেরেনি। ওর সঙ্গে যারা গেছিল তারা ফিরে এসেছে। কৌশিকী খবর পেয়েছে, এবার ট্যুরে প্রেমজিতের সেক্রেটারি শ্রীমতীও গেছে। সেও ফিরে আসেনি।

প্রেমজিতের বউদি এসেছিল কাল, নন্দিনী বউদি। নিজের না, দূর সম্পর্কের। কৌশিকীকে খুব ভালবাসে। সব জানে ও। কৌশিকীকে খুব বকল ও, বলল—'তুই কিচ্ছু করতে পারিস না? এভাবে চললে শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবি?' 'আমার তো কিছু করার নেই, যা হবার তাই হবে।' সেই নিস্পৃহ স্বর কৌশিকীর। সিত্যই তো, কী করবে কৌশিকী। স্বামীকে ছেড়ে চলে যাবে? কোথায় যাবে? বাবার কাছে? কোনওদিক থেকেই তা আর সম্ভব না। তাছাড়া প্রেমজিৎকে এতটাই ভালবাসে ও, যে তাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারে না। এত কিছুর পরেও কী করে স্বামীকে ভালবাসে সেটাই আশ্চর্যের।

হ্যাঁ, আর একটা কাজ করতে পারে। নতুন করে আবার বাঁচার চেষ্টা করা। আবার যদি কাউকে ভালবেসে তার সঙ্গে চলে যায়, তো বেশ হয়। শিক্ষা হয় প্রেমের। কিন্তু প্রেমের ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবতেও যে ঘেন্না হয় কৌশিকীর। তাছাড়া, প্রেম যে কৌশিকীকে ভালবাসে এটাও তো সত্যি।

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য তার অটুট। স্ত্রীকে কোথাও এতটুকু অবহেলা নেই। এমনকী কৌশিকীর ওপর প্রেমের ভালবাসাতে কোনও ভেজাল নেই। কৌশিকী সব জানে। আর প্রেমজিতের অসাধারণ পৌরুষ, সেও কি অসামান্য আকর্ষণ নয়।

অফিস-ট্যুর থেকে প্রেমজিৎ ফিরে আসার পরে কৌশিকী গম্ভীর হয়ে ছিল। খুব কম কথা বলেছে। অবশ্য কবেই বা বেশি কথা বলত। তবে প্রেমের ব্যবহারে কোনও তারতম্য নেই। সে আগের মতোই হাসছে। অফিস যাচ্ছে। কাল ট্যুর থেকে ফিরে এসে ভালবাসায় সোহাগে কৌশিকীকে ভরিয়ে দিয়েছে। ওর জন্য দামি একটা উপহারও কিনে এনেছে। আর এবারই প্রথম কৌশিকী স্বামীর মন রক্ষা করার জন্যও সেই উপহার হাতে নেয়নি। খুলে দেখা তো দূরের কথা। কৌশিকী এবার সত্যিই ভারী আহত হয়েছে। এবার প্রেমও বড্ড বাড়াবাড়ি করেছে। শ্রীমতীকে নিয়ে কলকাতার বাইরে উধাও।

কৌশিকী একবার ভালব, বউদি ঠিকই বলেছে এভাবে চলতে থাকলে সব কিছু ওর হাতের বাইরে চলে যাবে, যাচ্ছেও তাই। কিন্তু কী করবে কৌশিকী, কীভাবে সামলাবে? নন্দিনী বউদি বলেছিল, 'ছেলেরা একটু ছলাকলা ভালবাসে কৌশিকী। অত সরল আর নির্ভেজাল হলে চলবে না। তোমার গভীরতা কে মাপবে? যদি অভিব্যক্তিই না রইল। আর কি তার ভাল লাগে? দরকার হলে অভিনয়ও একটু করতে হয়।'

ওরকম বলা সহজ করা সহজ নয়, অন্তত কৌশিকীর পক্ষে সম্ভব নয়। সে ওসব পারে না। তাই ভয়-ভয় করে ওর। এক অজানা আশঙ্কা উঁকি-ঝুঁকি দেয়। মনে হয় সব ভেঙে পড়বে না তো তাসের ঘরের মতো!

কৌশিকীর মাসতুতো বোনের বিয়ে। প্রেমজিতের খুব কাজের চাপ যাচ্ছে, একটুও সময় পাচ্ছে না, বলল, 'তুমি চলে যাও একাই, আমার অনেক কাজ।'

'না, সে হবে না। তোমাকেও যেতে হবে। নইলে আমিও যাব না।'

'সেটা খারাপ হবে।' প্রেমজিৎ কৌশিকীকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

'সে আমিও জানি, খারাপ হবে। বিশেষত আমরা অতগুলো টাকা ক্যাশ দিয়েছি। ভাববে, ডাঁট দেখিয়ে এল না'। এরপর আর কথা চলে না।

প্রেমজিৎ আর কৌশিকী বিয়েবাড়ি গেল। আর সেই বিয়েতেই দেখা হল কৌশিকীর পুরনো বন্ধু দয়িতার সঙ্গে। সেই দয়িতা। কলেজে কত ছেলের বুকে ঝড় তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত পছন্দ করল কলেজের বাইরে একটা সিঙ্গি ছেলেকে। পরে শুনেছে, তাকেও নাকি বিয়ে করেনি দয়িতা। এখন একটা নামী-দামি কোম্পানিতে কাজ করে। ভালই আছে। এসব খবর আজই পেল কৌশিকী। দয়িতা আরও স্মার্ট হয়েছে, আর চৌখস। একেবারে টগবগ করে ফুটছে। সত্যি বলতে কী কৌশিকীর ইচ্ছে ছিল না দয়িতার সঙ্গে প্রেমজিতের পরিচয় হোক। কিন্তু দয়িতাই জোর করে 'তোব বর কোথায়— তোর বর কোথায়' বলে আলাপ করে ছাড়ল।

এতদিন ধরে প্রেমকে দেখে আসছে কৌশিকী। ও প্রেমকে চেনে। আসলে প্রেম আমুদে। মেয়েদের ওপর ওর দুর্বলতা আছে। মেয়েরাও ওর ওপর আছড়ে পড়ে। প্রেমও এনজয় করে। একটা খেলার মতো। তাই বলে বিশেষ কোনও মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে না। এই তো সেদিন পার্টিতে অঙ্কিতা কাপুরকে নিয়ে ওরকম কাণ্ড ঘটাল কিন্তু তারপর অঙ্কিতার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগই নেই। নারীলিপ্সা প্রেমকে দিয়ে যতই রংদার ঘটনা বা কাহিনী তৈরি করুক, আসলে প্রেম তার ঘর, ঘরনি ও আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে খুব সচেতন। সেখানে কোনও কমপ্রোমাইজ করে না প্রেমজিৎ। কৌশিকী এ কথা জানে।

একদিন দয়িতা ফোন করল। কৌশিকীই ফোন ধরল। কেমন আছিস? ভাল আছি গোছের দু-একটা কথা বলে সোজা বলল, 'প্রেমকে ফোনটা দে তো।'

প্রেম ফোনে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, 'সো কাইণ্ড অব ইউ', 'রিয়েলি'? 'হাউ নাইস', 'অফকোর্স', 'থ্যাঙ্ক ইউ'। কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে রাখল প্রেমজিৎ।

কৌশিকী জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলল দয়িতা?'

'একটা নাচের প্রোগ্রামে যাবার জন্য নেমতন্ন করল।'

'তোমাকে একাই বলল? বন্ধু তো আমারই, আমাকেও বলা ভদ্রতা ছিল ওর।' কৌশিকী যেন একটু বিরক্ত হল।

'হ্যাঁ, আমাকে একাই তো যেতে বলল, তোমার কথা তো কিছু বলল না, তোমাকে কিছু বলেছে?'

'আমাকে ফোনট দিলে কোথায়, নামিয়ে রাখলে তো!'

'আরে , ও তো কথা বলেই ফোন কেটে দিল।'

দয়িতাটা চিরকালই চালবাজ। এখন আবার কী চাল দিচ্ছে কে জানে? মনে মনে কৌশিকী কথাগুলো বলল।

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে প্রেমজিৎ বলল, 'এ ধরনের অনুষ্ঠানে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেসের নেমতন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তোমাকে বলেনি কারণ তুমি নাচ-টাচ পছন্দ করো না, হয়তো সেইজন্যই।'

কৌশিকী চুপ করে ছিল। প্রেমজিৎ এখন অফিসে বেরোচ্ছে, কী আর বলবে। প্রেমই বলল, 'বেশ, তোমার বন্ধুর অনুষ্ঠানে যাব না, হল?'

এবারও কৌশিকী কোনও কথা বলল না।

গভীর রাতে ফিরে এসেই প্রেমজিৎ কৌশিকীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। কৌশিকী হাত দিয়ে ঠেলে দিল প্রেমকে। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে কিছুটা নিস্পৃহ স্বরে কেবল জিজ্ঞাসা করল, 'নাচের অনুষ্ঠানটায় শেষ পর্যন্ত গেলে না?'

'কী করব? আমি তো না-ই বলেছিলাম। দয়িতা নিজে এসে, এমন জোর করতে লাগল, বাধ্য হয়ে গেলাম। তবে অনুষ্ঠান হল বটে একটা। দয়িতাও একজন তুখোড় নাচিয়ে।'

'সে আর কে না জানে।' কৌশিকী না চমকে বলল।

সেই শুরু। দয়িতা যখন তখন ফোন করে। কখনই কৌশিকীর সঙ্গে কথা বলে না। যদি কৌশিকী কখনও ফোন ধরে, অম্লান গলায় বলে, 'প্রেমকে ফোনটা দে তো।' এভাবেই চলছে। আর কৌশিকী বেশ অবাক হয়ে দেখছে দয়িতার সঙ্গে প্রেম বেশ ইনভলভড্ হয়ে পড়েছে। কোনও একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম এভাবে জড়িয়ে পড়ে না। আগে কখনও দেখেনি কৌশিকী।

তাছাড়া প্রেমের আচরণও বদলে গেছে। কৌশিকীর সঙ্গে মাঝে মাঝেই গম্ভীর হয়ে কথা বলে, প্রেম এতদিন যেখানেই যাক, যাই করুক, স্ত্রীর মর্যাদা সম্বন্ধে সবসময় সজাগ থাকত।

স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে নেমতন্ন থাকলে কৌশিকীকে ছেড়ে একা কখনও যেত না। এক-একদিন, শাড়ি বেছে দিত—এইটা পরো আজ। কখনও-সখনও গয়না পছন্দ করে দিত। এটা তোমাকে খুব মানায়। প্রেমজিতের মধ্যে সেই স্বচ্ছন্দ ভাবটা আর নেই।

এবার একটা পার্টিতে যাবার নেমন্তন্ন এল। প্রেমজিৎ জানাল, এই পার্টিতে দয়িতাও আসছে। ব্যস্ কী যে হল কৌশিকীর, হঠাৎ বেঁকে বসল, 'যাব না আমি।'

কয়েকবার অনুরোধ করল প্রেম, তারপর বলল, 'তাহলে আমাকে একাই যেতে হবে।'

এতটা আশা করেনি কৌশিকী। ভীষণ অভিমান হল ওর, বলে ফেলল, তা হলে তাই যাও।'

সত্যি সত্যি প্রেম স্যুট-টাই পরে গট গট করে পার্টিতে চলে গেল। কৌশিকী একটু অবাকই হয়ে গেল। এরকম কখনও হয়নি।

অভিমানে গোঁজ হয়ে বসে রইল কৌশিকী। কিন্তু সময় যত গড়াতে লাগল, ততই মনে মনে ছটফট করতে লাগল। পার্টিতে মিসেস প্রেমজিৎ নেই। সেখানে দয়িতা রয়েছে। কী করছে দয়িতা? প্রেমজিৎকে ঘিরে রয়েছে নিশ্চয়ই। তখনই কৌশিকী বুঝতে পারল, কখনও কখনও অভিমানের চেয়ে অধিকারকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। মানুষের অধিকারই মানুষের হাতিয়ার।

'পায়া তুমে তো হাম্‌কো লাগা তুমকো খো দিয়া
হাম দিল পে রোয়ে ঔর ইয়ে দিল হামপে রো দিয়া
পলকো সে খোয়াব কিউ গিরে.....।'

তানপুরার তারটা ছিঁড়ে গেল, মাঝপথেই থেমে গেল সুর। খুব মন দিয়ে গজলটা গাইছিল কৌশিকী। হঠাৎই চুপ করে গেল। খেয়াল করে দেখল ওর চোখের পাতা কখন ভিজে গেছে।

উঠে পড়ল কৌশিকী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেমন দেখতে আমাকে? সবাই তো বলে সুশ্রী, তাই? আলমারি থেকে বার করে একটা নতুন তাঁতের শাড়ি পড়ল। হলুদ জমিতে সবুজ ফুল। পছন্দ হল না। একটানে খুলে ফেলল শরীর থেকে। কৌশিকীর সুঠাম তনুতে এবার শোভা পেল গোলাপি ঢাকাই। তাও ওর অস্থির হাতে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। তারপর বোমকাই—তারপর সোনালি কাঞ্জিভরম। না-না, কিছুই ভাল লাগছে না। হলুদ তাঁত ছেড়ে সে তো কাঞ্জিভরমে পৌঁছেছিল, কী সুখ হল? কৌশিকী আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ, মনে হল, আকাশের ওই নীল রং যেমন মিথ্যে তার জীবনের এই বর্ণময় সমৃদ্ধি তেমনই মিথ্যে। আকাশের সত্যি যদি কোনও রং থাকে তা হল শূন্যতা। সেই শূন্যতার ওপরে মিথ্যে নীল আবরণ মানুষকে আবিষ্ট করে রাখে।

কিছুদিন ধরে এমন কিছু ঘটছে যা এই ক'বছরে কখনও ঘটেনি। তার চেয়েও বড় পরিবর্তন প্রেমজিতের দয়িতার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এসেও কৌশিকীর কাছে ধরা দেয় না ও। যে স্বভাব একদিন কৌশিকী অপছন্দ করত, বোধহয় ঘৃণাই করত, সেই ঘৃণ্য কাজটি দয়িতা সম্বন্ধে কোনও অপরাধবোধ নেই। অর্থাৎ সত্যিই দয়িতার সঙ্গে ইনভলভ্ হয়ে পড়েছে প্রেম।

সেই মুহূর্তে একটি কথা মনে পড়ে কৌশিকী শঙ্কিতবোধ করে। দু-তিনদিন আগে ফোনে কৌশিকী দয়িতাকে প্রবল তিরস্কার করেছিল, 'আমার স্বামীকে নিয়ে কেন পড়েছিস দয়িতা? তোর লজ্জা হওয়া উচিত।'

একটুও লজ্জিত না হয়ে দয়িতা কাটা কাটা উত্তর দিয়েছিল, 'না, কারণ শিগগিরই প্রেমজিৎ আমাকে বিয়ে করবে।'

'কী বলছিস? তোর স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি।' অস্ফুট চিৎকার কৌশিকীর।

'স্পর্ধা? আমার? দেখা যাক তা হলে।' খিলখিল করে হেসে উঠল দয়িতা।

কৌশিকী ফোন ছেড়ে দিল। ও অল্প-অল্প কাঁপছিল। উত্তেজনায় না কি আশঙ্কায়? মনে মনে বলল, না-না প্রেম এ কাজ কিছুতেই করতে পারে না। কৌশিকীকে তার জায়গা থেকে নামাতে পারে

না প্রেম। ও প্রেমকে চেনে। নারীসঙ্গ প্রেমের চরিত্রের দুর্বলতা। একটু এনজয় করছে, দু'দিন পরেই দয়িতাকে ভুলে যাবে।

এ কথা ভেবেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল কৌশিকী কিন্তু কাল নিজের কানে প্রেমকে ফোনে বলতে শুনল, প্রেম আবেগভরা গলায় বলছে—'তোমার সঙ্গে কেন আগে দেখা হয়নি দয়িতা?'

এ কথা শুনে কৌশিকীর হৃৎপিণ্ড ঠান্ডা হয়ে গেছে। ওর আঙিনা জুড়ে দেখতে পেয়েছে কালবৈশাখীর ঝড়। কিন্তু মুখে কিচ্ছু বলতে পারেনি। তার চেয়েও কঠিন কথা এই যে, প্রেম বোধহয় বুঝেছে যে কৌশিকী তার কথা শুনতে পেয়েছে। বুঝেও প্রেমের আচরণে এতটুকু কুণ্ঠা দেখা যায়নি। বরং সেদিন থেকে ও কৌশিকীর সঙ্গে কথা বলা আরও কমিয়ে দিয়েছে আশ্চর্যভাবে।

তানপুরার ছেঁড়া তারটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে উঠে দাঁড়াল কৌশিকী। সারা ঘরে চোখ বোলাল। এই ঘর তার। একটু একটু করে সাজিয়েছে মনের মতো করে। এই ঘর আর তার থাকবে না? এর অধিকারী হবে দয়িতা? ছটফট করে উঠল কৌশিকী। সারা ঘরে একটি একটি করে আসবাবপত্র ছুঁয়ে দেখতে লাগল। প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে কিছু না-কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। চাবি ঘুরিয়ে ও আলমারি খুলল। অজস্র শাড়ি। অজস্র পোশাক। কিছুদিন আগেও কৌশিকী মনে করেছে, এ সবের ওপর তার কোনও আকর্ষণ নেই। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে—খুব আকর্ষণ আছে। চাবি ঘুরিয়ে লকার খুলল। কত গয়না, আরও আছে ব্যাঙ্কের লকারে। এ সব সে তাচ্ছিল্য করেছে কত সময়। এখন মনে হচ্ছে এসব তাঁর নিজস্ব। কত স্মরণীয় অনুষ্ঠানে প্রেম তাকে নানাভাবে উপহার দিয়েছে এগুলো।

আলমারি বন্ধ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল কৌশিকী। প্রায় এক মাস হতে চলল প্রেমজিতের সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়েছে। কোনও সংসর্গ নেই। হঠাৎ কী খেয়াল হল আজ কৌশিকীর, ইচ্ছে হল আজ শপিং করবে।

প্রেমজিৎ অফিসে পৌঁছে এখন আর গাড়ি ছেড়ে দেয় না আগের মতো। তাতে কী, ট্যাক্সিতে ঘুরবে যেমন খুশি।

সত্যি সত্যি আজ পাগলের মতো কেনাকাটা করল কৌশিকী। সারা শহর হন্যে হয়ে ঘুরে কিনল নতুন ঝাড়বাতি, একটা মাঝারি কার্পেট, সন্দর সুন্দর ওয়াল-হ্যাঙ্গিং, মনের মতো ফুলদানি আর অজস্র ফুল। ঘর ভেঙ্গে যাবার আগে কি ও শেষবারের মতো আঁকড়ে ধরছে সবকিছু?

তাছাড়া এতদিনে কৌশিকী বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আগে যে জীবন ছিল, সেখানে ফিরে যাওয়া কোনওমতেই আর সম্ভব নয়। সচ্ছলতা তার সর্বাঙ্গে, স্বাচ্ছন্দ্য তার পায়ে পায়ে। একে ছেড়ে যাওয়া কারও পক্ষেই যে সম্ভব নয়। একবার বিদ্যুতের আলোয় অভ্যস্ত হয়ে গেলে, প্রদীপের আলোয় আর ফেরা যায় না।

নতুন কেনা সমস্ত উপকরণ দিয়ে কৌশিকী আজ ঘর সাজাল। সাজল নিজেও। প্রেমজিৎ ফিরলে আজ তাকে অবাক করে দেবে। পুরনো সমস্ত দুঃখ ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে, এসো সব ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করি।

রুম-ফ্রেশনারের গোলাপ-গন্ধ সারা ঘরে মোহ ছড়াচ্ছিল। অনেক আশা নিয়ে বসে রইল কৌশিকী। কে বলেছে সে বিপ্রলব্ধা নারী, সে তো খণ্ডিতাও নয়, এমনকী তাকে আজ অভিসারিকাও বলা যাবে না। সে আজ বাসকসজ্জিতা, আজ সে উপযাচিকা।

প্রেমজিৎ এল বেশ রাত করে। এসে সে সাজানো ঘর দেখল না। দেখল না তার উৎকণ্ঠিতা স্ত্রীকেও। সে আজ দয়িতার কাছে শপথ করে এসেছে। তাই প্রায় বিনা ভূমিকাতেই বলল, 'কৌশিকী,

আমি তোমার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে চাই।'

'তারপর?' বেশ উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করল কৌশিকী।

'দয়িতাকে বিয়ে করব আমি।'

'তুমি তা করতে পারো না।' অতটাই কি ঋজু শোনাল কৌশিকীর স্বর। নাকি ভেঙে গেল একটু?

ভীষণ নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাকাল প্রেমজিৎ, তারপর কঠোর স্বরে যেন ব্যঙ্গ করে বলল, 'করলে কী করবে তুমি?' বলে আর দাঁড়াল না, ভেতরে চলে গেল। আকণ্ঠ সুরা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল।

শূন্য ঘরের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রইল কৌশিকী। সত্যিই তো, কী করবে ও? মনে হল নতুন কেনা ঝাড়বাতিটা ওকে ব্যঙ্গ করছে। মেঝের কার্পেটটা মুখ মচকিয়ে উপভোগ করছে কৌশিকীর অপমান। ইচ্ছে হল, সব ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ করে দেয়। কিন্তু পারল না। কৌশিকী কোনওদিন পারেনি। কোনওদিন জ্বলে উঠতে পারেনি। নন্দিনী বউদি বলেছিল, এভাবে চললে শেষ পর্যন্ত সামলাবি কী করে। ঠিকই বলেছিল।

আয়নার মধ্যে নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখল কৌশিকী। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, মাথার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আগুন বেরোচ্ছে শরীর থেকে। কানে বাজছে প্রেমজিতের নিষ্ঠুর স্বর 'কী করবে তুমি'?

অনেক সহ্য করেছে কৌশিকী। প্রেমের অন্যায় লাম্পট্য সহ্য করছে নীরবে। উপদ্রুত জীবন চায়নি কখনও, তাই। কিন্তু আজ, কী করবে ও? কেমন করে বাঁচাবে ওর সব কিছু।

কৌশিকী সহসা যেন নিজের নামের অর্থ বুঝতে পারল আজ। মনে হল কোথায় যেন শঙ্খ বেজে উঠল। যেন কাসর-ঘণ্টা বাজছে কোথাও। মুহূর্তের মধ্যে তার খেলাঘর ওলট-পালট হয়ে গেল।

সকালে শোবার ঘরে প্রেমজিতের প্রাণহীন নিথর দেহটি যখন পাওয়া গেল। তখন দেখা গেল বসার ঘরে নতুন পাতা কার্পেটের ওপর, নতুন কেনা ঝাড়বাতির নীচে, একেবারে শান্ত মেয়েটির মতো কৌশিকী চুপ করে বসে আছে।

আরও পরে কত লোক এল। নন্দিনী বউদি কৌশিকীকে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'তুই তো শেষ হয়ে গেলি কৌশিকী। কেউ বাঁচাতে পারবে না তোকে। এ কী করলি তুই?'

'কী করব? আর কী করার ছিল? যা হবার তা হবে।' একেবারে পুরনো নিস্পৃহ সেই স্বর কৌশিকীর।

পুলিশ ঢুকছে বাড়িতে। কৌশিকী সেসব দেখছেও না। জানলার গরাদে মুখ চেপে নীল আকাশেব দিকে তাকিয়ে আছে ও। তানপুরার তার ছিঁড়ে গেছে, সেখানে আর সুর নেই, কবেই বা তার জুড়ে ছিল! শুধু খালি গলায় খুব নিচু স্বরে প্রিয় গজল গাইছে কৌশিকী—

'আপনি আঁখো কে সমুন্দর মে উতর জানে দে
তেরা মুজরিম মুঝে ডুবকে মর জানে দে......'